জীবনলীলা

জীবনলীলা

কাকাসাহেব কালেলকর

অনুবাদক

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

অনুক্রমণিকা

জীবনলীলা

সংশোধন :

পৃ ৩০	পংক্তি ৩	'পাণ্ডা' স্থলে	'মহিষশাবক'
পৃ ১১৬	পংক্তি ১৫	'পিসীমা' স্থলে	'অনন্তবুয়া'

প্রস্তাবনা

কোথাও নিশ্চয় লিখিয়াছি যে আমার ভারতভ্রমণের বর্ণনা শুধু সাহিত্য-বিলাস নয়, ভারতভক্তি ও ভারতপূজারই একটা রূপ। ভগবদ্‌গুণ-কীর্তন যেমন নবধা ভক্তির একটা প্রকার, তেমনই ভারতের ভূমি, উহার পাহাড় ও পর্বতশ্রেণী, নদী ও সরোবর, গ্রাম ও শহর, উহার অধিবাসীরা ও তাহাদের পৌরুষ, তাহাদের আশ্রয়ে বাস করে যে সব গ্রাম্য পশুপক্ষী ও তাহাদের সঙ্গে অসহযোগ করিয়া স্বাধীনতার আনন্দ ভোগ করে যে সব বন্য পশুপক্ষী—এ সকল বর্ণনা করিয়া তাহাদের পরিচয় প্রচার করা ভারতভক্তির এক অতি আনন্দময় রূপ। এই ভক্তি একান্তেও সাধন করা যায়, বহুলোক লইয়াও করা যায়। যখন কোনও পরিব্রাজক যুবকদের দল্ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন আর বলেন, 'আপনার ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি পড়িয়া আমরা ভারতভ্রমণে বাহির হইয়াছি,' তখন আমার বড় আনন্দ হয়, তাঁহাদের প্রতি এমন কৃতজ্ঞতা বোধ করি, মনে করি তাঁহারা বুঝি আমার উপকার করিবার জন্যই বাহির হইয়াছেন।

আমার এই সকল ভ্রমণবৃত্তান্তের যে সব বর্ণনা আমি ভারতের নদীগুলির প্রতি ভক্তিকুসুমাঞ্জলিরূপে অর্পণ করিয়াছি, তাহা একত্র করিয়া 'লোকমাতা'[১] নামে গুজরাটি ও মারাঠি জনসাধারণের সম্মুখে অনেক পূর্বেই উপস্থিত করিয়াছিলাম। মহাভারতকার আমাদের নদীগুলিকে 'বিশ্বস্য মাতরঃ' বলিয়াছেন। এই সকল স্তন্যদায়িনী মাতার বর্ণনা করিতে করিতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই। আমার মনে হয়, এই সকল নদীর এই নূতন ধরণের স্তব যদি লোকের সামনে ধরা যায় তবে আধুনিক যুগের লোকও তাহা সাদরে গ্রহণ করিবে।

এখন স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য অকাদেমী' (ভারত-ভারতী পরিষদ্) নির্দেশ দিলেন যে 'লোকমাতা'র সঙ্গে অন্য কিছু প্রবাসবর্ণনা মিলাইয়া

১ হিন্দীতে ইহাদের মধ্যে শুধু সাতটি নদীর বর্ণনা 'সপ্ত-সরিতা' নামে দিল্লীর সস্তা-সাহিত্য মণ্ডলী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমি যেন এক পুস্তক রচনা করি; 'সাহিত্য অকাদেমী' ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ভাষায় উহার অনুবাদ করাইয়া প্রকাশিত করিবেন।

এই প্রস্তাব ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করিবার সময় ভাবিলাম, উহাতে যে কোনও স্থানের বর্ণনা না করিয়া নদী, প্রপাত ও সরোবরের সঙ্গে মিল খায় এমন সাগর, সাগরসংগম ও সাগরতটেরই বিবিধ লীলা যদি বর্ণনা করি, তাহা হইলে পঞ্চমহাভূতের এক অতি আনন্দদায়ক তত্ত্বের লীলা বর্ণনা একত্র করা হইবে, এবং এই নূতন পুস্তকের একরূপতা বা ঐক্যও থাকিবে। এ সিদ্ধান্ত বন্ধুদের এবং 'সাহিত্য অকাদেমী'র গুজরাটি পরামর্শদাতা এবং সঞ্চালকদেরও মনে ধরিল। তাই 'লোকমাতা' 'জীবনলীলা' রূপে পাঠকদের নিকট উপস্থিত।

'লোকমাতা'য় শুধু নদীরই বর্ণনা থাকায় তাহার আরম্ভে 'বিশ্বস্য মাতরঃ' শ্লোক মানাইয়াছিল। এখন উহা ব্যাপক 'জীবনলীলা'র রূপ ধারণ করিয়াছে, সুতরাং উক্ত শ্লোক প্রয়োগ করিলে অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হইতে হয়। তথাপি পরম্পরা রক্ষার জন্য শ্লোকটি এই পুস্তকেও ভক্তিভাবে রাখিয়া দেওয়া হইল।

'জীবনলীলা'র গুজরাটি সংস্করণ পাঠকসমাজে দেখা দিল, আর শীঘ্রই তাহার হিন্দী অনুবাদের প্রশ্ন উঠিল। নবজীবন প্রকাশন মন্দির তাহার নীতি অনুসারে হিন্দী অনুবাদ প্রকাশের ভার নিজেই গ্রহণ করিল এবং ওয়ার্ধায় আমার নিকটে শ্রীরবীন্দ্র কেলকার ছিলেন, আমার নিদেশে তাঁহাকে অনুবাদের কাজ দেওয়া হইল। তিনি খুবই যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সহিত এই অনুবাদ যথাসময়ে করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত অনুবাদ আমি দেখিয়া দিয়াছি ও প্রীতিলাভ করিয়াছি।

গুজরাটি সংস্করণের জন্য যে সব টিপ্পনী অধ্যাপক শ্রীনগীনদাস পারেখ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই সংস্করণেও তাহা কাজে লাগানো হইল। আমাদের দেশে একেই প্রবন্ধপুস্তকের অভাব, তাহাতে আবার ভাল পুস্তকালয়ও খুব অল্প স্থানেই পাওয়া যায়। সুতরাং শুধু ছাত্রদের জন্য নয়, সাধারণ শিক্ষিত ও রসগ্রাহী পাঠকদেরও টিপ্পনীগুলি কাজে লাগিবে।

অনুবাদ ও টিপ্পনী দেখিয়া আমার ছাত্র শ্রীনরেশ মন্ত্রী নিজেই উৎসাহ করিয়া 'জীবনলীলা'র সূচী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আজকালকার যুগে কেহ সূচীর প্রয়োজন অনুক্রমণিকা অপেক্ষা কম বলিয়া স্বীকার করিবে না। সূচী যিনি প্রস্তুত করিয়াছেন পাঠক অবশ্যই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন, কারণ অনুক্রমণিকা ও সূচী, পুস্তকের দুইটি চক্ষু বলিয়া মনে করা হয়।

নবজীবন প্রকাশন মন্দির আমার এই গ্রন্থের জন্য এইরূপ টিপ্পনী ও সূচী সংযোজনে উৎসাহ দিয়া অবশ্যই বিদ্যানুরাগী পাঠকদের ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছেন।

যতক্ষণ আমার ভ্রমণ চলিতে থাকিবে ও ভক্তিজড়িত স্মৃতি কাজ দিবে, ততক্ষণ আমার গ্রন্থের কলেবর বাড়িতেই থাকিবে। গুজরাটি 'জীবনলীলা' প্রকাশের পর জীবনলীলার সম্পর্কিত প্রায় দশটি মৌলিক রচনা প্রস্তুত হইল, হিন্দী সংস্করণে সেগুলিকে স্থান দিয়া আমার 'জীবন'ভক্তিকে নবীন বা up-to-date করা হইল। নূতন লেখাগুলি অনুক্রমণিকায় তারকাচিহ্নিত করা হইল। এখন আর এবিষয়ে বেশী লিখিবার উৎসাহ নাই, কিন্তু ভারতের নদনদী, দিঘী ও সরোবর, প্রপাত ও সমুদ্রতট, বার্ষিক জলপ্লাবন ও মরুভূমির মৃগতৃষ্ণা প্রভৃতির বিবিধ বর্ণনা নবযুগের উদীয়মান প্রতিভাশালী লেখকদের লেখনী-নিঃসৃত রচনায় পড়িবার ইচ্ছা বা লোভ আছে। পণ্ডিত বানারসী দাস মহাশয় এ বিষয়ে লেখকদের দৃষ্টি বহু পূর্বেই আকৃষ্ট করিয়াছেন।

২৬-১-৫৮ কাকা কালেলকর
গণতন্ত্র দিবস

২

বস্তুত পঞ্চমহাভূতের সংযোগেই জীবন। তথাপি আমরা যে শুধু জলকেই জীবন বলি, ইহার মধ্যে গভীর রহস্য আছে। পৃথিবীর চারিদিক ঘিরিয়া যতই বায়ুমণ্ডল থাকুক, আর এই বাতাবরণ বিনা আমরা যতই কেন না ক্ষণেকের জন্যও বাঁচিতে অসমর্থ হই, তথাপি পৃথিবীর মহত্ত্বের কারণই হইল উহার 'উদাবরণ', জলের আবরণ, যাহা উহাকে ঘিরিয়া আছে। জলের মধ্যে যে সরসতা ও নবীনতা আছে, যে জীবনতত্ত্ব আছে, তাহা অগ্নিশিখায় নাই, পবনের মধ্যে অথবা ভীষণ ঝটিকার মধ্যে নাই। জল যেখান দিয়া বহিয়া যায় তাহা শীতল করিয়া যায়, মরুভূমিকেও উপবনে পরিণত করে, প্রাণীমাত্রেই যাহাতে জল নানা প্রকারে ব্যবহার করিতে পারে, এরূপ সুযোগ সুবিধা দান করে। জলের স্বভাবই এই, তাহা চঞ্চল, তরল, উর্মিল; তাহা হইতেও অধিক, উহা বৎসল।

প্রকৃতি নিরীক্ষণের আনন্দ অনুভব করিয়া পাহাড়, ক্ষেত, মেঘ ও উহাদের উৎস স্বরূপ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণ বৈচিত্র্য আমি দেখিয়াছি। প্রত্যেকেরই আনন্দ পৃথক, চমৎকারিতা অতুল্য, তাহা হইলেও জলের প্রবাহ ও বিস্তারের মধ্য দিয়া যে জীবনলীলার প্রকাশ, অন্য কোনও প্রাকৃতিক অনুভব তাহার সমতুল্য নয়। পাহাড় যতই উত্তুঙ্গ বা গগনভেদী হউক, যতক্ষণ তাহার বিশাল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কোনও বড় বা ছোট ঝর্ণা লাফাইয়া না পড়ে, ততক্ষণ তাহার সৌন্দর্য ম্লান, শূন্য ও বিরস বলিয়া মনে হয়।

সংস্কৃতে 'ডলয়োঃ সাবর্ণ্যং' ন্যায় অনুসারে জলকে জড়ও বলা যায়। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে যাহারা জলকে জড় বলে তাহাদের বুদ্ধিই জড়, জড়তার যদি কোথাও অভাব থাকে তবে তাহা জলের মধ্যে।

পাহাড়ের দিকে তাকাইলেই তাহার শিখরদেশে উঠিতে ইচ্ছা হয়, আর সম্ভব হইলে শিখরদেশ পর্যন্ত পদযুগল অগ্রসর হইবে। জল সম্বন্ধেও এই কথা। মানুষ যতক্ষণ না নদীর উদ্‌গম ও মুখ খুঁজিয়া বাহির করে, ততক্ষণ তাহার মনে শান্তি নাই। জল দেখিলেই তাহার নিকটে যাইবার ইচ্ছা হইবে। উহা যদি পান করিবার মত হয়, তাহা হইলে পিপাসা না পাইলেও মন তাহা পান করিতে চাহিবে। স্নানে বাহ্য শরীরের ও পানে শরীরের মধ্যভাগ পবিত্র না করিলে মানুষের তৃপ্তিই হয় না। আর কিছু না হইলে সে জল লইয়া আচমন করিবে। অন্তত দুই ফোঁটা জল সে চোখের পাতার উপর দিবে। হিমালয়ের শীতপ্রধান অঞ্চলে যেখানে জামা কাপড় খোলাই কঠিন, সেখানেও আমাদের ধার্মিকেরা পঞ্চস্নান করেন। জলের মধ্যে আঙ্গুল ডুবাইয়া মাথায় ছোঁয়াইলে এক স্নান হইবে, দুই চক্ষু ছুঁইলে দুই স্নান হইল, পুনরায় ঐ জলের বিন্দু দুই কর্ণমূলে লাগিলে পঞ্চস্নান সম্পন্ন হইল! জল স্পর্শ না করিলে মানুষের মনেই হয় না যে সে পবিত্র হইয়াছে।

মানুষ মরিলে যে পৃথিবী হইতে তাহার শরীর আসিয়াছিল তাহারই উদরে সমর্পণ করিবার প্রথা সর্বত্র আছে, কিন্তু আমরা ইহার সংশোধন করিয়াছি। আমরা মনে করি, শরীরকে পচিতে না দিয়া উহার অগ্নিসংস্কার করা অধিক শ্রেয়স্কর। অগ্নিকে আমরা পাবক বলি। পাবক, অর্থাৎ যাহা পবিত্র করে! কোনও বস্তু যতই দুর্গন্ধযুক্ত হউক, যতই পচা হউক, যতই অপবিত্র হউক, অগ্নিসংস্কারে উহা পাবন হইয়া যায়, এজন্য আমরা কাঠ পাথর চন্দন ধূপ কর্পূর

প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ একত্র করিয়া শরীরের অগ্নিসংস্কার করি। এ পর্যন্ত সবই ঠিক, কিন্তু জীবননিষ্ঠ সংস্কৃতির ইহাতেও সন্তোষ নাই। অগ্নিসংস্কার হইয়া গেলে যে অস্থি ও ভস্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহা যখন পবিত্র জলাশয়ে বিসর্জন করি তখন আমাদের পরম সন্তোষ হয়।

মহাত্মাজীর অস্থি ও চিতাভস্ম আমরা সমস্ত দেশে, যেখানে যেখানে পবিত্র জলাশয় আছে সেখানেই পৌছাইয়া দিয়াছি। হিমালয়ের পরপারে, কৈলাসের পথে, সুবিস্তীর্ণ মানস সরোবরেও কিছু কিছু অস্থিভস্ম বিসর্জন করা হইয়াছে। প্রয়াগের মত উপযুক্ত স্থানে বিসর্জন করিবার পর অবশিষ্টাংশ কিছু সমুদ্রতীরেও লইয়া যাওয়া হয়, বিশেষ করিয়া মনে রাখিবার কথা যে, যে আফ্রিকা খণ্ডে গান্ধীজী সত্যাগ্রহের মত দৈবী শক্তি খুঁজিয়াছিলেন ও তাঁহার জীবনের ব্রত শুরু করিয়াছিলেন, সেই আফ্রিকায় নীলনদের উৎস প্রবাহেও এই অস্থি ভস্ম বিসর্জন করা হইয়াছিল। জলের পবিত্রতা এইরূপে সর্বতোভাবে স্বীকার করা হয়।

জলের এরূপ পবিত্র দর্শনের আনন্দ যাহাতে উচ্ছলিত হইয়াছে তাহার বর্ণনাই এই সংগ্রহে গ্রহণ করা হইয়াছে। সংগ্রহ করিবার সময় আমার 'স্মরণ-যাত্রা' হইতে ক্ষুদ্র এক অধ্যায় মাথা উঁচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'আমাকে কি ইহাদের মধ্যে লইবেন না?' অনবধানতার জন্য মাপ চাহিয়া বলিলাম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। জীবনলীলায় তোমারও স্থান হইবে।' মানসী সৃষ্টি, কল্পনার সৃষ্টি, মায়াবী যাদুকরের সৃষ্টিও পরিণামে পার্থিব সৃষ্টির মত সৃষ্টি তো বটেই। সুতরাং মানুষের চোখে ও মৃগের চোখে যাহা জলের মত মনে হয়, আর যাহার প্রবাহ এই দুইটিকে নিজের দিকে টানিয়া লয়, তাহা প্রাণবায়ু ও উদজান বায়ুর সৃষ্টি হউক না কেন, তথাপি জীবনলীলায় উহার স্থান হওয়াই চাই—এই কথা ভাবিয়া ছেলেবেলায় ভ্রমণকালে তেরদালের যে মরীচিকা দেখিয়াছিলাম, তাহার বর্ণনাও ইহার মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

সাহারা মরুভূমির কাছাকাছি যদি দ্বিপ্রহরের সময় যাইতাম, তাহা হইলে সেই বিরাট্ মরুভূমি আর সেখানকার মরীচিকার বর্ণনা অবশ্যই ইহার মধ্যে স্থান পাইত। কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকা হইতে উত্তর দিকে যাইবার পথে সময় ও প্রাণ বাঁচাইবার জন্য রাত্রির অন্ধকারেই আফ্রিকার মরুভূমি সমস্তটা পার হইলাম। তাহাও হাওয়াই জাহাজ করিয়া। পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যযুগের নগরী 'কানো' হইতে রওয়ানা হইয়া মধ্যরাত্রির পর ট্রিপোলিতে পৌছিলাম।

তখন পর্যন্ত সমস্ত সময়টাই দূরবীণ লাগাইয়া সাহারার দিকে তাকাইয়াছিলাম। কিন্তু সেরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। সাহারা মরুভূমি পার হইয়াও সেখানকার মরীচিকা দেখিতে পারা গেল না! হাওয়াই জাহাজ হইতে নামিয়া এইমাত্রই বলিতে পারিলাম:

লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।

আমাদের সংস্কৃত কবিদের নদী-বর্ণনা ও নদীর স্তবরচনা পড়িয়া আমি মুগ্ধ। এইসব স্তবের মধ্যে ভক্তিই প্রধান। তাঁহাদের পদলালিত্য অসাধারণ, ভাষার প্রবাহ যেন নদীর প্রবাহের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছে। কোথাও কোথাও এক আধটা শব্দে বা সমাসে সুন্দর বর্ণনাও আসিয়া গিয়াছে, কিন্তু সবটা মিলাইয়া এ স্তোত্র বর্ণনা নয়, মাহাত্ম্য কীর্তন।

আজ আমাদের হৃদয় যথাযথ বর্ণনা ও শব্দচিত্রের জন্য ক্ষুধিত। তাহার সঙ্গে সামান্য কিছু মাহাত্ম্য কীর্তন আর এক আধটু কাব্য যদি আসিয়াই পড়ে তাহা বাঞ্ছিতই, কিন্তু নদী বা সরোবর প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে যে সন্তোষ পাওয়া যায়, বর্ণনা পডিবার সময়ে তাহাও তো অল্পবিস্তর পাওয়া চাই। বরং জৈন পুরাণে যে সমস্ত নগরীর বর্ণনা আছে তাহাদের সম্বন্ধে বলা চলে যে, বর্ণনা যে কোনও স্থান হইতে উঠাইয়া যে কোনও শহরের সঙ্গে জুড়িয়া দিলে বেমানান হইবে না। সর্বদাই লেখক দুই চারি পঙ্‌ক্তি লিখিয়া সত্য কথাই বলেন, অমুক গল্পে অমুক নগরীর যে বর্ণনা আছে তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। এরূপ বর্ণনা যথার্থ চিত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না, মাহাত্ম্য হিসাবেও গ্রহণ করা চলে না।

প্রাচীন এক হিন্দী কবি পার্বত্য দুর্গের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে অশ্বশালার সহিত হস্তীশালারও বর্ণনা আছে। ভালোমানুষ কবি, তাঁহার মনে সন্দেহ হয় নাই যে, মহারাষ্ট্রের পাহাড়ে হাতি কি করিয়া উঠিবে! অন্যত্র এক স্থানে উদ্যান বর্ণনায় শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের, সমুদ্রতীরের ও পর্বতের উপরের সমস্ত গাছপালা, ফুল ও ফল একত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অদ্ভুত এই যে, রচনায় এই সকল ফুলের একত্র ফোটায় ও ফলগুলির একত্র পরিপক্ব হওয়ায় মাস বা ঋতুর কোনও বাধা সৃষ্টি হয় নাই।

সৌভাগ্যবশত এরূপ সাহিত্য-সৃষ্টি এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে আজকার লেখকেরা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে শুধু সাধারণ ভাবের বর্ণনা করিয়া লেখেন—"আকাশে তারা আলো দিতেছিল, বাগানে নানাপ্রকার ফুল

ফুটিয়াছিল। জঙ্গলে ঘন বৃক্ষলতার বিন্যাস ছিল।” এরূপ সাধারণ বর্ণনা লিখিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট। লেখক আকাশ ও আকাশের তারা চেনেন না, তাহাদের নাম জানেন না, কোন ঋতুতে কি ফুল ফোটে তাহা জানেন না, কোন জঙ্গলে কি রকমের গাছ হয় আর কি ধরণের হয় না, এ সমস্ত জ্ঞানও তাঁহার নাই, তিনি কি করিবেন? শব্দের ঐশ্বর্য ছড়াইয়া অনুভূতির দারিদ্র লুকাইবার চেষ্টা তিনি যতই করুন, দারিদ্র সেখানে ফুটিয়া উঠিবেই। আমাদের দেশে এখন ভ্রমণের উপকরণ অনেক বাড়িয়াছে, দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফোটোগ্রাফি বিদ্যার এতখানি উন্নতি হইয়াছে যে এখন তাহা ললিতকলার পর্যায়ে স্থান পাইবার চেষ্টা করিতেছে। বিদেশী ভাষায় রচিত ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়িয়া আমাদের কল্পনা যখন উদ্দীপিত হইতে পারে, তখন ভারতীয় ভাষায় যে সমস্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহার দারিদ্র কেন দূর না করি?

আমাদের প্রিয় ও পুজ্য জন্মভূমিকে আমরা সাহিত্য দ্বারা এবং অন্য অনেক প্রকারে সুসজ্জিত করিব, বংশধরদিগকে ভারতভক্তির দীক্ষা প্রদান করিব।

দেশ অর্থে শুধু মাটি, জল, আর উপরের আকাশ বোঝায় না, দেশের অধিবাসী লোকদেরও বোঝায়। একথা আমাদের যেমন জানা উচিত, তেমনি আমাদের দেশভক্তিতে শুধু মানবপ্রেমই নয়, পশুপক্ষীর মত আমাদের স্বজন অন্যান্য জীবের প্রতিও প্রেম থাকা উচিত।

নদী পাহাড় পর্বতশ্রেণী ও তাহার উত্তুঙ্গ শিখর এবং ইহাদের সকলের উপরে যে সব তারা ফুটিতেছে সেসকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়া ভারতভক্তির বিষয়ে আমরা যেন আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া চলিতে পারি। আমাদের পূর্বপুরুষদের সাধনার জন্য গঙ্গার মত নদী, হিমালয়ের মত পাহাড়, স্থানে স্থানে প্রসারিত আমাদের তীর্থস্থান, পিপুল বা বটের মত মহাবৃক্ষ, তুলসীর মত বৃক্ষ, গোরুর মত পশু, গরুড় বা ময়ূরের মত পক্ষী, গোপীচন্দন বা গেরুয়ার মত মাটি—এই সমস্ত যে দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দেশে সংস্কৃতি ও চিন্তার সমৃদ্ধি বাড়ানো আমাদের যুগের কর্তব্য।

দাদাভাই নওরোজির পুণ্যতিথি কাকা কালেলকর

১. ৬. ৫৬

বোম্বাই

নদী-সংস্কৃতি

যে দেশে কেবল বর্ষার জলেই সেচ করা হয়, যেখানে বর্ষার আশ্রয়েই চাষ-বাস করা হয়, সেই দেশকে বলে 'দেবমাতৃক।' বিপরীত পক্ষে, যে দেশ এইভাবে বর্ষার উপর নির্ভর করে না, বরং নদীর জলে যেখানে সেচের কার্য হয় ও নিশ্চিত ফসল উৎপন্ন হয়, সেই দেশকে বলে 'নদীমাতৃক।' ভারতবর্ষে যাহারা ভূমিকে এইরূপে দুই ভাগ করিয়াছে, তাহারা নদীর উপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। পাঞ্জাবের নামই রাখা হইল 'সপ্তসিন্ধু।' গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশের নাম হইল অন্তর্বেদী বা দো-আব। বিন্ধ্যাচল বা সাতপূরা পর্বত ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান ও দক্ষিণ, এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের নাম না লইয়া আমাদের দেশের লোকেরা সংকল্পবাক্য বলিবার সময় "গোদাবর্যাঃ দক্ষিণে তীরে" অথবা "রেবায়াঃ উত্তরে তীরে" এইরূপে নদীর দ্বারা দেশ ভাগ করেন। এক শ্রেণীর বিদ্বান কুলীন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের জাতির নামই রাখিয়াছেন—সারস্বত। গঙ্গাতীরবাসী পুরোহিত ও পাণ্ডা, গঙ্গাপুত্র বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করেন। রাজাকে রাজপদে বসাইবার সময় প্রজারা যখন চারি সমুদ্র ও সপ্তনদীর জল আনিয়া তাহা দিয়া রাজাকে অভিষেক করে তখন তাহারা মানিয়া লয় যে, রাজা এখন রাজত্ব করিবার অধিকারী হইয়াছেন। ভগবানের নিত্যপূজা করিবার সময়েও ভারতবাসী তাহার ক্ষুদ্র কলসে অধিষ্ঠান করিবার জন্য নদীগুলির নিকটে অবশ্যই প্রার্থনা করে—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

ভারতবাসী যখন তীর্থযাত্রা করে তখনও বেশির ভাগ সে নদী দর্শন করিবার জন্যই যায়। তীর্থ কথাটার অর্থ হইল, নদীর সিঁড়ি বা ঘাট। নদী দেখিতে দেখিতে তাহার মনে একথা ওঠে না, যে নদীতে স্নান করিয়া সে পবিত্র হইতেছে সেই নদীকে অভিষেক করিবার প্রয়োজন কি। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা না করিয়া তাহার ভক্তমন সন্তুষ্ট হয় না। সীতা যখন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে

বনবাসে বাহির হইলেন, তখন প্রত্যেকটি নদী পার হইবার সময় তিনি মনে মনে মানত করিয়া যাইতেন, বনবাস হইতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া আসিলে আমরা তোমার পূজা দিব। মানুষ মরিয়া গেলেও তাহাকে বৈতরণী নদী পার করাইতে হয়। এক কথায় জীবন ও মৃত্যু, উভয়ক্ষেত্রেই আর্যদের জীবন নদীর সঙ্গে জড়ানো ছিল।

নদীর মধ্যে প্রধান হইলেন গঙ্গা। তিনি কেবল পৃথিবীতে নয়, স্বর্গেও প্রবাহিতা, পাতালেও প্রবহমানা। এই জন্যই লোকে তাঁহাকে বলে ত্রিপথগা।

পাপ ধুইয়া মুছিয়া জীবনের যদি আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে হয়, তাহা হইলেও মানুষকে নদীতে এক কোমর জলে নামিয়া সংকল্প করিতে হয়, তবে তাহার বিশ্বাস হয় যে এখন তাহার সংকল্পপূরণ হইতে পারে। বৈদিক-যুগে ঋষিদের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাস, বাল্মীকি, শুক, কালিদাস, ভবভূতি, ক্ষেমেন্দ্র ও জগন্নাথ পর্যন্ত যে কোনও সংস্কৃত কবির কথা গ্রহণ করুন —নদী দেখিবামাত্র তাঁহাদের প্রতিভা পূর্ণবেগে স্ফুরিত হইতে থাকিত। আমাদের যে কোনও ভাষায় নদীর স্তোত্র অবশ্যই পাইবেন। আর ভারতবর্ষের সরলচিত্ত জনসাধারণের লোকগীতির মধ্যেও নদীর বর্ণনা বড় কম নয়।

গোরু বলদ ও ঘোড়ার মত পশুদের জাতি নির্ণয় করিবার সময়ও আমাদের লোকেরা নদীর কথাই স্মরণ করে। ভাল ভাল ঘোড়া সিন্ধুর তীরে পালিত হইত; তাই ঘোড়ার নামই দাঁড়াইল সৈন্ধব। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত টাট্টু ভীমা নদীর তীরে পালিত হইত, তাই তাহার নাম ছিল ভীমথড়ীর টাট্টু। মহারাষ্ট্রের উত্তম দুগ্ধবতী ও সুন্দর গোরুকে ইংরেজ আজও 'কৃষ্ণাবেলী ব্রীড' বলে।

গ্রাম্য পশুদের জাতির নাম যেমন নদী দিয়া রাখা হয়, তেমনি পশুপক্ষীদের নাম অনুসারেও বহু নদীর নামকরণ হয়—যেমন, গো-দা, গো-মতী, সবর-মতী, হাথ-মতী, বাঘ-মতী, সরস্বতী, চর্মন্বতী প্রভৃতি।

মহাদেবের পূজায় প্রতীকরূপে যে গোল চিকণ পাথর ব্যবহার করা হয়, তাহা নর্মদারই হওয়া চাই। নর্মদার মাহাত্ম্য এত বেশি যে তাহার প্রত্যেকটি কঙ্করই শঙ্কর। আর বৈষ্ণবের শালগ্রাম তো গণ্ডকী নদী হইতে আসে।

তমসা নদীকে বিশ্বামিত্রের ভগ্নী বলিয়া ধরা হয়; আর কালিন্দী যমুনা তো কালভগবান যমরাজার সাক্ষাৎ ভগ্নী।

প্রত্যেক নদীর অর্থ হইল সংস্কৃতির প্রবাহ। প্রত্যেকের উল্লাস পৃথক। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি বিবিধের মধ্যে একতা সৃষ্টি করে। সুতরাং সমস্ত নদীকেই আমরা সাগরপত্নী বলি। সমুদ্রের তো অনেক নাম, তাহার মধ্যে তাহার সরিৎপতি নামের মাহাত্ম্য খুব বেশি। সমস্ত নদী নিজের নিজের পবিত্র জল সাগরে অর্পণ করে বলিয়া সমুদ্রের জল এত পবিত্র মনে করা হয়। 'সাগরে সর্বতীর্থানি।'

দুই নদীর সঙ্গম স্থানকে আমরা 'প্রয়াগ' বলিয়া পূজা করি। তাহা এই জন্য যে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ বা সঙ্গম হইলে তাহা যেন আমরা শুভ সঙ্গম বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখি। স্ত্রী পুরুষের বিবাহে উভয়ের ভিন্ন গোত্রীয় হওয়া চাই, ইহাতে আমরা বুঝাইতে চাই যে একটিমাত্র অপরিবর্তনশীল সংস্কৃতির মধ্যে পচিয়া মরা ভাল নয়। ভিন্ন ভিন্ন মেলামেশা করাইবার বিদ্যা ও কৌশল আমাদের থাকাই চাই। 'লংকাদেশের কন্যার ঘোঘার (সৌরাষ্ট্রের) ছেলের সহিত বিবাহ হইতেছে', তাহার অর্থ ঐ দুইজনের মধ্যে জীবনের সকল প্রশ্ন উদার দৃষ্টিতে দেখিবার ক্ষমতা আসিল। ভারতীয় সংস্কৃতি প্রথম হইতেই সঙ্গম-সংস্কৃতি। আমাদের রাজপুত্র সুদূরের কন্যা সব বিবাহ করিতেন। কেকয় দেশের কৈকেয়ী, গান্ধারের গান্ধারী, কামরূপের চিত্রাঙ্গদা, একেবারে দক্ষিণের মীনাক্ষী মীনলদেবী, সম্পূর্ণ বিদেশ হইতে আগত উর্বশী ও মহাশ্বেতা—এইরূপ অনেক মিশ্রণের কথা বলা যায়। আজও রাজা মহারাজেরা যথাসম্ভব দূর দূর স্থান হইতে কন্যা আনিরা বিবাহ করেন। নদী হইতেই আমরা এই সঙ্গম-সংস্কৃতি শিখিয়াছি।

নিজের নিজের নদীর প্রতি আনুগত্য রাখিয়া যদি চলি, তাহা হইলে অন্তত সমুদ্রে পৌঁছাইতে পারিব। সেখানে কোনও ভেদভাব থাকিতে পারে না। সব কিছু হইয়া দাঁড়ায় একাকার, সর্বাকার, নিরাকার। 'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।'

নদীমুখেনৈব সমুদ্রমাবিশেৎ

সকালে বা সন্ধ্যায় নদীতীরে গিয়া আরাম করিয়া বসিলে মনের মধ্যে নানা বিচিত্র কথা ওঠে। বালুময় শুভ্র বিশাল তটভূমি সর্বদা যেন যেমনকার তেমনই আছে; কিন্তু আসলে সেখানকার প্রত্যেক কণা বাতাসে বা জলের দ্বারা স্থানভ্রষ্ট হইতেছে। এত বালি কোথা হইতে আসিতেছে, যাইতেছেই বা কোথায়? বালুর তটে হাঁটিলে তাহাতে পায়ের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট চিহ্ন দেখা দেয়। কিন্তু দুই এক ঘণ্টা বাতাস বহিলে সে চিহ্নের কিছু থাকে না। নদী বহিতে থাকে দুই তীরের সীমার মধ্য দিয়া, তাহার বিরাম নাই। জল আসিতেছে যাইতেছে—চলিয়াছে—চলিয়াছে। ছেলেবেলায় মনে হইত, 'মধ্যরাত্রে এই জল ঘুমাইয়া পড়ে, আর সকালে সর্বপ্রথমে জাগিয়া পুনরায় বহিতে থাকে। সূর্য চন্দ্র ও অসংখ্য তারা যেমন বিশ্রামের জন্য পশ্চিমে নামে, তেমনি এই জলও রাত্রিবেলায় হয়তো ঘুমাইয়া থাকে। প্রত্যেকেরই বিশ্রামের প্রয়োজন।' পরে দেখিলাম, না, নদীর জলের বিশ্রামের প্রয়োজন নাই। নদী নিরন্তর বহিতেই থাকে।

নদী দেখিলেই মনে চিন্তা জাগে—নদী আসে কোথা হইতে, আর যায় কত দূর? এই চিন্তা বা প্রশ্ন সনাতন। নদীর আদি ও অন্ত থাকিতেই হইবে। যতবার নদীর দিকে তাকাই, ততবারই এই প্রশ্ন মনে জাগে। আর এই প্রশ্ন যতই পুরানো হইয়া যায়, ততই অধিক গম্ভীর, অধিক কাব্যময়, অধিক গূঢ় হইয়া ওঠে। অবশেষে মনে মনে স্থির থাকিতে পারা যায় না, পা আর বাধা মানে না। মন একাগ্র হইয়া প্রেরণা দেয়, পা চলিতে আরম্ভ করে। আদি আর অন্ত খোঁজা—এই সনাতন সন্ধান আমরা হয়তো নদীর মধ্য হইতেই পাইতে পারি। তাই জীবনপ্রবাহকেও নদীর উপমা দিয়া আসিতেছি। উপনিষদ্‌কার ও অন্যান্য ভারতীয় কবি, ম্যাথু আর্নল্ডের মত ইউরোপীয় কবি ও রোমাঁ রোলাঁর মত ঔপন্যাসিক জীবনের সঙ্গে নদীর উপমা দিয়াছেন। এই সংসারের আদিম যাত্রী হইল নদী। তাই সেকালের যাত্রীরা নদীর উদ্‌গমস্থান, সঙ্গমস্থান ও মোহানা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন।

জীবনের প্রতীক এই যে নদী, ইহা কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়?

শূন্য হইতেই আসে, আর মিলাইয়া যায় অনন্তে। শূন্য অর্থাৎ অত্যল্প, সূক্ষ্ম কিন্তু প্রবল; আর অনন্তের অর্থ হইল বিশাল ও শান্ত। শূন্য ও অনন্ত, উভয়েই পরস্পরের নিকট হইতে গূঢ়, উভয়েই অমর। শূন্য হইতে অনন্ত—ইহাই হইল সনাতন লীলা। কৌশল্যা বা দৈবকীর প্রেমে গলিয়া যাওয়ার জন্য পরব্রহ্ম যেমন কালরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ কারুণ্যপ্রণোদিত হইয়া স্বয়ং অনন্ত শূন্যরূপ ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমাদের সংগ্রহশক্তি যতই বাড়িবে, ততই শূন্যের বিকাশ হইতে থাকিবে, বিকাশের বেগ সহ্য না হইলে তাহা মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া বা মর্যাদা ভাঙ্গিয়া অনন্তে লীন হয়—বিন্দু হইতে সিন্ধুরূপ।

মানবজীবনেরও এই অবস্থা। ব্যক্তি হইতে পরিবার, পরিবার হইতে জাতি, জাতি হইতে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র হইতে মানবসমাজ, মানবসমাজ হইতে ভূমা বিশ্ব—এইভাবে হৃদয়ের চিন্তার বিকাশ চলিয়া আসিতেছে। মাতৃভাষার দ্বারা আমরা প্রথমে আত্মীয়স্বজনের হৃদয় বুঝিয়া লইতে পারি, সমস্ত বিশ্বকে শেষে ডাকিয়া লই। গ্রাম হইতে প্রদেশ, প্রদেশ হইতে দেশ, দেশ হইতে বিশ্ব, এই ভাবে ‘স্ব’ বিকশিত করিতে করিতে আমরা ‘সর্বে’র মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করি।

নদী ও জীবনের ক্রম সমান। নদী স্বধর্মনিষ্ঠ হইয়া চলে, তাহার কূলমর্যাদা রক্ষা করে, তাই সৃষ্টি হয় প্রগতির। শেষে নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়া যায়। তখনও সে স্থগিত বা নষ্ট হয় না; চলিতেই থাকে। ইহা হইল নদীর ক্রম। জীবন ও জীবন্মুক্তিরও ইহাই ক্রম।

এই দিক দিয়াই কি আমরা জীবনদায়ী শিক্ষার ক্রমের বিষয় বুঝিয়া লইব?

১৯২১

উপস্থান বা পূজা

বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল নদী দর্শন করিয়াছি তাহাদের কয়েকটিকে এখানে স্মরণ করা হইয়াছে। ভূগোলে জ্ঞানের সংগ্রহ করা হয়, এখানে তাহা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে নদীর যে প্রভাব তাহাও এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করি নাই। ইহা শুধু আমাদের দেশের লোকমাতাদের উদ্দেশ্যে নূতন ধরণের ভক্তিপূর্বক পূজা।

আমাদের পূর্বপুরুষদের নদীভক্তি প্রসিদ্ধ, আজও তাহা ক্ষীণ নয়। যাত্রীদের ছোট বড় নদী তীর্থস্থানের দিকে প্রবাহিত হইয়া প্রমাণিত করে যে সেই প্রাচীন ভক্তি আজও পূর্বের মতই জাগ্রত আছে।

ভক্তহৃদয় ভক্তির এই সকল বাণী শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হউন, যুবকদের মধ্যে লোকমাতাদের দর্শন করিবার এবং নানাভাবে তাঁহাদের ক্ষীরধারা পান করিয়া সংস্কৃতিপুষ্ট হইবার উৎসাহ জাগ্রত হউক।

* * *

হিন্দুস্থানের সবগুলি সুন্দর স্থানের বর্ণনা করা মানুষের শক্তির বাহিরে—স্বয়ং ভগবান ব্যাস যখন ভারতবর্ষের নদীগুলির নাম শুনাইতে বসিলেন তখন তাঁহাকেও বলিতে হইল যে যতগুলি নদীর নাম তাঁহার মনে আছে শুধু ততগুলিরই সেখানে নাম কীর্তন করা হইল, অসংখ্য নদী বাকি রহিয়া গেল।

আমার দেখা নদীগুলির মধ্য হইতে যথাসম্ভব স্মরণ ও বর্ণনা দ্বারা পবিত্র হওয়াই আমার সংকল্প ছিল। আজ যখন এই ভক্তিকুসুমাঞ্জলির দিকে তাকাইয়া দেখি, তখন মনে দুঃখ হয় যে কৃতজ্ঞতাভাজন অনেক নদীরই পূজা করিতে পারি নাই। যাহাদের বর্ণনা করিতে পারি নাই, তাহাদের সংখ্যা অনেক। যে প্রদেশে আমি প্রায় এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ পর্যন্ত ছিলাম, গুজরাটের সেই নদীগুলিরও বর্ণনা করিতে পারি নাই। নর্মদা ও সাবরমতীর বিষয়ে সম্প্রতি অবশ্য কিছু লিখিতে পারিয়াছি। তাপ্তী বা তপতীর বিষয়ে কিছু লিখি নাই, এজন্য মনে পরিতাপ অবশ্যই আছে। এই নদীর উৎপত্তিস্থান মধ্যপ্রদেশের বেতুলের কাছে, বরহানপুর ও ভুসাওয়াল হইয়া উহা অগ্রসর হইয়াছে। উহার সাহায্যে আমি একবার সুরাট হইতে হজীরা পর্যন্ত হইয়া

আসিয়াছি। তাপ্তীর নিকটে ভগবান সূর্যনারায়ণের প্রেমের কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, আর ইংরেজেরা বাণিজ্যের অজুহাতে সুরাটে কিভাবে কুঠি নির্মাণ করে ও বাজীরাও এখানেই মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা ইংরেজকে কবে সমর্পণ করেন সে বিষয়েরও সন্ধান লওয়া যাইতে পারে।

গোধরা যাইবার সময়ে যে ছোট্ট মহী নদী দেখিয়াছিলাম তাহাই খাম্ভাত হইতে কাউই বন্দর পর্যন্ত এক প্রকাণ্ড পরিপূর্ণ নদী কি করিয়া হইতে পারে তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। পূর্বে মহানদী, পশ্চিমে মহী নদী, উভয়ের কার্য স্বতন্ত্র। সূর্যা, দমনগঙ্গা, কোলক, অম্বিকা, বিশ্বামিত্রী, কীম আদি অনেক পশ্চিমবাহিনী নদীর মধুর আতিথ্য আমি কখনও না কখনও গ্রহণ করিয়াছি। তাহাদের উদ্দেশ্যে যদি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ না করি তবে লোকে আমাকে কৃতঘ্ন বলিবে। আর যে আজীর তীরে মহাত্মাজী শৈশবে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন বিশেষ করিয়া উহা তো আমার নিকটে অঞ্জলি পাইবার দাবি করিতে পারে। বওয়াঢ়ওয়ানের ভোগাও নদীর বিষয়েও হয়তো কোথাও কোথাও লিখিয়া থাকিব, কিন্তু তাহাতে ভোগাও অপেক্ষা রাণক দেবীকেই স্মরণ করা হইয়াছে।

গুজরাটের বাহিরে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্যান্য নদনদীর কথা যখন স্মরণ করি তখন সর্বপ্রথম মনে পড়ে সর্বাপেক্ষা বড় ব্রহ্মপুত্রের কথা। উহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ের পরপারে মানসসরোবর অঞ্চলে। হিমালয়ের উত্তর দিকে যে জল বহিতেছে তাহার বিন্দু বিন্দু একত্র করিয়া উহা হিমালয়ের সমস্ত প্রাচীর পার হয়, এবং পাহাড় ও জঙ্গলের অজ্ঞাত প্রদেশ দিয়া বহিতে বহিতে আসামের দিকে আসিয়া বিন্দুগুলি ছাড়িয়া দেয়। পরে সদিয়া ডিব্রুগড় তেজপুর গৌহাটি ধুবড়ি প্রভৃতি স্থান পবিত্র করিয়া উহা বঙ্গদেশে আসিয়া নামে, তাহার পর গঙ্গার সহিত আসিয়া মেশে। সেজন্য কিছুদূর পর্যন্ত উহার নাম যমুনা এবং পরে পদ্মা দেওয়া হইয়াছে। ইতিহাসের উষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জাপানীদের সম্প্রতিকার আক্রমণ পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস ব্রহ্মপুত্রের জানা। কিন্তু এই সম্প্রতিকার ইতিহাস মণিপুরের ইমফল নদীও কিছু বলিতে পারে, আবার এই নদীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, আমাকে এসব কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমাদের ঐরাবতীর সখী ছিন্দবীনকেই জিজ্ঞাসা করুন। মণিপুর হইতে যাহারা পলাইয়া আসিয়াছে তাহাদের কিছু ইতিহাস সুরমা পাহাড়ের বরাক নদীকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

আমি নদী তো অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু যাহার গূঢ়গামিতা ও নিশ্চিন্ত বেপরোয়া ভাবে সব চেয়ে বেশি মুগ্ধ হইয়াছি তাহা কালিম্‌পং-এর নিকটবর্তী তিস্তা নদী। কী তাহার উন্মাদনা, কেমন তাহার আত্মগৌরবের মর্যাদা !

উৎকলে আমি অনেকবারই গিয়াছি। সেখানকার মহানদী কাঠজুড়ি ও কাকপেয়া তো আছেই, কিন্তু বরীকটক হইতে ফিরিবার সময় যে সূর্যোদয় দেখিয়াছি, ও অন্য প্রসঙ্গে ঋষিকুল্যা নদীর যে ইতিহাস শুনিয়াছি, সে সব কথা ও তাহার তীরের সৌন্দর্য কি কোনওদিন ভুলিতে পারি ? জৌগড়ের অশোকের বিখ্যাত শিলালিপি দেখিতে গিয়াছিলাম, সেই আমার ঋষিকুল্যা দর্শন ; আর যদি ভুল করিয়া না থাকি, তবে ধৌলির হাতির উপর শিলালিপি যখন দেখিতে যাই তখন এক নদী কেমন করিয়া দুই ভাগ হইল তাহা দেখিয়াছিলাম। উভয় নদীর সঙ্গম দেখা একটা মস্ত বড় কথা। দুই নদী মিলিত হইয়া নিজেদের জলরাশি বাড়াইতেছে এবং সম্ভূয়-সমুত্থানের নিয়মানুসারে প্রকাণ্ড এক ব্যাপার করিয়া তুলিতেছে, ইহা তো শক্তি বাড়াইবার প্রয়াস। কিন্তু এক নদীরূপিণী জলধারা দূর হইতে আসিয়া যখন দেখে যে তাহার উভয় প্রদেশের বিস্তীর্ণ ভূমি তাহার জলের প্রত্যাশায় তৃষিত হইয়া তাকাইয়া আছে, তখন সে কোন দিকে যাইবে ? নিজের জল ভাগ করিয়া উহা তখন দুই স্বতন্ত্র প্রবাহে বহিতে আরম্ভ করে, তখন উহাকে উভয় শিশুর মাতা বলিয়া মনে হয়। তখন আর উহাকে বিশেষ ভক্তিপূর্বক প্রণতি না জানাইয়া থাকিতে পারা যায় না।

আপনারা কি কখনও কালো নদীর সাদা হইয়া যাওয়ার কথা শোনেন নাই ? ছেলেবেলায় কারোয়ারে আমি এক কালো নদী দেখিয়াছিলাম। সমুদ্রে মেশা পর্যন্ত উহার রং একেবারে কালো ছিল। কিন্তু গোয়ার নিকটে এক কালো নদী আছে, তাহা সমুদ্রে মিশিবার আগ্রহে পাহাড়ের উপর হইতে নীচে এমন ভাবে লাফ দিয়া পড়ে যে তাহার প্রপাত দুধের মত কাব্যময় শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়। উহার নামই হইয়াছে দুধসাগর। এই দুধসাগর দেখিতে এমন যে মনে হয় যেন কোনও মেয়ে বুঝি স্নানের পর চুল শুকাইতেছে। শরাবতীর জোগের প্রপাত আমি তিনবার বর্ণনা করিয়াছি, সে কথা বিবেচনা করিলে দুধসাগরের গম্ভীর কাব্যের কথা আমাকে দশবার মনে করিতে হয়।

হিমালয়ে যাইবার পথে রামগঙ্গা দেখিয়াছিলাম। হিমালয়ের উপর হইতে আগত সরযূ ও ঘাঘরার বর্ণনা তো আছেই। কিন্তু লংকায় দেখা সীতাবা ও

অন্যান্য দুই তিনটি গঙ্গার কথাও কি কোথাও লিখিয়াছি ? মধ্যপ্রদেশে ধসানা দেখিয়াছিলাম, তাহার বিষয় লিখিয়াছি, আর বেত্রবতীর কথা ছাড়িয়া দিয়াছি, ইহাই বা কি প্রকারে সঙ্গত ? উজ্জয়িনী যাইবার পথে শিপ্রা নদী দেখিয়াছিলাম, তাহার উদ্দেশ্যে যদি স্মরণাঞ্জলি না দিই, তাহা হইলে কালিদাস নিজেই আমাকে অভিশাপ দিবেন। মোরাদাবাদে গোমতী দেখিয়াছিলাম, সে কথা স্মরণ করিতে করিতেই দ্বারকার গোমতীর কথা মনে হয়, আর অনুরূপ ভাবে সিন্ধুপ্রদেশের সিন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যভারতের সিন্ধুর কথাও মনে পড়িয়া যায়।

কাঠিওয়াড়ে চোরওয়াডের নিকটে সমুদ্রে যাইবার সময় পথেই আটকাইয়া গিয়াছে এমন মেগল নদী আমি দেখি নাই। কিন্তু মাদ্রাজের নিকট অনুরূপ অডিয়ার নদী দেখিয়াছি। সমুদ্রের সঙ্গে তাহার বনে না। অডিয়ার নদী সমুদ্রের নিকটে হৃদয়-সমৃদ্ধির খাদ বা গাদ লইয়া আসে, আর সমুদ্র রাগ করিয়া তাহার সামনে বালির এক বাঁধ খাড়া করিয়া দেয়। খণ্ডিতার এই দৃশ্য এতই করুণ যে বহু বৎসর ধরিয়া তাহার প্রভাব আমার মনের উপর কাজ করিতেছে।

ইহার চেয়ে কেরলের 'ব্যাক-ওয়াটার' ভাল। সেখানে সমুদ্রের সমানান্তর তীরে তীরে এক দীর্ঘ নদী বহিতেছে, যেন সমুদ্রকে বলিতেছে, তোমার লবণাক্ত জলের হাওয়া আমি ভারতবর্ষের মাটি পর্যন্ত পৌছিতে দিব না। ইহার একটি ছোটখাট নমুনা আমরা জুহুর মধ্যে দেখিতে পাই। জুহুর নারিকেলবহুল অঞ্চলের পশ্চিমে সমুদ্র। পূর্বে কখনও কখনও. জল জমিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি এই অবস্থা সর্বদা থাকিত, আর জল যদি উত্তর দক্ষিণে প্রায় একশ মাইল পর্যন্ত ছড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলে বোম্বাইয়ের লোকেরা কেরলের 'ব্যাক-ওয়াটার'-এর কিছু ধারণা করিতে পারিত। কিন্তু কেরলের ঐ অংশের সৃষ্টিসৌন্দর্য প্রত্যক্ষ না করিলে মনে মনে আঁকিতে পারা যাইবে না।

সিন্ধুর পদ্মশোভিত মঞ্চর সরোবরের কথা অল্প কিছু লিখিয়াছি, কিন্তু উৎকলে যে চিল্কা হ্রদ দেখিয়াছি তাহার বিষয়ে লেখা এখনও বাকি আছে। লর্ড কার্জন একবার বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সুন্দরতম স্থান যদি কোথাও থাকে তবে তাহা হইল চিল্কা হ্রদ। আমি যখন সুইডেন ও নরওয়ের সমুদ্রশাখার চিত্র দেখি, তখনই যে চিল্কা আমি একবার দেখিয়াছি তাহার কথা মনে না হইয়া পারে না। উৎকলের এক কবি এই হ্রদ লইয়া এক সুন্দর সুদীর্ঘ কাব্য রচনা করিয়াছেন।

* * *

নদী আর সরোবরের বিষয় লিখিবার পর জীবন-তর্পণ সম্পন্ন করিবার জন্য আমাকে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের তীরে তীরে বিশেষ বিশেষ সমুদ্র-দর্শনের বর্ণনাও লিখিতে হয়। করাচি, কচ্ছ ও কাঠিওয়াড় হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই, দাভোড়, কারোয়ার ও গোকর্ণ পর্যন্ত সমুদ্রতট, তাহার পর কালিকট হইতে আরম্ভ করিয়া রামেশ্বর ও কন্যাকুমারী পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে, সেখান হইতে উত্তরে পণ্ডিচেরি, মাদ্রাজ, মসলিপত্তন, বিশাখাপত্তন প্রভৃতি সূর্যোদয়ের পূর্বতীরভাগ আর শেষে গোপালপুর, চাঁদীপুর, কোণার্ক ও পুরীর জগন্নাথ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত দক্ষিণাভিমুখের সমুদ্রতীরের কথা যখন মনে পড়ে, তখন অন্তত পঞ্চাশ ষাটটি দৃশ্য একই সঙ্গে দৃষ্টির সামনে বিশ্বরূপ দর্শনের মত অদ্ভুত জোয়ার-ভাঁটা খেলিতে আরম্ভ করে। মনের মধ্যে এই সমস্ত আনন্দ এমন ভরিয়া আছে যে বাণীর মাধ্যমে তাহা যদি একসঙ্গে বহাইয়া দিই, তাহা হইলে সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া বহুদিকে বহমানা নূতন এক অলৌকিক সরস্বতীর সৃষ্টি হইতে পারে। অন্তত মনের ভাব লঘু করিবার জন্যই এই সকল স্মৃতি প্রকাশ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের পাহাড় ও জঙ্গল, মরুভূমি ও প্রান্তর, শহর ও গ্রাম সকলেই প্রতীক্ষা করিয়া আছে। গ্রামগুলির গৌরব দেখাইবার জন্য শহরের যতই নিন্দা করি না কেন, আর কার্য শেষ হইতে না হইতে শহর হইতে পালাইবার যতই চেষ্টা করি না কেন, শহরের বৈশিষ্ট্য চিনিতে ভুল করা সম্ভব নয়। সেগুলির প্রতিও আমার প্রেমভক্তি রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সমস্ত শহরই কি আমাদের দেশবাসীদের পৌরুষের নিদর্শন নয়? শহরের সঞ্চিত সংস্কৃতি কি আমাদের লোকেরাই স্থাপিত করে নাই? প্রত্যেক শহর কি তাহার বায়ুমণ্ডল, তাহার গৌরব, তাহার পৌরুষ অখণ্ডরূপে চালাইতেছে না? শহর যদি গ্রামের ভক্ষক বা শোষক না হইয়া তাহার রক্ষক হয়, শোষকের পালা শেষ করিয়া পোষক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে উহারাও প্রত্যেক সমাজহিতৈষীর আশীর্বাদ অবশ্যই পাইবে।

ভারতবর্ষের অনেক শ্মশান দেখিয়াছি, আমার দৃষ্টিতে সেসবও আমার ভক্তির পাত্র। তাহা হরিশ্চন্দ্রের দ্বারা রক্ষিত কাশীর শ্মশানই হউক আর দিল্লীর আশ-পাশের বহু রাজধানীর শ্মশানই হউক, অথবা মহাযুদ্ধের পর সম্প্রতি আসামে যে হাওয়াই জাহাজ বিনষ্ট হইতে দেখিয়াছি তাহার অবশেষ দুই তিনটি

উজ্জ্বল শ্মশানই হউক, শ্মশান তো শ্মশানই। উহা দেখিতে দেখিতে মানব-জাতি ও রাজবংশের সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যের জন্মমরণের বিষয়ে গভীর চিন্তা মনে না উঠিয়া পারে না।

যে শ্মশানে আমি নিজেও যাইব তাহার কথা বাদ দিয়া অন্য সমস্ত শ্মশানের বর্ণনা করার ইচ্ছা মনে জাগে। তাহা যদি সম্ভব না হয়; তাহা হইলে যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী অজ্ঞাত বীর যোদ্ধাদের উদ্দেশে অথবা শ্রাদ্ধের সময় অজ্ঞাত আত্মীয়স্বজনের উদ্দেশে এক সাধারণ পিণ্ড ও অঞ্জলি অর্পণ করা হয়। সেই ভাবেই হরিশ্চন্দ্র, বিক্রম, ভর্তৃহরি ও মহাদেবের উপাসক অসংখ্য যোগী যে শ্মশানকে নিজেদের বাসভূমি করিয়াছেন, সেই প্রতিনিধিস্থানীয় সর্বসাধারণের শ্মশানের উদ্দেশে অঞ্জলি দিবার ইচ্ছাও অবশ্যই আছে।

এই সমস্ত কি আমি করিতে পারিব? আমার সে চিন্তা নয়। স্বয়ং ঈশ্বরই যে অবতাররূপ ধারণ করেন এমন কিছু কথা নয়। যাহার যাহার মনে সংকল্প জাগে তাহাকেই অবতার ধারণ করিতে হয়। একথাও স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই যে একই জীবাত্মা অনেক অবতার ধারণ করে। অবতার ধারণ করিতে হয় অদম্য সংকল্পকে। অদম্য সংকল্পই প্রকৃত বিধাতা। সংকল্প জন্মিলে তাহার মধ্য হইতে সৃষ্টি অবশ্যই হইবে—তাহা ব্রহ্মার পার্থিব সৃষ্টিই হউক, সাহিত্য শব্দসৃষ্টিই হউক, আর শুধু কল্পনার চিত্রসৃষ্টিই হউক।

এই সৃষ্টি দ্বারা জীবনদেবতা তাঁহার অনন্ত উল্লাস প্রকাশ করিয়া চলিতেছেন।

১

সখী মার্কণ্ডী

প্রত্যেক নদীই কি মাতা? না। মার্কণ্ডী তো আমার ছেলেবেলার সখী। সে এতই ছোট যে আমি তাহাকে দিদি বলিয়াও ডাকিতে পারি না।

বেলগুন্দীতে আমাদের খেতে গুলঞ্চগাছের নীচে দুপুরবেলায় ছায়ায় গিয়া যদি বসি তো মার্কণ্ডীর মন্দ বায়ু আমাকে অবশ্য ডাকিবে। মার্কণ্ডীর তীরে আমি কতবার গিয়া বসিয়াছি, বাতাসের হিল্লোলে দোলায়মান ঘাসের সারি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া দেখিয়াছি। মার্কণ্ডীর তীরে অসাধারণ অদ্ভুত কিছুই নাই। না আছে কোনও বিশেষ জাতীয় ফুল, না আছে নানা বর্ণের প্রজাপতি। সুন্দর পাথরও সেখানে নাই। নিজের কলগুঞ্জনে মনকে আত্মহারা করিবার মত ছোট বড় প্রপাতই বা কোথা হইতে সেখানে আসিবে? সেখানে আছে শুধু স্নিগ্ধ শান্তি।

লোকে বলে যে মার্কণ্ডী বৈজনাথের পাহাড় হইতে আসিতেছে। তাহার উৎপত্তিস্থান খুঁজিবার ইচ্ছা আমার কখনও হয় নাই। আমাদের অঞ্চলের মানচিত্র হাতে পাইলেও তাহাতে মার্কণ্ডীর রেখা আমি খুঁজিব না। কারণ সেরূপ করিলে সে আর সখী থাকিবে না, নদী হইয়া যাইবে। আমার তো তাহার জলে পা ডুবাইয়া বসিতে ভাল লাগে। জলে পা ডুবাইলেই তাহার কলকল কলকল শব্দ আরম্ভ হয়। ছেলেবেলায় আমরা দুই জনে কতই গল্প করিতাম। উভয়ে একত্র আছি, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দের হেতু। মার্কণ্ডী কি বলিতেছে তাহা জানিবার জন্য আমারও কোন আগ্রহ ছিল না, সেও আমার কথার অর্থ বুঝিবার জন্য থামিত না। পরস্পর কথা বলিতেছি, এইটুকুই ছিল আমাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট। ভাই-বোন যখন বহুবৎসরের পর মিলিত হয় তখন দুজনে দুজনকে হাজার হাজার প্রশ্ন করে। কিন্তু এই সব প্রশ্নের পিছনে জিজ্ঞাসার অর্থ ঠিক থাকে না। উহা তো প্রেম প্রকাশ করিবার শুধু একটা রীতি মাত্র। কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল, আর কি উত্তর

পাওয়া গেল, এসব দিকে মন দেওয়ার মত সজাগ মন কি আর প্রেমিকের মিলনের সময় থাকে ?

মার্কণ্ডীর ধারে ধারে আমি গান গাহিয়া বেড়াইতাম, মার্কণ্ডী সে সব গান শুনিয়া যাইত। ষোল বৎসর বয়সে শিবভক্তির বলে যমরাজকে যে হটাইয়া দিয়াছিল সেই মার্কণ্ডেয় ঋষির উপাখ্যান গাহিবার সময় আমার কতই না আনন্দ হইত !

মৃকণ্ডু ঋষির কোনও সন্তান ছিল না। তিনি তপস্যা করিতেন আর মহাদেবকে প্রসন্ন করিতেন। মহাদেব বর দিতে গিয়া বিকল্পের অবকাশ রাখিয়াছিলেন।

সাধু, সুন্দর, বুদ্ধিমান ছেলে হইবে, ষোল বৎসর হইবে তাহার আয়ু; না হইলে মূর্খ, কুরূপ পুত্রও হইতে পারে, তাহার আয়ু হইবে এক শত বৎসর, কিন্তু এক শত বৎসরেও তাহার পরিবর্তন হইবে না। এই দুইটির মধ্যে যাহা মনে ধরে, তাহাই তোমাকে দিব, বাছিয়া লও।

> সাধু সুন্দর শাহণা সুত তয়া সোলাচ বর্ষে মিতী
> জো কাঁ মূঢ় কুরূপ তো শতবরী বর্ষে অসে স্বস্থিতী
> যা দোহীঁত জসা মনাঁত রুচলা তো ম্যাঁ তুতেঁ দীধলা.

দুইটির মধ্যে কোনটি পছন্দ করিবে ? ধর্মপত্নীকে ঋষি প্রশ্ন করিলেন। উভয়ে ভাবিলেন, ছেলে না হয় ষোল বৎসরই বাঁচুক, কিন্তু গুণবান হউক। সেই বংশের উদ্ধারের কারণ হইবে। উভয়ে সে বরই চাহিলেন। মার্কণ্ডেয় জন্মগ্রহণ করিলেন, বয়স যতই বাড়িতে লাগিল ততই বাপ-মায়ের মুখ ম্লান হইতে লাগিল। শেষে ষোল বৎসর পূর্ণ হইল।

যুবক মার্কণ্ডেয় পূজাতে বসিয়া আছেন। যমরাজ তাঁহার বাহনে চড়িয়া উপস্থিত। কিন্তু শিবলিঙ্গের সম্মুখে উপবিষ্ট যুবক সাধুকে স্পর্শ করিবার সাহস তাঁহার কি করিয়া হইবে ? ইতস্তত করিতে করিতে তিনি শেষটায় পাশ নিক্ষেপ করিলেন। ওদিকে লিঙ্গ হইতে ত্রিশূলধারী শিবের আবির্ভাব। নিজের দুঃসাহসের জন্য যমরাজকে ভাল-মন্দ দুকথা শুনিতে হইল। মৃত্যুঞ্জয়ী মহাদেবের দর্শন লাভের পর মার্কণ্ডেয়ের আর মৃত্যুভয় কি করিয়া থাকিতে পারে ? তাঁহার আয়ু এখনও অব্যাহত চলিয়া আসিতেছে।

পরবর্তী কালে আমি যখন কলেজে পড়িতে লাগিলাম তখন পরীক্ষার পর

আমাদের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইত। ফসল কাটার সময়। দুই দিন গোটাই খেতে কাটাইতে হইত। তখন মার্কণ্ডী আমাকে শকরকন্দও খাওয়াইত, আর অমৃতসমান জলও খাওয়াইত। রাত্রের শীতে সে কাঁপিতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য আমি যখন যাইতাম, তখন সে তাহার দর্পণে আমাকে মৃগনক্ষত্র দেখাইত।

আজও যখন আমি আমাদের গ্রামে যাই, মার্কণ্ডীকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু এখন সে আর পূর্বের মত আমাকে আদর করে না। একটুখানি হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে। তাহার সুকুমার মূর্তির পূর্বের সেই লাবণ্য আর নাই। কিন্তু এখন তাহার স্নেহের গভীরতা বাড়িয়া গিয়াছে।

আগস্ট, ১৯২৮

২

কৃষ্ণার স্মৃতি

একাদশীর দিন। গাড়িতে চড়িয়া মাহুলী রওনা হইয়াছি। মহারাষ্ট্রের রাজধানী সাতারা হইতে মাহুলী কিছুটা দূরে। পথের ডান ধারে শাহু মহারাজের কুকুরের সমাধি পড়ে। পথে আমাদেরই মত অনেকে মাহুলীর অভিমুখে গাড়ি ছুটাইয়া চলিয়াছে। অবশেষে নদীর তীরে পৌঁছিলাম। সেখানে এপার হইতে ওপার লোহার এক শিকল উঁচু করিয়া টানা ছিল। তাহার দড়ির সঙ্গে একটা নৌকা ঝুলিতেছিল, আমার শিশু নয়নের নিকট তাহা বড়ই সুন্দর মনে হইতেছিল।

নিকটের কাঁকরগুলি কত চিকন, কালো কালো ও শীতল ছিল! একটা হাতে নিলে অন্যটার উপর নজর পড়িত। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি ভালো লাগিত। ততক্ষণে আর একটি ভিজা কাঁকরের উপর কথই রঙ্গের আলো দেখা যাইত। আর তাহা হাতে লইতে মন চাহিত। ঐদিন আমি কৃষ্ণার দর্শন প্রথম লাভ করিলাম। কৃষ্ণা মাও আমাকে প্রথমবার চিনিলেন। আমি যে তাঁহাকে চিনিতে পারিব তখন তো আমার এতটা বয়স হয় নাই। শিশু

মাকে চিনিবার পূর্বেই মা তাহাকে নিজের করিয়া লন। আমরা শিশুরা নগ্ন দেহে খুব স্নান করিলাম, লাফাইলাম, জল ছিটাইলাম, নৌকায় চড়িয়া জলে লাফ দিয়া পড়িলাম! যতক্ষণ না খুবই ক্ষুধা পায় ততক্ষণ কৃষ্ণায় জলবিহার করিলাম।

নদী দর্শন যেমন এই আমার প্রথম, তেমনই স্নানের পর মনোজ্ঞ মুগকলির প্রাতরাশও আমার এই প্রথম। তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ময়ূরপঙ্খের টুপি পরিয়া 'বাসুদেব' ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিল। নূপুরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধুর ভজনও সেদিন প্রথম শুনিলাম। কৃষ্ণা মায়ের মন্দিরে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া আমরা বাড়ি ফিরিলাম।

সহ্যাদ্রির কান্তারে, মহাবলেশ্বরের নিকট হইতে বাহির হইয়া সাতারা পর্যন্ত ছুটিতে কৃষ্ণার বেশি দেরি হইত না। কিন্তু ততক্ষণে বেণ্যা আসিয়া কৃষ্ণার সহিত মিশিয়াছে। এখানে উহাদের সঙ্গমের জন্যই মাহুলীর মাহাত্ম্য। দুইজন পরস্পরের কাঁধে হাত রাখিয়া যেন খেলিতে বাহির হইয়াছে, এমন একটি দৃশ্য আমার হৃদয়পটে গত পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া অঙ্কিত আছে।

কৃষ্ণার পরিবার খুব বড়। কত ছোট বড নদী আসিয়া তাহার সঙ্গে মিশিতেছে। গোদাবরীর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাকেও আমরা 'মহারাষ্ট্র-মাতা' বলিতে পারি। যে সময়ে এখনকার মারাঠী ভাষা বলা যাইত না, তখনকার সারা মহারাষ্ট্র কৃষ্ণারই ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিত।

২

'নরসোবাচী বাড়ী' যাইবার সময় নৌকার উপর গাড়ি উঠাইয়া আমরা কৃষ্ণা পার হই, তাহা হইল আমাদের দ্বিতীয়বার কৃষ্ণাদর্শন। এখানে এক দিকের সুউচ্চ পাড়, অন্য দিকে সুদূর প্রসারিত কৃষ্ণার সমতল তটভূমি, তাহাতে দেখা দিতেছে বেগুন, খরমুজ, কাঁকুড় ও তরমুজের অমৃত-খেত! কৃষ্ণার এই বেগুন যে এক আধবার খাইয়াছে, সে স্বর্গে গিয়াও তাহা খাইতে চাহিবে! দুই দুই মাস ক্রমাগত বেগুন খাইয়াও আশা মেটে না; অরুচি হইবে কি করিয়া!

৩

সাঙ্গলীর নিকটে, কৃষ্ণার তীরে এই প্রথমবার 'রিয়াসতী মহারাষ্ট্র' বা মারাঠা রাজ্যের রাজবৈভব দেখিলাম। সেই সুন্দর ও বিশাল ঘাট, সুন্দর সুগঠিত উজ্জ্বলধাতু কলস ভরিয়া ভরিয়া মহারাষ্ট্র মেয়েরা জল লইয়া যাইতেছে; জলে লাফাইয়া নদীর ধারের লোকেরা যাহাতে ভিজিয়া যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যায়ামবীরদের দৌড় ধাপ, ছোট ছোট ঘণ্টায় তালবদ্ধ শব্দে নিজেদের আগমন সূচনা করিয়া দিতেছে এরূপ পর্বতপ্রমাণ হাতী, আর কর্‌-র্‌-র্‌-র্‌ এই একটা ধ্বনি পুরা আখমাড়াই কল রস পানের নিমন্ত্রণ জানাইতেছে—এই ছিল আমার কৃষ্ণা মায়ের তৃতীয় দর্শন।

ভাল করিয়া সাঁতার দিতে পারিতাম না। তাহা হইলেও একটা বড় ঘড়া জলের ভিতর ঠাসিয়া তাহার সাহায্যে বহিয়া যাইবার জন্য আমি একবার এখানে নদীতে নামিয়াছিলাম। কিন্তু জায়গায় জায়গায় এমন ভাবে জড়াইয়া গেলাম যে পা ছাড়াইব কি, আরও ভিতরে ঢুকিতে লাগিলাম। আর সে আবর্জনাও কি যেমন তেমন? যেন কালো কালো মাখন! মনে হইতে লাগিল, এখন জঙ্গম না থাকিয়া গাছপালার মত এখানেই স্থাবর হইয়া থাকিব! সেদিনকার ঘাবড়াইয়া যাওয়ার কথা আজও ভুলিতে পারি নাই।

৪

চিঁচলী স্টেশনে সর্বদাই কৃষ্ণার জল খাইতে পাওয়া যাইত। আমাদের পরিচিত একজন ভদ্রলোক ওখানকার স্টেশনমাষ্টার ছিলেন। তিনি খুব ভালো বাসিতেন বলিয়া এক আধ ঘটি জল চাহিয়া দেওয়াইতেন। আমাদের পিপাসা থাক আর নাই থাক, বাবা সকলকে ভক্তিপূর্বক জল খাইতে বলিতেন। কৃষ্ণা হইলেন মহারাষ্ট্রের আরাধ্য দেবী। তাঁহার এক গণ্ডূষ জল পানেও আমরা পবিত্র হইয়া যাই। যাঁহার পেটে কৃষ্ণার এক বিন্দু জলও গিয়াছে তিনি কখনও তাঁহার মহারাষ্ট্র স্বভাব ভুলিতে পারেন না। শ্রীসমর্থ রামদাস ও শিবাজী মহারাজ, শাহু ও বাজীরাও, ঘোরপড়ে ও পটবর্ধন, নানা ফড়নবীশ ও রামশাস্ত্র প্রভু—সংক্ষেপে বলিতে গেলে মহারাষ্ট্রের সাধুত্ব ও বীরত্ব, ন্যায়নিষ্ঠা ও রাজনৈতিকতা, ধর্ম ও সদাচার, দেশসেবা ও বিদ্যাসেবা, স্বাধীনতা ও উদারতা,

সবকিছুই কৃষ্ণার স্নেহবৎসল পরিবারে স্থান পাইয়া ফলেফুলে বিকশিত হইয়াছে। দেহু ও আড়ন্দীর জল কৃষ্ণাতেই আসিয়া মিলিয়াছে। পণ্ঢরপুরের চন্দ্রভাগাও ভীমা নাম ধারণ করিয়া কৃষ্ণাতেই আসিয়া পড়িয়াছে। 'গঙ্গায় স্নান ও তুঙ্গায় পান'—এই প্রবাদের মধ্যে যাহার গৌরব স্বীকৃত হইয়াছে সেই তুঙ্গভদ্রা কর্ণাটকের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া কৃষ্ণাতেই লীন হইয়াছে। সত্যকথা বলিতে গেলে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও তেলিঙ্গানা বা অন্ধ্র, এই তিনটি প্রদেশের ঐক্য সাধন করিয়াই বহিতেছে কৃষ্ণানদী। কৃষ্ণা-নদীর মধ্যে প্রাদেশিকতার পক্ষপাত নাই।

৫

কলেজের জীবন। বড় বড় আশা লইয়া দাদার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পুনা হইতে বাড়ি গেলাম। আমি বাড়ি পৌছিবার পুর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। আমার অদৃষ্টে ছিল কৃষ্ণার পবিত্র জলে তাঁহার অস্থি বিসর্জনের দায়িত্ব। বেলগাঁও হইতে আমি কুড়চী গেলাম। সন্ধ্যাকাল। রেলওয়ের পুলের নিকটে কৃষ্ণার পুজা করিলাম। দাদার অস্থি কৃষ্ণার উদরে সমর্পণ করিলাম। স্নান করিয়া স্বস্তিকাসনে বসিয়া জীবন-মরণের কথা লইয়া ভাবিতে লাগিলাম।

কৃষ্ণানদীর জলে কতই না মহারাষ্ট্রীয় বীর ও মহারাষ্ট্রের শত্রুর রক্তধারা আসিয়া মিশিয়াছে! বর্ষাকালের উন্মাদনায় কৃষ্ণায় কত শত কিষাণ ও তাহাদের গোমহিষাদির সলিলসমাধি না হইয়াছে! কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণার কি? তাহার জলে মদমত্ত হাতি বিহার করুক, আর তাহার তীরে বসিয়া সংসার-বিরাগী সাধুই তপস্যা করুক, কৃষ্ণার পক্ষে দুই-ই সমান। আমার দাদার অস্থি আর পাহাড়ের কঙ্করীভূত অস্থি, উভয়ের মধ্যে কৃষ্ণার মনে ভেদ কোথায়? মাহলীতে আমাকে কাঁধে করিয়া জলে লাফাইবার জন্য যে দাদা উৎসাহ দিতেন, তাঁহার অস্থি আমার নিজে হাতে করিয়া সেই কৃষ্ণার জলে সমর্পণ করিতে হইল! জীবনের লীলা কে বুঝিতে পারে!

৬

কৃষ্ণার উদরে আমার আরও এক ভাই শুইয়া আছেন। ব্রহ্মচারী অনন্তবুয়া মরডেকর হৃদয়ের অনুভূতি হিসাবে ছিলেন আমার কনিষ্ঠ সহোদর, দেশসেবা-ব্রতে তিনি ছিলেন আমার জ্যেষ্ঠ। স্বদেশী, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ও গোসেবা—এই ত্রিবিধ কার্যে রত থাকিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। আমার সঙ্গে তিনি গঙ্গোত্রী ও অমরনাথ যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণার তীরে আসিয়াই তিনি অমর হইলেন। ভক্তির গুঞ্জনে তিনি শোধ-বোধ হারাইতেন। কত জায়গায় ঠোকর খাইতেন। হিমালয়ে ভ্রমণকালে ইহা বার বার দেখিয়াছি। আমি বার বার তাঁহাকে গালি দিতাম, তিনি গ্রাহ্যই করিতেন না। তিনি তো থাকিতেন শ্রীসমর্থের প্রসাদবাণীর সাত্ত্বিক উন্মাদনায় মগ্ন হইয়া। কৃষ্ণাকেও তিনি ডাকিয়া থাকিবেন। দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে এক দহের মধ্যে পড়িয়া যান, তাহার পর দেবলোকে প্রস্থান করেন। যখন পাথুরিয়া ঘাটের পাশে বহমান গঙ্গাকে স্মরণ করি, কৃষ্ণাতে প্রতি বর্ষায় শিরস্নান করিয়া দেবমন্দিরের শিখরগুলি দর্শন করি, তখন কৃষ্ণার নিকটে আমারও এই এক ভাই চিরকালের জন্য বিশ্রাম করিতেছে একথা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারি না; সঙ্গে সঙ্গেই অনন্তবুয়ার তপোনিষ্ঠ কিন্তু প্রেমসুকুমার মূর্তি স্মৃতিপটে ভাসিয়া না উঠিয়া পারে না।

৭

১৯২১ সালের সেই বৎসর। ভারতবর্ষ এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। হিন্দুমুসলমান এক হইয়া গিয়াছে। তেত্রিশ কোটি দেবতার মত ভারতবাসীও কোটি কোটির হিসাবে চিন্তা করিতেছে। স্বরাজের ঋষি লোকমান্য তিলকের স্মৃতি স্থায়ী করিবার জন্য তিলক স্বরাজ কাণ্ড এক কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। রাষ্ট্রসভার ছত্রের নীচে কাজ করিবার মত সদস্যের সংখ্যাও এক কোটি হওয়া চাই। আর পটবর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনের সমান চরকাও এই ধর্মভূমিতে অনুরূপ সংখ্যায় চালাইতে হইবে। এই কাজের জন্য ভারতসন্তানেরা বেজোয়াড়ায় একত্র হইয়াছেন। আব্বাস সাহেব, পুন্তাম্বেকর, গিদোয়ানী ও আমি একত্র বেজোয়াড়ায়

পৌঁছিলাম। এই শুভমুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণাম্বিকার বিরাট দর্শনের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। যে কৃষ্ণার তীরে বসিয়া মা সন্ধ্যাবন্দনা করিয়াছিলেন এবং ন্যায়নিষ্ঠ রামশাস্ত্রী ও রাজকার্যপটু নানাফড়নবীশ আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই ছোট্ট কৃষ্ণাকে এত বড় হইতে দেখিয়া প্রথমে তো বিশ্বাসই হইতে চায় না। কোথায় মাহুলীর সেই ছোট্ট শিকল, কোথায় ইউরোপ-আমেরিকার যোগসূত্র কেব্‌লের মত এখানকার ঐ রশি! হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক এখানে স্নান করিতে আসিয়াছে। স্থূলকায় অন্ধ্রভাইদের মধ্যে আজ ভারতবর্ষের সকল ভাইয়েরা মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় হিন্দীর বাক্‌-প্রবাহ যেখানে সেখানে শোনা যাইতেছে। কৃষ্ণাতে যেমন বেণ্যা, বারণা, কোয়না, ভীমা, তুঙ্গভদ্রা আসিয়া মিলিয়াছে, তেমনি গ্রামের পর গ্রাম হইতে লোক আসিয়া দলে দলে বেজোয়াড়ায় উপস্থিত হইতেছে। এই সুযোগে সকলের সঙ্গে রোজ কৃষ্ণায় স্নান করিবার আনন্দ পাওয়া গেল। ভূমিষ্ঠ হইলে যে কৃষ্ণা দুগ্ধ পান করাইয়াছেন, তিনিই আজ স্বরাজের প্রার্থী ভারতরাষ্ট্রের গৌরবমূর্তি দর্শন করাইলেন। জয় কৃষ্ণা! তোমার জয় হউক! ভারতবর্ষ এক্‌ হউক! স্বাধীন হউক!

জুলাই, ১৯২৯

৩

মুলা-মুঠার সংগম

নদী তো আমাদের অনেক দেখা আছে। কিন্তু দুই নদীর সংগম সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। সংগমের কাব্যই স্বতন্ত্র।

যখন দুই নদী আসিয়া একত্র হয়, তখন সর্বদাই একটি তাহার নিজের নাম ত্যাগ করিয়া অন্যটির সঙ্গে আসিয়া মেশে। সকল দেশেই এই নিয়ম পালিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু কলঙ্ক বিনা চন্দ্র যেমন শোভা পায় না, অপবাদ বা ব্যতিক্রম ভিন্ন নিয়মও তেমনই চলে না। অনেক সময় তো নিয়ম অপেক্ষা ব্যতিক্রমই দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করে। উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি-

মিসোরী তাহার লম্বা চওড়া সপ্তাক্ষরী নাম দ্বন্দ্ব সমাসের সাহায্যে ধারণ করিয়া সংসারের দীর্ঘতম নদী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সীতাহরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিজয়নগরের স্বাধীনতা লোপ পর্যন্ত ইতিহাসের কথা মনে করাইয়া দিয়া তুঙ্গভদ্রাও তুঙ্গা ও ভদ্রার মিলন হইতে তাহার নাম আরও গৌরবান্বিত করিতে পারিয়াছে। পুনাকে নিজের কোলে খেলা দিতে দিতে মুলা-মুঠাও মুলা ও মুঠার সঙ্গম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

সিংহগড়ের পশ্চিমদিকের ঘাট হইতে মুঠা আসিতেছে। খড়ক-ওয়াসলা পর্যন্ত ন্যাড়া পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করে। খড়ক-ওয়াসলার বাঁধ তন্বঙ্গী মুঠাকে এক সুদীর্ঘ সরোবর করিয়া ফেলিয়াছে। এই সরোবরের পাড়ে না আছে কোনও বাঁধ, না আছে কোনও মন্দির। দিনের বেলায় মেঘ ও রাত্রিবেলায় তারা, নিজেদের চিন্তাকুল প্রতিবিম্ব এই সরোবরের উপর ফেলে। এখানকার মুঠা হইতে খাল হইয়া দুই ধারা জোর করিয়া মাশুল আদায় করা হইয়াছে, সেখান হইতে পুনা ও খড়কীর লোকেরা প্রাণ ভরিয়া জল পান করে। মুঠার পাড়ে আখের খেত বাড়িয়া চলিতেছে। বসন্তকালে যে দিকে চাই সেদিকে আখের কলওয়ালা ডাকিয়া লোকদের আখের রস পানের কথা মনে করাইয়া দেয়। লকড়িপুল নামে পরিচিত কিন্তু বাস্তবিক পাথরে তৈরী পুলের নীচ দিয়া নদী অগ্রসর হয়, ও দগড়িপুল নামে পরিচিত কিন্তু বাস্তবিক পাথরের বাঁধ পার হইয়া যায়। ঠিক ইহার পরই মুঠা তাহার ভগ্নী মুলার সঙ্গে আসিয়া মেলে। লকড়িপুল হইতে ওঙ্কারেশ্বর পর্যন্ত তীরে তীরে যতই শবদাহ হউক, সংগমের সময় কিন্তু মুঠার চেহারায় সে দুঃখ ধরা পড়ে না।

এতখানি শান্তসংগম আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। ক্যাপ্টেন মলেট পেশোয়াপদের শেষ পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে এই সংগ্রামতটে ছাউনি গাড়িয়া বসিয়াছিলেন। আজ তো সংস্কৃত ভাষার সংশোধন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য যত্নশীল আর্য পণ্ডিত ভাণ্ডারকরজীর সংগমাশ্রমই সেখানে বিরাজ করিতেছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য সংস্থাপিত চতুষ্পাঠীর রূপান্তর করিয়া নূতন ও পুরাতনের সমন্বয়কারী ডেকান কলেজও এই সংগমের নিকটেই শোভা পাইতেছে। এখানে নৌকাবিহারের জন্য নদীর উপর বাঁধ বাঁধিয়া গোরা সিপাইয়েরা জলকে প্রতিহত করিয়াছে,

সঙ্গে সঙ্গে বিশাল মশককুলকেও আশ্রয় দিয়াছে। নিকটে টিলার উপর গুজরাটের লক্ষ্মীর এক বরপুত্রের উত্তুঙ্গশির কিন্তু নম্রনামধেয় 'পর্ণকুটী' আছে। মানবের স্বাধীনতা অপহরণকারী যারবেদা জেল ও প্রাণহরণপটু সৈন্য বিভাগের বারুদখানাও এই সঙ্গম হইতে বেশি দূরে নয়। না জানি, মুলামুঠার তীরে কতই বিচিত্র বস্তুর সংগম হইয়াছে ও হইতে থাকিবে। বাঁধের নিকটে ব্যাণ্ড গার্ডেনে লক্ষপতি ও ভিক্ষাজীবীর সংগম প্রতি সন্ধ্যায় হয়, ইহাও এই স্থানের হয়তো এক লক্ষণ।

পরিণামে বাঁধ পার হইয়া মুলামুঠা এখান হইতে অগ্রসর হইয়া কতদূর যায়, একথা ভাল করিয়া কে বলিতে পারিবে? এ বিষয়ের অভিজ্ঞতা কাহার আছে?

মহারাষ্ট্রের নদীগুলির মধ্যে তিনটির সহিত আমার বিশেষ আত্মীয়তা। মার্কণ্ডী আমার ছোটবেলার সঙ্গী, আমার মাঠ-ঘাটের জীবনের সাক্ষী, আমার ভগ্নী আক্কার প্রতিনিধি। কৃষ্ণার তীরে তো আমার জন্মই হইয়াছিল। মহাবলেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বেজোয়াড়া ও মসলিপট্টনম্ পর্যন্ত তাহার বিস্তার নানা প্রকারে আমার জীবনের সঙ্গে গাঁথা। তৃতীয়, মুলা-মুঠা। বাল্যকালে আমরা সব ভাইয়েরাই শিক্ষার জন্য পুনায় গিয়াছিলাম। তখন হইতেই মুলা-মুঠার সংগম আমার বাল্যকালের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। কলেজে পড়িবার সময় যে সকল বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মধ্যে মানুষ হইয়াছিলাম, সে সমস্তই মুলা-মুঠার জানা। কিন্তু এ সকল স্মৃতি ছাপাইয়াও রহিয়াছে সেই সকল দিনকার কথা যখন ইহার তীরে অতীতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গলাভ করিয়াছিলাম! লেডী ঠ্যাকারসের পর্ণকুটী, দিনশা মেহতার প্রাকৃতিক চিকিৎসা ভবন, সিংহগড়ের নিবাস—একই সঙ্গে সব মনে পড়িয়া যায়।

আর শেষের সেই দিনগুলি—যেখানে ইংরেজ সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই আগাখাঁর প্রাসাদও ইহারই তীরে। এখানেই গান্ধীজীর দুই জীবনসঙ্গী স্বরাজযজ্ঞে নিজেদের অন্তিম আহুতি দান করিয়াছিলেন। যাহার তীরে কস্তুরবা ও মহাদেবভাই দেহরক্ষা করিয়াছেন তাহা ভারতবাসীর পক্ষে, বিশেষ করিয়া আশ্রমবাসীর পক্ষে তো তীর্থস্থান।

আজ যখন মুলা-মুঠার কথা ভাবি, তখন সিংহগড়ের সামনে খড়ক-ওয়াসলা সরোবরের উপরে যে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার কথা স্মরণ না করিয়া পারি না। এই প্রতিষ্ঠানের নাম যুদ্ধ মহাবিদ্যালয় না রাখিয়া

রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বিদ্যালয় রাখা হইয়াছে, একথাও মনে না আসিয়া পারে না। যে সরোবরের তীরে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার নামও মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের অনুরূপই হওয়া চাই। কোনও ইংরেজের নামে না হইয়া এই সরোবর নরবীর তানাজী মালশ্রীর নামে হওয়া উচিত। প্রাণ দিয়াও যখন তানাজী ছত্রপতি শিবাজীর জন্য কোণ্ডাণা গড় জয় করিয়া লইলেন, তখন শিবাজীর মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল—'গড় আলা পণ সিংহ গেলা'—গড় তো জয় করিলাম, কিন্তু সিংহকে হারাইলাম। সেইদিন হইতে এই গড়ের নাম সিংহগড় হইল।

এই সরোবরের নাম হয় তানাজী সরোবর, নয়তো সিংহ সরোবর রাখা হউক।

১৯২৬-২৭

সংশোধিত, ১৯৫৬

৪

সাগর-সরিতের সঙ্গম

ছেলেবেলায় ভোজ রাজা ও কালিদাসের কাহিনী পড়িতাম। ভোজ রাজা জিজ্ঞাসা করিতেন: 'এই নদী এত কাঁদে কেন?' নদীর জল পাথরগুলির উপর দিয়া যাইতে যাইতে হয়তো শব্দ করিয়া থাকিবে। রাজার মনে হইল, কবির সামনে একটা কল্পনা ফেলিয়া দিবেন। এইজন্য তিনি উপরের প্রশ্নটি করিয়াছিলেন। জনশ্রুতির কালিদাস লোকের মনে ধরে এমন জবাবই তো দিবেন। তিনি বলিলেন, 'কাঁদিবার কারণ কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মহারাজ? এই বালিকা বাপের বাড়ি হইতে শ্বশুরবাড়ি যাইতেছে। কাঁদিবে না তো কি করিবে?' তখন আমার মনে হইল, 'শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা যদি না-ই হয়, তাহা হইলে আসিতেছে কেন?' কে উত্তর করিল, 'মেয়েদের জীবন তো শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার জন্যই।' নদী যখন সরিৎপতি সাগরের সহিত আসিয়া মিলিত হয় তখন তাহার সমস্ত রূপেরই পরিবর্তন হয়। সেখানে তাহার প্রবাহকে নদী বলাও কঠিন হইয়া পড়ে। সাতারার পাশে মাহুলীর

নিকটে কৃষ্ণা ও বেণ্যার সঙ্গম দেখিয়াছি, পুনাতে মুলা ও মুঠার। কিন্তু নদী ও সাগরের সঙ্গম তো প্রথম দেখিয়াছিলাম কারোয়ারে। উত্তর দিকে কেশুরিনা বা শরবন ছাড়াইয়া আমরা দুই ভাই সমুদ্রতটে বালুকার উপর খেলিতে খেলিতে ঘুরিতে ঘুরিতে দূরে চলিয়া গিয়াছিলাম। সর্বদা যতটা যাইতাম তাহার অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ এক সুন্দর নদী সমুদ্রে মিশিতে দেখিলাম। দুই নদীর সঙ্গম অপেক্ষা নদী ও সমুদ্রের সঙ্গম অনেক বেশি কাব্যময়। দুইটি নদীর সঙ্গম গূঢ় ও শান্ত হয়। কিন্তু যখন নদী ও সমুদ্র পরস্পরে মেশে, তখন উভয়ে যেন স্পষ্টই উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই উন্মাদের নেশা আমাদেরও নিশ্চয় লাগে। নদীর জল শান্ত আগ্রহে সমুদ্রের দিকে বহিয়া যায়, তখন যে সমুদ্র নিজের মর্যাদা কখনও লঙ্ঘন করে না বলিয়া প্রসিদ্ধি, তাহারই জল চন্দ্রের উত্তেজনা অনুসারে কখনও নদীর জন্য পথ করিয়া দেয়, কখনও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। নদী ও সাগর যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিয়া বসে, তখন নানা প্রকারের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের ঢেউ যখন বক্রভাবে আছড়াইয়া পড়ে, তখন জলের ফোয়ারা এক ধার হইতে অন্য ধার পর্যন্ত ছুটিয়া চলে। কোথাও কোথাও জলে গোল গোল চক্র কাটিয়া ঘূর্ণি সৃষ্টি করে। সমুদ্রের আনন্দ যখন বাড়িতে শুরু করে তখন নদীর জল পিছনে হটিয়া যায়, এমন সময়ে দুই দিকের তীরের উপর তাহার আঘাত তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া ওঠে। নদীর গতির বিপরীত দশা দেখিয়া তাহা হইতে কিছু লাভ করিবার আশায় স্বার্থপর নাবিকেরা পূর্ণ উৎসাহে তাহার ভিতরে প্রবেশ করে। তাহারা জানে যে ভাগ্যবশে এই জোয়ারের টানে যতটা ভিতরে ঢুকিতে পারিবে ততটাই লাভ। আবার যখন ভাঁটা শুরু হয় আর সাগরের ঢেউ বিরোধের পরিবর্তে বাহু তুলিয়া নদীকে স্বাগত করে, তখন মতলবী নৌকাগুলির তিনকোনা পাগড়ি বা পাল বদলাইতে দেরি হয় না। হাওয়া যে দিকেই থাকুক না কেন, যতক্ষণ তাহা প্রত্যক্ষ সম্মুখে না আসে ততক্ষণ উহা হইতে কিছু না কিছু কাজ হাসিল করিবার চতুরতা এই সব বৈশ্যবৃত্তিধারী নৌকাগুলিতে থাকেই। তাহাদের পাগড়ি বা পালের সাজসজ্জাও তদনুরূপই হইয়া থাকে।

আমরা যখন গিয়া পড়িয়াছিলাম তখন নৌকাগুলি এইভাবে নদীর মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিল কিন্তু সমুদ্রের এই পতঙ্গ বা নৌকাগুলি দেখার জন্য

আমাদের মনে কোনও আগ্রহ ছিল না। আমরা তো সঙ্গমের সঙ্গে সূর্যাস্তের দৃশ্য কেমন মানায় তাহা দেখিতেই মশগুল ছিলাম। সোনালি রং সর্বত্র সুন্দর, কিন্তু সবুজের সঙ্গে তাহার বাদশাহী শোভা বিচিত্র অদ্ভুত রকমের হইয়া থাকে। উঁচু উঁচু গাছের মাথায় সন্ধ্যার স্বর্ণকিরণ যখন আরোহণ করে তখন মনে সন্দেহ হয় যে ইহা কি মাটির পৃথিবীর আকাশ, না পরীর রাজ্য? সমুদ্রের সৌন্দর্য তখন এমন প্রকট হয় যে, মনে হয় যেন গলিত স্বর্ণের সরোবর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। এই শোভা দেখিয়া আমরা হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম। সত্যকথা বলিতে গেলে যতই শোভা দেখিতেছিলাম ততই আমাদের প্রাণ চৈতন্যশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছিল, সৌন্দর্যপানে আমরা বিভোর হইয়া পড়িতেছিলাম।

সূর্যাস্তের পর বর্ণের এই উগ্রতা কমিয়া শান্ত হইয়া আসিল। আমাদেরও চেতনা ফিরিয়া আসিল এবং ফিরিয়া আসিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু জল এতটা বাড়িয়াছিল যে ফিরিয়া যাওয়া কঠিন হইয়া পড়িল। ফলে আমরা উলটা পথে নদীর তীরে চলিলাম। এখানেও নদীর জল দুই দিক হইতে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল—যেমন মহিষের পিঠে চামড়ার থলিগুলি ভরিবার সময় ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে। অন্ধকারও বাড়িয়া যাইতেছিল। পারাপার করিবার জন্য একখানি ছোট্ট নৌকা এক কোনায় পড়িয়াছিল। আর গ্রাম্য কয়েকজন মজুর ল্যাঙ্গটের দড়িতে পিছনের দিকে এক 'চাকা' গুঁজিয়া তাহাতে নিজেদের 'কোয়তে' লটকাইয়া চলিতেছিল। (কোয়তা হইল হাঁসিয়ায় মত এক অস্ত্র, যাহা দিয়া নারিকেল ছোলা হয়, অথবা সাধারণ ভাবে কুড়ালের মত ব্যবহার করা যায়।) ইহাদের পরণে ছিল এক ল্যাঙ্গট, আর একটা ছোট জামা—জ্যাকেট। নদী পার হইবার সময় জ্যাকেট খুলিয়া মাথায় বাঁধিলেই হইল। বাস্, প্রকৃতির সন্তান, ইহাদের নিকট মাটি ও জলে কোনও ভেদ নাই।

ঘরে ফিরিবাব তাড়া কেবল আমাদেরই ছিল না— মনে হইতেছিল, বুঝি এই গাঁয়ের লোকদেরও ফিরিবার তাডা ছিল; আর নদীর ধার দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে ছোট ছোট কাঁকড়াদেরও আমাদেরই মত তাড়া ছিল। রাত আসিয়া পড়িল। আমরাও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিলাম। কিন্তু মনে চিন্তা জাগিল, এক দিন এই নদীর ধার দিয়া দিয়া অনেক দূর পর্যন্ত যাইতে হইবে।

পেঁয়াজ বা বাঁধাকপি হাতে লইলে যেমন তখনই উহার সব খোসা বা পাতা খুলিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়, নদী দেখিলে তেমনিই উহার উৎসের দিকে যাইবারও ইচ্ছা মানুষের হয়। উৎপত্তির সন্ধান—সনাতন সন্ধান। গঙ্গোত্রী, যমুনা, মহাবলেশ্বর অথবা ত্র্যম্বকের সন্ধান এইভাবেই হইয়াছে।

কৈশোরের এই ইচ্ছা কয়েক বৎসর পূর্বে পুরণ হইয়াছে। শ্রীশংকররাও গুলবাডী আমাকে এক সেবাকেন্দ্র দেখাইবার জন্য নদীর বিপরীত দিকে অনেক দূর লইয়া গিয়াছিলেন। এই প্রতীপ যাত্রার সময়েই কবি বোরকরের কবিতা শুনিয়াছিলাম, আজও সেকথা স্মরণ করিয়া আনন্দ পাই।

১৯৩৪

৫

গঙ্গামাতা

গঙ্গা যদি আর কিছুই না করিতেন, শুধু দেবব্রত ভীষ্মের জননী হইতেন, তাহা হইলেও সমগ্র আর্যজাতির মাতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেন। পিতামহ ভীষ্মের গৌরব, নিঃস্পৃহতা, ব্রহ্মচর্য ও তত্ত্বজ্ঞান সর্বদাই আর্যজাতির আদরণীয় লক্ষ্য হইয়া আসিয়াছে। আমরা গঙ্গাকে আর্যজাতির আধারস্তম্ভ এই মহা-পুরুষের মাতা বলিয়াই জানি।

নদীকে যদি কোনও উপমা মানায়, তাহা হইল উহা মাতার উপমা। নদীকূলে বাস করিলে দুর্ভিক্ষের ভয় থাকে না। মেঘরাজ যখন বঞ্চনা করেন তখন নদীমাতাই আমাদের ফসল দেন। নদীর তীর বলিলেই বুঝি শুদ্ধ ও শীতল হাওয়া। নদীর তীরে তীরে বেড়াইলে প্রকৃতিদেবীর বাৎসল্যের অখণ্ড প্রবাহের দর্শন হয়। নদী যদি বড় হয় আর তাহার প্রবাহ যদি ধীর ও গম্ভীর হয়, তাহা হইলে তাহার তীরে যাহারা বাস করে তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে ঐ নদীর প্রকৃতিই প্রতিফলিত হয় মাতার চরিত্রের মতো। সত্যই নদী জন-সমাজের মাতা। নদীতীরবর্তী নগরীর অলিগলিতে বেড়াইবার সময় যদি কোনও এক কোণ হইতে নদীর দর্শন হইয়া যায় তবে আমাদের কতই না

আনন্দ হয়। কোথায় শহরের সেই দুর্গন্ধ বায়ুমণ্ডল, কোথায় নদীর এই প্রসন্ন দর্শন। উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা অচিরে বুঝিতে পারা যায়। নদী ঈশ্বর নহেন, তবে ঈশ্বরকে মনে করাইয়া দেন এমনই দেবতা। যদি গুরু-বন্দনার আবশ্যকতা থাকে, তবে নদীরও বন্দনা করা উচিত।

এই তো হইল সাধারণ নদীর কথা। কিন্তু গঙ্গামাতা যে আর্যজাতির মাতা। আর্যদের বড় বড় সাম্রাজ্য এই নদীর তীরেই স্থাপিত হইয়াছিল। কুরু-পাঞ্চাল দেশের সঙ্গে অঙ্গবঙ্গাদি দেশের যোগস্থাপন গঙ্গাই করিয়াছেন। আজও হিন্দুস্থানে গঙ্গাতীরেই বেশি ঘন বসতি।

যখন আমরা গঙ্গাদর্শন করি তখন আমাদের দৃষ্টিতে শ্যামল ধান্যক্ষেত্রই শুধু পড়ে না, দৃষ্টিপথে শুধু মালবোঝাই জাহাজই আসে না; এক সঙ্গে স্মৃতিপথে উদিত হয় বাল্মীকির কাব্য, বুদ্ধ-মহাবীরের বিহার, অশোক সমুদ্রগুপ্ত হর্ষের মত সম্রাটদের পরাক্রম, তুলসীদাস কবিরের মত সন্তজনের ভজন। গঙ্গার দর্শন তো হৃদয় দিয়া দর্শন।

কিন্তু গঙ্গার দর্শন সর্বত্র একই প্রকারের নয়। গঙ্গোত্রীর নিকটে হিমাচ্ছাদিত প্রদেশে গঙ্গার রূপ ক্রীড়ারত কন্যার মতো, উত্তরকাশী ও চীড় দেবদারুর কাব্যময় প্রদেশে মুগ্ধরূপ, দেবপ্রয়াগের পার্বত্য অঞ্চলে চমৎকারিণী অলকানন্দার সঙ্গে ইহার লুকোচুরি খেলা, লক্ষ্মণঝোলার করাল দংষ্ট্রা হইতে মুক্তি পাইবার পর হরিদ্বারের নিকট বহুধারায় তাহার স্বচ্ছন্দ বিহার, কানপুর হইতে সহসা নিষ্ক্রমণের পর সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রবাহ, প্রয়াগের বিশাল তটে কালিন্দীর সঙ্গে তাহার ত্রিবেণী-সংগম, প্রত্যেকের শোভা খানিকটা স্বতন্ত্রই, যেন বয়সে বাড়িয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। একটি দৃশ্য দেখিয়া অন্যটির কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেকের সৌন্দর্য পৃথক, ভাব পৃথক, বাতাবরণ পৃথক, মাহাত্ম্য পৃথক।

প্রয়াগ হইতে গঙ্গা নিজের রূপে দেখা দেয়। গঙ্গোত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়িতে বাড়িতে চলিলেও প্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গার প্রায় একই রূপ বলা যাইতে পারে, প্রয়াগে যমুনা আসিয়া উহার সহিত মিলিত হইল। যমুনার তো প্রথম হইতেই দুই রূপ। সে খেলে, লাফায়, কিন্তু ক্রীড়াসক্ত বলিয়া মনে হয় না। গঙ্গা শকুন্তলার মত তপস্বিকন্যারূপে দেখা দেয়, কৃষ্ণবর্ণা যমুনা দ্রৌপদীর মত অভিমানিনী রাজকন্যা বলিয়া মনে হয়। শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কথা আমরা যখন শুনি, তখনই প্রয়াগের নিকটে গঙ্গা-যমুনার মিলনে

শুক্ল-কৃষ্ণপ্রবাহের কথা মনে পড়ে। হিন্দুস্থানে অগণিত নদী, এইজন্য সঙ্গমের কোনও সীমা নাই। এই সকল সঙ্গমের মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা গঙ্গা-যমুনার এই সঙ্গমকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসিয়াছিলেন, আর সেইজন্য তাহার গৌরবের নাম দিয়াছিলেন 'প্রয়াগরাজ'। মুসলমানেরা আসিবার পর যেমন হিন্দুস্থানের রূপ বদলাইয়া ছিল, তেমনই দিল্লী-আগ্রা ও মথুরা-বৃন্দাবনের নিকটে আসিবার সময় যমুনার ও যমুনার প্রবাহের জন্য প্রয়াগের পরে গঙ্গার রূপও একেবারে বদলাইয়াছে।

প্রয়াগের পর গঙ্গাকে কুলবধূর মত গম্ভীর ও সৌভাগ্যবতী দেখায়। ইহার পর বড় বড় নদী আসিয়া তাহার সঙ্গে মিশিতেছে। যমুনার জল মথুরা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করাইয়া দেয়। অযোধ্যা হইয়া আসিতেছে সরযূ—আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের কীর্তিকাহিনীর সহিত সেই জীবনের করুণস্মৃতি বহন করিয়া। দক্ষিণ হইতে আসে চম্বল, সে বলে রন্তিদেবের যাগযজ্ঞের কথা। প্রচণ্ড কোলাহল করিতে করিতে শোণভদ্র গজগ্রাহের জন্য দারুণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা ক্ষণিকের জন্য স্মরণ করাইয়া দেয়। এইভাবে পুষ্ট হইয়া গঙ্গা পাটলীপুত্রের নিকট মগধসাম্রাজ্যের মত সুবিস্তীর্ণ হইয়া যায়। তাহার পর গণ্ডকী তাহার মহামূল্য করভার লইয়া আসিতে সংকুচিত হয় না। জনক ও অশোকের, বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রাচীন ভূমি হইতে বাহির হইয়া অগ্রসর হইবার সময় গঙ্গা যেন মহা ভাবনায় পড়িয়া যায়, এখন কোথায় যাই! যখন প্রচণ্ড বারিরাশি অমোঘ বেগে পূর্বদিকে বহিয়া চলে, তখন দক্ষিণদিকে ফেরা কি তাহার পক্ষে খুব সহজ কথা! সে সত্যই মুখ ফিরাইয়া পূর্বাভিমুখিনী হইল।

দুইজন সম্রাট বা দুইজন জগদ্‌গুরু যেমন হঠাৎ পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন না, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র যেন তেমনই। ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের অপর পারের সমস্ত জল লইয়া আসাম হইয়া পশ্চিমের দিকে আসিতেছে, গঙ্গা অগ্রসর হইতেছে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে। তাহাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ কি করিয়া হইল? কে কাহার প্রতি প্রথমে মাথা নত করিল? কে কাহাকে প্রথমে পথ দিল? উভয়েই স্থির করিল যে দক্ষিণ দিক অবলম্বন করিয়া সরিৎপতির দর্শনে যাওয়া যাক, এবং ভক্তিনম্র হইয়া যাইতে যাইতে যেখানে সম্ভব হয়, পরে পরস্পরে একত্র হইয়া যাওয়া হইবে।

এইভাবে গোয়ালন্দের নিকটে যখন গঙ্গার (পদ্মার) সহিত ব্রহ্মপুত্রের বিশাল জল আসিয়া মিলিত হয় তখন মনে সন্দেহ জন্মে যে সাগর আর ইহার চেয়ে বেশি কি হইবে! বিজয়ী সৈন্যদল সুসজ্জিত অবস্থায় জয়লাভের পর যেমন অস্থির হইয়া পড়ে, বিজয়ী বীর যেমন মনের খেয়ালখুশিতে এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহার পর এই দুই প্রকাণ্ড নদীর ঠিক সেই অবস্থা হয়। বহু ধারায় উহারা আসিয়া সাগরে মিলিত হয়। প্রত্যেক প্রবাহের পৃথক পৃথক নাম, কোনও কোনও প্রবাহের তো একাধিক নাম। গঙ্গার ধারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তাহার এক ধারা পদ্মা নামে ব্রহ্মপুত্রের সহিত এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। ইহার পর একটু আগে গিয়া মেঘনা নামে পরিচিত হইয়াছে।

এই বহুমুখী গঙ্গার ভাগীরথী ধারা যায় কোথায়! সুন্দরবনে আটকাইয়া যায় কি? না, সে যায় সগরপুত্রদের উদ্ধার করিতে। আজ যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই চোখে পড়িবে—মেয়েরা শনের বিড়ে তৈয়ারি করিতেছে, আর বিস্তর বিশ্রী কলকারখানা। যেখান দিয়া এদেশের কারিগরদের তৈয়ারি অসংখ্য বস্তু ভারতের জাহাজে করিয়া লঙ্কা বা যবদ্বীপ পর্যন্ত যাইত, সেই পথে এখন বিলাতি ও জাপানী স্টীমার বিদেশী কারখানায় নির্মিত বাজে মাল ভারতের পণ্যশালায় ছড়াইয়া দিবার জন্য আসিতেছে। গঙ্গামাতা পূর্বের মতই আমাদিগকে নানাপ্রকারের সমৃদ্ধি দান করিতে চান, কিন্তু আমাদের দুর্বল হস্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না।

মা গঙ্গা! এই দৃশ্য দেখা তোমার অদৃষ্টে কতদিন পর্যন্ত লেখা আছে?

ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬

৬

যমুনারাণী

হিমালয় তো সৌন্দর্যের ভাণ্ডার! যেখানে সেখানে সৌন্দর্য বিক্ষিপ্ত করিয়া অন্তরের সৌন্দর্যকে কম করিয়া দেখানোই যেন হিমালয়ের বৈশিষ্ট্য। আবার হিমালয়েও এমন এক স্থান আছে যাহার উর্জস্বিতা হিমালয়বাসীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনই হইল যমরাজভগিনীর উৎপত্তিস্থান।

খুব উচ্চস্থান হইতে বরফ গলিয়া এক প্রকাণ্ড প্রপাতের আকারে পড়িতেছে। গগনচুম্বী বলিলেও ঠিক বলা হইবে না। উত্তুঙ্গ পাহাড় যেন প্রহরীর মত রক্ষা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও জল জমিয়া বরফ হইয়া যাইতেছে, আর কোথাও বরফ গলিয়া জল হইয়া যাইতেছে। এমন স্থানে মাটির ভিতর হইতে জল এক বিচিত্রধরণে টগ্‌বগ্ করিতে করিতে উপরে ওঠে ও ছড়াইয়া পড়ে। মাটির ভিতর হইতে এমন শব্দ বাহির হয় যে, মনে হয় যেন কোনও বাষ্পযন্ত্র হইতে বাষ্প বাহির হইতেছে। আর ঐ সকল ঝরণা হইতে উত্থিত উড়ন্ত জলবিন্দুগুলি এত ঠাণ্ডার মধ্যেও মানুষকে যেন ঝলসাইয়া দেয়। এরূপ চমৎকার স্থানেই অসিত ঋষি যমুনার উৎস খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। এই স্থানে জলে স্নান করা এক প্রকার প্রায় অসম্ভব—ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে চিরকালের জন্য ঠাণ্ডা হইতে হইবে, গরম জলে স্নান করিলে তখন তখনই আলুর মত সিদ্ধ হইয়া মরিতে হইবে। এই জন্য সেখানে ঠাণ্ডা গরম মিশানো জলের কুণ্ড তৈয়ার করা হইয়াছে। এক একটি ঝরণার উপর এক এক গুহা। তাহাতে কাঠের তক্তা পাতিয়া শোওয়া যায়। তবে সারা রাত পাশ বদল করিতে হইবে, কারণ উপরের ঠাণ্ডা ও নীচের গরম দুই-ই একেবারে অসহ্য।

দুই ভগিনীর মধ্যে গঙ্গা হইতে যমুনা বড়, প্রৌঢ়, গম্ভীর, কৃষ্ণা দ্রৌপদীর মত কৃষ্ণবর্ণা ও মানিনী। গঙ্গা তো যেন সরলা মুগ্ধা শকুন্তলার মতই স্থির। কিন্তু দেবদেব তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যমুনা তাঁহার দিদিগিরি ছাড়িয়া

গঙ্গাকেই অভিভাবিকার পদে বসাইয়াছেন। দুই বোনেরই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য কি আকুলতা! হিমালয়ে থাকিতে তো উভয়ে প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। ঈর্ষাপরায়ণ দণ্ডাল পর্বতের মধ্য দিয়া বিঘ্ন নিবারণের মত বক্র হইয়া আসে বলিয়া তাহাদের মিলন সেখানে হয় না। এক কবিপ্রাণ ঋষি সেখানে যমুনাতীরে থাকিয়া নিত্য গঙ্গাস্নানে যাইতেন। কিন্তু ভোজনের জন্য ফিরিয়া যমুনার ঘরেই আসিতেন। তিনি যখন বৃদ্ধ হইলেন—ঋষিরাও শেষে বৃদ্ধ হন—তখন তাঁহার ক্লান্তচরণে ভয়ভীতা গঙ্গা নিজের প্রতিনিধিস্বরূপে এক ক্ষুদ্রকায়া ঝরনা যমুনাতীরে ঋষির আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। আজও সেই ক্ষুদ্রকায় শ্বেতপ্রবাহ সেই ঋষির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সেখানেই বহিয়া যাইতেছে।

দেরাদুনের নিকটেও আমাদের আশা ছিল যে দুই নদী আসিয়া পরস্পরে মিলিত হইবে। কিন্তু না, নিজের শৈত্য ও পাবনত্ব দ্বারা অন্তর্বেদীর সমস্ত প্রদেশ পবিত্র করিবার কর্তব্য সম্পাদন না করিয়া উহাদের পরস্পর মিলনের কথা কি করিয়াই বা মনে আসে? গঙ্গা তো উত্তরকাশী, টিহিরি, শ্রীনগর, হরিদ্বার, কনৌজ, ব্রহ্মাবর্ত, কানপুর প্রভৃতি ইতিহাসে ও পুরাণে প্রসিদ্ধ স্থান-গুলিকে স্তন্য পান করাইবার আকর্ষণে ছুটিয়াছে; এদিকে যমুনা কুরুক্ষেত্র ও পানিপথের নরহত্যাক্লিন্ন ভূমিভাগ দেখিতে দেখিতে ভারতবর্ষের রাজধানীর নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যমুনার জলে সাম্রাজ্যের শক্তি নিহিত থাকা চাই। তাহার স্মৃতির ভাণ্ডারে কুরুপাণ্ডব হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল সাম্রাজ্য পর্যন্ত আর বাবরের যুগ হইতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। দিল্লী হইতে আগ্রা পর্যন্ত যমুনাপথে এমনই মনে হয় যেন বাবরের অন্তরঙ্গ লোকেরাই আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে চায়। উভয় নগরের দুর্গ যেন সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য নয়, যমুনার শোভা দেখিবার জন্যই নির্মিত হইয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের নাকাড়া কবেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মথুরা-বৃন্দাবনের বাঁশরী এখনও বাজিতেছে।

মথুরা-বৃন্দাবনের শোভা অপূর্ব। এই অঞ্চল যেমন রমণীয় তেমনই সমৃদ্ধ। হরিয়ানের গোরুরা তাহাদের মিষ্ট সরস দুধের জন্য ভারতে প্রসিদ্ধ। যশোদা মাতা বা গোপরাজা নন্দ নিজে এই জায়গাটি পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন, একথা যেন এখানকার মাটি ভুলিতেই পারে না। বৃন্দাবন মথুরা বালকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি

বীর কৃষ্ণের বিক্রমভূমি। দ্বারকাবাসের কথা ছাড়িয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের শ্রেষ্ঠ সখী কালিন্দী। যে যমুনা কালীয় দমন দেখিয়াছিল সেই যমুনা কংসের শিরশ্ছেদও দেখিয়াছিল। যে যমুনা হস্তিনাপুরের রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা-বাক্য শুনিয়াছিল, সেই যমুনা রণকুশল শ্রীকৃষ্ণের যোগমূর্তি কুরুক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিল। যে যমুনা বৃন্দাবনের প্রণয়-বাঁশরীর সঙ্গে আপনার তান মিলাইল, সেই যমুনা আবার কুরুক্ষেত্রে গীতার রোমাঞ্চকর বাণীর প্রতিধ্বনি করিল। যমরাজার ভগ্নীর ভ্রাতৃত্ব তো শ্রীকৃষ্ণকেই মানায়।

ভারতবর্ষের সমগ্র কুলনাশ যমুনা বহুবার দেখিয়াছে কিন্তু তবুও পারিজাত-সুকুমার তাজবিবির দেহাবসান তাহার নিকট কতই না মর্মভেদী হইয়া থাকিবে! তথাপি সেই বেদনার উপরেও সে প্রেম-সম্রাট শাজাহানের জমাট অশ্রুর প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ বৈদিক নদী চর্মণ্বতীর নিকট হইতে করভার লইয়া যমুনা যেমন অগ্রসর হইয়াছে, অমনই মধ্যযুগের ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন করাইবার জন্য ক্ষুদ্রকায়া সিন্ধুনদী আসিয়া উহার সহিত মিলিত হইল।

এখন যমুনা অধীর হইয়া উঠিল। কতদিন হইয়া গিয়াছে গঙ্গা বহিনের সঙ্গে দেখা হয় নাই। বলিবার কত কথা আছে, পেটে আর ধরে না। জিজ্ঞাসা করিবারও অসংখ্য প্রশ্ন জমিয়াছে। কানপুর ও কালপি বেশি দূরে নয়। এখানে গঙ্গার সংবাদ পাইয়াই খুশিতে সেখানকার মিশ্রীতে মুখ মিষ্টি করিয়া যমুনা এমনই দৌড়িল যে প্রয়াগরাজে আসিয়া গঙ্গাকে গলায় জড়াইয়া ধরিল। উভয়ের কী উন্মাদনা! মিলনের পরও যেন তাহাদের জ্ঞান নাই যে তাহারা মিলিত হইয়াছে। ভারতের সকল সাধুসন্ত এই প্রেমসঙ্গম দেখিবার জন্য একত্র লইয়াছে, কিন্তু সেদিকে দুই বোনের হুঁশ নাই। অঙ্গনে অক্ষয় বট দাঁড়াইয়া, সেদিকেও উহাদের কোনও দৃষ্টি নাই। বুড়া আকবর ছাউনী গাড়িয়া বসিয়া আছে, তাহাকে গ্রাহ্য করে কে? আর অশোকের শিলাস্তম্ভ আনিয়া যদি ওখানে দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও কি এই দুই বোন তাহার দিকে চোখ মেলিয়া দেখিবে?

প্রেমের এই সংগম-প্রবাহ অখণ্ড বহিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কবিসম্রাট্ কালিদাসের সরস্বতীও অখণ্ড বহিতেছে!

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈর্মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপংকজানা মিন্দীবরৈ রুৎখচিতান্তরেব॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং কাদম্বসংসর্গবতীব পঙক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিশ্ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা-রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা॥
ক্বচিৎ চ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি! বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতাকে সম্বোধন করিয়া রামচন্দ্র লঙ্কা হইতে পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া ফিরিবার সময় বলিতেছেন: দেখ, এই গঙ্গাপ্রবাহে যমুনা-তরঙ্গ মিলিয়া কেমন সুদৃশ্য হইয়াছে। কোথাও মনে হইতেছে, মুক্তামালায় অনুবিদ্ধ ইন্দ্রনীলমণি মতির প্রভাকে খানিকটা ম্লান করিয়া চলিয়াছে; কোথাও মনে হইতেছে, মানসগামী শ্বেতহংসের সঙ্গে সঙ্গে কদম্বফুল উড়িয়া চলিয়াছে; কোথাও যেন শ্বেত চন্দনে ভূষিত ভূমিতে কৃষ্ণাগুরুর পত্র রচনা করা হইয়াছে; কোথাও আবার চন্দ্ররশ্মির সঙ্গে ছায়ায় বিলীন অন্ধকারের খেলা চলিতেছে; কোথাও শরৎশুভ্র মেঘের পিছনে এদিকে ওদিকে আকাশ দেখা যাইতেছে; কোথাও যেন মহাদেবের ভস্মভূষিত শরীরে কৃষ্ণসর্পের আভরণ দেওয়া হইয়াছে।

কী সুন্দর দৃশ্য! উপরে পুষ্পক বিমানে মেঘশ্যাম রামচন্দ্র, আর শুভ্র স্ফটিকরুচিতনু জানকী চৌদ্দবৎসরব্যাপী বিরহের পর অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, আর নীচে ইন্দীবরশ্যামা কালিন্দী ও সুখসলিলা দুগ্ধফেননিভা জাহ্নবী পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া সাগরে নামরূপ বিসর্জন দিয়া বিলীন হইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া স্বর্গ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া থাকিবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে এদিকে পৃথিবীতে কবিপ্রতিভার সৃষ্টির উৎস খুলিয়া গিয়া থাকিবে।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

৭

মূল ত্রিবেণী

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনে মিলিয়া যেমন দত্তাত্রেয়, তেমনি অলকনন্দা মন্দাকিনী ও ভাগীরথী একত্র হইয়া গঙ্গামাতা। এই তিনটি গঙ্গার ভগ্নী নহেন, গঙ্গার অঙ্গ। ভাগীরথী গঙ্গোত্রী হইতে আসেন। তবু মন্দাকিনীর কেদারনাথ আর অলকনন্দার বদরীনারায়ণ গঙ্গারই উৎপত্তিস্থল।

অলকনন্দা ব্রহ্মকপাল হইতে বহিতেছে। যাঁহার জলে একবার স্নান করিলেই যিনি একসঙ্গে সকল পূর্বপুরুষের সর্বকালের জন্য মুক্তি বিধান করেন সেই অলকনন্দার উৎপত্তিস্থান কি গঙ্গোত্রী হইতে কম পবিত্র? ব্রহ্মকপালে একবার শ্রাদ্ধ করিলে আর কখনও শ্রাদ্ধ করিতেই পারা যায় না; মোহবশে করিলে পিতৃপুরুষদের অধোগতি হয়। উহা কত জাগ্রত স্থান!

মন্দাকিনীর গৌরীকুণ্ডের জলের উষ্ণতা কমিয়া আসিলে বদরীনারায়ণের উষ্ণকুণ্ডের জল লইয়া অলকনন্দা আসেন। কেদারনাথের মন্দির, নির্মাণপদ্ধতির দিক দিয়া অন্য সকল মন্দির হইতে পৃথক। ভিতরের শিবলিঙ্গও স্বয়ম্ভূ, কোনও আকার নাই। তাহা এত উঁচু যে মানুষ তাহার উপর ঝুঁকিয়া হৃদয়স্থল স্পর্শ করাইতে পারে। মন্দিরের যতখানি বৈশিষ্ট্য, মন্দাকিনীরও ততখানি। এখানে পাথর ভিন্ন রকমের, এখানকার স্রোত অন্য প্রকারের, এখানে স্নানের আনন্দও স্বতন্ত্র ধরণের।

গঙ্গোত্রী তো গঙ্গোত্রীই। এই তিনটি স্রোতের মধ্যে ভাগীরথীর স্রোত অধিক বন্য ও মুগ্ধ বলিয়া মনে হয়। গঙ্গাতে যে এই তিনটি ধারাই আছে তাহা নয়। নীলগঙ্গা আছে, ব্রহ্মগঙ্গা আছে, কত গঙ্গা আছে। হিমালয় হইতে যত ধারা বহিয়া যাইতেছে, সকলের নামই তো গঙ্গা! হরিদ্বারের নিকটে যাহাদের জল আসিয়া হরির চরণ স্পর্শ করিয়া যায় সে সকল নদীর নামই গঙ্গা। বাল্মীকিও যখন গঙ্গাকে আকাশ হইতে হিমালয়ের শিখররূপী মহাদেবের জটার উপর পড়িতে ও সেখান হইতে বহুধারায় বাহির

হইতে দেখেন, তখন তাঁহার আর্ষ দৃষ্টি পৃথক্ পৃথক্ সাতটি নদী গণিতে পারিয়াছিল।

> তস্যাং বিসৃজ্যমানায়াং সপ্ত স্রোতাংসি জজ্ঞিরে।
> হ্লাদিনী, পাবনী চৈব, নলিনী চ তথৈব চ॥
> সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ, সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।
> সপ্তমী চান্বগাৎ তাসাং ভগীরথরথং তদা॥

১৯৩৪

৮

জীবনতীর্থ হরিদ্বার

ত্রিপথগা গঙ্গার তিন অবতার। গঙ্গোত্রী বা গোমুখ হইতে আরম্ভ করিয়া হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গার প্রথম অবতার। হরিদ্বার হইতে প্রয়াগরাজ পর্যন্ত গঙ্গার দ্বিতীয় অবতার। প্রথম অবতারে সে পাহাড়ের বন্ধন হইতে—শিবের জটাজূট হইতে—মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে। দ্বিতীয় অবতারে সে তাহার ভগ্নী যমুনার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। প্রয়াগরাজ হইতে যমুনার সঙ্গে মিশিয়া গঙ্গা তাহার বিশাল প্রবাহ লইয়া সরিৎপতি সাগরে বিলীন হইবার সাধ পোষণ করে—ইহাই তাহার তৃতীয় অবতার। গঙ্গোত্রী, হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর, গঙ্গাপুত্র আর্যদের এই চারটি সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। যতই উপরে উঠিবেন তীর্থমাহাত্ম্য ততই অধিক মনে হইবে। এক দিক দিয়া দেখিলে কথাটা সত্যও বটে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তো ভারতবাসীর পক্ষে হরিদ্বারের আকর্ষণই বেশি। হরিদ্বারেও পাঁচটি তীর্থ প্রসিদ্ধ। পুরাণকারেরা শ্রদ্ধার সহিত সরস করিয়া প্রত্যেকটির মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মাহাত্ম্য না জানিয়াও মানুষ বলিতে পারে, 'হরিকী পৈড়ী'তেই গঙ্গার মাহাত্ম্যই বলুন আর কাব্যই বলুন সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

এমনিতেই তো প্রত্যেক নদীর দৈর্ঘ্য হইল তাহার কাব্যময় ভূমিভাগ। আমার ইহা বলা অভিপ্রায় নয় যে গঙ্গার তীরে হরিদ্বার অপেক্ষা সুন্দর স্থান

থাকিতেই পারে না। 'হরিকী পৈড়ী'র আশপাশে কাশীর শোভার শতাংশও আপনি পাইবেন না। তথাপি এখানে প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পরের বিরোধিতা না করিয়া গঙ্গার শোভা যাহাতে বাড়ে সেজন্য সহযোগিতা করিতেছে। গঙ্গার সেই শ্বেত ও স্বচ্ছ প্রবাহ; মন্দিরের নিকটে সেই দীর্ঘ ঘাট; ঘাটের নীচে সেই বাঁকাটেরা দহ; এদিকে হাজার হাজার লোক বসিতে পারে ঘাটের মত এমন নদীতীর; ওদিকে ছোট 'ব্যাটের মত' টুকরা ও দুই হাতে ভর দেওয়ার মত পুল; সকলই কাব্যময়। তীরের মন্দিরগুলি ও ধর্মশালাগুলির শ্বেত চূড়া গঙ্গার প্রতি নিবিষ্ট আমাদের মন কাড়িয়া লয় না; তাহারা গঙ্গার শোভাই বৃদ্ধি করে। কাশীর বাজারে বিশ্রাম করিতেছে অলস বলদগুলি, আর এখানকার শান্তিতে রোমন্থনকারী বলদগুলি, উভয়ে স্বতন্ত্র। এখানে গঙ্গার মধ্যে কোথাও ময়লার চিহ্ন পর্যন্ত পাইবেন না। অনন্ত কাল হইতে শ্বেত প্রস্তরগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণ করিয়া গোলাকার হইয়াছে, সর্বত্র তাহাই দেখিতে পাইবেন।

'হরিকী পৈড়ী'তে সব চেয়ে যাহা আকর্ষণ করে তাহার দিকে আমাদের মনই যায় না। আমরা তাহার প্রবল প্রভাবই অনুভব করি। ইহা হইল ওখানকার হাওয়া। হিমালয়ের সুদূরবর্তী হিমাবৃত শিখরের উপর হইতে যে পবন দক্ষিণদিকে বহিতেছে তাহা সর্বপ্রথম এখানকার বসতিগুলি স্পর্শ করে। এমন পবিত্র বায়ু আর কোথায় পাওয়া যাইবে? 'হরিকী পৈড়ী'র নিকটে দাঁড়ান, আপনার ফুসফুস ও মন শুধু আনন্দেই ভরিয়া যাইবে— তাহাতে উন্মাদনা নাই, বরং প্রাণ আছে, শান্তিও আছে।

যখনই এখানে আসিয়াছি, তখনই সেই শান্তি, সেই আনন্দ, সেই স্ফূর্তি মনে মনে অনুভব করিয়াছি। অনেকে বোম্বাইয়ের চৌপাটির সঙ্গে এই ঘাটের উল্লেখ করেন। উভয়ে অবশ্যই একেবারেই বিপরীতধর্মী। এখানকার যাত্রীরা মাছগুলিকে খাবার দেয়, আর সেখানে জেলেরা আহারের জন্য মাছ ধরিতে যায়।

যদি 'হরিকী পৈড়ী' দেখিতে হয় তো সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পরে যাইতে হয়। জ্যোৎস্না আছে কিনা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। জ্যোৎস্না থাকিলে এক প্রকারের সৌন্দর্য, না থাকিলে অন্য প্রকারের। উভয়ের মধ্যে আবার যে বাছবিচার করিতে বসিবে, সে কলানুরাগী নয়। সন্ধ্যার পর একে একে

তারা দেখা দেয়, নীচে একে একে দীপ জ্বালিয়া তাহার জবাব দেয়। এই দৃশ্যের গূঢ় শান্তি মনের উপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে। এতক্ষণে মন্দির হইতে ঢং ঢং ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা আরতির নিমন্ত্রণ জানায়। এই ঘণ্টাগুলির যেন আর শেষই নাই। ঢং ঢং ঢং ঢং যেন চলিতেই থাকে। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে নানাধরণের আরতির গান গায়। পুরুষেরা গায়, স্ত্রীলোকেরা গায়, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, স্থানীয় লোক, বিভিন্ন প্রদেশের যাত্রীরাও গায়; কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না, কেহ কাহারও ভয় করে না। প্রত্যেকে নিজের নিজের ভক্তিভাবে মগ্ন। সনাতনী হিন্দু স্তোত্র গান করে, আর্যসমাজী উপদেশ দেয়। শিখেরা গ্রন্থসাহেবের এক আধ 'মহোল্লে' হইতে 'আসা-দি-বার' জোর গলায় গায়। গোরক্ষা প্রচারক আপনার নিকট আসিয়া বুঝাইয়া দিবে যে, সংসারে সাদা রং এই জন্যই আছে যে গোরুর দুধ সাদা। গোরুর পেটে আছে তেত্রিশকোটি দেবতা, নাই শুধু ভরপেট ঘাস। এই ভিড়ের মধ্যে অনেক নাস্তিক নিজের মতপ্রচারের জন্য প্রমাণ দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিতেছে যে ঈশ্বর নাই। আর উদার হিন্দুধর্ম এ সমস্তই সদ্ভাবে চলিতে দিতেছে। গঙ্গামাতার বাতাবরণে কাহারও তিরস্কার নাই, সকলেরই সৎকার, অভ্যর্থনা। লাল গেরুয়া পরিয়া যাহারা মুক্তির দাবি করে সেই মুক্তিফৌজের মিশনরীরাও যদি এখানে আসিয়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করে, তাহা হইলেও আমাদের যাত্রীরা শান্ত হইয়া তাহাদের কথা শুনিবে আর বলিবে, ভগবান যেমন বুদ্ধি দিয়াছেন, বেচারীরা সেইমত বলিতেছে; উহাদের অপরাধ কি?

হিন্দুসমাজে অনেক দোষ আছে, এই সকল দোষের জন্য হিন্দুসমাজ যথেষ্ট সহ্যও করিয়াছে। কিন্তু উদারতা, সহিষ্ণুতা, সদ্ভাব আদি হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য সর্বদা দোষই নয়। যাহারা বলে উদারতার জন্য বড় বেশি সহ্য করিয়াছে, তাহারা হিন্দুসমাজের মূলই কাটিয়া ফেলে।

এখনও সেই ঘণ্টা বাজিতেছে, অলস লোকদের জানাইতেছে যে এখনও আরতির সময় আছে, যায় নাই। জীবনের কল্যাণ সাধনের জন্য ডাকিতেছে।

আর ঐ যে মেয়েরা 'খাখরের' পাতায় বড় বড় ঠোঙ্গায় বা দোলায় ফুল-গুলির মধ্যে ঘিয়ের প্রদীপ রাখিয়া তাহা স্রোতে ভাসাইয়া দিতেছে, যেন নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করিতেছে। আর ঐ দোলা অমনি তাড়াতাড়ি—যেন নিজের ভিতরের জ্যোতির মাহাত্ম্য জানে—জীবনযাত্রা শুরু করিয়া দিতেছে।

চলিল। ঐ জীবনের যাত্রা শুরু হইল। একের পর এক, একের পর এক, নিজেকে ও নিজের ভাগ্যকে জীবনপ্রবাহে ছাড়িয়া দিতেছে। মানুষের জীবনে ব্যক্তির পক্ষে যে কথা, এখানকার দীপগুলির সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। কোনও অভাগা যাত্রার আরম্ভেই পবনের বশীভূত হইয়া চারদিকে বিষাদ ছড়াইতে থাকে। কেহ বা যথেষ্ট আশা দেখাইয়া পরে নিরাশ করে। কেহ আজন্ম ব্যাধিগ্রস্তের মত কাঁপিতে কাঁপিতে বহু দূর চলিয়া যায়। কখনও দুইটি দোনা পাশাপাশি আসিয়া পরস্পরে লাগিয়া যায়, পরে এই জোড়া-নৌকা দম্পতীর মত দীর্ঘ পথ যাত্রা করে। তাহাদের গোল গোল হইয়া ঘুরিতে দেখিতে মনে যে ভাব ওঠে তাহা ব্যক্ত করা কঠিন। অনেকে তো জীবনের আলো নিভিবার পূর্বে দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যায়। মৃত্যু ও অদৃষ্ট দুই-ই মানবজীবনের অন্তিম অধ্যায়। ইহাদের সামনে কেহ দাঁড়াইতে পারে না, তাই মানুষ ঈশ্বরকে স্মরণ করে। মরণ না থাকিলে হয়তো ঈশ্বরকে স্মরণও করিত না।

সাহস থাকে তো কোনও দিন ভোর চারটায় একাকী এই ঘাটে আসিয়া বসুন। সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর ভক্ত এখানে দেখিতে পাইবেন। ভোর তিনটা হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বিশিষ্ট লোকেরাই এখানে আসেন। বাজিনীবতী উষা সূর্যনারায়ণকে জন্ম দেন আর অচিরে ব্যবহারিক জগৎ এই ঘাট তাহার অধিকারভুক্ত করিয়া লয়। তাহার পুর্বেই এখান হইতে সরিয়া যাওয়া ভাল। আকাশের তারাগুলিও তাহাতে খুশি হইবে।

মার্চ, ১৯৩৬

৯

দক্ষিণগঙ্গা গোদাবরী

ছেলেবেলায় সকালে উঠিয়া আমরা প্রভাতী গাহিতাম। তাহার মধ্যে এই চারিটি লাইন এখনও স্মৃতিপটে অংকিত আছে :

উঠোনিয়াঁ প্রাতঃকালীঁ। বদনীঁ বদা চন্দ্রমৌলী।
শ্রীবিন্দুমাধবাজবলীঁ। স্নান করা গঙ্গেচেঁ। স্নান করা গোদেচেঁ॥

* * *

কৃষ্ণা বেণ্ন্যা তুঙ্গভদ্রা। শরযূ কালিন্দী নর্মদা।
ভীমা ভামা গোদা। করা স্নান গঙ্গেচেঁ॥

গঙ্গা আর গোদা একই। উভয়ের মাহাত্ম্যে এতটুকু পার্থক্য নাই। প্রভেদ থাকিলে বড় জোর এইটুকু যে কলিকালের পাপের জন্য গঙ্গার মাহাত্ম্য কখনও কম হইতে পারে, গোদাবরীর মাহাত্ম্য কখনও কমিতেই পারে না। শ্রীরামচন্দ্রের অত্যন্ত সুখের দিন এই গোদাবরীর তীরেই কাটিয়াছিল, আর জীবনের দারুণ আঘাতও তাঁহাকে এখানেই সহিতে হইয়াছিল। গোদাবরী তো দক্ষিণের গঙ্গা।

কৃষ্ণা ও গোদাবরী এই দুই বিক্রমশালী 'মহাপ্রজা' বা অধিবাসীদের পুষ্ট করিয়াছে। মহারাষ্ট্রের স্বরাজ্য ও অন্ধ্র সাম্রাজ্য এই দুই নদীর নিকট ঋণী বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হইবে না। সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রজাদের উন্নতি বা পতন হইয়াছে। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ভূমিতে এই দুই নদীর অখণ্ড প্রবাহ বহিয়াই যাইতেছে। এই নদী দুইটি ইতিহাসের অতীত গৌরবের যেমন সাক্ষী, ভবিষ্যতের মহতী আশারও তেমনই প্রেরণা জোগাইতেছে। দুইটির মধ্যে গোদাবরীর মাহাত্ম্য প্রায় অতুলনীয়। উহা যেমনই সলিল-সমৃদ্ধ, তেমনই ইতিহাস-সমৃদ্ধ। গোপালক কৃষ্ণের জীবন যেভাবে সর্বত্র বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যে ভরিয়া আছে, উৎকর্ষের পর উৎকর্ষ, গোদাবরীর সুদীর্ঘ প্রবাহের তীর ভূমিও অনুরূপ সৃষ্টি-

সৌন্দর্যের উৎকর্ষ বৈচিত্র্যে ও বিশালতায় ভরিয়া আছে। ব্রহ্মার এক কল্পনা হইতে যেমন সৃষ্টির বিস্তার হইতেছে, বাল্মীকির এক কারুণ্যময়ী অনুভূতি হইতে যেমন রামায়ণের সৃষ্টির বিস্তার হইয়াছে, ত্র্যম্বকের শৃঙ্গ হইতে উৎপতনশীল গোদাবরীও তেমনই অগ্রসর হইয়া রাজমহেন্দ্রীর বিশাল বারিরাশিতে পরিণত হইয়াছে। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র যেমন হিমালয়কে আলিঙ্গন করিয়া আছে দেখা যায়, নর্মদা ও তাপ্তী যেমন বিন্ধ্য ও সাতপুরাকে ধরিয়া আছে বলিয়া মনে হয়, গোদাবরী ও কৃষ্ণাও যেন দক্ষিণের উন্নত প্রদেশকে আর্দ্র করিয়া তাহাকে ধনে ধান্যে সমৃদ্ধ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। অপরপক্ষে সহ্যাদ্রি পর্বত পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে, ইহাদিগকে যেন তাহার পছন্দ হয় নাই ; এমনই মনে হয়, নদী দুইটি যেন অনবরত তাহাকে পূর্ব দিকে টানিবার চেষ্টা করিতেছে। নদী দুইটির উৎপত্তিস্থান পশ্চিম সমুদ্র হইতে পঞ্চাশ পঁচাত্তর মাইলের বেশি দূর হইবে না ; তথাপি উভয়ে আট নয় শত মাইল গিয়া তাহাদের জল-ভার ব' কর-ভার পূর্ব সমুদ্রকেই অর্পণ করিতেছে। আর এই করভারের বিস্তার বড় সাধারণ নয়। তাহার ভিতরে আসিয়া যায় সমগ্র মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদ রাজ্য। সমগ্র অন্ধ্রদেশই তো তাহার মধ্যে ঢুকিয়া যায়। মিশরের সংস্কৃতির জনক নীলনদ তো আমাদের গোদাবরীর সম্মুখে উল্লেখ-যোগ্যই নয়।

ত্র্যম্বকের নিকটে পাহাড়ের এক প্রাচীর হইতে গোদার উৎপত্তি। গিরনারের উঁচু দেওয়ালের উপর হইতেও ত্র্যম্বকের এই প্রাচীর চোখে পড়ে না। ত্র্যম্বক গ্রাম হইতে যে চড়াই শুরু হইয়াছে তাহা গোদাবরী মাতার চরণ পর্যন্ত গিয়াছে। তাহারও উপর উঠিবার জন্য বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে বিরাট সিঁড়ি নির্মিত হইয়াছে। এই পথে মানুষ ব্রহ্মগিরি পর্যন্ত পৌছিতে পারে। কিন্তু সে জগৎই যে পৃথক্। গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান হইতে যে দৃশ্য দেখা যায় তাহা আমাদের বাতাবরণের অনুকূল। মহারাষ্ট্রের তপস্বীরা ও রাজারা সমান ভাবে এইস্থানে নিজের নিজের ভক্তি উজাড় করিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণার তীরে সাতারা আর গোদার তীরে নাসিক পৈঠণ মহারাষ্ট্রের প্রকৃত সাংস্কৃতিক রাজধানী।

২

কিন্তু গোদাবরীর ইতিহাস সহিষ্ণুবীর রামচন্দ্র ও বেদনার প্রতিমূর্তি সীতা মায়ের বৃত্তান্ত হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। রাজ্যপাট ছাড়িবার সময়ে রামচন্দ্রের দুঃখ হয় নাই ; কিন্তু গোদাবরীর তীরে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে যে আনন্দ ভোগ করিয়াছিলেন তাহা শেষ হইতেই রামের হৃদয় একেবারে শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। বাঘ-ভালুকের অভাবে নির্ভীকচিত্ত হরিণ আর্য রামভদ্রের দুঃখোন্মত্ত চক্ষু দেখিয়া দূরে পালাইয়া গিয়া থাকিবে। সীতার সন্ধানে নির্গত দেবর লক্ষ্মণের দিব্য শুনিয়া বড় বড় হাতিও ভয়কম্পিত হইয়া থাকিবে। পশুপক্ষীর দুঃখাশ্রুতে গোদাবরীর বিমল জলও কষায় হইয়া থাকিবে। হিমালয়ে পার্বতীর মত, জনস্থানে সীতা ছিলেন সমস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার প্রস্থানে যে কল্পান্ত দুঃখ হইল, তাহা যদি সার্বভৌম হইয়া থাকে, তবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে ?

রামসীতার পুনরায় মিলন হইল। কিন্তু জনস্থানের বিয়োগব্যথা চির-কালের। আজও যদি আপনি নাসিক-পঞ্চবটীতে ঘুরিয়া দেখেন, চাতুর্মাস্যেই হউক আর গ্রীষ্মকালেই হউক, মনে হইবে বুঝি সমস্ত পঞ্চবটী জটায়ুর মত উদাস হইয়া 'সীতা, সীতা' বলিয়া ডাকিতেছে। মহারাষ্ট্রের সাধুসন্তেরা যদি তাঁহাদের মঙ্গলবাণী এখানে না ছড়াইতেন, তাহা হইলে জনস্থান বুঝি ভয়ানক রিক্তপ্রদেশ হইয়া যাইত। গ্রীষ্মের রৌদ্রতাপ সহ্য করিবার জন্য তৃণরাশি যেমন চারিদিকে জন্মায়, জীবনের বিষমতা ভুলাইয়া দিবার জন্য সাধুসন্ত তেমনই বিচরণ করেন, ইহা কত বড় সৌভাগ্যের কথা! যখনই নাসিক-ত্র্যম্বকের দিকে যাইতে হয়, তখনই মন চায়, রামলক্ষ্মণের চক্ষু দিয়া সমস্ত অঞ্চল দেখি, কেন তাঁহারা বনবাসের জন্য এই স্থানটি বাছিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই কম্পিত তৃণগুচ্ছের মধ্য দিয়া সীতামায়ের কাতর তনুযষ্টিই চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে।

রামভক্ত শ্রীসমর্থ রামদাস যখন এখানে থাকিতেন তখন তাঁহার হৃদয়ে কোন্ ভাবতরঙ্গ উঠিত। তিনি গোদাবরীর তীরে গোবরের হনুমান মূর্তি কি কারণে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ? এই কথা বলিবার জন্য কি, যে হনুমান পঞ্চবটীতে থাকিলে কখনই সীতাহরণ হইতে দিতেন না ? সীতা মা কঠোর-বচনে লক্ষ্মণকে আঘাত করিয়া এক মহাসংকটের সৃষ্টি করিলেন। হনুমানকে তিনি এমন কিছু বলিতেই পারিতেন না। কিন্তু জনস্থান ও কিষ্কিন্ধ্যার মধ্যে অনেক প্রভেদ, আর গোদাবরীও তুঙ্গভদ্রা নয়।

* * *

রামায়ণের করুণ রস সে যুগ হইতে আজ পর্যন্ত বহিয়াই আসিতেছে। ইহার প্রবাহ রোধ করিবে কে? তাই আমরা অন্ত্যজ জাতির দ্বারা স্বীকৃত পাঁণ্ডার মুখে যিনি বেদপাঠ করাইয়াছিলেন সেই জ্ঞানেশ্বর মহারাজের দর্শনের জন্য পৈঠণ যাই। গোদাবরী যেমন দক্ষিণের গঙ্গা, তাহার তীরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরী তেমনই দক্ষিণের কাশী বলিয়া লোকে মান্য করে। এখানকার দশগ্রন্থী ব্রাহ্মণ যে ব্যবস্থা দেন তাহা চারি বর্ণকেই শিরোধার্য করিতে হয়। বড় বড় সম্রাটের তাম্রপত্র হইতেও এখানকার ব্রাহ্মণদের ব্যবস্থাপত্র মহত্ত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এরূপ স্থানে শাস্ত্রধর্মের উপর হৃদয়ধর্মের বিজয় দেখাইবার কাজ শুধু জ্ঞানরাজই করিতে পারিতেন। পৈঠণে জ্ঞানেশ্বরের যজ্ঞোপবীতে অধিকার স্বীকার করা হয় নাই। সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্যের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের স্মৃতি মনে জাগরূক রাখিবার জন্য সেখানকার রাজা যেমন নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের উপর কতকগুলি প্রথার ভার চাপাইয়াছিলেন, সন্ন্যাসীপুত্র জ্ঞানেশ্বরেরও যদি কোনও শিষ্য রাজ্যপাটের অধিকারী হইতেন তাহা হইলে তিনিও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের সাজা দিতেন ও বলিতেন, তোমরা জ্ঞানেশ্বরকে উপবীতের অধিকার দিতে চাও নাই, ভবিষ্যতে তোমরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারিবে না।

হাতের আঙ্গুলগুলিতে যেমন রেখা অঙ্কিত থাকে, তেমনিই বড় বড় নদীর মধ্যে যে সব ছোট নদী আসিয়া আত্মবিলোপ করে তাহাদেরও রেখা অঙ্কিত হয়। সহ্যাদ্রি ও অজন্তার পাহাড় দিয়া যে কোনা হয় তাহার মধ্যে যত জল আসিয়া পড়ে সে সকল টানিয়া টানিয়া ইহারা নিজেদের সঙ্গে লইয়া যায়। ধারণা ও কাদোয়া, প্রবরা ও মুলা ছাড়িয়া দিলেও মধ্যভারত হইতে সুদূর পর্যন্ত যাহারা জল টানিয়া আনে সেই ওয়ার্ধা ও বেনগঙ্গাকে কি করিয়া ভোলা যায়? দুই নদী মিলিয়া এক নদী হইলে তাহার নাম যাঁহারা প্রাণহিতা রাখিলেন, তাঁহাদের মন কত কৃতজ্ঞতা, কত কাব্য কত আনন্দে পূর্ণ হইয়া আছে! সোজা ঈশান কোন হইতে পূর্ব ঘাটের জল যাহারা লইয়া আসে সেই অষ্টচক্রা ইন্দ্রাবতী ও তাহার সখী শ্রমণী তপস্বিনী শবরীকে প্রণাম না করিলে চলে কি?

গোদাবরীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য তো ভদ্রাচলম্ হইতেই দেখা যায়। গোদাবরীর বিস্তার এক হইতে দুই মাইল; সে যখন উঁচু উঁচু পাহাড়ের মধ্য দিয়া নিজের

পথ নির্মাণ করিতে করিতে শুধু দুই শত গজের আবর্ত হইতে বাহির হয় তখন তাহার মনে মনে সে কি ভাবে? কোনও রাজপুরুষ নিজের শক্তি ও যুক্তি প্রাণপণে প্রয়োগ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রজাশক্তি লইয়া যেমন অগ্রসর হয়, তেমন করিয়া গভীর গর্জনে সংসারের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া গোদাবরী সেখান হইতে জলরাশি লইয়া বাহির হয়। নদীতে ঘোড়ার মত কি হাতির মত উঁচু হইয়া বান আসে, একথা আমরা শুনি; কিন্তু একেবারে পঞ্চাশ ফুট উঁচু বানের কথা কি কখনও কল্পনাতেও আসে? কিন্তু কল্পনায় যাহা সম্ভব নয় গোদাবরীর প্রবাহে তাহাও সম্ভব। সংকীর্ণ আবর্ত হইতে জল বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহার পৃষ্ঠভাগও সুরক্ষিত রাখা প্রায় অসম্ভব হয়। অর্ঘ্য দেওয়ার সময় যেমন অঞ্জলীর ছোট নালী হয়, সেইরূপ গর্ত হইতে যে জল বাহির হইয়া আসে তাহার পৃষ্ঠভাগেরও এক ভয়ানক নালী তৈয়ারি হয়। কিন্তু অগ্রভাগে ইহার চেয়েও বেশি অদ্ভুত রস। এই নালীর মধ্য দিয়া নৌকা চালাইবার মত সাহসী নাবিকও এখানে পাওয়া যাইবে। নৌকার দুই দিকে জলের উঁচু উঁচু প্রাচীরও নৌকার বেগের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে দেখিয়া মানুষের মনে কোন জাতীয় চিন্তা জাগে?

ভদ্রাচলম্ হইতে রাজমহেন্দ্রী পর্যন্ত গোদাবরীর প্রবাহ অখণ্ড। তাহার পর হয়তো তাহার মনে পড়িয়াছে সেই সনাতন সিদ্ধান্ত—ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাম্। এখান হইতে গোদাবরী জীবন বিতরণ করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। এক দিকে গোতমী গোদাবরী, অন্য দিকে বশিষ্ঠ গোদাবরী; মধ্যে কয়েকটি দ্বীপ ও অন্তর্বেদীর মত প্রদেশ; আর এই প্রদেশে গোদার সরস জলে ও কৃষ্ণবর্ণ চিকন মাটিতে উৎপন্ন সোনার মত শালিধানে পরিপুষ্ট হইয়া বেদপাঠকারী ব্রাহ্মণ বাস করিতে আসিয়াছে। এমন সমৃদ্ধ দেশকে স্বাধীন রাখিবার শক্তি আমাদের লোকেরা যখন হারাইয়া ফেলিল, তখন ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসীরাও গোদাবরীর তীরে ছাউনি ফেলিবার জন্য একত্র হইল। আজও* ইউনানে ফ্রান্সের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িতেছে।

* সৌভাগ্যবশত আজ এই অবস্থা নাই।

৩

মাদ্রাজ হইতে রাজমহেন্দ্রী যাওয়ার সময় বেজোয়াড়ায় সূর্যোদয় হইল। বর্ষাকাল। আরও কি বলিতে হইবে? সর্বত্র সবুজ রং ছড়ানো—বিচিত্র তাহার ছটা। আরও মাটিতে সবুজ রং এরূপে পড়িয়া আছে ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া যেন তাহার বড় বড় গুচ্ছ হাতে লইয়া উপর দিকে উঁচাইয়া এখানে ওখানে তালগাছ দাঁড়াইয়া আছে দেখা যায়। পূর্বদিকে এক পুষ্করিণী রেললাইনের ধারে ধারে বহিয়া যাইতেছিল। কিন্তু পাড় উঁচা বলিয়া তাহার জল বড় একটা দেখা যাইতেছিল না। শুধু প্রজাপতির মত পক্ষ বা পাল বিস্তার করিয়া কাতারে কাতারে নৌকা দাঁড়াইয়াছিল বলিয়াই তাহার অস্তিত্ব চোখে পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে ছোট বড় পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। এই সব পুষ্করিণীতে নানা বর্ণের মেঘ সমন্বিত অনন্ত আকাশ স্নানের জন্য নামিয়াছিল। তাই জলের গভীরতা অনন্তগুণ বাড়িয়া গিয়াছে মনে হইতেছিল। কোথাও কোথাও চঞ্চল কমলদলে নিস্তব্ধ বকগুলি দেখিয়া প্রভাত বায়ুকে অভিনন্দন করিতে মন সরিতেছিল। এই কাব্যপ্রবাহের মধ্য দিয়া আমরা কোব্বুর স্টেশন পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। এখান হইতে ব্যগ্রতা জন্মিল, এই বুঝি গোদাবরী মাতার দর্শন মিলিবে। পুলের উপর দিয়া যাইবার সময় ডান দিকে দেখিব না বাঁ দিকে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে পুল আসিয়া গেল এবং ভগবতী গোদাবরীর সুবিশাল বিস্তার দেখিতে পাইলাম।

গঙ্গা সিন্ধু শোণভদ্র ঐরাবতীর মত বিশাল বারিপ্রবাহ আমি প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছি। বেজোয়াড়াতে কৃষ্ণামায়ের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম বলিয়া সর্বদা গর্ব অনুভব করিয়াছি। কিন্তু রাজমহেন্দ্রীর নিকটে গোদাবরীর যে শোভা, তাহার তুলনাই নাই। কাব্যসৌন্দর্য আমি এখানে যতখানি অনুভব করিয়াছি আর কোথাও তাহা ততখানি করিয়াছি কি না সন্দেহ। পশ্চিম দিকে দৃষ্টি গেলে সুদূর পর্যন্ত পাহাড়গুলি যেন দলবদ্ধ হইয়া সুন্দরভাবে বসিয়া আছে বলিয়া মনে হইতেছিল। আকাশ মেঘে ঢাকা বলিয়া কোথাও রৌদ্র ছিল না। শ্যামল মেঘে গোদাবরীর ধূলিধূসর জলের কালিমা যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। আর ভবভূতির কথাই বা মনে পড়িবে না কেন? উপরের ও নীচের এই কালিমার জন্য সমস্ত দৃশ্যের উপর বৈদিক প্রভাতের সৌম্য সৌন্দর্যের ছায়া পড়িয়াছিল। পাহাড়গুলির উপর অবতীর্ণ শ্বেতবর্ণ মেঘগুলিকে ঠিক যেন

ঋষিদের মতই মনে হইতেছিল। শব্দ দিয়া এই সকল দৃশ্যের বর্ণনা কি করিয়া সম্ভব ?

এ সমস্ত জল আসে কোথা হইতে ? বাধা-বিপদ সগৌরবে পার হইয়া দেশ যেমন নূতন নূতন বৈভবের ছটায় বিভূষিত হয় আর চারদিকে সমৃদ্ধি ছড়াইয়া পড়ে, গোদাবরীর প্রবাহও তেমনই পাহাড় পর্বত হইতে বাহির হইয়া সগৌরবে নব নব রূপ লইয়া দেখা দিতেছিল। ছোট বড় জাহাজগুলি ছিল নদীর শিশুর মত। মাতৃস্বভাবের সহিত পরিচয় আছে বলিয়া মায়ের কোলে তাহারা যতই নৃত্য করুক, তাহাদিগকে বাধা দিবে কে ? কিন্তু এই সমস্ত নৌকার অপেক্ষা ইতস্তত যে সব ঘূর্ণির সৃষ্টি হইতেছিল, শিশুর উপমা তো তাহাদেরই মানায়। তাহারা কিছুকাল দেখা দিত, বড় বড় ঢেউ দেখিলে ভেংচাইত, এক আধ ক্ষণে হাসিয়া ফেলিত, আর ভাঙ্গিয়া পড়িত। যেখান হইতে ইচ্ছা আসিত, যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত, অথবা লোপ পাইত।

এত বড় নদীগর্ভে দ্বীপ না থাকিলে ইহার আদর থাকিত না। গোদাবরীর দ্বীপ প্রসিদ্ধ। কয়েকটি দ্বীপ সনাতন ধর্মের মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে। কয়েকটি কবিপ্রতিভার মত ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন স্থানে গিয়া নব নব রূপ ধারণ করিতেছে। ইহাদের উপর অনাসক্ত বক ছাড়া আর কে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে ? বকেরা যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন তাহারা নিজেদের গভীর পদচিহ্ন না রাখিয়া যায় না। যদি নিজেদের ধবলচরিত্রের অনুকরণ-কারীদের পথনির্দেশ না করে তাহা হইলে তাহারা আর বক কি ?

নদীর তীর মানে মানুষের কৃতজ্ঞতার অখণ্ড উৎসব। শ্বেতবর্ণ প্রাসাদ ও সু-উচ্চশিখর তো এক অখণ্ড উপাসনাই। কিন্তু ইহাতেও কাব্য সম্পূর্ণ হয় না। তাই ভক্তেরা প্রত্যহ নদীর ঢেউয়ের উপর দিয়া ঢেউয়ের এপার হইতে ওপার পর্যন্ত ঘণ্টানাদ পাঠাইয়া দেন।

সংস্কৃতির উপাসক ভারতবাসী এই স্থানে গঙ্গাজলের কলসীর অর্ধেক গোদাতে ঢালিয়া দেন আর পুনরায় গোদার জলে তাহা ভরিয়া লইয়া যান। কি সুন্দর নিয়ম! কেমন পবিত্র ভাবপ্রধান কাব্য! এই ভক্তিরসে প্রত্যেক হৃদয় পূর্ণ। ঐ ঘণ্টানাদ ও ভক্তিরব পূর্বেকার স্মৃতিই শুনাইয়াছে। না হইলে তো শুধু এঞ্জিনেরই আওয়াজ শুনিতে পাইতাম। আধুনিক সংস্কৃতির এই প্রতিনিধির প্রতি যদি আমাদের ঘৃণা পোষণ না করি তাহা হইলে রেলগাড়ির

পায়ে পায়ে চলার তালের আকর্ষণ কিছু কম বলিয়া মনে হয় না। আর পুলের উপর তাহার সিংহনাদ তো সংক্রামক বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।

পুলের উপর দিয়া গাড়ি বেশ খানিকটা চলিবার পর মনে পড়িল, পুব দিকটাই যে দেখিতে বাকি থাকিল। সেই দিকে মুখ ফিরাইলাম। একেবারে নূতন শোভা চোখে পড়িল। পশ্চিমে গোদাবরীর যতটা প্রসার, পূর্বে তাহার অপেক্ষাও বেশি। অনেকটা পথ পার হইয়া যে তাহাকে সমুদ্রে পড়িতে হইয়াছিল। সরিৎ যখন সরিৎপতির সহিত মিলিত হইতে যায় তখন তাহার সম্ভ্রম তো হইবেই। কিন্তু গোদাবরী তো ধীরোদাত্ত মাতা। তাহার সম্ভ্রম তো উদাত্ত রূপেই প্রকাশ হইবে। এ ধারের দ্বীপগুলি সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের ছিল, তাহাদের মধ্যে বনশ্রীর সৌন্দর্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত ছিল, এদিক হইতে ব্রাহ্মণ বা কৃষকদের কুটির দেখাই যাইত না। এই সকল দ্বীপ জলপ্রবাহের আক্রমণ প্রতিরোধ করিত, ইহাদের মধ্যে কেহ সু-উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করিলে তাহা দূর হইতে দেখা যাইত। প্রকৃতি শুধু সু-উচ্চ বৃক্ষগুলিকে বিজয়পতাকারূপে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন। বামদিকে রাজমহেন্দ্রী ও ধবলেশ্বরের সুখী লোকদের বাসগৃহ হইতে আনন্দচ্ছটা প্রকাশ পাইতেছিল। এমন বিরল দৃশ্যে তৃপ্ত হইবার পূর্বেই দৃষ্টিপথে পড়িল, নদীর দক্ষিণ দিকে উন্মত্তবৎ আন্দোলিত কাশ-পুষ্পের শ্বেতধারার সুদূরগামী স্থাবর প্রবাহ। নদীর জলে উন্মাদনা ছিল, কিন্তু ঢেউ গড়িয়া ওঠে নাই। কাশপুষ্পের চূড়ায় এই প্রবাহ পবনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাই পবন ঢেউগুলি ইচ্ছামত উঠাইতে নামাইতে পারিতে-ছিল। যত দূর দৃষ্টি যায়, দেখিলাম। দৃষ্টির পরিধি এখানে কম হইবে কেন? কিন্তু কাশপুষ্পচূড়া বহিয়াই যাইতেছিল। গোদাবরীর বিশাল প্রবাহের সঙ্গে ছুটিয়া চলিতে তাহার সংকোচ ছিল না। সংকোচ হইবেই বা কেন? মাতা গোদাবরীর বিশাল পুলিনে সে কি মাতৃস্তন্য কম পান করিয়াছিল?

মাতা গোদাবরি! রাম লক্ষ্মণ সীতা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ জটায়ু পর্যন্ত সকলকেই তুমি স্তন্য পান করাইয়াছ। তোমার তীরে শূরবীরও জন্মিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞানীও জন্মিয়াছেন, সাধুসন্তও জন্মিয়াছেন, রাজনীতিজ্ঞও জন্মিয়াছেন। দেশভক্ত ও ভগবদ্ভক্ত উভয়েই জন্মিয়াছেন। তুমি চতুর্বর্ণেরই মাতা। আমার পূর্বপুরুষদেরও তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নব নব আশা লইয়া তোমার দর্শনে আসিয়াছি। দর্শন করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু আমার আশা তো

পূর্ণ হয় নাই। তোমার তীরে শ্রীরামচন্দ্র যেমন দুষ্ট রাবণের নিধন সংকল্প করিয়াছিলেন, কতদিন হইতে আমিও সেইরূপ সংকল্প মনে মনে করিয়া রাখিয়াছি। তোমার কৃপা হইলে তবে না হৃদয় হইতে এবং দেশের মধ্য হইতে রাবণ রাজ্যের অবসান ঘটিবে, রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। যতদিন তাহা দেখিতে না পাইব, ততদিন পুনরায় তোমার দর্শনের জন্য আসিব। আর যদি কিছু না-ই হয়, তবে কাশপুষ্পের চূড়ার স্থাবর প্রবাহের মত আমাকে পাগল করিয়া দাও, যাহাতে বিনা সংকোচে একধ্যানে আমি মাতৃসেবায় রত থাকি, আর সমস্ত ভুলিয়া যাই। তোমার জলে অমোঘ শক্তি আছে, তাহার এক বিন্দু সেবনও ব্যর্থ হইবে না।

অক্টোবর, ১৯৩১

১০

বেদধাত্রী তুঙ্গভদ্রা

জলমগ্ন পৃথিবীকে শূলদন্ত দিয়া বাহির করিবার সময় ভগবান বরাহ যে পর্বতে তাঁহার শ্রান্তি দূর করিবার জন্য বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই পর্বতের নাম অবশ্য বরাহ পর্বতই হইতে পারে। ভগবান যখন বিশ্রাম করিতে-ছিলেন তখন তাঁহার দুই দন্ত হইতে জল ঝরিতেছিল, তাহা হইতে স্রোতের সৃষ্টি হইল। বাম দন্তের স্রোতে হইল তুঙ্গ নদী, দক্ষিণ দন্ত হইতে বাহির হইল ভদ্রা নদী। আজ এই উৎপত্তিস্থানকে বলে গঙ্গামূল, আর বরাহ পর্বতের নাম বাবাবুদান। বাবাবুদান হয়তো বরাহপর্বত নয়, তবে তাহার প্রতিবেশী। তুঙ্গার তীরে শঙ্করাচার্যের শৃঙ্গেরী মঠ। তুঙ্গাকে দর্শন করিয়াছিলাম তীর্থহল্লীতে। (কানাড়ি ভাষায় 'হল্লী' কথার অর্থ গ্রাম।) তীর্থহল্লীতে বড়-জোর এক ঘণ্টা ছিলাম, কিন্তু সেখানকার নদীগর্ভের শোভা দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম। তীর্থহল্লীর মাহাত্ম্য আমার জানা ছিল না, কিন্তু কানাড়ি ভাষায় এক ছোট পুস্তিকায় ইহার বর্ণনা পড়িয়াছিলাম। তীর্থহল্লীর কথা চিরকাল মনে রাখিবার জন্য উহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুঙ্গার তীরে

শিমোগা শহরের নিকটে একবার মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এই কারণেও ঐ নদী আমার স্মৃতিপটে অংকিত আছে।

ভদ্রার তীরে বেঙ্কিপুর পড়ে। এখানকার ভাষায় অগ্নিকে বলে বেঙ্কি। ভদ্রার জল কি বেঙ্কিপুরের আগুন নিভাইবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না?

তুঙ্গা ও ভদ্রার সঙ্গম হয় কূড়লীর নিকটে। শ্রীবাসবেশ্বর, যিনি এক রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়াও লিঙ্গায়ত পন্থের স্থাপনা করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি সম্ভবত এই সঙ্গমের মহাদেবের ভক্ত ছিলেন। বাসবেশ্বরের কাব্যময় গদ্যবচনের শেষে বারবার 'কূড়ল সঙ্গম দেবরাজ'-এর উল্লেখ আছে। উহা পড়িয়া 'মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর' মনে পড়িয়াই যায়। কূড়লীর নিকটে যে তুঙ্গভদ্রার সঙ্গম হইল, তাহা আরও অগ্রসর হইয়া কুর্নুলের নিকটে মাতা কৃষ্ণার সহিত মিলিয়াছে। ইতিমধ্যে কুমুদ্বতী, বরদা, হরিদ্রা, বেদাবতী প্রভৃতি নদী তুঙ্গভদ্রার সহিত মিশিয়াছে। (বেদাবতী ও তুঙ্গভদ্রার মত 'দ্বন্দ্ব নদী', বেদ ও অবতী উভয়ে মিলিয়া বেদাবতী হইয়াছে।) এই অঞ্চলে তুল্যবল দ্বন্দ্বসংস্কৃতিরই প্রাধান্য হইয়া থাকিবে। কারণ তুঙ্গভদ্রার তীরেই হরিহরের মত পুণ্যনগরীর স্থাপনা হইয়াছে। শৈব ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব মিটাইবার জন্য উভয়ের কোনও ভক্ত হরি ও হরের মূর্তি মিশাইয়া এক মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিল। সেই মূর্তির মন্দিরের আশেপাশে যে নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার নামও রাখা হইয়াছিল হরিহর নগর।

তুঙ্গভদ্রার আধার পাথরের। গোল গোল বড় বড় পাথর নদীর মধ্যে স্নান করিতে গিয়া পাওয়া যায়। তেমন পাথর এ অঞ্চলের পাহাড়ের টিলার উপরেও পর পর থাকিতে দেখা যায়। এই প্রস্তরময় অঞ্চলের এক প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। বিজয়নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্য আমি যখন হস্পেট হইতে বিরূপাক্ষ যাই, তখন আমি ভীমকায় 'বট্ট' বা প্রস্তরের দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। বিজয়নগরের অতুলনীয় কারুকার্যখচিত ভগ্নমন্দিরগুলি দর্শন করিতে করিতে আমার হৃদয় সম্রাট কৃষ্ণরাওয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছিল। তিন শত বৎসর ধরিয়া যাহার কীর্তি স্থায়ী হইয়াছিল রাত্রে শুইয়া শুইয়া সেই সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিরই স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। পরের দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া নিকটে মাতঙ্গ পর্বতের শিখরে গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে অরুণোদয়ের ও তাহার পরে

তেমনি সুন্দর সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখিবার কথা ছিল। মাতঙ্গ পর্বতের শিখরের উপর হইতে তুঙ্গভদ্রা দর্শন করিয়া আমরা সন্তর্পণে লাফাইতে লাফাইতে নীচে নামিয়া আসিলাম।

রাবণ যখন সীতামাকে রথে উঠাইয়া গগনপথে যাইতেছিল তখন সীতার বল্কলাঞ্চল এখানকার পাথরে আটকাইয়া যায়। তাহার দাগ এখনও এখানকার পাথরে পাওয়া যায়।

আজ হইতে ঠিক চার বৎসর পূর্বে আমি কুর্নুলের নিকটে তুঙ্গভদ্রাকে সমস্ত জীবন কৃষ্ণাকে অর্পণ করিতে দেখিয়াছি; তাহার নিকটে আত্মসমর্পণের দীক্ষাও লইয়াছি।

শুনিতেছি, এখন এই তুঙ্গভদ্রার উপর বাঁধ বাঁধিয়া তাহার একত্রীকৃত জল লইয়া সমস্ত দেশকে সমৃদ্ধিশালী করা হইবে, আর সেই জল হইতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার শক্তি দিয়া শিল্পের উন্নতি হইতে পারিবে। মাতার সেবার কোনও সীমা বা শেষ কখনও হয় কি?

নদীর স্রোতের মধ্যে এই যে সব হাতির মত বড় বড় পাথর, ইহারা কি পরস্পর সংঘর্ষ করিতে করিতে চলিয়া আসিয়াছে, না হাতির মত বড় পাথরের মধ্য দিয়াই নদী তাহার পথ বাহির করিয়া লইয়াছে, তাহার সন্ধান কে করিবে? দক্ষিণে বৈদিক সংস্কৃতির বিজয় ঘোষণাকারী বিজয়নগর সাম্রাজ্য এই নদীর তীরে নির্মিত হইয়াছিল। ইহারই তীরে কাঁচা মাটির কলসির মত তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কীর্তিপতাকা ত্রিখণ্ডে উড়িত। চীনের সম্রাট্, বোগদাদের বাদশাহ এবং বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ—এই তিনজনের ঐশ্বর্য সকলের চেয়ে বেশি ছিল বলিয়া স্বীকৃত হইত। সে সময়ে কি তুঙ্গভদ্রা এখনকার মতই দেখাইত? না হইলে কিরূপ দেখাইত? নদী কি মানুষের কৃতিত্ব, যাহা হইতে তাহার উৎকর্ষ কি অপকর্ষ হয়?

মুলা ও মুঠা মিলিয়া যেমন মুলামুঠা নদী হইয়াছে, তুঙ্গা ও ভদ্রার সঙ্গমেও তেমনই তুঙ্গভদ্রা হইয়াছে। 'দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ' ন্যায় অনুসারে এই দুই নদীর উচ্চনীচ ভাব আদৌ নাই। দুইটি নামই সমভাবে একসঙ্গে বহিতেছে। এই নদীর জলের মিষ্টতা ও উপযোগিতার প্রশংসা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সকল নদীভক্তেরাই স্বীকার করিয়াছে যে গঙ্গায় স্নান ও তুঙ্গার পান মানুষকে মোক্ষের পথে লইয়া যায়। যদি মোটরে যাওয়া না হইত তাহা

হইলে অনেক স্থান হইতে অনেক রূপে তুঙ্গভদ্রাকে দেখিতে পাইতাম। তুঙ্গভদ্রা হইল এক বিরাট সংস্কৃতির প্রতিনিধি। আজও বেদপাঠীদের মধ্যে তুঙ্গভদ্রার তীরবাসী ব্রাহ্মণদের উচ্চারণ আদর্শ ও প্রামাণিক বলিয়া লোকে মনে করে। বেদের মূল অধ্যয়ন সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে যতই হউক, তাহার যথার্থ আদর ও রক্ষণ সায়নাচার্যের সময়ে তুঙ্গভদ্রারই তীরে হইয়াছে।

১৯২৬—২৭

১১

নেল্লূরের পিনাকিনী

নেল্লূর কথাটার অর্থ হইল ধান্যের গ্রাম। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে নেল্লূরের নাম চিরস্থায়ী হইয়া আছে। বেজোয়াড়া হইতে মাদ্রাজ যাওয়ার সময় নেল্লূর পথে পড়ে।

ভারত সেবক সমাজের স্বর্গীয় হনুমন্তরাও নেল্লূর হইতে কিছু দূরে পল্লীপাড় নামক গ্রামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহা দেখিতে যাওয়ার সময় সুভগসলিলা পিনাকিনীর দর্শন লাভ করি। শ্রীমতী কনকাম্মার পবিত্র হাতে-কাটা সুতার ধুতি উপহার লইয়া আমরা আশ্রম দেখিতে চলিলাম। কিছু দূর পর্যন্ত বাগানের পর বাগান চোখে পড়িল। এখানে ওখানে খালের জল ছুটিতেছিল, আর দেখা যাইতেছিল যেন সবুজের পর সবুজ খেত হাসিতেছে।

পরে আসিল বালুময়ভূমি, সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে বালু আর বালু। বাতাস তাহার ইচ্ছামত যেখানে সেখানে বালুর টিলা বানাইতেছিল, আবার খেয়াল হইলে তেমনই সহজে তাহা ছড়াইয়া দিতেছিল। এই বালুভূমিতে শান্তিতে বিরাজমান উন্নতকায় তালবৃক্ষগুলি আনন্দে দুলিতেছিল। রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর চামর দুলাইতেছিল, না আমাদের মত পথিক দেখিয়া সম্ভ্রমে বীজন করিতেছিল, একথা তালগাছ কখনও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে কি? দ্বিপ্রহরের রৌদ্র কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণের মত কঠোরভাবে দহন করিতেছিল। পা জ্বলিতেছিল। মাথা পুড়িয়া যাইতেছিল। হাত-পায়ের

সঙ্গে সমবেদনা জানাইবার জন্য শরীরের মধ্যভাগও পিপাসায় জ্বলিয়া যাইতেছিল।

এইরূপে ত্রিবিধ তাপে তপ্ত হইয়া আমরা আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে আমি একটা বড় টিলার উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। সহসা পিনাকিনীর জলপ্রবাহ চোখে পড়িল। কী শীতল সে দৃশ্য! গমের চারার মত শুভ্র বালুর উপর স্ফটিকের মত জল বহিয়া যাইতেছে, উপর হইতে প্রচণ্ড সূর্যকিরণ বৃষ্টি হইতেছে, এ শোভা কি করিয়া বর্ণনা করা যাইবে? যেন চাঁদের রসভাণ্ড আগুনের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর ভিতরের রস যেদিকে পথ পায় ছুটিয়া চলিয়াছে। হাওয়া বদলাইল, আর পিনাকিনীর উপর দিয়া বহিয়া আসিয়া শীতল বায়ু সমস্ত শরীর জুড়াইয়া দিতে থাকিল। নিকটের এক গাছে চড়িয়া, দুই ডালের মধ্যে আরামকেদারার মত একটু জায়গা খুঁজিয়া লইয়া আমি বসিয়া পড়িলাম। দূরে তালবৃক্ষ দুলিতেছিল। বয়োবৃদ্ধ আম্রবৃক্ষ ছায়া দিতেছিল। পিনাকিনী শীতল বায়ু ফুৎকার দিতেছিল। নন্দনবনেও কি ইহার অপেক্ষা অধিক সুখ মেলে?

নদীতীরের এই কাব্যসুধা পান করিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল, চক্ষু বুজিয়া আসিল। দিব্য চঞ্চল আম্রশাখার আসন হইতে পড়িয়া যাইবার ভয় যদি না থাকিত, তবে জাগরণের এই কাব্যের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে এমন স্বপ্নকাব্য আমি সেখানে অবশ্যই অনুভব করিয়া লইতাম।

পিনাকিনীর তটদেশ বহুবিস্তীর্ণ। শুনিয়াছি, বর্ষা ঋতুতে নদী রুদ্রাবতার ধারণ করে। উহার লীলাবর্ণনার এই শৈলী বা ভঙ্গী হইতে মনে হয়, স্থানীয় লোকদের পিনাকিনীর উপর অসীম ভক্তি। আসলে পিনাকিনী এক নয়, দুই। যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা উত্তর পিনাকিনী বা পেন্নের। ইহা সোজা নন্দীদুর্গ হইতে আসিতেছে। সেখান হইতে আসিবার পথে ইহা জয়মঙ্গলী, চিত্রাবতী ও পাপঘ্নীর জল লইয়া আসে। লোকে এই সব নদীর স্তন্য পান করিয়া খুবই উপকৃত হয়। এখন তো তুঙ্গভদ্রারও কিছু জল আসিয়া পেন্নেরে মিশিবে। সমস্তই ধান বুনিবার কাজে লাগিবে।

১৯২৬-২৭

জোগ প্রপাত

একেবারে ছেলেবেলাতেই, পশ্চিম সমুদ্রতটে কারোয়ারে যখন ছিলাম তখনই, গিরসপ্‌পার কথা শুনিয়াছিলাম। তখন শুনিয়াছিলাম যে কাবেরী নদী পাহাড়ের উপর হইতে নীচে পড়িয়া যায়, আর তাহাতে যে শব্দ হয় সেই শব্দ-তরঙ্গের আঘাতে দুই মাইল পর্যন্ত একটার উপর একটা কলসি রাখিলে সে কলসি পড়িয়া যায়। তাহা হইলে সেই প্রপাতের শব্দ কতদূর পৌঁছায়? পরে যখন ভূগোল পড়িতে লাগিলাম, তখন মনে সন্দেহ হইল, কাবেরীর জন্মতো একেবারে সেই কুর্গে, আর সে তো পূর্বসমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে, সে তো আর পশ্চিম ঘাটের পাহাড়ের উপর হইতে গিয়া নীচে পড়িতে পারে না। তবে গিরসপ্‌পাতে যে নদী পড়ে তাহা আর কোনও নদী হইবে। তাহাকে তো তাড়াতাড়ি হোন্নাওয়ারের নিকটেই পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া মিশিতে হয়। তাই তাহাকে সওয়া শ', দেড শ' মানুষের সমান উঁচু হইতে লাফাইতে হয়। সে নদীর নাম কি?

নায়েগ্রা প্রপাতের অনেক বর্ণনা পড়িয়াছি। প্রকৃতিমাতা আমেরিকাকে এই অদ্ভুত অলংকার দিয়াছেন। সারা পৃথিবী জুড়িয়া লোকেরা তাই উহার উদ্দেশে যাত্রা করে। অনেকে খুব শক্ত পিপায় চড়িয়া ঐ প্রপাত পার হইবার চেষ্টা করিয়াছে, ইত্যাদি বর্ণনা যেমন যেমন পড়িয়াছি, আমার কৌতূহলও তেমনি তেমনি বাড়িয়াছে। নায়েগ্রার অনেক দিক হইতে নেওয়া চিত্র ও বায়স্কোপ তাহাকে দৃষ্টিপথের সামনে ধরিয়া রাখে। এইরূপে নায়েগ্রার পরোক্ষদর্শন যেমন যেমন বাড়িতে থাকিল, ছেলেবেলায় শোনা সেই গিরসপ্‌পা প্রপাতের মানসপূজাও সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে থাকিল। পরে যখন জানিলাম যে নায়েগ্রা শুধু ১৬৪ ফুট উঁচু হইতে পড়ে আর গিরসপ্‌পার উচ্চতা হইল ৯৬০ ফুট, তখন আমার গৌরবের আর সীমা থাকিল না। সব চেয়ে প্রধান ও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পর্বত হইল ভারতবর্ষে। সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মত নদীর

বিষয়ে যে-কোনও দেশেরই অবশ্য গর্ব হইতে পারে। সবচেয়ে দীর্ঘ নদী তাহাদেরই দেশে আছে এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য আমেরিকার দুইটি নদীর দৈর্ঘ্য যোগ করিতে হইল। মিসোরী ও মিসিসিপি যদি পৃথক্ ধরি, তাহা হইলে তাহারা কতটা দীর্ঘ হইবে? ভারতবর্ষের ইতিহাস যেমন সব চেয়ে পুরানো, তাহার ভূসংস্থানও তেমনি পৃথিবীতে অদ্ভুত।

ভারতবর্ষ কি তবে শুধু জলপ্রপাতের বেলাতেই হার মানিবে? সমস্ত পৃথিবী স্বীকার করিয়াছে যে অশোকের মত সম্রাট্ পৃথিবীতে আর হয় নাই। ভূগোলেও লোককে স্বীকার করিতে হইবে যে সৌন্দর্যে গিরসপ্পার (প্রকৃত নাম জোগ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে এমন একটাও জলপ্রপাত পৃথিবীতে নাই।

কারিকল রাষ্ট্রীয় পরিষদের জন্য যখন দক্ষিণ কর্ণাটকে গিয়াছিলাম তখন আশা ছিল, অঙ্গুবা ঘাটে চড়িয়া শিমোগা হইয়া গিরসপ্পা দেখিয়া আসিব। কিন্তু তাহা হইতে পারিল না।

মনসা চিন্তিতং কার্যং দৈবেনান্যত্র নীয়তে।

হতাশ হইয়া স্বীকার করিলাম, এই চিরপোষিত আশায় আমাকে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইল। গিরসপপা দর্শন আমাকে মনে মনেই করিতে হইবে।

কিন্তু এইটুকু তো জানিয়া গেলাম যে, জোগ মহীশূর রাজ্যের সীমানাতেই অবস্থিত। জোগে যাওয়ার দুইটি পথ—উপরের পথ হইল শিমোগা সাগর হইয়া, অন্য পথ হইল নদীর মুখের দিকে। এ পথে হোন্নাওয়ার বন্দর হইতে নৌকায় গিয়া জঙ্গল পার হইয়া গিরসপ্পা গ্রাম পর্যন্ত যাইতে হয়, সেখান হইতে পাহাড়ে চড়িতে হয়। যাহারা দুই পথেই যাতায়াত করিয়াছে, তাহারা বলে যে এক পথের শোভা অন্য পথে দেখা যায় না, এবং এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, এক দিকের শোভা অন্য দিকের শোভা অপেক্ষা অধিক। যদি এক রাস্তা দিয়া যাই, অন্য দিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকে, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে আমার জোগদর্শন অর্ধেক হইয়াছে।

গুজরাটে যখন বন্যা হইল তখন গান্ধীজী রোগে আক্রান্ত হইয়া বাঙ্গালোরে ছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সেখান হইতে মহীশূর রাজ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে গান্ধীজী সাগর পর্যন্ত পৌছিলেন। সঙ্গে ছিলেন গঙ্গাধর

রাও ও রাজাগোপালাচারি। সমুদ্রে পৌঁছিবার পর গিরসপ্পা দেখিতে না যাওয়া আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। মোটরে করিয়া গেলে মাত্র এক ঘণ্টারই রাস্তা। শিমোগায় তুঙ্গার তীরে বেড়াইতে গিয়া গান্ধীজীকে আগ্রহ করিয়া বলিলাম, "আপনি গিরসপ পা দেখিতে যাইবেন না? লর্ড কর্জন শুধু গিরসপ্পা দেখিবার জন্যই বিশেষ করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন। এদিকে আর কবে আসা হইবে?" গান্ধীজী বলিলেন, "আমার এতটুকুও নড়চড় হইবে না। তুমি অবশ্যই দেখিয়া আসিবে। তুমি দেখিয়া গেলে ছাত্রদের দুই একটা ভূগোলের পাঠ দিতে পারিবে।" আমি যুক্তি পেশ করিলাম: "কিন্তু এ যে পৃথিবীর এক অদ্ভুত দৃশ্য। নায়েগ্রা হইতে জোগ ছয় গুণ উঁচু। ৯৬০ ফুট উপর হইতে জল পড়ে। আপনাকে একবার গিয়া দেখিতেই হইবে।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্ষার জল আকাশে কত উঁচু হইতে পড়ে?" আমি হারিয়া গেলাম। মনে মনে বলিলাম,

"স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং?"

আমি জানিতাম যে, গান্ধীজী সঙ্গীতের মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও খুব অনুরাগী ছিলেন। বেড়াইতে গিয়া অস্তগামী সূর্যের শোভা বা মেঘের মধ্য হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, এমন কোনও একক তারকার দিকে কতবার তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু জনসেবাব্রতী গান্ধীজীর মত মহাত্মার মনে চাঞ্চল্য হইবে কি করিয়া?

কুলশিখরিণঃ ক্ষুদ্রা নৈতে ন বা জলরাশয়ঃ।

এই ভাবে একটা কথা শেষ হইতেই আমি অন্য কথা পাড়িলাম: "আপনি আসিবেন না, তাই মহাদেবভাইও আসিবেন না। আপনি বলিলে তবে তো তিনি আসিবেন।"

"ওর ইচ্ছা হইলে যাক না কেন তোমার সঙ্গে। আমি বারণ করিব না। কিন্তু ও যাইবে না। আমিই যে ওর গিরসপ্পা।"

আমরা সকলে মনে করি, আমরাই পৃথিবীর আদর্শবাদী। পাহাড়ের উপর হইতে জলপ্রপাত পড়িতেছে তাহা যতক্ষণ চর্মচক্ষুতে না দেখিলাম ততক্ষণ তৃপ্তি হইতেছিল না। এইজন্য আহারের পূর্বেই আমরা সাগর যাত্রা করিলাম, আর মোটরে চড়িয়া জঙ্গল পার হইতে লাগিলাম। পাহাড় কাটিয়া লোকে যখন সুড়ঙ্গ তৈয়ারি করে তখন আমাদের খুব আশ্চর্য মনে হয়। কিন্তু

বোম্বাইয়ের বসতি অপেক্ষাও সহ্যাদ্রির ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তা করিয়া লওয়া তাহার চেয়েও কঠিন। এখানে আপনার ডিনামাইট চলিবে না। খানিকটা কাটিবার পরও এক একটা গাছ তাহার শাখাজাল হইতে মুক্ত করা হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া মেটানোর মতই কঠিন। খাণ্ডালা ঘাটের গভীর সুড়ঙ্গের মাঝামাঝি গেলে মানুষ যে ভীষণ রমণীয়তা অনুভব করে, সেইরূপই অনুভূতি এই সকল জঙ্গলে হয়। এই সব জঙ্গলে হাতি, বাঘ, অজগরের মত প্রাণীই মানায়। ইহাদের মধ্যে মানুষ একেবারে তুচ্ছ প্রাণী বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, এইরূপ জঙ্গলে সে আসিল কোথা হইতে ?

যাহা হউক, আমরা জঙ্গল পার হইয়া শরাবতীর তীরে পৌঁছিলাম। এ অঞ্চলের লোকে উহার নাম ভারঙ্গী বলিয়াই জানে— ভারঙ্গী, অর্থাৎ বারো গঙ্গা। এখানকার লোকেরা যদি মনে করে যে গঙ্গা অপেক্ষা এ নদীর মাহাত্ম্য বারো গুণ অধিক, তবে আমরা তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিব না। প্রত্যেক শিশুই কি নিজের মাকে সব চেয়ে বড় বলিয়া মনে করে না ? রিম্‌ঝিম্ শব্দে বৃষ্টি হইতেছিল। এখানে গগনভেদী মহাবৃক্ষও ছিল, ছোট-বড় ঝোপ-ঝাড়ও ছিল। অমর তৃণও ছিল, মাটি ও গাছপালার জীর্ণত্বকের উপর বাড়িতেছে এমন শৈবালও ছিল। ওপারের ছোট বড় গাছ, নদীর জল কতটা ঠাণ্ডা বা গভীর হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের পাতার হাত নদীর জলে ফেলিয়া দিতেছিল। কুয়াসার কিছু কিছু মেঘ অলস ষণ্ডের মত এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছিল।

নদী দেখিলে সর্বদাই প্রশ্ন ওঠে, এ নদী আসে কোথা হইতে, যায় বা কোথায় ? আমার মনে তো সর্বদাই সর্বপ্রথম 'নদী কোথা হইতে আসে' এই প্রশ্ন জাগে। অন্যের মনেও হয়তো এই প্রশ্ন ওঠে। কারণ কি ? 'নদী যায় কোথায়', তাহা পরীক্ষা করা সহজ। নদীতে লাফাইয়া পড়, দেখিবে সে অনায়াসে তোমাকে তাহার সহিত লইয়া চলিবে। যদি অতটা সাহস না থাকে তবে এক আধটা গাছ চিরিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া পড়। কিন্তু 'নদী আসে কোথা হইতে' তাহা পরীক্ষার জন্য বিপরীত দিকে যাত্রা করিতে হইবে। তাহা তো শুধু ঋষিগণই পারেন। সে দিনের দৃশ্য এমন ছিল যে মনে সন্দেহ জাগিতেছিল, ভারঙ্গী বা শরাবতীর জল পাহাড় হইতে আসে, না মেঘ হইতে ?

নৌকা করিয়া আমরা ওপারে গেলাম। তীরের নিকটে মাটিতে অনেক-গুলি ছোট ছোট ঝরনা লাফাইয়া লাফাইয়া নদীতে পড়িতেছিল। উপর হইতে সহজেই অনুমান করিতে পারিলাম, গতকল্য খুব অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় নদীর জল খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, আজ তাহা প্রায় পাঁচ ফুট নামিয়াছে। আমাদের নামাইয়া নৌকা অন্য সকলকে আনিতে ফিরিয়া গেল। শান্ত জলরাশির মধ্যে দাঁড়ের 'ছলাৎ ছপ ছলাৎ ছপ' শব্দ করিতে করিতে নৌকা যখন যাতায়াত করে তখনকার দৃশ্য কী সুন্দর! আর যখন সে নৌকা আমাদের প্রিয়জনদের লইয়া তাহাদিগকে গভীর জলস্রোতের উপর দিয়া টানিয়া লয়, তখন কোনও কারণ না থাকিলেও মনে ভয় না হইয়া পারে না। রাজাগোপালাচারি তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া নৌকায় বসিতে যাইতে-ছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন যে এক পরিবারের সকলে একসঙ্গে একই নৌকায় বসাটা ভাল নয়। হয় পিতা আমাদের সঙ্গে থাকুন, নয় তো পুত্র; উভয়ে নয়।" সঙ্গীরা এই নিয়মের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কেহ ইহার মধ্যে প্রতিষ্ঠা বা কৌলীন্যের গন্ধ পাইলেন, কেহ অন্য কিছু বুঝিলেন। কিন্তু কাহারও মনে একথা হইল না যে, সর্বনাশের সম্ভাবনামাত্র দূর করিয়া দিবার জন্যই এই নিয়ম করা হইয়াছিল। আমি একথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বায়ুমণ্ডল বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত করিতে চাহি নাই। তাই পূর্বপুরুষদের নিন্দা শুনিতে শুনিতে ওপারে পৌছিলাম। নৌকা যখন নদীর মাঝখানে পৌছিল তখন মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিতে ভুলি নাই। নদী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যে স্নান পান ও দানের বিধি পালন করিতেই হয়; তবে বলিতে পারা যায় যে নদীর সাক্ষাৎ পূর্ণভাবে হইয়াছে।

অন্য দলের সঙ্গীরা আসিয়া পড়িলে আমরা ডান দিকের রাস্তা দিয়া হাঁটিতে লাগিলাম। উহা ছিল নদীর বাঁ দিকের তীরে। রাস্তার বড় বড় গাছ মসজিদের স্তম্ভের মত সোজা উঠিয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে আনন্দ হইল। আমাদের দল এত বড় ছিল যে এই নির্জন অরণ্য দেখিতে না দেখিতে আমাদের সরস আলাপ ও অট্টহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কত ক্ষণের জন্য? আমরা একটু অগ্রসর হইলেই নদী আরম্ভ করিল তাহার গম্ভীর ধ্বনি। কাহার সঙ্গে সে ধ্বনির উপমা দেওয়া চলে? এমন গম্ভীর শব্দ আর কোথাও শুনিয়া থাকিলে তবে তো উপমা দেওয়া চলে, নয় কি? মেঘ গর্জন অবশ্যই ভীষণ,

সত্য, তাহা আকাশ জুড়িয়া ছড়াইয়া যায়। কিন্তু তাহা তো সর্বদা হয় না। এখানে তো শুনিয়া শুনিয়া ক্লান্ত হইলেও শব্দ মোটেই থামিবে না। এখানে কি মেঘ ভাঙ্গিয়া পড়ে? কামানের গোলা ছোটে? না, পাহাড়ে বড় বড় পাথরের ঘানি ভাঙ্গিয়া যায়? না, নদী তাহার ধ্যানমৌন ভাব ছাড়িয়া মহারুদ্রের স্তবরাজ পাঠ করে?

"এখন কি দেখিব", "এবার কি দেখিব", এই কৌতূহলে বড় বড় চোখ করিয়া দেখিতে দেখিতে আমরা ডাক বাংলো পর্যন্ত আসিয়া পৌছিলাম। যে স্থান হইতে প্রপাতদর্শন সব চেয়ে সুন্দর, সেই মহীশূর রাজ্য হইতে এই অতিথিশালা নির্মিত হইয়াছে। দেখিবার জন্য যে চত্বর, আমরা সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু একী! সর্বগ্রাসী কুয়াসা ছাড়া আর কিছু তো দেখিবারই নাই। প্রপাত তাহার গভীর গর্জনে সমস্ত পার্বত্য প্রদেশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। ঠিক দিবা দ্বিপ্রহরেও সূর্যের দর্শন পাওয়া গেল না। যেদিকেই তাকাই, কুয়াসা আর কুয়াসা! কুয়াসার ঘন মেঘ যেন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, জোগ যেন তাহার সঙ্গে তাল দিতেছিল। এত আশা লইয়া আসিয়া এইরূপ কৌতুকের সম্মুখীন কখনও হই নাই। মিনিটের পর মিনিট যাইতেছে, আমাদের নিরাশার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াসা যেন আরও ঘন হইয়া উঠিতেছে। অবশেষে আমরা মৌন ভঙ্গ করিয়া পরস্পরে কথাবার্তা কহিতে থাকিলাম—বিশেষ কোনও বিষয়ে নয়, নিরাশার শূন্যতাটা তো ভরানো চাই।

ইন্দ্রদেবই কুপিত হইয়াছেন, না বরুণদেব অপ্রসন্ন হইয়াছেন? মনের মধ্যে ইহা লইয়া তোলাপাড়া করিতেছিলাম, এমন সময়ে পবনদেব সহায় হইলেন, এবং মুহূর্তের জন্য—শুধু মুহূর্তের জন্য—কুয়াসার সেই ঘন পর্দা দূরে সরিয়া গেল, এবং যাহার জন্য সারাজীবন ব্যাকুল হইয়াছিলাম সেই অদ্ভুত দৃশ্য অবশেষে চোখের সামনে উপস্থিত হইল। দেবাদিদেব মহাদেবের শিরোদেশ হইতে যেমন গঙ্গাবতরণ হয়, সেইভাবে এক বড় প্রপাত নীচের স্তর হইতে নির্গত হাতির মত বৃহৎ এক প্রস্তরখণ্ডের উপর পড়িয়া জলরাশিকে ময়দার মত মাখিয়া লইয়া চার দিকে ফোয়ারা হইয়া ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল!!

না। শব্দ দিয়া এ দৃশ্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বিস্ময়মগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিলাম:

নমঃ পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥

অবিলম্বে সম্মুখের সেই হস্তিকায় প্রপাতের পুরোভাগ হইতে পতিত প্রপাতের জটালহরীর দিকে ফিরিয়া বলিলাম ঃ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥

কুয়াসার পর্দা আবার পূর্বের মত জমাট হইল, আমাদের অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, মনে হইতে লাগিল— এতক্ষণ যাহা দেখিতেছিলাম তাহা কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম! সেই বিস্তীর্ণ তট, সেই বিশাল আধার, সেই ভীষণ গভীরতা, আর তাহার মধ্যে জলের নয়, বরং আটার—না ময়দার—সেই অদ্ভুত প্রপাত আর ফোয়ারা! সমস্ত দৃশ্যটা ছিল কল্পনাতীত। যাহা নিজের চোখে দেখিতেছি তাহা সত্যকারের, এই বিশ্বাস দৃঢ় হইবার পূর্বেই কুয়াসার ক্ষীরসাগর আবার ছড়াইয়া পড়িল, আমরা সম্মুখের কাব্যের সঙ্গে তাহাতে ডুবিয়া গেলাম।

এখন কেহ কাহাকেও কিছু বলিতেছে না, যে যাহা দেখিয়াছে তাহা লইয়া সকলে চিন্তামগ্ন। যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে এত বিশাল ও গভীর সৃষ্টি কোথা হইতে সম্ভব হইল, আর দেখিতে দেখিতে লুপ্ত হইয়া গেল—এই আশ্চর্য ভাব সকলকে যেন ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

মনে হইল, ক্ষণেকের জন্য হইলেও যাহা দেখিতে আসিয়াছিলাম তাহা দেখিয়া লইয়াছি, অদ্ভুতভাবে দেখিয়া লইয়াছি। ক্ষণেকের জন্য যে দর্শন লাভ হইল তাহার স্মরণে ও চিন্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো যাইতে পারে। ততক্ষণে সেই শুভ্রজটাধারী প্রস্তর পুনরায় বলিল—

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।

কুয়াসার আবরণ আবার দূর হইল। এখন এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সব কিছু স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। সম্মুখভাগে ঠিক বাম প্রান্তের উপর 'রাজা' অর্ধচন্দ্রাকার প্রস্তরের উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িতেছিল। বর্ষার আবর্জনার জন্য তাহার জলের রং কফির মত হইয়াছিল। কিন্তু সব চেয়ে বেশি জল তো রাজাই পাইতেছিল। বুক ফুলাইয়া যখন সে ঠিক সোজা নীচে পড়িতেছিল তখন প্রকৃতির শক্তি যে কত অপরিমিত সে ধারণা হইতেছিল।

'রাজা' প্রপাতের বিস্তারও বড় কম নয়। তাহার দুই পাশে বড় বড় অনেক মোতির হার দুলিতেছে। সত্যই এ প্রপাত রাজা নামের উপযুক্ত।

ইহার নিকটে যে প্রপাতের দর্শন আমি সর্বপ্রথম লাভ করিয়াছিলাম তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে তৃতীয়, তাহার নাম বীরভদ্র। মাঝখানে এক প্রপাত—নাম রুদ্র—এদিক হইতে স্পষ্ট দেখাই যাইতেছিল না। উহা প্রতিপদে জোরে চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া 'রাজা'তে মিলিয়া গেল।

ঠিক দক্ষিণ দিকে আর একটি ছোট প্রপাত আছে, তাহার ক্ষীণ কটি দেশের জন্য নাম রাখা হইয়াছে পার্বতী। প্রাণ ভরিয়া দেখিবার পর আমাদের কথাবার্তা আবার শুরু হইল। নিজে যাহা কিছু দেখিয়াছে তাহা অন্যকে দেখাইবার উৎসাহ যাহার নাই, সে মানুষ মানুষই নয়। মানুষ সঞ্চরণশীল, সংবাদ আদান প্রদানের জন্য তাহার মন আগ্রহশীল। তাহার মধ্যে আছে একটা ব্যাপ্তির ইচ্ছা। সে নিজে যাহা অনুভব করিয়াছে, অন্যেও তাহা করে—করিতে পারে—যতক্ষণ তাহার এ বিশ্বাস না হয় ততক্ষণ তাহার মনে পরম সন্তোষ হইবে না। রাজাজী দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, 'এই দিকে নীচে তাকাও—শীতল বাষ্পের এই মেঘ কেমন করিয়া উপরে লাফাইয়া আসিতেছে।' দেবদাস বলিতে লাগিল, 'ঐ পাখিদের দিকে তাকাইয়া দেখুন, কেমন নির্ভয়ে উড়িতেছে।' মণি বেনও এমনই কিছু বলিলেন, আর লক্ষ্মী তাহার মাকে তামিল ভাষায় অনেক কিছু বুঝাইয়া নিজের আনন্দ প্রকাশ করিল। আমাদের সঙ্গে আর এক জন ভাই ছিলেন, তিনি পথে অকারণেই অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। আমরা যখন এই দিব্য দৃশ্যের আনন্দে বিভোর হইয়া ছিলাম তখন সেই ভাই নিজের মনগড়া অপমানের দাহ ভোগ করিতেছিলেন। চন্দ্রশংকর তাঁহার এই অবস্থার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আমি মনে মনে বলিলাম—

> পত্রং নৈব যদা করীরবিটপে দোষো বসন্তস্য কিম্ ?
> নোলূকোপ্যবলোকতে যদি দিবা সূর্যস্য কিং দূষণম্ ?

এই সংসারে নিরাশা ভুলভ্রান্তি অপ্রতিষ্ঠা বা মৃত্যুবিচ্ছেদ সত্যকার দুঃখ নয়, অহংকারই সবচেয়ে বড় দুঃখ। বড় বড় ধন্বন্তরিরাও অহংকারের বিকার দূর করিতে পারেন না।

ঐ ভাইয়ের অনেক প্রকার অবসাদ ও মনোবিকারের কথা আমি জানিতাম,

তাই গিরসপ্‌পার জোগের সামনেও তাহাকে দুই মুহূর্ত সময় না দিয়া পারিলাম না। আমি তাহাকে গিরসপ্‌পার বিষয়ে অল্প কিছু বলিলাম ও তাহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলাম।

'রাজা' প্রপাতের পিছনের গুহায় অসংখ্য পক্ষীর বাস। সুদূর খেত হইতে বাছিয়া বাছিয়া তাহারা 'উচ্ছিষ্ট' ও উৎকৃষ্ট শস্যের দানা সংগ্রহ করে। একবার শোনা গিয়াছিল যে এই সংগ্রহের পরিমাণ এত যে সরকারের পক্ষ হইতে তাহা নিলাম করা হয়। মধুমক্ষিকাদের মধু যে মানুষ লুট করিয়া লয়, পক্ষীদের সংগ্রহও সে লুটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি। যাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় তাহাই লুটিয়া লয়, লুট হয়। সৃষ্টির ব্যবস্থাই তো এই: 'পরিগ্রহো ভয়ায়ৈব।'

আবার কুয়াসার আবরণে চারিদিক ঢাকিয়া গেল, অন্তর্মুখ হইয়া চিন্তায় ডুবিয়া যাইবার সুযোগ পাইলাম। এইরূপ সুন্দর দৃশ্যের রহস্য কি? ভূগোল-বেত্তা ও ভূতত্ত্ববেত্তা অমনি বলিয়া উঠিবেন। 'এখানকার পাহাড় 'নিস্' শ্রেণীর পাথরের স্তরের। পর্বতশ্রেণীর মধ্য হইতে একটা গ্রন্থি হয়তো ভাঙিয়া ভাঙিয়া গিয়াছে, আশপাশের মাটি গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। একবার প্রপাত আরম্ভ হইলে তাহা অনেক দূর পর্যন্ত নীচের মাটি গভীরভাবে খনন করিয়া চলে। আর যেখান হইতে প্রপাত শুরু হয় সেই কোনের কাছ ঘেঁষিয়া চলে। উপরের সেই মাথা যদি শক্ত পাথরের হয়, তবে তাহার উচ্চতা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া একরূপই থাকিতে পারে। প্রপাত হইতে সমুদ্র বেশি দূর নয় বলিয়া নদীর অগ্রভাগ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, আর প্রপাতের উচ্চতা একরূপই আছে। কিন্তু ইহা তো হইল প্রপাতের জড় রহস্য। কোনও আধুনিক যন্ত্রবিৎকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, 'একা গিরসপ্‌পার প্রপাতের এত প্রচণ্ড সামর্থ্য আছে যে, মহীশূর ও কানাড়া (কর্ণাটক) দুই অঞ্চলের যত 'শক্তি' চাই তাহা দিতে পারে। আবার, আপনি উহা হইতে বিজলী লউন, প্রত্যেক শহর ও গ্রাম আলো করুন, কল কারখানা চালান। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশেই হউক আর অন্য দেশেই হউক, সেই পরিমাণ লোককে বেকার করিয়া দিন।'

প্রকৃতির মধ্য হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা পৃথিবীর সকল সাধুজন নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া ভাগ করিয়া নিন, এবং জীবনযাত্রার বোঝা হালকা করিয়া নিন—এমন বুদ্ধি মানুষের যখন হইবে তখনকার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আজ তো মানুষের হাতে যে কোনও ধরনের শক্তি আসিলে অমনই

অন্যের সহিত পাল্লা দিয়া তাহার প্রয়োগে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করে—সেই প্রাধান্য অন্যকে মারিয়া বা অন্যকে গোলাম করিয়া অথবা আধপেটা খাওয়াইয়া লাভ করা যায়।

মহীশূর রাজ্য অগ্রসর রাজ্যদের মধ্যে অন্যতম। বড় বড় ইঞ্জিনীয়রেরা এই রাজ্যে দেওয়ানের পদ অলংকৃত করিয়া ইহার সমৃদ্ধি বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যদি কেহ একথা বলে যে সমস্ত পৃথিবীর যত চন্দনতেল প্রয়োজন তাহা শুধু মহীশূর রাজই দেয়, তাহা এমন কিছু অত্যুক্তি হইবে না। ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় সোনার খনি মহীশূরেই আছে। ভদ্রাবতীর লোহার কারখানার কীর্তি বাড়িয়াই চলিতেছে। আর কৃষ্ণসাগর তো মানুষের শক্তির এক সুন্দর নিদর্শন। এমন তো হইতেই পারে না যে এই মহীশূর রাজ্যের কর্তৃপক্ষের গির্‌সপ্পার প্রপাতটা হজম করিবার কথাটা মনেই হয় নাই, কিন্তু এ পর্যন্ত কাজে কিছু করা হয় নাই—এত বড় শক্তি কি কাজে লাগানো যায় তাহা ঠিক করিতে না পারার জন্যই হউক, আর সীমান্ত লইয়া কোনও ঝগড়া মাঝে বাধার জন্যই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই গির্‌সপ্পার শোভা যে এখনও তেমনই স্বাভাবিক, উদাত্ত ও অক্ষুণ্ণ আছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ভগিনী নিবেদিতার বিখ্যাত তুলনার কথা এখানে মনে পড়ে। ভারতবাসীকে যখন কোনও স্থানের রমণীয়তা আকৃষ্ট করে, তখনই সে তাহাকে ধর্মের একটা রূপ দেয়। ভারতের হৃদয় যখন কোনও একটা অদ্ভুত, রমণীয় বা সুন্দর দৃশ্য দেখে, তখনই তাহার মনে হয়, গাভী যেমন গোবৎসকে ডাকে পরমাত্মাও তেমনই জীবাত্মাকে ডাকিতেছেন। ভারতবর্ষে গঙ্গামাতার জলে যদি নায়াগ্রার প্রপাত হইত, তাহা হইলে এখানকার জনসাধারণ তাহার বায়ুমণ্ডল কেমন করিয়া প্রস্তুত করিত? আমোদপ্রমোদ ও বনভোজনের দলের বদলে ও রেলপথে যাত্রীর ভিড়ের বদলে, প্রপাতের মূলে পূজা করিবার জন্য প্রতিবৎসর বা প্রতিমাসে তীর্থযাত্রীর দলই এখানে জমা হইত। নায়াগ্রায় ভোগবিলাসের সমস্ত উপকরণ হোটেলগুলি মুখের সামনে তুলিয়া ধরিতেছে, তাহার পরিবর্তে এদেশে প্রপাতের তীরে বা তাহার পথে পথে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করিবার জন্য মন্দির নির্মিত হইত। সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখিয়া বিহ্বলচিত্ত ব্যক্তি আরাম ও আড়ম্বরের স্থানের পরিবর্তে এখানে তপস্যার ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিত।

আর এতখানি প্রচণ্ড শক্তি মানুষের লাভের ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বন্দী করিবার কথা না ভাবিয়া প্রকৃতির সহিত ঐক্য অনুভব করিবার উন্মাদনায় ভৈরব মন্ত্র জপ করিতে করিতে জলের প্রবাহে নিজের জীবনপ্রবাহ মিশাইয়া দিবার কথাই মনে করিত। ভিন্ন স্বভাবের পরিচয় দিতে আর কিছু বাকি থাকিল কি?

কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখিয়া তাহার মধ্যে নিজের শরীর ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আছে কি? না। শরীরের বন্ধন ভাঙিয়া গেলেও সেই ভগ্নরুগ্ন অবস্থাতেই বাঁচিয়া থাকিব, এরূপ মূক জীবনের মায়া মানুষ ছাড়িয়া দিক,—এই চিন্তায় আধ্যাত্মিক উন্নতি আছে, কিন্তু এই মনোভাব স্থায়ী হওয়া চাই। ক্ষণিক উন্মাদনার কোনও অর্থ নাই। পাগল হওয়ার ইচ্ছা প্রত্যেক মানুষের মনে কখনও না কখনও জাগে, প্রেমের ইহা এক বিকৃতি। ইহাতে কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আভাস পাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইলে মানুষের জীবনে মহত্ত্বের শোভা দেখা যায় না। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার অভ্রান্ত দৃষ্টিতে উহাকে বিভবতৃষ্ণা নাম দিয়া নিন্দা করিয়াছেন, বিভবের অর্থ হইল নাশ। ভগবান মনুও এই কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন,

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে গিরসপ্পার প্রপাতের মত রোমাঞ্চকর দৃশ্যের সামনে শুধু যন্ত্রশক্তির 'হর্স' পাওয়ার, বিদ্যুতের আলো, কলকারখানার কথা ভাবা আর আত্মাকে ভুলিয়া বাহিরের বৈভব ধ্যান করা একই কথা। কিন্তু চারিদিকের অঞ্চল যদি দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়, লোকে যদি অনেক রোগে আক্রান্ত হয়, আর প্রপাতের জল অন্যপ্রকারে ব্যবহার করিলেই যদি জনসাধারণের এই দুঃখ দূর হয়, তাহা হইলে তখন আমাদের কি চেষ্টা হইবে? আমরা সৃষ্টিসৌন্দর্যের রসপান করিতেই থাকিব, আমাদের চিত্তের পুষ্টিকর সাধন হিসাবে প্রপাত যেমন তেমনই রাখিব, না আমাদের বিপন্ন ভাইদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহা বলি দিব? যেখানে পর্যাপ্ত শস্য পাওয়া যায় না সেখানে ধান ক্ষেত ছাড়িয়া গোলাপফুলের চাষ করিলে কি আমাদের হৃদয়ের শান্তি হইবে?

গোলাপে কাব্য আছে, শস্যে কারুণ্য আছে; উভয়ের কোনটিকে আমরা বাছিয়া লইব? ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায়, এক রাজা অনেক গ্রাম উজাড় করিয়া মৃগয়ার জন্য এক প্রকাণ্ড উপবন তৈয়ারি করিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহ এই রাজা পুরুষোচিত খেলার রসগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই:

তাঁহাকে প্রজাপালক বলিয়া স্বীকার করা যাইবে কি? কলা ও সেবার প্রশ্ন যখন সামনাসামনি দাঁড়ায়, তখন কোন্ বৃত্তিকে সমর্থন করিব,—কাব্য না কারুণ্য, তাহা স্থির করিতে হয়। তখন কোন্ কষ্টিপাথরে কষিয়া এ বিষয়ে কর্তব্য নির্ণয় করা যাইবে? রোমকে আগুনে পুড়িতে দেখিয়া নিরোর বেহালা বাজানো, আর জলন্ত মিথিলা দেখিয়া জনকরাজার অধ্যাত্মচর্চা, উভয়ে পার্থক্য আছে। জনসাধারণের যতদূর সম্ভব সেবা করিবার পর ব্যর্থ চিন্তায় মনকে দগ্ধ করা অপেক্ষা হৃদয়ে অন্তর্যামীর স্মরণ দৃঢ় করিবার চেষ্টা আর্য মনোবৃত্তির লক্ষণ। অসংখ্য লোকের বিলাস বা ঐশ্বর্যের জন্য প্রকৃতির শক্তি প্রয়োগ করা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নাশ করা অধর্ম। কিন্তু প্রাণীদের আর্তিনাশ হইতে হৃদয়ের যে বিকাশ হয়, তাহা ছাড়িয়া প্রকৃতির বিভূতিদর্শনে সেই বিকাশ সাধন করিবার ইচ্ছা জাগ্রত রাখা উচিত কি না তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা।

আমাদের সেই ক্রুদ্ধ সঙ্গী তাঁহার কল্পিত অপমানের আগুনে সম্মুখের দৃশ্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আর আমি আমার তাত্ত্বিক কল্পনাবিহারে শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়াছিলাম। উভয়েই হতভাগ্য, কারণ কল্পনা বা মনস্তাপের সময়টুকু পরে প্রয়োজন হইলেই পাওয়া যাইত। কুয়াসার আস্তরণ আবার ছড়াইয়া পড়িল। এখন কি আর প্রপাত আবার দেখা দিবে? রাজাজী বলিলেন, 'গ্রীষ্মকালে প্রপাতে জলের ফোয়ারায় নানাপ্রকার ইন্দ্রধনু দেখা যায়, সেই সময়ের শোভা একেবারে অতুলনীয়।' ইহাও বলা যায় না যে জ্যোৎস্নারাতেও ইন্দ্রধনু দেখা যায় না। মহীশূরের সর্বসংগ্রহ বা গেজেটিয়ারে লেখে যে, ঘাসের বড় বড় বোঝায় আগুন লাগাইয়া প্রপাতে ছাড়িয়া দিলে দেখায় যেন ঠিক পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে। অনেকে এখানে রাত্রিকালে আতসবাজী পোড়াইয়া অদ্ভুত আনন্দ পায়। মানুষ যখন উৎপাত করে তখন সব রকমেই করে। আমার তো এ সমস্ত ভাল লাগে না। এমন স্থানে প্রকৃতি যে সব খাদ্য পরিবেশন করে স্বাভাবিক রুচি অনুসারে তাহা আস্বাদ করাতেই প্রকৃত রসগ্রাহিতার পরিচয়। তাহাতে মানুষের মসলা মিশাইলে স্বাদ ও পাচন শক্তি উভয়ই নষ্ট হয়।

এতক্ষণে আমরা বাংলোয় ভিতরে পৌঁছিলাম। সঙ্গে যে আহার্য লইয়া আসিয়াছিলাম তাহা উদরস্থ করিলাম। এখানকার জল খাওয়া যায় না, খাইলেই ম্যালেরিয়া হয়। বেশির ভাগ লোকে কফি খাইয়াই পিপাসা

মিটাইল। আমি তো সেদিন চাতকের মত বর্ষার ধারার কয়েক বিন্দু জল পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিলাম।

আর একবার প্রপাত দর্শন করিয়া আমরা ফিরিলাম। এখন তো সর্বপ্রকারে স্পষ্টই দেখা গেল, প্রপাতের সংখ্যা চার, তিন নয়। বাঁ দিকে সর্বাপেক্ষা বড় প্রপাত হইল 'রাজা', তাহার পাশে কুয়াসার বিরুদ্ধে গর্জন করিতে করিতে তাহার সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে রোরার—Roarer—অর্থাৎ আমার 'রুদ্র'। মাথার উপর যাহার ফোয়ারার শুভ্র জটাজাল, তাহা হইল 'রকেট'। উহাকে এখন বীরভদ্র বলা ছাড়া উপায় নাই। আর সর্বশেষে যে প্রপাতটি আসিতেছে তাহার নাম আমি তম্বঙ্গী পার্বতীই রাখিলাম। ইংরেজরা রুদ্রকে Roarer নাম দিয়াছে, বীরভদ্রকে Rocket ও পার্বতীকে Lady।

এবার আমাদের ফিরিবার পালা। পায়ে জোঁক ধরিবার ভয় ছিল। এখানকার লোকেরা আমাদের সকলকে সাবধানে চলিবার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, জোঁকে ধরিলে মনেই হইবে না যে রক্ত চুষিয়া লইতেছে। আমি বলিয়াছিলাম, আপনারা এ বিষয়ে ভাবিবেন না, আমরা ইংরেজদেরই চিনিতে পারিয়াছি, জোঁক হইতে সাবধান থাকিতে পারিব না? তাহাতেও প্রায় প্রত্যেকের পায়ে এক একটা জোঁক লাগিয়াই রহিল। সম্ভবত আমার শরীরে রক্তের বিশেষ আকর্ষণ না থাকায় অথবা আমার রক্তের স্বাদ কটু হওয়ায় অথবা হয়তো কাকদৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম বলিয়া আমি বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। আমরা খানিকটা অগ্রসর হইলাম। কিন্তু মণি যেন থাকিতে পারিলেন না। 'একটু থামুন। পারিলে এই দিক হইতে আর একবার প্রপাত দর্শন করিয়া আসি।' 'কিন্তু কুয়াসা যদি দূর না হইয়াই থাকে?' 'তাহাতেও ক্ষতি নাই, ফিরিয়া আসিব। কিন্তু একবার তো দেখিতে দিন।'

ফিরিবার পথে রাস্তার মাঝখানে এক জায়গায় ভাঙ্গা ছিল। সেখান হইতে অনেকে নিকট হইতে পার্বতীকে দর্শন করিল, আর সেখানকার মাটি পিছল ছিল বলিয়া আর অগ্রসর না হইয়া পার্বতীকে 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতও করিল।

যাওয়ার সময় যে পথ হইতে অজ্ঞাত ও অননুভূত অবস্থায় কাব্য অনুভব করিয়াছিলাম, সেই পথ দিয়া ফিরিবার সময় আমরা স্মৃতির মধ্যে সেই কাব্য

আবার অনুভব করিতেছিলাম। কারণ সেই দৃশ্য বিপরীত দিক হইতে দেখিলেও কম নবীন ছিল না। যাওয়ার সময় যে সব গাছের কথা বলিয়াছিলাম ফিরিবার সময় সেই সব গাছ তো দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই। তাই এই সব পরিচিত ভাইদের 'কি হে, কেমন আছ' বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা না করিয়া কি ভাবে যাওয়া যায়? আর গাছে গাছে যে সব লতা প্রেমসেতু বাঁধিয়া দিয়াছে, তাহাদের কথা? তাহাদের নম্রতাকে নমস্কার না করিয়া যে অগ্রসর হয় সে অরসিক। আমরা ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখন উহার শান্ত প্রবাহের উপর হইতে ফিরিয়া আসিবার কথা। কুয়াসার মেঘ চারিদিকে ছড়াইয়া ছিল। নদীর শান্ত জলপ্রবাহ ধীরে ধীরে প্রপাতের দিকে যাইতে দেখিয়া আমার মানস চক্ষে বলিদানের জন্য নীয়মান মেষপালের চিত্র ভাসিয়া উঠিল। আমি সেই জলরাশিকে বলিলাম: 'তোমাদের ভাগ্যে কত বড় অধঃপতন লেখা আছে তাহার ধারণা পর্যন্ত তোমাদের নাই। তাই তোমরা এত শান্তচিত্তে অগ্রসর হইতেছ। অথবা তাহা নয়, আমিই ভুল করিয়াছি। তোমরা জীবনধর্মী। তোমাদের বিনাশের ভয় কি?

প্রায়ঃ কন্দুকপাতেন পতত্যার্যঃ পতন্নপি।

যত উঁচু হইতে পড়িবে, ততখানি উঁচু পর্যন্তই উছলিয়া উঠিবে। তোমাদের দয়া করিবার আমি কে?' শরাবতীর পবিত্র জল স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইলাম। জল খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, আর বলিল—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।' নৌকা এপারে আসিল, আমরা বুঝিলাম, মোটরে যদি এদিকে আর একটু নীচে পর্যন্ত আসা যায় তবে পুনরায় দক্ষিণ দিক হইতে ঐ প্রপাত দেখাও হইবে। আমরা যে দিক দিয়া আসিয়াছিলাম তাহাকে বলে 'মহীশূরের দিক' আর ডান দিকে যাইবার জন্য যে পথ দিয়া বাহির হইলাম তাহা 'বোম্বাইয়ের দিক।' জোগ উভয় রাজ্যের সীমায় অবস্থিত।

এখন তো আমরা নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বড় বড় শিলাখণ্ডের ভিতর দিয়া ছুটিতে লাগিলাম। দুই বৎসর রোগে ভুগিয়াছি, এজন্য আমার নাম সকলেই খুব জানিত। তাই আমাকে ছুটিতে দেখিয়া রাজাজীর আশ্চর্য লাগিল। কে একজন বলিল, 'উনি তো মহারাষ্ট্রের মাউলি, আবার হিমালয়ের যাত্রীও বটে। মাছের যেমন জল, এই সব মারাঠাদের তেমনই পাহাড়।'

এই সব কথা শুনিবার জন্য কি আর থামি? আমি তো ছুটিতে ছুটিতে রাজা প্রপাতের পাশে সেই টিলার কাছে গিয়া পৌছিলাম। সেখানে দাঁড়াইয়া নীচের দিকে তাকাইতেই পারা যায় না, মানুষ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। প্রপাত চারটির আওয়াজে কানে আর কোনও শব্দই শোনা যায় না। প্রপাতের জল যেমন উপর হইতে নীচে পড়িয়া আবার উঁচুতে উছলিয়া ওঠে, কানেও হয়তো শব্দ সেইরূপ উছলিয়া ওঠে। আমার দৃষ্টি প্রথম পড়ে রাজার গণ্ডস্থলে মোতিবিন্দুগুলির প্রতি, জলপ্রলয় হইতে মানুষকে বাঁচাইবার জন্য বীরহৃদয় সন্তরণপটু যেরূপ জলে লাফাইয়া পড়েন, প্রপাতের এই দিকে থাকিয়া যে সব পক্ষী বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটায় তাহাদের প্রতি। এই প্রপাতের ভীষণ সৌন্দর্যের কোনও ধারণাই কি এসকল পক্ষীর নাই, না ঈশ্বর ইহাদের হৃদয়ে এতখানি সাহস ভরিয়া দিয়াছেন? আমার মনে হয় আগন্তুক পক্ষীদের এতখানি সাহস ছিল না। জোগের এই অধিবাসীদের জন্ম এখানেই হইয়াছিল, প্রপাতের রক্ষণব্যাপারে উহাদের হাত ছিল। বাঘের বাচ্চা বাঘিনীকে ভয় পায় না। সমুদ্রের মাছগুলি সমুদ্রে আনন্দ পায়। জোগের এই সকল সন্তান হয়তো জোগের সঙ্গে খেলাই করে।

দূর হইতে মহীশূরের দিক দিয়া যখন রাজা প্রপাতকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার প্রভাব ছিল ভিন্নপ্রকারের। এখানে তো আমরা তাহার এতটা কাছে ছিলাম যে মনে হইতেছিল, বুঝি হাতির গণ্ডস্থলেই শুইয়া আছি। উপরের জল প্রপাতের দিকে এমন করিয়া টানিয়া আনিতেছিল যেন কোনও মহাজাতিকে জ্ঞানে অজ্ঞানে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মহান বিপ্লবের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। একটা মহাজাতি যখন সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়, তখন সম্মুখে কি আছে তাহার ধারণাই সে করিতে পারে না। পারিলেও 'আমাদের এরূপ ঘটিবে না, কোন না কোন উপায়ে আমরা বাঁচিয়া যাইব' এরূপ অন্ধ বিশ্বাস তাহার মনে থাকিতে পারে। উন্নতির আশা বাড়িয়াই চলে। শেষে উগ্রপন্থীরা সংযত হয়, নরমপন্থী বা 'মডারেট্‌-'রা অন্ধ হইয়া, যাহাদের উপর দায়িত্ব নাই তাহাদের সঙ্গে মেশে, পুনরায় ইচ্ছা থাকিলেও পিছনে হটিতে পারে না। আর যদি পিছনে হটিয়া যায় তাহাতেই বা কি? যে তীর ধনুক হইতে ছোঁড়া হইয়াছে তাহা কি আর কখনও পিছনে টানিতে পারা যায়? যাহা অটল নহে, তাহা আবার বিপ্লব কি?

প্রপাতের জল নীচে কতদূর যায় তাহা দেখা বা জানা অসম্ভব ছিল। কারণ উচ্ছলিত জল বড় বড় মেঘের আকারে প্রপাতের পাদদেশে সংলগ্ন ছিল। জলের উন্মত্ত উল্লাস দেখিয়া মনে হইতেছিল, মহাদেব বুঝি ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্যই করিতেছেন, আর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রুদ্র তাল দিতেছেন। কিন্তু রোমাঞ্চকারী শোভার উৎকর্ষরূপে বীরভদ্রকেই তো দেখিতেছি। সেখানে জল পড়িতেছে, কি উছলিয়া উঠিতেছে, সে কথা আপনাদের মনেই হইবে না। মনে হইবে, বুঝি বড় বড় তোপে গোলা দাগা হইয়াছে, আর কাঁচা আটার ফোয়ারা উড়িতেছে। শব্দে সে দৃশ্যের বর্ণনা হইতেই পারে না, কারণ শব্দের পরিবেশ 'শান্তি ও শৃঙ্খলা'র মধ্যেই হয়।

শুইয়া শুইয়া প্রাণ ভরিয়া এই দৃশ্য দেখিলাম। অথবা সত্য বলিতে কি, এতখানি শুইয়াও তৃপ্ত হওয়া অসম্ভব একথা না বোঝা পর্যন্ত দেখিতেই থাকিলাম। অবশেষে আমরা দাঁড়াইয়া উঠিলাম ও ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ফিরিয়া আসা সহজ ছিল না। কেহ কেহ উঠিতে চাহিতই না। তাহাকে টানিয়া আনিবার জন্য যে যাইত, সে-ও ঐ নয়নোৎসবে ডুবিয়া যাইত। প্রথম জন যদি বা অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইত, তথাপি যে ডাকিতে গিয়াছিল সে আর উঠিত না। আর যখন উভয়ে কষ্টে সংযত হইয়া ফিরিয়া আসিত, তখন ইহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিবার জন্য তৃতীয় যে ভ্রাতা অগ্রসর হইয়াছেন তিনি এক মুহূর্ত নয়ন তৃপ্ত করিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইতেন, আর ঐ দুইজনের সংযম কিছুটা শিথিল করিয়া দিতেন। ঐ দুইজনের মনে হইত, এতখানি রাগ করিয়াও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যদি এতখানি আলগা হইয়া পড়েন তাহা হইলে আমরাও ততখানি ঢিলা হইলে কোনও দোষ নাই। আমরা কি আর উঁহার চেয়ে সংযমী বলিয়া দাবী করিয়াছি?—আমার মনে হইল, ঐ শিলা পর্যন্ত গেলে আমি রাজার জলে পা ডুবাইতে পারিব। কিন্তু নদীর জল বাড়িতেছিল, আর তাহাতে সেই শিলা ছোট দ্বীপের মত হইয়া গিয়াছিল। আমারও মনে হইল, রাজাজীর কথা না মানিলে দ্বিগুণ ঔদ্ধত্য হইবে। তাঁহার আদেশ অমান্য করি কি করিয়া? আর 'রাজা'র মাথায়ই বা পা রাখি কি করিয়া?

আমরা ফিরিয়া চলিলাম। ভক্তি, বিস্ময়, মানবজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা, দৃশ্যের সৌন্দর্য, বর্তমান মুহূর্তের সার্থকতা—বহু ভাবনার মেঘে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া-

ছিল। আর সেখান হইতে বীরভদ্রের মত মস্তিষ্কে তীর ছুঁড়িতেছিল। চিন্তার এই আতসবাজি অদ্ভুত। তীর হৃদয় হইতে মস্তিষ্কে যায়, আর তাহা বিদীর্ণ করে। সুস্থ শরীর কিরূপ অসুস্থ হইয়া পড়ে, সে কথা যিনি অনুভব করিয়াছেন তিনিই এই অভিজ্ঞতার চমৎকারিতা বুঝিবেন।

এখানে মন্দির নাই কেন? মন্দিরই তো আমাদের জন্মভূমির কাব্যময় ক্ষেত্র। পাহাড়ের কোনও উত্তুঙ্গ শিখর হইলে সেখানে কোনও ঋষি ধ্যান করিতে বসিয়া গিয়াছেন, আর ভক্তেরা একটা মন্দির অবশ্যই নির্মাণ করিয়া থাকিবেন—তাহা পুণার নিকটে পার্বতীশিখরেই হউক আর চম্পানগরের নিকটে পাণ্ডুয়াগড়েই হউক, জুনাগড়ের নিকটে গিরনারেই হউক, আর হিমালয়ের কৈলাসশিখরেই হউক। দক্ষিণে যাইতে যাইতে নদী কোথাও উত্তরবাহিনী হইয়াছেন কি? তাহা হইলে চল, সেখানে এক আধটা তীর্থ স্থাপন কর, কোটি কোটি লোক আসিয়া পবিত্র হইয়া যাইবে। বড় বড় দুই নদী একত্র মিলিয়াছে; তবে সেই প্রয়াগে আমাদের সাধুসন্তেরা তৃতীয় এক নদী সরস্বতীকে বহাইয়াছেন! সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া সমুদ্রতীরে পৌছিয়াছেন, সেখানে ভক্তেরা জগন্নাথের বা সেতুবন্ধ মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যেখানে ভূভাগের শেষ প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছেন সেখানে হইবে হয় কন্যাকুমারী নয় তো দেবেন্দ্র। দীর্ঘ মরুভূমির মধ্যে এক আধটা সরোবর যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা নারায়ণের সরোবর, তাহার পূজা হওয়াই চাই। আর ক্ষীরভবানীর স্থাপনা তো করিতেই হইবে।

আমাদের সন্ত কবিগণ কোথায় কোথায় তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা খুঁজিতে আরম্ভ করিলে ভারতবর্ষের সমস্ত ভূগোল শেষ হইয়া যাইবে। মুসলমান সাধু ও রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরাও আমাদের দেশে এইরূপ অদ্ভুত কাব্যময় স্থান পছন্দ করিয়াছেন, সেখানে পূজা-প্রার্থনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে এই প্রপাতের নিকট মন্দির নাই কেন? জীবনরাশির এত বড় অধঃপতন দেখিয়া কি মুনি খিন্ন হইয়াছেন। ভৈরব পাহাড়ের মত এখানে দেহত্যাগ করিবার নেশার সৃষ্টি হইবে, এই আশংকায় লোকসংগ্রহে চেষ্টিত মুনিগণ লোকরক্ষার জন্যই কি এই স্থান অপছন্দ করিয়াছিলেন? না, মনটা উদ্‌ভ্রান্ত করিবার মত অবিরাম ভীষণ গর্জন ধ্যানের অনুকূল নয়, ইহা মনে করিয়া উপাসক এখান হইতে বিমুখ হইয়া থাকিবেন? না, এই প্রপাতই স্বয়ং অভয়ব্রহ্মের

মূর্তি, দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এমন কোন্ মূর্তি আনিয়া তাঁহার পাশে দাঁড় করাইবেন, এই সমস্যায় পড়িয়া তাঁহারা এই চিন্তা ছাড়িয়া দিয়াছেন? কে বলিতে পারে? আমাদের পূর্বপুরুষেরা এখানে কোনও মন্দির গড়েন নাই, ইহাতে আমার একটুও দুঃখ নাই। কিন্তু এই স্থানটি দেখিয়া যে ভাবের উদয় হয় তাহা লইয়া এক আধটা তাণ্ডবস্তোত্র তো তাঁহাদের অবশ্যই লেখা উচিত ছিল। পার্থিব মূর্তি যেখানে অচল, বাঙ্‌ময়ী মূর্তি সেখানে অবশ্যই উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে পারে।

আমরা প্রপাতের মাথার উপর হইতে এই সমস্ত সৌন্দর্য দেখিতেছিলাম। হোন্নাওয়ারের দিক হইতে যাহারা আসে তাহারা যখন উত্তর কানাড়া জেলার মহাকান্তার পার হয়, তখন তাহারা নীচ হইতে সম্ভবত প্রপাতটির আপাদমস্তক দর্শন লাভ করে। দুইটির মধ্যে কোন দর্শনটি ভাল, একথা অভিজ্ঞতা না থাকিলে কে বলিতে পারে? আর অভিজ্ঞতা থাকিলেই বা কি? প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ বিভূতির মধ্যে কবে তুলনা হইয়াছে? হিমালয়ের সৌন্দর্য, সাগরের গাম্ভীর্য, মরুভূমির ভীষণতা ও আকাশের নম্র অনন্তরূপ—তুলনা ও পছন্দ অপছন্দের বিচার কে করিতে পারে? তাই একবার হোন্নাওয়ারের পথে জোগদর্শন করিতে আসা চাই।

সমুদ্রে জাহাজের বেড় মাপিবার অভিজ্ঞতা লইয়া কয়েকজন সামরিক কর্মচারী কুশলতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রপাত মাপিবার জন্য আসিয়াছিলেন, আর দোলায় ঝুলিতে ঝুলিতে প্রপাতের পিছন দিকে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনোভাব কিরূপ হইয়াছিল? জোগের পাখীরা কিভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল? প্রপাতের পরদার মধ্য হইতে ভিতরে যে বাহিরের আলো ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা তাঁহাদের কেমন লাগিতেছিল? আর অন্ধকার রাত্রিতে প্রপাতের পিছনে ঘাস জ্বালাইয়া যদি খুব বড় আলো করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলে কী এক গন্ধর্বনগরীর সৃষ্টি হইবে, একথা কি কেহ ধারণা করিয়াছেন? এখানে যখন বিদ্যুতের কলকারখানা হইবে, তখন পরিকল্পনাপটু কোনও বীর এই প্রপাতের পিছনে বিদ্যুতের বাতির সারি অবশ্যই বসাইবেন, আর সংসার যাহা কখনও দেখে নাই এমন ইন্দ্রজাল বিস্তার করিবেন। তখন এই সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল বিশাল এক রঙ্গভূমির মত সজ্জিত হইয়া উঠিবে, সারা পৃথিবীর ব্রাহ্মণেরা উহা দেখিবার জন্য অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু

তখন কি কাহারও ঈশ্বরের কথা মনে পড়িবে ? মনে হয়, মানুষ ঈশ্বরকে পাইবার জন্য নয়, ভুলিবার জন্যই যুক্তি ও উপায় খুঁজিতে তাহার বুদ্ধিকে চালনা করে।

এমনও হইতে পারে যে সব দিক দিয়া হার মানিবার পরেই বুদ্ধি দিয়া ঈশ্বরকে অনেক ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

প্রত্যেক বস্তুরই শেষ আছে। আমাদের এই জোগ-যাত্রারও শেষ হইল। অত্যন্ত পবিত্র ও মধুর স্মৃতি লইয়া আমরা ফিরিলাম। কিন্তু আরও একবার এখানে আসিবার বাসনা তো থাকিয়াই গেল। তাই 'পুনরাগমনায় চ' এই শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে আমরা ভারতের ঐশ্বর্যের এই অসাধারণ রূপ হইতে বিদায় লইতে পারিলাম।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

১৩

জোগ প্রপাতের পুনর্দর্শন

হিমালয়, নীলগিরি, সহ্যাদ্রির মত উত্তুঙ্গ পর্বত ; গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা ব্রহ্মপুত্রের মত সুদীর্ঘ নদনদী ; চিল্কা বুলর ও মঞ্চরের মত প্রসন্ন হ্রদ যে দেশে বিরাজমান, সে দেশে দুই একটি মহান্ ভীষণ ও রোমাঞ্চকারী জলপ্রপাত না থাকিলে প্রকৃতিমাতা কি করিয়া নিজেকে সার্থক মনে করেন ? দক্ষিণ ভারতে কারোয়ার জেলা ও মহীশূর রাজ্যের সীমায় এমন একটি প্রপাত আছে, তাহা সংসারে একমাত্র অদ্বিতীয় বা সর্বশ্রেষ্ঠ পদবাচ্য না হইলেও শ্রেষ্ঠ প্রপাতগুলির অন্যতম। ইংরেজেরা উহাকে 'গিরসপ্ পা ফল্‌স্' বলে, দেশী নাম হইল 'জোগ'।

লর্ড কার্জন যখন ভারতে আসেন তখন তিনি জোগ প্রপাত দেখিবার জন্য এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে প্রথম সুযোগ পওয়ামাত্র তিনি ইহা দেখিতে আসেন এবং ইহার অদ্ভুত সৌন্দর্য দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করেন। সেই হইতে আমাদের দেশে ইহার প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া গেল। যেখান হইতে লর্ড কার্জন প্রপাত দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, মহীশূরের রাজসরকার সেখানে এক চত্বর নির্মাণ করিয়া দেন—উহার নাম 'কার্জন সীট।'

প্রপাতের নিকটেই মহীশূরের রাজসরকার এক অতিথিশালাও নির্মাণ করেন। অতিথি তালিকায় প্রকৃতিপ্রেমিক দেশী বিদেশী যাত্রীরা সময়ে সময়ে নিজেদের মনের আনন্দ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল প্রকাশের একটা সংগ্রহ যদি ছাপানো যায়, তবে তাহা প্রকৃতি কাব্যের এক অসাধারণ মঞ্জুষা হইবে। কবিতাগুলি উচ্চশ্রেণীর হইলেও জোগের প্রত্যক্ষ দর্শনে উহাদের অপূর্ণতা সিদ্ধ হইবে, মুখ হইতে আপনা আপনি বাহির হইয়া আসিবে—এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ। শরাবতী তো ছোট একটি নদী। তবু তাহার তিন তিনটি নাম হইয়াছে কেন? প্রথমে উহা পরিচিত ছিল ভারঙ্গী বা বারো গঙ্গা নামে। মধ্যভাগে উহার নাম ছিল শরাবতী। যেখানে উহা পরিণত অবস্থায় সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়াছে সেখানে উহার নাম বালনদী। শরাবতীর স্রোত যদি এই রোমাঞ্চকারী প্রপাতের রূপ না-ও ধারণ করিত, তাহা হইলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দ্বারা উহা লোকের মন হরণ করিত। তাহা হইলে উহা ভারতবর্ষের অনেক সুন্দর নদীর মধ্যে অন্যতম বলিয়াই পরিগণিত হইত। কিন্তু এই প্রপাতের জন্যই ক্ষুদ্র শরাবতী ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়া হইয়া গিয়াছে।

জোগের এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিবার জন্য রাজাজী ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আমি যখন প্রথমবার যাই, তখন ঐ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া একটা কৌতূহল অবশ্য তৃপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখনই মনুষ্য স্বভাবের অনুসারে মনে কৌতূহল হইতে নূতন এক সংকল্প জন্মিল যে এতখানি উঁচু হইতে লাফাইবার পর এই নদী অগ্রসর হইয়া কোথায় যায় তাহা দেখিতে হইবে, আর সমুদ্রের সঙ্গে ইহার কিরূপে মিলন হয় তাহাও কখনও না কখনও অবশ্যই দেখিতে হইবে, আর সম্ভব হইলে শিশু যেমন মাতৃবক্ষে থাকে তেমনই শরাবতী মাতার বক্ষে নৌকা বিহার করিতে হইবে। অন্তরাত্মার এই কৌতূহল ঈশ্বরের আশীর্বাদে পূর্ণ হইল, এক 'তপ' অর্থাৎ বারো বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই আমার দ্বিতীয়বার জোগ দর্শনের সৌভাগ্য হইল। প্রথমবার আমরা উপর হইতে প্রপাতের দিকে গিয়াছিলাম। এবার নদীর মুখের দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া নৌকায় বসিয়া আমরা বিপরীত দিকে যাত্রা করিলাম। নৌকা যেখানে আটকাইয়া গেল, সেখান হইতে মোটরযোগে পাহাড়ে চড়িয়া আমরা প্রপাতের মাথায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

সেখানে ঐ অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়ে চারটি প্রপাত আছে। ডান দিকে 'রাজা' প্রপাত, উপর হইতে একবারে খাড়া ৯৬০ ফুট নীচে লাফাইয়া পড়িতেছে। তাহার 'রাজা' নাম যথার্থ। তাহার জলরাশি, তাহার উন্মাদনা, তাহার সাহস, জগতের কোনও একচ্ছত্র সম্রাটেরই শোভা পায়। তাহার বাঁ দিকে মহারুদ্রের মত গর্জন করিতেছে ঐ যে রুদ্রপ্রপাত (Roarer) তাহা রাজার চরণে গিয়া পড়িতেছে। আশপাশের পাহাড় ও তটদেশ বহু মাইল ধরিয়া রুদ্রের ঘোর গর্জনের প্রতিধ্বনি করিতেছে। সে ধ্বনিকে না বলিতে পারি মেঘগম্ভীর, না সাগরগম্ভীর। মেঘগর্জন আকাশভেদী হইলেও ক্ষণজীবী ; সাগরের সনাতন গর্জন জোয়ার ভাটার সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। রুদ্রের ধ্বনি অবিরাম, অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন। সে ধ্বনির মধ্যে বিপুল উন্মাদনা আছে।

সংসারে কোথাও না কোথাও রাজা ও রুদ্রের সম্রাটের পদবী মিলিতে পারে। কিন্তু জোগের প্রকৃত ঐশ্বর্য তো উর্দ্ধলোকে নানাছন্দে উৎক্ষিপ্ত বীরভদ্রের (Rocket) শুভ্র বারিরাশির জটাজালের জন্য। বীরভদ্রের প্রপাত হস্তীর গণ্ডস্থলের ন্যায় এক বিশাল শিলাখণ্ডের উপর পড়িতে না পড়িতে উহা হইতে বারুদখানার তুবড়ির মত ফোয়ারা ক্রমশ উঁচুতে উঠিতে থাকে। ইহাই কি শংকরের তাণ্ডব নৃত্য? অথবা মহাকবি ব্যাসের প্রতিভার নবনবোন্মেষ-শালী কল্পনা-বিলাস? না সূর্যবিম্বের পৃষ্ঠভাগ হইতে বাহিরে পড়িতেছে সর্বধ্বংসী কিন্তু কল্পনা-মনোহর অগ্নিচ্ছটা? না ভূমাতার বাৎসল্য প্রেরিত স্তন্যধারার প্রস্রবণ? এমন অনেক কথা মনে উঠিতেছিল। দেখিতে জানিলে বীরভদ্র সত্যই চক্ষুকে পাগল করিয়া দেয়।

বীরভদ্রের বাম দিকে কর্পূরগৌরী তন্বঙ্গী ও ক্ষীণমধ্যা পর্বতকন্যা পার্বতী (Lady) তাঁহার লাবণ্য দিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিতেছিলেন।

প্রপাত চারটি রক্ষা করিবার জন্যই যেন তাহাদের দুই দিকে দুই প্রচণ্ড পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে। এই প্রহরী দুইটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আর কি বা করিতে পারে? প্রপাতগুলির অখণ্ড গর্জনের প্রতিক্ষণ প্রতিধ্বনি করিতে থাকা, তাহাদের ইন্দ্রধনু ধারণ করা, আর নানাপ্রকারের বনস্পতি দিয়া নিজেদের দেহকে সুসজ্জিত করিয়া পুলকিত হওয়া, ইহাই তাহাদের অবিরাম চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এবার আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন গ্রীষ্মকাল ছিল। ভারঙ্গীর জল

বেশ খানিকটা নামিয়া গিয়াছিল। বীরভদ্রের জটা কোথাও চোখে পড়িল না। রুদ্রের দীর্ঘ ও সুদীর্ঘ লম্ফঝম্প কম হইয়া গিয়াছিল। পার্বতী এখন বিরহিণীর বেশ ধারণ করিয়াছিল। আমাদের আশা ছিল যে অন্তত রাজার ঐশ্বর্য তো দর্শনীয় হইবেই। কিন্তু বিশ্বজিৎ যজ্ঞের সময় যেমন কোনও সম্রাট্ অকিঞ্চন হইয়া গিয়াছিলেন, আর সেই অবস্থাতেও নিজের ঐশ্বর্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন, রাজারও ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল।

এবার আমরা শরাবতীর ডান অর্থাৎ উত্তর দিকে আসিয়া পৌঁছিলাম। অতিথিগৃহে না থামিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে সোজা 'রাজা' প্রপাতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

সেখানে এক দিকে কঠোর রৌদ্র, অন্য দিকে নীচে উৎপতনশীল তুষারের ঠাণ্ডা কুয়াসা ছিল; উভয়ের মধ্যে ফাঁসিয়া গিয়া আমাদের যে দশা হইল তাহা বর্ণনা করা কঠিন। রাজার মুকুটের মত সুন্দর তপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর ঝুঁকিয়া আমরা নীচে পাহাড়ের গায়ে চাহিলাম। উপর হইতে যে ধারা নীচে নামিতেছিল তাহা একবারে মাটি পর্যন্ত পৌঁছিতেছিল না। কোনও মদমত্ত হাতির শুঁড়ের সমান এক প্রচণ্ড স্রোত উপর হইতে নীচে পড়িতে দেখা যাইতেছিল। নীচে পড়িতে পড়িতে শতধা বিদীর্ণ হইয়া তাহার সহস্রধারা হইতেছিল, আবার আগে গিয়া সেই ধারাগুলি বড় বড় জলবিন্দু হইয়া যাওয়ায় উহা মোতিমালার মত শোভা পাইতেছিল। এই মোতিগুলিও আবার আগে গিয়া চূর্ণ হইতেছিল, তাহার বড় বড় কণা চোখে পড়িতে লাগিল। এখন নীচে ও সম্মুখে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়া সেগুলি স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে শুরু করিয়া দিল। এই বড় কণাগুলিও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, শীকর-পুঞ্জের রূপ ধারণ করিল, আর মেঘের মত বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেই প্রকৃতি মাতার সন্তোষ হইল না। আর একটু পরে এই সকল মেঘ নীহারিকার আবরণ রচনা করিল, আর পবনের লহরের সঙ্গে উড়িয়া উহা সমস্ত বায়ুপ্রবাহ শীতল করিয়া তুলিতে লাগিল। আশ্চর্যের কথা, এত বড় জলধারার এক বিন্দুও মাটিতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নীচের মাটিটা ছিল গরম, উপরেরটা ঠাণ্ডা! বিপদ দেখিয়া আমার মনে পড়িল সেই সব রাজাদের যাঁহারা কোনও ব্যবস্থা না করিয়াই দান করেন। প্রজাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত দেখিয়া আমাদের রাজারা যখন উদার হস্তে অর্থ দিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের

জয়নাদে সমস্ত বায়ুমণ্ডল মুখরিত হইয়া ওঠে। কিন্তু অন্নের এক কণাও বেচারা গরিব জনসাধারণের মুখ পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। মধ্যপথে কর্মচারীরাই সমস্ত খাইয়া ফেলে।

কুবেরের মনেও ঈর্ষা জন্মাইতে পারে এখানকার ইন্দ্রধনুগুলির ছিল তেমনই শোভা। প্রভেদ শুধু ইহাই ছিল যে, এই ইন্দ্রধনুগুলি স্থায়ী নয়। পবনের তরঙ্গ যেমন যেমন দিক পরিবর্তন করে, এই সব শীকরপুঞ্জও তেমনি তেমনি স্থান পরিবর্তন করে। এই কারণে, পার্বতীর সংকেত পাইয়া শংকর যেমন নাচিতে থাকেন, এই ইন্দ্রধনুগুলিও তেমনই এদিকে ওদিকে ছুটিতে থাকে; ক্ষণে ক্ষীণ হইয়া যায়, পরক্ষণেই ভয়াসুরের কুটুম্বদের মূর্তি ধারণ করে। ফল যেমন কর্মানুবন্ধী, কর্মের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার ফলও আসে, প্রত্যেক ইন্দ্রধনুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতি-ধনুও তাহার বর্ণক্রম ঠিক উলটা করিয়া হাজির হইয়াই থাকে। আমাদের জায়গা বদল হইয়াছে, ঐ সুরধনুগুলিও তাই তাহাদের জায়গা বদলাইয়াছে। সুরধনু ও সুরধুনীর এই আনন্দময় খেলা আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্ময় বিমূঢ় ভাবে দেখিতেই থাকিলাম। যতই দেখি ততই দেখিবার পিপাসা বাড়িয়া চলে। মনে হইতেছিল দুই এক ঘণ্টাই এখানে থাকিতে পারিব। প্রতিমুহূর্তে আমাদের সময়রূপ পুণ্য ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, একটু পরেই মর্ত্যভূমিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে, একথা আমাদের মনে ছিল। যে বিষাদের সঙ্গে স্বর্গলোভী দেবতা স্বর্গসুখ অনুভব করেন, বিক্রমশালী পুরুষ যৌবনের উত্তরার্ধে তাহার সংকল্প পূরণের জন্য যেরূপ অধীর হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ বিষাদের সহিত ও সেইরূপ অধীর হইয়া আমরা সকলে ঐ গন্ধর্বনগরী সমস্ত চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও ত্বক্ দিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম, আমাদের কল্পনা দ্বারা সেই আনন্দকে শতগুণ করিয়া তাহা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

* * *

এক দিন আমরা তিনটি নৌকা লইয়া বাহির হইলাম। মাঝের নৌকায় স্ত্রী ও বালকদের রাখিয়া আমরা পুরুষেরা দুই পাশের নৌকা দুইটিতে বসিয়াছিলাম। রাত্রিবেলা। উপরে আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল। তাহার সেই কাব্য মেয়েরা অন্তরে গ্রহণ করিল, সেখান হইতে তাহা সুরের আলাপের সঙ্গে বাহিরে আসিতে লাগিল। প্রত্যেক মেয়ে তাহার প্রিয় গান নদীর স্রোতে

ভাসাইয়া দিল। সে শব্দ কানে আসিতেই তীরের নারিকেল ও সুপারিগাছ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, আর নিজেদের উন্নত শির কিছু নোয়াইয়া ঐ সকল সুরের আলাপ পান করিতে লাগিল। ক্লান্ত হইয়া না পড়া পর্যন্ত মেয়েরা গীত গাহিল। তাহার পর তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। চাঁদ অস্তে গেল। অন্ধকারের রাজ্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। আর অসংখ্য তারকা আশপাশের পাহাড়গুলির দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিল। চারিদিকের নীরব শান্তি জাগিয়া রহিল, না ঘুমাইয়া পড়িল, সে কথা বলা কঠিন ছিল।

যখনই ঘুম ভাঙিতেছিল তখনই কখনও হালের শব্দ কখনও মাঝিদের জোরে লগি ঠেলিতে গিয়া জলের শব্দ কখনও দাঁড়ি মাঝিদের পরস্পরকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকিবার শব্দ শোনা যাইতেছিল। অবশেষে প্রভাত হইল। পাখিরা তাহাদের ডাক হাঁক শুরু করিয়া দিল। আমার মনে হইল, মাঝের নৌকায় যে সব কোকিল শুইয়া আছে তাহারাও যদি জাগিয়া ওঠে তবে কী সুন্দর হয়! আমার গদ্য নিমন্ত্রণের তাহারা উত্তর দিল সঙ্গীতালাপে। বৃক্ষেরাও রাত্রিবেলায় শোনা এই সব আলাপের কথা মনে করিয়া 'ইহা রাত্রির গান' এই কথা পরস্পরকে বুঝাইবার জন্য মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিল। রাত্রির জলবিহার সত্যই সাত্ত্বিক, শান্তিময়, যৌবনের উল্লাসময় ছিল।

উষাকালের জলবিহারও সেইমত সাত্ত্বিক, শান্তিময় ও যৌবনের প্রসাদযুক্ত, যদিও এখান হইতে প্রপাতদর্শন অদ্ভুত ভীষণ ও রোমাঞ্চকর। এখন আর মেয়েদের চেহারায় প্রাতঃকালের মুগ্ধ প্রসন্নতা ছিল না। 'এরূপ অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি কি প্রকারে হইল? সত্যই কি আমরা পৃথিবীতে আছি, না ইহা স্বপ্নের সৃষ্টি?' তাহাদের আকৃতিতে এই বিস্ময়ের ভাব স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল। তাহারা পরস্পরের দিকে তাকাইয়া নিজ নিজ বিস্ময় বাড়াইতেছিল। আর তাহাদের এই বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া আমরা গর্ব অনুভব করিতেছিলাম, আমরাই যেন এই কাব্যময় সৃষ্টির বিধাতা।

আহারের সময় হইয়া গিয়াছিল। নৌকা ছাড়িয়া আমরা এক গ্রামের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে ধান কুটিবার এক চাকি ছিল। ভক্ ভক্ করিতে করিতে এই চাকি গরিব লোকদের শান্তি, স্বাস্থ্য ও জীবিকার উপায় কুটি কুটি করিয়া নষ্ট করিতেছিল। আমরা অর্ধেক খাবার খাইয়া আমাদের জন্য যে মোটর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল তাহাতে চড়িয়া বসিলাম।

পেট্রোলের এক টিনে অল্প একটু তেল বাকি ছিল। আমাদের সারথি তাহাতে জল ভরিয়া আনিয়া উহা মোটরে ঢালিল। জল গরম হইল ও তেলের ধুঁয়া জলে আসিয়া মিশিল। আর কি রক্ষা আছে? প্রতি পদে মোটর আটকাইয়া যাইতে লাগিল; চিৎকার করিতে লাগিল; অভিযোগ করিয়া চলিল ও দুর্গন্ধ ছাড়িতে লাগিল। আমরাও মজিয়া গেলাম, রাগ করিলাম, পথ ভুলিলাম, শেষে যখন দেখিলাম যে এখন আর কোনও প্রতিকার নাই, তখন ঠাণ্ডা হইলাম। বাংলা ভাষার এক প্রবাদ মনে পড়িল, 'তেলে জলে মিশ খায় না।' খুব কষ্ট করিয়া, কোনও রকমে যখন আমরা জল পাওয়া যায় এমন জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন পুরাতন 'বিপ্লবী' জল বাহির করিয়া আমরা উহাতে শুদ্ধ 'সজ্জন' জল ভরিয়া লইলাম। তাহার পর আমাদের পথ একেবারে সহজ হইয়া গেল।

বহু বৎসর ধরিয়া প্রশ্ন চলিতেছিল, গিরসপ্পার প্রপাত হইতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিতে পারা যায় কি না। শরাবতীর জল এক দিক হইতে ফিরাইয়া যদি বড় বড় নলের দ্বারা নীচে নামাইয়া সেখানে উহার সাহায্যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত মহীশূর রাজ্যকে অল্প খরচে বিদ্যুৎ জোগানো সম্ভব হইবে। শুধু তাহা নয়। উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া জেলাকেও বিদ্যুৎ দিতে পারা যাইবে। ইহাতে লোকদের খুব লাভ হইবে, কিন্তু ঐ অদ্ভুত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে। দুইটির মধ্যে কোনটি অধিক বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনও স্থির সিদ্ধান্ত হইতে পারে নাই। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের ভরপেট আহার মিলিবে, শত শত বিজ্ঞানবেত্তা নবীন যুবক তাহাদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাইবে, হাজার হাজার পশুর পীড়া দূর হইবে—এক স্থানে এইরূপ কারখানা দাঁড়াইতে পারিলে ভারতবর্ষের সকল প্রপাতেরই এরূপ ব্যবস্থা হইতে পারিবে। দেশের এক মহাশক্তি হইতে আমরা লাভবান হইব। তাহা হইলে শুধু কি এক ভীমকান্ত দৃশ্যের লোভে আমরা এই সকল হিতকর কার্য ছাড়িয়া দিব? ললিতকলার শখেরও কি কোনও সীমা নাই? নিজের রাণীর চিত্তবিনোদনের জন্য নীরো তাঁহার রাজধানী রোম আগুনে পোড়াইয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার বাদশাহী চেষ্টায় আর এই ধরণের কলানুরাগের মধ্যে বাস্তবিক কি প্রভেদ আছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে তাহা আলোচনা করিবার

পূর্বে অন্য বিষয়ের সামান্য কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ইউরোপে যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল আর লক্ষ লক্ষ তরুণ যুবক কামান বন্দুকে প্রাণ বিসর্জন দিল, তখন সাহিত্যিক শিরোমণি রমাঁ রোলাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, অন্য লোকের মত তিনিও নিজে যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের সেবার কিছু ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু যখন উভয় পক্ষের যোদ্ধারা পরস্পরের কলানিকেতনগুলির উপর বোমা বর্ষণ আরম্ভ করিল তখন তাঁহার শিল্পীর প্রাণ ক্রোধে জলিয়া উঠিল, তিনি গম্ভীর স্বরে সমস্ত ইউরোপকে উদ্‌বুদ্ধ করিলেন, "ওরে হতভাগ্যেরা, তোরা পরস্পরকে মারিতে চাস তো মার ; এই পৃথিবীতে তোরা একেবারেই যদি নষ্ট হইতে চাস তো নষ্টই হইয়া যা। কিন্তু এই সকল কলাসৃষ্টি তো আত্মার অভিব্যক্তি করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। উহাদের দ্বারাই সমগ্র মানবজাতির আত্মা নিজে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে—আর কিছু না হয় তো ইহাদের নাশ করিস না !!"

ঋষি রমাঁ রোলাঁর বাণী ইউরোপের আত্মা শুনিল, যুদ্ধরত পক্ষেরা কলাকৃতি বা শিল্পের নিদর্শনগুলির ধ্বংস বন্ধ করিল। এখন প্রশ্ন এই যে, সত্যই কি কলাসৃষ্টিগুলি মানবাত্মার অভিব্যক্তির দ্যোতক বা প্রেরক ? না উন্নত অভিব্যক্তির পিছনে আছে বিলাসিতারই সাধন-সামগ্রী ?

কলা যে সত্যই জানিয়াছে চিনিয়াছে সে অমনই বলিয়া দিতেছে, কলা ও বিলাসিতার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, এবং প্রকৃত কলাসৃষ্টির দ্বারা যে নিরতিশয় আনন্দ লাভ হয় তাহা সুপ্ত আত্মাকে সত্যই জাগ্রত করে। ক্রোড় ক্রোড় ভল্ট শক্তি উৎপাদন করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা এমন কিছু সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু অসংখ্য লোককে কলার সাহায্যে যে আনন্দ বা সংস্কার দেওয়া যায় তাহা তো উহাদের আত্মাকে পুষ্ট করিবারই সাধন বা উপকরণ।

আর জোগ এমন কিছু মানুষের হাতে গড়া সৃষ্টি নয়। উহা তো প্রকৃতিজননীর এক অলৌকিক বিভূতি—কলাকারদের সৌন্দর্য ও সভ্যতা একই সঙ্গে শিক্ষা ও দীক্ষা দিতেছে। উহা নষ্ট করা আর নাস্তিকতার বিদ্রোহপতাকা উড়ানো একই কথা। উহা নষ্ট করিবার পূর্বে আমাদের সহস্রবার ভাবিতে হইবে। জোগ প্রপাত শুধু বর্তমান যুগেরই সম্পত্তি নয়। আমাদের বহু ঋষি ও পূর্বপুরুষ উহার নিকটে বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া থাকিবেন, ভবিষ্যতে

আমাদের বংশধরের বংশধরেরা উহা দর্শন করিয়া তাহাদের জীবনের অবজ্ঞাত বৃত্তি ও শক্তির সাক্ষাৎকার করিবে।

হিতকারিবাদ (utilitarianism)-এর সাহায্য লইয়া 'অল্পস্য হেতোঃ বহু হাতুমিচ্ছন্' এইরূপ জড়বুদ্ধি আমরা যেন না হই। এই প্রপাতকে সুরক্ষিত রাখিয়া তাহা হইতে যদি কোনও লাভ করিতে পারি তবে তাহাই করা ভাল। মানুষের বুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু এই তাণ্ডবযোগ দর্শন হইতে মনুষ্যজাতিকে বঞ্চিত করার ধর্মত কাহারও অধিকার নাই। মন্দিরে আমরা মূর্তি স্থাপনা করি। প্রকৃতিও সেইরূপ বিরাট্ স্বরূপের সুন্দর প্রতিমাগুলি এখানে, আমাদের সম্মুখেই স্থাপিত করিয়াছেন। এখানে শুধু ধ্যান, দর্শন ও উপাসনার জন্য আসা চাই, এবং হৃদয়ে যদি কিছু সামর্থ্য থাকে তবে ইহাদের সঙ্গে 'তদাকার' বা একাত্ম হইয়া যাওয়া চাই। ইহাই আমাদের অধিকার।

মে, ১৯৩৮

১৪

জোগের শুষ্ক প্রপাত

মনে নাই, কোন্ কবি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সেই ভাব আমি আমার ভাষায় এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"একথা সত্য যে পাহাড়ের মত উঁচু উঁচু ঢেউ সমুদ্রে ওঠে, সমুদ্রকে ভয়ানক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহার সমস্ত জল শুকাইয়া যদি পাত্র খালি হইয়া যায় তাহা হইলে হাজার হাজার মাইল জুড়িয়া তাহার গভীর গহ্বর কতখানি ভীষণ হইতে পারে, সে কথা কল্পনা করাও কঠিন। সত্য যে দুষ্ট লোকের নিকট প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকিলে সে তাহার অপব্যবহার করিয়া লোকের উপর অত্যাচার করিবে। কিন্তু তাহার এই সম্পত্তি নষ্ট হইয়া সে যদি কাঙ্গাল ভিখারী হইয়া যায় তাহা হইলে কি সে ভীষণ দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইবে? সমুদ্র যে জলে ভরিয়া আছে, তাহা ভালই; দুষ্ট জনের নিকট

তাহার দুরাচারের আগুন নিভাইবার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ্ আছে, তাহা ভালই।”

জোগের প্রপাতের মধ্যে রাজা ও রুদ্রের শুষ্ক প্রপাত দেখিয়া কবির উপরে উদ্ধৃত উক্তি মনে পড়িবার কোন কারণ ছিল না, তথাপি এই উক্তি স্বতঃই মনে পড়িল।

১৯২৭ সনে আমি যখন সর্বপ্রথম জোগের প্রপাত দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার ঐশ্বর্য ষোলকলায় পূর্ণ ছিল। প্রধান প্রপাত তাহার প্রচণ্ড জলরাশি লইয়া ৮৪০ ফুট নীচে লাফাইয়া নীচে পাহাড়ের ঘাটিতে প্রপাতের জলস্রোতের দ্বারা প্রস্তুত দেড় শ' ফুট গভীর পুষ্করিণীতে আসিয়া পড়িত। এই প্রধান জলস্রোতের মর্যাদা বাড়াইবার জন্য তাহার দুই দিকে মোতির মালার মত জলের অনেক ধারা বিচিত্র ধরণে পড়িত। দক্ষিণ দিকে বাঁকা বাঁকা সিঁড়ির উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে রুদ্র তাহার জল অর্ধেকের বেশি পড়িবার পর, রাজার জলে আনিয়া ফেলিত। রাজার গর্জন প্রায় নীচে পড়িবার পরই শুনিতে পারা যাইত। রুদ্র প্রপাত রাবণের মত জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু করিয়া দিত।

দুইটি প্রপাতই অদ্ভুত, কিন্তু তখন আমার নিকট যে দৃশ্য অলৌকিক বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহা বীরভদ্রের উচ্ছল জটাজাল। এ দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। কোনও ছবিতেও বীরভদ্রের এই জটাজালের চিত্র ধরা পড়ে নাই।

সর্বশেষ প্রপাত হইল পার্বতীর, দেখিবামাত্র স্ত্রীজাতির প্রতি মনে দাক্ষিণ্যের ভাব সৃষ্টি হয়।

দশ বৎসর পরে যখন আমি আবার জোগ দর্শন করিলাম, তখন রাজার স্রোত খুব ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। বীরভদ্রের জটা মুণ্ডিত হইয়াছিল। রুদ্রের চিৎকার যদিও কমে নাই, তথাপি জোগের ক্ষীণ প্রপাতের সঙ্গে তাহার সেই প্রচণ্ড তাল মিলিতেছিল না। আর পার্বতী একেবারেই কৃশাঙ্গী তপস্বিনীর মত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এই সব সংকোচন ভুলাইয়া দিবার মত আনন্দ ছিল প্রপাতের শীতল বাষ্পে উৎপন্ন ইন্দ্রধনুর ভ্রূবিলাসে। এই শোভা যত দিক হইতে দেখা যাইতেছিল তত দিক হইতে ইন্দ্রধনু তাহার মুখ ফিরাইয়া নূতন নূতন সৌন্দর্য

প্রদর্শন করিতেছিল। পুনরায় ঠিক দশ বৎসর পরে এবার যখন আমরা জোগের প্রপাত দেখিতে গেলাম, তখন চারটি প্রপাতের মধ্যে তিনটি তো একেবারেই শুকাইয়া গিয়াছিল। রুদ্রের অভাবে সর্বত্র শ্মশানের শান্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রাজা শুকাইয়া যাওয়ায় একটির পরে একটি, দুইটি বড় ফাঁক ঔরঙ্গজেব দ্বারা উৎপাটিত শম্ভাজীর চক্ষুর মত ভীষণ মনে হইতেছিল। পার্বতী যেন দক্ষযজ্ঞে গিয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিলেন, আর বীরভদ্রকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন দক্ষকে বিনাশ করিবার পর কিছুটা শান্ত হইয়া তাহার প্রভুর শ্বশুরের মৃত্যুতে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। এতখানি বিষাদ বুঝি মহাভারতের যুদ্ধের পর কুরুক্ষেত্রের উপরও ছড়াইয়া পড়ে নাই।

প্রথমবার আমরা গিয়াছিলাম শিমোগা সাগরের পথে, গুজরাটে আগত বন্যাসংকটের দিনে। দ্বিতীয়বার গিয়াছিলাম আরব সাগরের তীর দিয়া বিপরীতক্রমে—শরাবতীর জলের উপর দিকে যাত্রা করিয়া। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন, 'নদীমুখেনৈব সমুদ্রমাবিশেৎ।' এই উপদেশের বিপরীত আচরণ করিয়া আমরা শরাবতী-সাগর-সংগম হইতে নৌকায় বসিয়া বিপরীতক্রমে প্রপাতের সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছিলাম এবং সেখান হইতে পাহাড়ের পায়ে চলার পথ দিয়া উপরে চড়িয়া প্রপাতের মাথা পর্যন্ত গিয়াছিলাম। এবার আমরা তৃতীয় পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছি। শিরসী হইতে সিদ্ধাপুর হইয়া প্রপাতের বোম্বাইয়ের দিক দিয়া আমরা গিয়াছি। সেখানে রাজার মাথায় যে বড় শিলাখণ্ড ছিল তাহার উপর শুইয়া নীচের লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিলাম। ধারের এই ভীষণ ফাঁকের মাথায় গিয়া ভিতরে তাকাইলে সমস্ত শরীর কাঁপিয়া ওঠে। মনে এই সন্দেহ না হইয়া পারে না যে, এই শিলা নিজেরই ভারে পড়িয়া যাইবে না তো?

এই শিলার ঠিক পাশে সেই পরিমাণ বড় আর সেই পরিমাণ ভীষণ স্থানে আর একটি শিলা আছে। উহার উপর প্রাচীনকালে কোনও রাজার বিবাহ মণ্ডপ হয়তো সাজানো হইয়াছিল, সেই মণ্ডপের চারিটি স্তম্ভ যাহার উপর দাঁড় করানো হইয়াছিল, সেই চারি ছিদ্রযুক্ত এক বড় চত্বর ঐ শিলার উপর দেখা যায়। এই ভীষণ প্রপাতের গহ্বরের ধারে মণ্ডপ খাড়া করাইয়া যে রাজা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্যদৃষ্টিকে বলিহারি যাই। এইরূপ সৌখীন রাজার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল, সেই রাজকন্যার এই মণ্ডপে বসিবার

সময় না জানি মনের ভাব কেমন হইয়াছিল। কে বলিল, 'ভীষণ রসের রসিক ঐ রাজার নামেই এই প্রপাতের নাম রাজা রাখা হইয়াছিল।' মনে মনে ভাবিলাম, উঁহার সঙ্গে যে রাজকন্যার বিবাহ হইয়াছিল তাহার নাম তো জানা নাই, এই সুযোগে তাহাকে পার্বতী বলি না কেন? পর্বতের গহ্বরের ধারে তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল, পার্বতী নামকরণের ইহাই কি যথেষ্ট কারণ নয়?

পাহারের ফাঁকে এমন গভীর গহ্বর আমি দেখি নাই তাহা নয়। মসজিদেও দেওয়ালে গভীর ছিদ্র করিয়া তাহার ধারে 'মেহয়াব' তৈয়ারি করে। কিন্তু রাজার নীচের 'আলা' তো ছিল কালপুরুষের মুখের চেয়েও বড় ও গভীর। তাহার ভিতরে যেখানে জায়গা পাইয়াছে সেখানেই পাখি তাহার বাসা বানাইতেছে, আর বাছিয়া বাছিয়া যে সব শস্যকণা আনিয়াছে তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে।

বোম্বাইয়ের দিক হইতে অর্থাৎ উত্তরের দিক হইতে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার পর আমরা মোটরে বসিয়া পূর্বদিকে যাত্রা করিলাম। সেখানে নৌকা দুইটি বাঁধিয়া যে বেড়া হইয়াছে—যাহাকে এখানে জঙ্গল বলে—তাহাতে আমাদের মোটর উঠাইয়া শরাবতী নদী পার হইয়া আমরা দক্ষিণ তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে মহীশূর সরকারের অতিথিশালার নিকট হইতে আর একবার দেওয়ালের দৃশ্য দেখিলাম।

বিশ বৎসর পূর্বে এখান হইতেই রাজা, বীরভদ্র ও পার্বতীর দেবদুর্লভ দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। এখনকার শুষ্ক দৃশ্যে কাব্য নাই, এমন নয়। পর পর দুইটি 'আল'—আটশত চল্লিশ ফুটের মত মাপিয়া রাখা হইয়াছিল, এরূপ দৃশ্য বিধাতার সৃষ্টিতে বড় বেশি দেখা যায় না।

আমার মনে যে বিষাদ ছাইয়াছিল, গাছগুলিতে আমি তাহার কোনও চিহ্ন দেখিলাম না। দুই 'আলে'তে পাখিরা বৃত্তাকারে উড়িতেছিল, তাহাদের দেখিয়াও বিষন্ন বলিয়া মনে হইল না। আকাশে মেঘগুলি সাঁতার দিতেছিল, আর প্রপাতের প্রাচীরে তাকাইয়াছিল, তাহাদেরও গম্ভীর বলিয়া মনে হইল না। তবে রিক্ততার এই দৃশ্য দেখিয়া শুধু আমিই বা কেন অস্থির হইয়া পড়িতেছি? বিশ বৎসর পূর্বে এখানে যে জনসমৃদ্ধি দেখিয়াছিলাম সে কথা মনে করিয়া কি, না দশ বৎসর পূর্বে এখানে দেখা ইন্দ্রধনুর কথা মনে করিয়া?

কিন্তু সেই জলসমৃদ্ধি ও বর্ণে বর্ণে মিশ্রণের সেই চমৎকারিতা তো আর চির-দিনের জন্য লুপ্ত হয় নাই? হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া প্রতি গ্রীষ্মকালে এই রিক্ততাই দেখিতে পাওয়া যাইবে, আর প্রতি বৎসর বর্ষাকালে সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল নিশ্চয়ই জলনিমগ্ন করিয়া দিবে। এই ধারা তো চলিতেই থাকিবে। তবে 'তত্র কা পরিদেবনা?'

জোগ প্রপাতের এই তৃতীয় দর্শনের পর আমরা এখানকার ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় খুলিলাম।

বিশ বৎসর পূর্বে শুনিয়াছিলাম, মহীশূর সরকার এই প্রপাতের জল হইতে বিদ্যুৎ তৈয়ারি করিতে চাহিতেছেন। বোম্বাই সরকার ও মহীশূর সরকারের মধ্যে ইহা লইয়া পত্রব্যবহার চলিতেছে। এ পর্যন্ত দুই সরকার একমত হইতে পারেন নাই। তাই বিদ্যুতের এই প্রয়োগ কার্যত কিছু হয় নাই।

সে সময়ে আমি মনে মনে চাহিয়াছিলাম, ঈশ্বর করুন, এই দুই সরকার যেন একমত না হয়। আমার মনে ভয় ছিল যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিলে এখানে কলকারখানা চলিবে, আর দেশের সমৃদ্ধি বাড়াইবার অজুহাতে দরিদ্র জনসাধারণের রক্তশোষণ করা হইবে। তাহার চেয়েও বেশি চিন্তার কারণ ছিল, যন্ত্র আসিলে প্রপাত ভাঙিয়া যাইবে, আর প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্য চিরকালের জন্য অন্তর্ধান করিবে। দেখা গেল, সৌভাগ্যবশত আমার এই ভয় অমূলক ছিল।

ইঞ্জিনীয়ারেরা প্রপাত হইতে অনেকটা উপরে একটি বাঁধ দিয়া সেখান হইতে জলের অভিযান বন্ধ করিয়াছে। এ কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বাঁধ বাঁধিয়া যে জল বন্ধ করা হইয়াছে তাহার চারনালা একদিকে লইয়া গিয়া মহীশূরের দিকে, প্রপাত হইতে অনেক দূরে, টিলার উপর হইতে নীচে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—প্রপাতের রূপে নয়, সোজা নিম্নগামী চারটি মহাকায় নলের দ্বারা। নলের দ্বারা জল যেখানে পৌঁছায় সেখানে এই জলের গতি-বেগে চলে এমন যন্ত্র রাখিয়া তাহা হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এখন এখানে এতখানি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হইবে যে মহীশূর রাজ্যের প্রয়োজন মিটাইয়া হায়দ্রাবাদকেও কিছু দেওয়া যাইবে। আর বোম্বাই সরকারের হোন্নাওয়ার তালুকের মধ্য হইতে শরাবতী নদীর উৎপত্তি, এইজন্য কয়েক হাজার কিলোয়াট বিদ্যুৎ বোম্বাই সরকারকেও দেওয়া হইবে। ন্যায়ত এই বিদ্যুতের

উপর সর্বপ্রথম অধিকার হোন্নাওয়ার তালুক ও কারোয়ার জেলার। কিন্তু এই জেলা শিল্প-উদ্যোগের দৃষ্টিতে এখনও বিকাশলাভ করে নাই বলিয়া স্থির হইল যে বিদ্যুৎ ধারোয়ার জেলাকে দেওয়া হউক। ইহাতে কারোয়ার জেলার লোকেরা অসন্তুষ্ট হইল। কারোয়ার জেলার খনিজ ও উদ্ভিজ্জ সম্পত্তি ধারোয়ার অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক, সমুদ্রতীরের নিকটে হওয়ায় উহার ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক বাড়িতে পারে। কারোয়ার জেলায় কালী, গঙ্গাবলী, অঘনাশিনী ও শরাবতী—এই চারিটি নদী নৌকা চলাচলের অনুকূল হওয়ায় এ জেলার শিল্পের উন্নতিসাধন খুবই সহজ, কিন্তু আজ এই জেলায় বড় কল-কারখানা নাই বলিয়া উহাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হইতেছে।। আর তাহার নিকটে বিদ্যুৎ না থাকায় সেখানে কলকারখানার দিকে উন্নতি করা যাইবে না, ইহাও তাহাকে শোনানো হইতেছে।। তামিল ভাষায় প্রবাদ আছে, 'বিবাহ হয় নাই বলিয়া মেয়েটার পাগলামি যাইতেছে না, আর পাগলামি যাইতেছে না বলিয়া মেয়েটার বিবাহ হইতেছে না'—সেই অবস্থা।

আশা করি স্বরাজ সরকার এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন, শরাবতীর বিদ্যুৎ কারোয়ার জেলাও পাইবে। ইহা ছাড়া, কারোয়ারের নিকটে উঁচল্লী, মাগোডের মত ছোট বড় আরও তিন চারটি প্রপাত আছে, শরাবতীর বিদ্যুৎ পাইলে তাহারই সাহায্যে তাহাদের উপরও লাগাম কসা যাইবে, আর কারোয়ারে বর্ষার মত বিদ্যুৎও প্রচুর হইবে। যেখানে চার চারটি নদী উপর হইতে নীচে প্রপাতের মত পড়ে, সেখানে আজ না হয় কাল মানুষ বিজলীর ভাণ্ডার সৃষ্টি করিতে পারিবেই পারিবে।

জানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে শরাবতীর জলে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিবার পরেও জোগের প্রাকৃতিক স্বরূপ একটুও খণ্ডিত হইবার ভয় নাই। বাঁধের জন্য যত জলই হউক বন্ধ করিবার পর নদীর সাধারণ প্রবাহে জল কম হইবে না। বর্ষার জল ধরিয়া লওয়ার পর চিরন্তন প্রবাহ চিরকালের মতই চলিতে থাকিবে। ইহার মধ্যে স্রোতের দিক, গতি, জলের অভিযান—কোনও দিকেই কিছু কম হইবে না, বরং লাভ হইবে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া গ্রীষ্মকালে যে প্রপাত শুকাইয়া যাইত, কোন দিন প্রয়োজন হইলে বাঁধের ভাণ্ডার হইতে জল ছাড়িয়া দিলে তাহা প্রচণ্ড ঝড়ের রূপে প্রত্যক্ষ করা

যাইতে পারিবে, তাহা দেখিয়া আকাশের গ্রীষ্মের উম্মপা দেবতাও চমকিত হইয়া যাইবেন।

জয় হউক মানুষের বিজ্ঞানের!

এপ্রিল, ১৯৪৭

১৫

গুর্জর মাতা সাবরমতী

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ ঘোষণা করিয়া মহাত্মাজী স্বরাজের আয়োজন করিতেছেন। আমেদাবাদে গুজরাট বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বাধীনতাকামী যুবকেরা মহাবিদ্যালয়ে যোগ দিয়াছে। তাহারা নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শের অভিব্যক্তির জন্য এক মাসিক পত্রিকা চায়। আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাসিক পত্রিকার নাম কি রাখিব?" সে যুগ এমনই ছিল যে কাকাকে পিসির কাজ করিতে হইত।

আমি বলিলাম, "মাসিক পত্রিকা তো যথেষ্ট প্রকাশিত হইতেছে। তোমরা প্রতি দুই মাসে, প্রতি ঋতুতে নূতন নূতন রূপে প্রকাশিত হইতে পারে এমন পত্রিকা শুরু করিয়া দাও, তাহার নাম রাখ 'সাবরমতী'। দ্বৈমাসিক পত্রিকার কথাটা মনে ধরিল, কিন্তু 'সাবরমতী' নাম কাহারও পছন্দ হইল না। সাবরমতী তো আমাদের চিরকালের পরিচিত নদী! আমরা উহাতে নিত্য স্নান করি। উহার মধ্যে এমন কি নবীনতা আছে যে আমাদের নবচেতনা আনিবার সাহিত্যপ্রবাহকে ঐ নাম দিব? আমি বলিলাম, "সাবরমতীর প্রবাহ সনাতন—তাই ইহা নিত্য-নূতন।" দৃষ্টান্ত দিয়া আমি বলিলাম, "সিন্ধু-হায়দ্রাবাদের বন্ধুরা তাঁহাদের কলেজের পত্রিকার নাম দিয়াছেন 'ফুলেলী।' 'ফুলেলী' সিন্ধুর এক খাল। আমাদের এই অনাবিল সাবরমতী গান্ধী যুগের প্রতীক হইতে পারে। আমার কথা রাখ, সাবরমতী নাম গ্রহণ কর।"

যুবকেরা যদিও ইহার চেয়ে জোরাল নাম পছন্দ করিত তাহা হইলেও আমার কথা রাখিবার জন্য সাবরমতী নাম গ্রহণ করিল।

আমি নরহরিভাইকে বলিলাম—"সাবরমতী বিশেষ করিয়া গুজরাটের লোকমাতা। আবুর পার্শ্বদেশ হইতে যে সব নদীর উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইহা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। উহার একটা গদ্যস্তোত্র লিখিয়া দিন।" তিনি উৎসাহ করিয়া সংক্ষেপে এক সুন্দর রচনা লিখিয়া দিলেন। বিদ্যার্থীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তাহাদের চিন্তাশক্তি জাগিয়া উঠিল। লোকমাতার প্রতি তাহাদের ভক্তি জন্মিয়াছে দেখিয়া সুযোগ বুঝিয়া বলিলাম, "আমার দেওয়া নাম তোমরা অনিচ্ছায় গ্রহণ করিবে, ইহা আমার ভাল লাগে না। যদি চাও তো আমি অন্য নাম বলিয়া দিই।" সকলে সমস্বরে উত্তর করিল, "না, না, আমরা অন্য নাম চাই না। 'সাবরমতী'ই সব চেয়ে সুন্দর।"

আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।"

* * *

নদী-পূজারত আমার হৃদয় ভারতের অনেক নদীর উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে অঞ্জলি দিয়াছে। সিন্ধু হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র ও ঈরাবতী পর্যন্ত, আর দক্ষিণে পিনাকিনী ও কাবেরী পর্যন্ত অনেক নদীর নামেই স্মরণাঞ্জলি দিয়াছি। কিন্তু ইহাদের মধ্যে গুজরাটেরই প্রধান প্রধান নদী বাদ গিয়াছে দেখিয়া অনেকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর গুজরাটের লোকমাতাদের বিষয়ে যাহাতে লিখি সেজন্য আগ্রহ প্রকাশ ও করিয়াছেন।

আমি বলিয়াছি, "নদীর পূজার জন্য প্রেরণা তো আমি দিয়াছি। এখন গুজরাটের নদীদের বিষয়ে গুজরাটি ভাষায় কোনও গুর্জরীপুত্রের লেখাই সংগত।"

এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল, এবং আমাকে বার বার অনুরোধ করা হইল। কিন্তু শেষে আমার শ্রদ্ধা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল—গুজরাট বিদ্যা-পীঠের এক ছাত্র, বনস্পতি-উপাসক শ্রীমান শিবশঙ্কর গুজরাটের লোকমাতাদের বিষয়ে লিখিতে শুরু করিলেন। একাজ অবশ্য কখনও না কখনও শেষ হইবে। সাবরমতীর নদী-পরিবারের বিষয়ে তিনি যথেষ্ট লিখিয়াছেন, ইহাতে আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তাই সবিস্তরে লিখিবার আর কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে নদীর তীরে আমি মহাত্মাজীর ও সব সঙ্গীদের সম্পর্কে থাকিয়া পঁচিশ ত্রিশ বৎসর কাটাইয়াছি, তাহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার কর্তব্য তো বাকি রহিয়াই যাইতেছিল। খুশি হইয়া তাহা শেষ করিবার জন্য কিছু লিখিতেছি

আমাদের কবিরা অবশ্যই প্রত্যেকটি নামের সংস্কৃতরূপ দিতে চেষ্টা করিবেন। সাবরমতীর সংস্কৃতরূপ গঠন করিবার সময় তাঁহারা সন্ধান করিয়া 'সাভ্রমতি' শব্দ বাহির করিয়াছেন, পুনরায় দুইভাবে তাহা ভাগ করিয়াছেন—'সা ভ্রমতি', সে ভ্রমণ করে, আঁকা-বাঁকা পথে চলে, অথবা এই নদীর জলে উপরের আকাশের অভ্র বা মেঘ দেখা যায়। ইহা 'অভ্রমতি' বা 'সা-ভ্রমতি।' আমার মতে এসব চেষ্টা ব্যর্থ। যে নদীর তীরে দলে দলে গোরু ঘুরিয়া বেড়ায়, চরে ও পুষ্টিলাভ করে, সে যেমন গোদা (গোদাবরী) অথবা গোমতী, যে নদীর তীরে ও স্রোতে অনেক পাথর তাহা যেমন দৃষদ্বতী, তেমনই অনেক সরোবরের যোগসূত্র অর্থাৎ সারসপক্ষী দ্বারা সুন্দর নদীকে সরস্-বতী বা সারসবতী বলা যায়। এই নিয়ম অনুসারে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বাঘমতী হাথমতী ঈরাবতী ইত্যাদি অনেক নাম দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে হাথমতী তো সাবরমতীতেই আসিয়া মিশিয়াছে। হরিণ বা সবর যাহার তীরে বাস করে, যুদ্ধ করে, স্বচ্ছন্দে বিহার করে সে নদীর নামই সাবরমতী।

গুজরাটের নদী গুলির মধ্যে তিন চারটি বড় নদী অন্তঃপ্রাদেশিক। নর্মদা তাপী, মহী—দূর দূর স্থান হইতে বাহির হইয়া পূর্বদিক হইতে আসিয়া গুজরাটে প্রবেশ করিতেছে, এবং সমুদ্রে পড়িতেছে। সাবরমতী ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র। আরাবল্লী পাহাড় হইতে জন্মলাভ করিয়া এবং বহু নদী সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ দিকে বহিতে বহিতে অবশেষে সে সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। সাবরমতীর মত কুটুম্ব-বৎসলা নদী আমাদের দেশেও বেশি নাই। সাবরমতীকে বিশেষ করিয়া গুর্জরী মাতা বলা যাইতে পারে। তাহার তীরে গুজরাটের আদিম নিবাসী সনাতন কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে; তাহার তীরে ব্রাহ্মণেরা তপস্যা করিয়াছে; রাজপুতেরা কখনও ধর্মের জন্য, প্রায়ই বা নিজেদের নির্বোধ জিদের জন্য, বীর্য ও পৌরুষের পরিচয় দিয়াছে; বৈশ্যেরা গ্রাম ও শহর বসাইয়া গুজরাটের সমৃদ্ধি বাড়াইয়াছে, আর এখন আধুনিক যুগের অনুকরণে শূদ্রেরাও সাবরমতীর তীরে কল চালাইয়াছে।

সত্য কথা বলিতে কি, এই সকল নদীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো পশুপক্ষীদের মত আদিবাসীদেরই হইয়া থাকে। তাই সাবরমতীর পরিবার বিস্তারের কাব্য যদি সংগ্রহ করিতে হয়, তবে পুরাণের দিকে না ফিরিয়া আদিবাসীদের লোক-কথা ও লোকগীতের দিকে আমাদের মন দিতে হইবে। শুধু ভয় যে

বর্তমান যুগের সংস্কারক যুবকেরা এই কাজে উৎসাহ করিয়া লাগিয়া যখন আদিবাসী পাহাড়ীদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া জন্য সময় দিবে, তাহার পূর্বেই আদিবাসীদের নদীকথা লুপ্ত হইয়া যাইবে।

শুধু নদীভক্তির প্রেরণায় অধিবাসীদের 'বৌঠা'র মেলা যতদিন থাকিবে ততদিন একেবারে নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। সাত নদীর জল ক্রমে ক্রমে পরস্পরে যেখানে একত্র হইয়া মেশে, তাহার কাব্যরূপের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য বা তাহাতে স্নান করিবার জন্য আদিবাসীরা ও অন্য লোকেরা যেখানে একত্র হয়, সেই 'বৌঠা'য় সাবরমতীর আদিকথা আমাদের পাইতেই হইবে।

সাবরমতীর পুরানো নাম খুঁজিতে গিয়া কশ্যপগঙ্গা বা ঐরূপ আর দুই একটা নাম নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। নদীকে কোন না কোন ভাবে গঙ্গার অবতার দাঁড় না করাইলে আর্যদের মনে সন্তোষ জন্মিত না। কিন্তু আমার তো সাবরমতীর পুরাতন নাম 'চন্দনা' সব চেয়ে বেশি ভাল লাগে। কারণ—আমি যেমন শুনিয়াছি—কোথাও কোথাও হরিদ্রাভ মাটির ভিতর দিয়া বহিয়া যাওয়ার জন্য উহার বর্ণ গোরোচনার মত হয়। সাবরমতীর যে তীরে আমরা ত্রিশ বৎসর কাটাইয়াছি সেখানকার জল অবশ্য সাধুসজ্জন ও মহাত্মাদের মনের মত একেবারে নির্মল।

নদীর যেখানে জল নির্মল বলিয়া ওপারে অনায়াসে যাওয়া যায়, সেরূপ স্থানকে সংস্কৃত ভাষায় বলে তীর্থ। বহুস্থানে চেষ্টা করিয়া দেখিবার পর যাত্রীরা স্থির করে যে অমুক অমুক স্থানে এরূপ ঘাট আছে। সুতরাং অল্পবিস্তর চলিয়া তাহারা এরূপ ঘাটের নিকট আসে, সেখানে একত্র হয়, আলাপ পরিচয় করে এবং নদীর জল হঠাৎ বাড়িয়া গেলে যতক্ষণ তাহা না কমিয়া যায় ততক্ষণ কয়েক ঘণ্টা কি কয়েক দিন সেখানে থাকিয়াও যায়। যেখানে এইরূপ স্বাভাবিক ভাবে লোকসমাবেশ হয়, সেখানে ধর্মচর্চা ও লোকসেবার জন্য পরম কারুণিক সাধুসন্তেরা আসিয়া থাকিয়া যান। তাই তীর্থ শব্দের নূতন অর্থ হয়। মূলে তীর্থ শব্দের অর্থ ছিল এমন ঘাট যেখানে সহজে নদী পার হওয়া যায়। ইহার অধিক অর্থ কিছু নাই। কিন্তু সাধুসন্তেরা যেখানে ভবনদী পার হইবার উপদেশ দেন আর তাহার বিদ্যাও শেখান, সেই তীর্থস্থান আপনা আপনি পবিত্র হয়।

আমেদাবাদের নিকটে সাবরমতীতে রেলওয়ে পুল হইতে সরদার পুল

পর্যন্ত আর তাহারও দক্ষিণে অনেক তীর্থ আছে। ইহাদের মধ্যেও চন্দ্রভাগা নদী যেখানে সাবরমতীর সঙ্গে মিলিত হয় সেখানে দধীচি তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই সেই স্থানটি অধিক পবিত্র বলিয়া মনে হয়। চারিদিকের লোকে ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকগামী যাত্রীদের অগ্নিসংস্কারের জন্য এই স্থানই পছন্দ করিয়া লইয়াছে, তাই শ্মশানঘাটও এইখানেই। শ্মশানাধিপতি দুধেশ্বর মহাদেব এখানে বিরাজ করিতেছেন, এবং এই মহাযাত্রার তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

সেদিনের কথা মনে পড়ে, যখন পূজনীয় গান্ধীজী তাঁহার স্নেহাস্পদ রেঙ্গুনের ডাঃ প্রাণজীবন মেহতা ও রণোলীর আমার স্নেহাস্পদ নাথা ভাই পটেলকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমের স্থান বাছিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। আমিও সঙ্গে ছিলাম। সেই দিন হইতে এই স্থানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। এখানে প্রথম কোদাল আমিই চালাইয়াছিলাম। প্রথম খুঁটি আমিই গাড়িয়াছিলাম। তাহার পর অনেক তাঁবুও খাটাইয়াছিলাম। কুটির তৈয়ারি করিয়াছিলাম। ঘরবাড়ি নির্মাণও করিয়াছিলাম। খাদির কাজ, চাষবাস ও গোশালার কাজ, রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় উৎসব, রাসনৃত্য, লোকসঙ্গীত, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত,'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইণ্ডিয়া,' সাহিত্যসৃষ্টি, সত্যাগ্রহ, কলের মালিকদের সঙ্গে মজুরদের ঝগড়া, পরিণামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমূল উৎপাটনের জন্য আরব্ধ দাণ্ডি অভিযান —এই সকল কাজের আরম্ভ এই আশ্রমেই হইয়াছিল। এখানেই তাহাদের বিকাশও ঘটিয়াছিল। রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, উহা হইতে উৎপন্ন পাঞ্জাবের হাঙ্গামা, জালিয়ানওয়ালা বাগ, খেড়া সত্যাগ্রহ, বারডোলির লড়াই, গুজরাট বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা, কংগ্রেসের অধিবেশন, দেশের প্রত্যেক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল সাবরমতীর এই তীর। সাবরমতীর বালুকাতীরে যখন সভা হইত, তখন লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় জমিত। এই সাবরমতীর জীবনলীলা শুধু গুজরাটের নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের জীবনধারা বদল করিয়া দিয়াছে। তখনকার বায়ুমণ্ডল আজ সমস্ত ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন পথ দেখাইতেছে, নবযুগের মূলধন জোগাইতেছে।

এই সাবরমতীর জলে আমরা কতই না আনন্দ উল্লাস করিয়াছি। আশ্রমের অনেক ছেলেমেয়ে ও শিক্ষকদেরও আমি এখানে সাঁতার কাটিতে শিখাইয়াছি। ইহারই বালুকার উপরে গীতা ও উপনিষদ চিন্তন ও মনন করিয়াছি। অনেক

সপ্তাহ গীতা-পারায়ণ চালাইয়াছি। এই আশ্রমভূমির উপর যে সব গাছ দাঁড়াইয়া আছে সেগুলির প্রায় সবই আমাদের হাতে লাগানো।

এই গঠনমূলক কাজের সময়টাই ছিল অদ্ভুত। প্রত্যেকের হৃদয়ে এক নূতন শক্তি আসিয়া অধিষ্ঠান করিত। উহা সকলের নিকট হইতে রকম রকমের কাজ আদায় করিয়া লইতে পারিত। আহার লইয়াই কি আমরা ওখানে কম পরীক্ষা করিয়াছি? পারিবারিক জীবন লইয়াও অনেক প্রকার পরীক্ষা চলিয়াছে। শিক্ষার তন্ত্র অনেকবার বদলানো হইয়াছে, তাহাতেও অনেক বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। জীবনের প্রতিমুহূর্তে নূতন নূতন স্মরণীয় কাজ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। সাবরমতী এই সব চেষ্টার সাক্ষী।

যতদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুনিয়াকে শিক্ষা দিবার কিছু থাকিবে, আর ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর স্থান অবিচল থাকিবে, ততদিন সাবরমতীর নাম পৃথিবীর সকল ভাষায় অবশ্যই থাকিবে।

মে, ১৯৫৫

১৬

উভয়াম্বয়ী নর্মদা

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ মহাদেবের মূর্তি। ভারতবর্ষের মানচিত্র যদি উল্‌টা করিয়া ধরেন, তবে তাহার আকার শিবলিঙ্গের মত মনে হইবে। উত্তরে হিমালয় তাহার পাদপীঠ, দক্ষিণে কন্যাকুমারীর অংশ তাহার শিখর।

গুজরাটের মানচিত্র একটু ঘুরাইয়া, পূর্বভাগের নীচের দিক ও সৌরাষ্ট্রের তীর—ওখা মণ্ডল—উপরের দিকে লইয়া গেলে তাহাও শিবলিঙ্গের মত মনে হইবে। কৈলাস শিখরের আকারও শিবলিঙ্গের মতই।

এই সব পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্য হইতে যখন কোনও নদী বাহির হয় তখন কবিরা না বলিয়া থাকিতে পারেন না যে, এই তো শিবের জটা হইতে গঙ্গা বাহির হইল। অনেকে পাহাড় হইতে আগত জলপ্রবাহকে অপ্সরা বলে, অনেকে পর্বতের এই সমস্ত কন্যাগুলিকেই পার্বতী বলে। যে নদীর কথা আজ

বলিতে চাই, তাহা এইরূপই একটি অপ্সরা। মহাদেবের পাহাড়ের নিকটে মেখল প্রদেশের তলপ্রদেশে অমরকণ্টক নামে এক সরোবর আছে, সেখান হইতে নর্মদার উৎপত্তি। যে নদী ভাল ঘাস জন্মাইয়া গোরুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে, সে নদীকে গোদা বলে ; যিনি যশ দেন তাঁহার নাম যশোদা, আর যিনি তাঁহার প্রবাহ ও তটদেশ মনোরম করিয়া নর্ম অর্থাৎ আনন্দ দেন, তাঁহার নাম নর্মদা। ইহার তীরদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে যাঁহারা প্রচুর আনন্দ পাইয়াছেন তাঁহাদের কোন একজন ঋষি সম্ভবত নদীর এই নাম দিয়াছেন। এই নদীকে মেখল কন্যা বা মেখলাও বলা চলে।

হিমালয় পাহাড় যেমন তিব্বত ও চীনকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের এই নর্মদা নদীও তেমনই উত্তর ভারত অথবা হিন্দুস্থান, ও দক্ষিণ ভারত বা দাক্ষিণাত্য, উভয়ের মধ্যে প্রায় ৮০০ মাইল ধরিয়া এক রেখা টানিয়া দিয়াছে। সে রেখা চমক লাগাইয়া দিতেছে। নাচিতেছে, ছুটিতেছে, তাহা সজীব। আর কোথাও কেহ ইহা মুছিয়া না ফেলে সেই জন্য ভগবান এই নদীর উত্তরে বিন্ধ্য, ও দক্ষিণে সাতপুরার সুদীর্ঘ পাহাড়গুলি নিযুক্ত করিয়াছেন। এইরূপ শক্ত সমর্থ রক্ষক দুই ভাইয়ের মাঝখানে নর্মদা ছুটিতে ছুটিতে লাফাইতে লাফাইতে অনেক প্রদেশ পার হইয়া ভৃগুকচ্ছ অথবা ভরোচের নিকটে গিয়া সমুদ্রে মিশিতেছে।

অমরকণ্টকের নিকটে নর্মদার উৎপত্তি, সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে। এখন ৮০০ মাইলের ভিতরে পাঁচ হাজার ফুট নীচে নামা এমন কিছু সহজ নয়, তাই নর্মদা স্থানে স্থানে ছোট বড় লাফ দিয়া চলিয়াছে। এই কারণে আমাদের পূর্বপুরুষেরা নর্মদার অন্য নাম দিয়াছেন রেবা—রেব্ ধাতুর অর্থ হইল লাফ দেওয়া।

যে নদী পায়ে পায়ে লাফ দিয়া চলে, সে নদীতে নৌকা চালানো যায় না, অর্থাৎ মাঝিদের দিয়া বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। সমুদ্র দিয়া যে জাহাজ আসে, সে জাহাজ কষ্টে স্টে নর্মদার ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল ভিতরে আসিতে পারে, বর্ষা ঋতুর শেষে বড় জোর পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত যায়।

যে নদীর উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে, তাহার জল খাল খনন করিয়া বেশি দূর কি করিয়া নেওয়া যায় ? তাই নর্মদা যেমন নৌকা যাতায়াতের পক্ষে বেশি কাজের নয়, তেমনই ক্ষেতে জল সেচনের জন্যও

বিশেষ উপযোগী নয়। তথাপি অন্য দিক দিয়া দেখিলে এই নদী কম সেবা করে না। উহার জলে যে সব হাঙর ও মাছ বিচরণ করে, উহার তটে যে সব গো-মহিষ চরিয়া বেড়ায়, যে সব চাষী বাস করে, তাহাদের এবং অন্যান্য পশু ও আকাশে কলরবকারী পক্ষীদের পক্ষে নর্মদা মাতা।

ভারতবাসীরা তাহাদের সকল ভক্তি গঙ্গার পায়ে ঢালিয়া দিক না কেন, আমাদের দেশে লোকে নর্মদার তীরে প্রতি পদক্ষেপে যত মন্দির গঠন করিয়াছে অন্য কোনও নদীর তীরে তত করে নাই।

পুরাণকারেরা গঙ্গা যমুনা গোদাবরী কাবেরী গোমতী সরস্বতী প্রভৃতি নদীতে স্নান পান ও তীরে দানের মাহাত্ম্য যতই বর্ণনা করুন, কিন্তু এই সকল নদী প্রদক্ষিণ করার কথা কোনও ভক্তই চিন্তা করেন নাই। কিন্তু নর্মদার ভক্তেরা, কবিদের বোধগম্য নিয়ম প্রণয়ন করিয়া সমস্ত নর্মদা পরিক্রমা বা পরিকম্মা করিবার রীতি প্রবর্তন করিয়াছেন।

নর্মদার উৎপত্তিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া আপনি দক্ষিণ তীর দিয়া চলিতে চলিতে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত যান, সেখান হইতে নৌকা করিয়া উত্তর তটে যান, সেখান হইতে পায়ে চলিতে চলিতে অমরকণ্টক পর্যন্ত যান, এক পরিক্রমা পূর্ণ হইবে। নিয়ম শুধু এইটুকু পালিতে হইবে যে, পরিকম্মার সময় নদীর স্রোত কোথাও উল্লঙ্ঘন করিবেন না, স্রোত হইতে বেশি দূরেও যাইবেন না; সর্বদা নদীর দর্শন হওয়া চাই, শুধু নর্মদার জলই পান করা চাই। নিজের নিকট ধনদৌলত রাখিয়া আয়েস করিয়া আরামের সঙ্গে যাত্রা করা উচিত নয়। নর্মদার তীরবর্তী জঙ্গলে যে সব আদিবাসীরা থাকে তাহাদের মনে যাত্রীদের ধন-দৌলতের প্রতি বিশেষ লোভ আছে। আপনার নিকট যদি বেশি কাপড়, বাসন বা টাকা পয়সা থাকে, তাহা হইলে তাহারা এই বোঝা অবশ্যই হালকা করিয়া দিবে।

আমাদের দেশবাসীর মত এরূপ নিঃস্ব ও ক্ষুধার্ত ভাইদের পুলিশের হাতে ধরাইয়া দেওয়ার কথা কখনও মনে হয় নাই। আদিবাসী ভাইয়েরাও মনে করিয়া থাকে যে, যাত্রীদের প্রতি এরূপ আচরণ করার তাহাদের অধিকার আছে। জঙ্গলে লুটের পর যাত্রীরা যখন জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসে তখন দাতারা যাত্রীদের নূতন কাপড় ও সিধা দেয়।

শ্রদ্ধাবান লোকেরা সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া—বিশেষত ব্রহ্মচর্য পালন

করিয়া—নর্মদার পরিক্রমা ধীরে ধীরে তিন বৎসরে পূর্ণ করেন। চাতুর্মাস্যের মধ্যে দুই তিন মাস কোথাও থাকিয়া সাধুসন্তদের সৎসঙ্গ হইতে জীবনরহস্য বুঝিতে চেষ্টা করেন।

এরূপ পরিক্রমা দুই রকমের হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যেটি কঠিন, তাহাতে সমুদ্রের নিকটেও নর্মদা পার হওয়া চলে না। উৎস হইতে সমুদ্রমুখ পর্যন্ত যাওয়ার পর পুনরায় ঐ পথেই উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত ফেরা, এবং উত্তর তট দিয়া সমুদ্রতট পর্যন্ত যাওয়া এবং পুনরায় উৎপত্তিস্থানে ফিরিয়া আসা—এভাবে এই পরিক্রমা দ্বিগুণ হয়। ইহার নাম হইল জলেরী।

স্ফূর্তি ও আরাম ছাড়িয়া তপস্যা করিয়া একই নদীর ধ্যান করা, তাহার তীরে মন্দিরগুলি দর্শন করা, আশপাশে যে সব সাধু মহাত্মারা আছেন ভক্তিপূর্বক তাঁহাদের বচন শ্রবণ করা, এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য ও শালীনতা উপভোগ করিতে করিতে জীবনের তিন বৎসর কাটানো বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। ইহাতে কঠোরতা আছে, তপস্যা আছে, সাহস আছে। ইহাতে অন্তর্মুখী হইয়া আত্মচিন্তা করা ও দরিদ্রের সঙ্গে একাত্ম হইবার ভাবনা, প্রকৃতিতে বিভোর হইবার শিক্ষা, প্রকৃতির দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে যে ভগবান বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে দর্শন করিবার সাধনা আছে।

আর এই নদীর তীরের সমৃদ্ধি সাধারণ নয়। যুগ যুগ ধরিয়া উচ্চ মার্গের সন্ত মোহন্ত বেদান্তী সন্ন্যাসী ও ঈশ্বরের লীলা দেখিয়া ভক্তিগদ্‌গদ ভক্ত নিজের নিজের ইতিহাস এই নদীর তীরে বপন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। নিজস্ব সম্ভ্রমের দীপ্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রজাদের রক্ষায় প্রাণবলি দিতে উদ্যত ক্ষত্রিয় বীরেরা তাঁহাদের পরাক্রমের পরিচয় এই নদীর তীরে দিয়া গিয়াছেন। অনেক রাজা তাঁহাদের রাজধানী রক্ষার জন্য নর্মদার তীরে ছোট বড় দুর্গ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আর ভগবানের উপাসকেরা ধর্মবিষয়ক শিল্পকলার সমৃদ্ধির সংগ্রহালয় নির্মাণের জন্য যেন স্থানে স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন। প্রত্যেক মন্দির তাহার শিল্পকলার দ্বারা মনকে আকর্ষণ করিয়া শেষে শিখরের অঙ্গুলি উপর দিকে নির্দেশ করিয়া অনন্ত আকাশের মধ্যে দৃশ্যমান মেঘশ্যামের ধ্যানে প্রেরণা দিতেছে।

আজানের শব্দ শুনিয়া খোদার উপাসকেরা যেমন আমাদের কথা স্মরণ করে, তেমনই বহু দূর হইতে দেখা যায় এই সকল মন্দিরের চূড়া, তাহাদের

চূড়ারূপী দীপ্তিমান অঙ্গুলি- আমাদিগকে ঈশ্বরস্তোত্র গাহিবার প্রেরণা জোগাইতেছে।

আর নর্মদার তীরে, শীতে, গ্রীষ্মে, রামচন্দ্র অথবা কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎপতি অথবা জগদম্বার স্তব আরম্ভ করিবার পূর্বে নর্মদার স্তব দিয়া আরম্ভ করিতে হয়—'সবিন্দুসিন্ধুসুস্খলত্তরঙ্গভঙ্গরঞ্জিতম্'। এইরূপে যখন পঞ্চচামরের লঘুগুরু অক্ষর নর্মদার স্রোতের অনুকরণ করে তখন ভক্তেরা ভাবে বিভোর হইয়া বলে, মাতা, তোমার পবিত্র কূল দূর হইতে দর্শন করিয়াই এ সংসারের সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর হইয়া গিয়াছে।

'গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদম্বু বীক্ষিতং যদা'—আর শেষে ভক্তিতে ডুবিয়া গিয়া ভক্ত নমস্কার করেন, 'ত্বদীয়পাদপংকজং নমামি দেবি নর্মদে।'

আমাদের একথা ভুলিলে চলিবে না যে নর্মদা যেমন আমাদেরও প্রাচীন সংস্কৃতির জননী, তেমনই তিনি আমাদের ভাই আদিবাসীদেরও জননী। ইহারা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া নর্মদার দুই তীরে রাজত্ব করিয়াছিল, অনেক দুর্গও নির্মাণ করিয়াছিল, আর ইহাদের বিশাল আরণ্য সংস্কৃতিরও বিকাশ সাধন করিয়াছিল।

আমার সর্বদাই মনে হইয়াছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রদেশ বা রাজ্যের অনুসারে না লিখিয়া যদি নদী অনুসারে লেখা হইত, তাহা হইলে উহাতে প্রকৃতির সঙ্গে প্রজার জীবন ওতপ্রোত হইয়া থাকিত। আর প্রত্যেক প্রদেশের কর্মসাধনা ও ঐশ্বর্য নদীর উৎস হইতে আরম্ভ করিয়া নদীর মুখ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে দেখা যাইত। আমরা যেমন সিন্ধুতীরের অশ্বের নাম দিয়াছি সৈন্ধব, ভীমার তীরে পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়া পুষ্ট 'ভীমঘোড়ি'র টাট্টুদের প্রশংসা করি, কৃষ্ণার ঘাটের গোরু মহিষের বিশেষ করিয়া আদর করি, ঠিক তেমনই প্রাচীন কালে প্রত্যেক নদীর তীরে বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতি পৃথক পৃথক নামে চেনা যাইত।

ইহাতেও নর্মদা নদী ভারতীয় সংস্কৃতির দুই প্রধান বিভাগের সীমা রেখা—একথা স্বীকার করা হইত। রেবার উত্তরদিকের অঞ্চলে পঞ্চগৌড়ের বিচার-প্রধান সংস্কৃতি, আর দক্ষিণে দ্রাবিড়ের আচারপ্রধান সংস্কৃতি মুখ্য বলিয়া মনে হইত। বিক্রম সংবতের কালমান ও শালিবাহন শকের কালমান, নর্মদার তীরে উভয়ের কথাই শোনা যাইত, এবং সেই অনুসারে পরিবর্তন করাও হইত।

আমি অবশ্য বলিয়াছি যে নর্মদা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে একটা

সীমারেখার কাজ করে; কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য একটি নদীও আছে। নর্মদা মধ্য ভারতবর্ষের পশ্চিমতীর পর্যন্ত সীমারেখা টানিয়াছে; ইহা ঠিক নয় মনে করিয়া গোদাবরী পশ্চিমের পাহাড় সহ্যাদ্রি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বসাগর পর্যন্ত নিজের এক তির্যক রেখা টানিয়াছে। তাই উত্তর দিকের ব্রাহ্মণ সংকল্প-বচন বলিবার সময় বলিবেন, 'রেবয়োঃ উত্তরে তীরে', আর আমরা পৈঠনের অভিমানী দক্ষিণের ব্রাহ্মণেরা বলিব, 'গোদাবর্যাঃ দক্ষিণে তীরে।' যে নদীর তীরে শালিবাহন বা সাতবাহন রাজারা ধূলা মাটি হইতে মানুষ তৈয়ারি করিয়া তাহারই সেনানী দিয়া যবনদের পরাস্ত করিয়াছিলেন, সংকল্পবচনে সেই গোদাবরী স্থান পাইবে না, ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়?

* * *

নর্মদা নদীর 'পরিকম্মা' আমি নিজে তো করি নাই। অমরকণ্টক পর্যন্ত গিয়া উহার উৎস দর্শন করিব, এ সংকল্প আমার বহুদিনের। এমন কি, গত বৎসর আমি বিন্ধ্যপ্রদেশের রাজধানী রেওয়া পর্যন্ত গিয়াছিলাম। কিন্তু অমর-কণ্টক পর্যন্ত যাইতে পারি নাই। নর্মদার দর্শন অবশ্য স্থানে স্থানে হইয়াছে, কিন্তু জব্বলপুরের পাশে ভেড়াঘাটে উহার কাব্যবৈশিষ্ট্য অনুভব করিলাম।

ভেড়াঘাটে নৌকায় বসিয়া নানা বর্ণের মার্বেল পাথরের মধ্য দিয়া যখন আমরা জলবিহার করি, তখন মনে হয় বুঝি যোগবিদ্যায় প্রবেশ করিয়া মানব-চিত্তের গূঢ় রহস্য আমরা উদ্‌ঘাটন করিয়াছি। ইহার পর যখন আমরা বানর-লাফের নিকট পৌঁছাই, আর পুরানো সর্দার কেমন ঘোড়াকে ইশারা করিয়া তাহার পিঠে এপার হইতে ওপারে লাফ দিয়া চলিয়া যাইত, এই সব কথা যখন আমরা শুনি, তখন মধ্যযুগের ইতিহাস যেন আবার জীবন্ত হইয়া ওঠে।

এই গূঢ় স্থানের এরূপ মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়াই যোগবিদ্যার কোন সাধক নিকটের টিলায় চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির নির্মাণ করাইয়া থাকিবেন, এবং তাঁহাদের চক্রের মধ্যে নন্দীর উপর বিরাজিত হরপার্বতীর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। এই যোগিনীদের মূর্তি দেখিলে ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শনের সম্মুখে মাথা নত হইয়া যায়, এবং যাহারা এই সকল মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের ধর্মান্ধতার প্রতি গ্লানি জন্মে। তবে বহু শতাব্দী ধরিয়াই তো আমরা ভগ্নমূর্তি দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া আছি।

* * *

ধুয়াধার প্রকৃতির এক স্বতন্ত্র কাব্য। জলকে যদি জীবন বলা যায়, তাহা হইলে অধঃপাতের জন্য খণ্ড খণ্ড হইয়াও যাহা অনায়াসে পূর্বরূপ ধারণ করে, এবং শান্তভাবে সম্মুখে বহিয়া যায়, তাহাকে সত্যই জীবনের সর্বপ্রধান উপাদান বলা যায়। চাতুর্মাস্যের সময় যখন সমস্ত অঞ্চল জলমগ্ন হইয়া যায়, তখন সেখানে না থাকে 'ধার' না হয় ধুঁয়া—যে ধুঁয়া ধার হইতে নির্গত শীতল বাষ্পের ধুঁয়া। চাতুর্মাস্যের পরেই ধুয়াধারের পাগলামি দেখিতে হয়। প্রপাতের দিকে দূরবীণ লাগাইয়া ধ্যান করিতে আমার ভাল লাগে না। কারণ প্রপাত হইল ধ্বংসশীল। এই প্রপাতের মধ্যে ধোবিঘাটের পরে জল যখন সাবান-গোলার মত দেখা যায় আর চারিদিকে শীতল বাষ্পের মেঘ খেলিতে থাকে, তখন যতই দেখি ততই মন চঞ্চল হইতে থাকে। প্রাণ ভরিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া যখন ফিরি, তখন মনে হয় জীবনের কোনও কঠিন প্রসঙ্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, আর এইরূপ অনুভূতির পর, আগে যেমন ছিলাম ঠিক তেমন আছি বলিয়া আর মনে হয় না।

* * *

ইটারসি-হোসঙ্গাবাদের নিকট নর্মদা একেবারেই অন্য ধরণের। ওখানকার পাথর মাটিতে বাঁকা-টেড়া হইয়া শক্ত হইয়া বসিয়া গিয়াছে। কোন্ ভূমিকম্পের জন্য এই পাথরের স্তর এমনধারা 'বিষম' হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। নর্মদার তীরে ভগবানের আকৃতি ধারণ করিয়া যে পাষাণ বসিয়া আছে, সেই পাষাণময়ী শিবমূর্তিও এবিষয়ে মূক।

আর যখন সেই নর্মদা, পাগড়ির 'শাফা'র সমান লম্বা কিন্তু কম চওড়া ভরোচের তীরদেশ ধৌত করে, ও অঙ্কলেশ্বরের মাঝিদের লইয়া খেলে, তখন তাহাকে একেবারে অসহায় বলিয়াই মনে হয়।

* * *

কবীরবটের নীচে তাহার কোলে একটি দ্বীপে অবসরকাল যাপন করিবার আনন্দ যে-নর্মদা একবার পাইয়াছে, সাগরসঙ্গমের সময়েও সে এইরূপে এক বা অনেক দ্বীপশিশুকে লালন পালন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে?

ভারতবর্ষে অনেক আশ্চর্য জিনিস আছে, কবীরবট তাহার মধ্যে একটি। লক্ষ লক্ষ লোক যাহার ছায়ায় বসিতে পারে, আর বড় বড় ফৌজ যাহার তলদেশে ছাউনি ফেলিতে পারে, এরূপ এক বটবৃক্ষ নর্মদার জলের মাঝামাঝি

এক দ্বীপে পুরাণপুরুষের মত অনন্তকাল প্রতীক্ষা করিতেছে। যখন বন্যা আসে, তখন উহাতে দ্বীপের এক আধটুকু অংশ ভাসিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে এই বটবৃক্ষের শাখা ও তাহার উপর হইতে যে সমস্ত শিকড় ঝুলিতেছে তাহাও ভাসিয়া যায়। এ পর্যন্ত কবীরবটের এইরূপ ভাগ বাঁটোয়ারা কতবার হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার লেখা-জোখা নাই। নদী বহিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে বটগাছের নূতন নূতন পাতা বাহির হইতে থাকে। সনাতন কাল বৃদ্ধও বটেন, আবার বালকও বটেন। ইনি ত্রিকালজ্ঞ, আবার বিস্মরণশীল—একসঙ্গে দুই-ই।

এই কাল-ভগবানের ও কালাতীত পরমাত্মার অখণ্ড ধ্যানে নিমগ্ন মুনি-ঋষি ও সাধুসন্ত যাহার তীরে বাস করিয়া আসিয়াছেন, আর্য অনার্য সকলের মাতা সেই নর্মদা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যুগের মানবের কল্যাণ করুন। জয় নর্মদা! তোমার জয় হউক!!

আগস্ট ১৯৫৫

১৭

সন্ধ্যারাগ

গৌরীশংকর * পুষ্করিণীর দর্শনলাভ হঠাৎ হইল। আমরা বাগানের মধ্যে গিয়া গাছের শোভা দেখিয়া লইলাম। চীনামাটির টুকরা টাকরা দিয়া তৈরী নির্জীব হাতি ঘোড়া ও বাঘের মূর্তি দেখিয়া ও গাছের ভিতর হইতে সজীব পক্ষীগুলির আনন্দ কলরব শুনিয়া পুষ্করিণীর নিকটে গিয়া পৌঁছিলাম; ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম; শীতল পবনের শান্ত স্পর্শ অনুভব করিলাম; তখনও বুঝি নাই যে এখানে পুষ্করিণী আছে। সিঁড়ির শেষ (অর্থাৎ উপরের) ধাপে পা ফেলিতেই মনে হইল, বুঝি আকাশের বুক চিরিয়া কোনও এক অপ্সরা দেখা দিয়াছে, সরোবরের জল এমন করিয়াই হাসিহাসি মুখে আমাদিগের দিকে তাকাইয়া আছে। আপনি হয়তো একাই সরোবর দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু আপনি এখানে একা থাকিবেন না। দেখিবেন যে আকাশের মেঘ, আর

* সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত ভাবনগরের একটি পুষ্করিণী।

সব চেয়ে তাড়াতাড়ি ওঠে যে সন্ধ্যাতারা, সেও, আপনার সঙ্গেই সরোবরের সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছে।

সরোবর তো সর্বদা নীচের স্রোতের উপরে হয়। পাহাড় হইতে নামিয়া যখন নীচে আসি তখন সরোবরের জলে পা ধুইতে যাই। কিন্তু এ যেন গন্ধর্ব সরোবর; মেঘ যেন পিছলাইয়া আসিয়া ছোট ছোট পাহাড়ের মাথা হইতে ছিটকাইয়া পড়িতেছে।

যে সরোবরের এপার হইতে ওপার দেখা যায় তাহা দেখিতে আর কাহার ভাল লাগে? 'এত সব জল কোথা হইতে আসে,' যে সরোবর দেখিয়া এরূপ অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা না জাগে, তাহার সৌন্দর্যের মধ্যে স্বর্গীয় গভীর ভাব কি করিয়া থাকে? রেলওয়ে লাইনও যদি একেবারে সোজাসুজি যায়, তবে আমাদের ভাল লাগে না। চড়াই হউক, উৎরাই হউক, ডাইনে বাঁয়ে মোড় ফিরুক, তাহা হইলেও উহা ছুটিতেছে। সরোবর তো প্রপাত নয় যে উঁচু নীচুর খেলা দেখাইবে। গৌরীশংকর চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় দিয়া ঘেরা। কিন্তু এই সমস্ত পাহাড় মরণজয়ী বীরের মত ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া নাই। তাই জল এদিক ওদিক সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে।

সরোবরের বাঁধের ওপার হইতে পশ্চিম দিকে তাকাইলে জলে যেন নানা রং ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়, যেন কোন অদ্ভুত রচনায় নব রস একত্র গাঁথা হইয়া গিয়াছে। পায়ের নীচে হরিদ্বর্ণ যেন প্রতিক্ষণে আমাদিগকে আত্ম-বিলোপের জন্য ভিতরে ডাকিতেছে। এই সবুজও সর্বত্র সমান নয়। কোথাও মেহেদী পাতার মত গাঢ়, কোথাও নিমপাতার মত গভীর। অনেকক্ষণ দেখিলে মনে হয়, উহা বুঝি জলের রং নহে, জলে লুকানো স্বতন্ত্র বিষ। আর একটু অগ্রভাগে দেখিলে বাদামী রং দেখা যায়, উহা যেন নিরাশার মধ্যে আশার প্রকাশ। রং তো বাদামী, কিন্তু তাহাতে আছে ধাতুর চমক। আগে গিয়া সেই রং কিছু রূপান্তরের পর কমলা রং-এর দ্বারা সন্ধ্যাপূজা করিতেছে দেখা যায়। মেঘের জাম রং-এর ছায়া যদি মাঝখানে আসিয়া না পড়িত, জানি না তাহা হইলে এদিকের কমলা ও ওদিকের সোনালী রং-এর মাঝে কি অপরূপ সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত!

আমাদের দৃষ্টি সোনালী রং-এর দিকে যাইতে না যাইতেই মন্দ মন্দ পবন জলপৃষ্ঠের উপরে বীচিমালা সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে বলিতেছে, 'শুনুন,

এসময়ের ইহাই স্তোত্র!' সামনের ছোট ছোট পাহাড়গুলি যদি মাথা উঁচু করিয়া না থাকিত, তাহা হইলে এই রসবতী পৃথিবী কোথায় শেষ হইল আর নিঃশব্দ আকাশ কোথায় আরম্ভ হইল, সে কথা জানা পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব কঠিন হইয়া উঠিত।

বাঁ দিকে কাট-ছাঁট করা মেহেদীর ঝাড়। সুন্দর ঝাড় কাহার না দেখিতে ভাল লাগে? কিন্তু অলংকরণ-সাধিকা মেহেদীর শিরশ্ছেদ আমার অসহ্য লাগিল। ডান দিকে স্তিমিত অথচ গাঢ় হয় নাই এমন সূর্যের আলোর মত সরোবর, আর নীচে বাঁ দিকে ঘন ঝোপের বেড়া! এইভাবে পরস্পর বিরোধী রসের মধ্য দিয়া জনকের মত যোগযুক্ত চিত্তে আমরা অগ্রসর হইলাম। পথে পড়িল এক নিরাধার সেতু। সংস্কৃত কবিরা দেখিলে তাহার নাম শিক্য সেতুই রাখিতেন। এরূপ সেতুর সন্ধান সর্বপ্রথম হিমালয়ের বনচরেরাই করিয়া থাকিবে। এই নিরাধার পুল আমাদিগকে ধীরে ধীরে লইয়া যায় জলে তপোমগ্ন কোনও ঋষির মত এক দ্বীপের জটাভারের মধ্যে। পুলের মাঝামাঝি পৌঁছিলে আতিথ্যশীতল জল চেতনা আনিয়া দেয়ঃ 'সাবধানে চলুন, সাবধানে চলুন।' আর উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া পাদ প্রক্ষালন করিতেও ভোলে না।

আর সেই দ্বীপ? উহা তো নিশ্চল শান্তির মূর্তি। জলে চাঁদ খিল খিল করিয়া হাসে, তথাপি তাহার প্রতিধ্বনি কোথাও শোনা যায় না। প্রকৃতি যেন ভয় পাইয়া গিয়াছে, কোথাও ধ্যানাবিষ্ট মুনির শান্তির ব্যাঘাত না জন্মে। এই দ্বীপে না আছে সাপ, না আছে গিরগিটি। পাখি যদি থাকে তো সে এখন নিজের কোটরে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। অতিথির জন্য যে মণ্ডপ তাহার নীচে আমরা। এখন তো জলের উপর অজ্ঞাত বা গূঢ় অন্ধকারের ছায়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল। অষ্টমীর জ্যোৎস্না সোজা জলের মধ্যে নামিয়া যাইতেছিল। শুধু জাতিবৈর সুরাসুরের গুরু, দীর্ঘ সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া পশ্চিম দিকে আলো দিতেছিলেন, যেন বুঝাইতে চাহিতেছিলেন যে একত্র হও। আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা সন্ধ্যা অনেকবার করিয়াছে। ইহাতে যদি কোথাও কোনও সাফল্য হইয়া থাকে, তবেই সুরাসুরের মধ্যে চিরকালের জন্য সমাধান হইতে পারিবে। দেখুন, উভয়ের গুরু দিক পরিবর্তন করিয়া নিজের স্বভাবোচিত গতিতে যাইতেছেন, আর সন্ধ্যার রক্তকালিমা

উভয়কে অপক্ষপাতে সমানভাবে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। যে সর্বদা বুদ্ধ চালায় তাহার অন্ত তো হইবারই কথা।

এখন জল তাহার রং বদলাইল। এ পর্যন্ত জলের উপর রূপার রাজ-পথের মত যে পট বিনা কারণে দেখা যাইতেছিল, তাহা এখন হইতে আর দেখা গেল না। 'খেলা যথেষ্ট হইয়াছে, এখন গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে ;' এরূপ কথা মনে হইবামাত্র জলের প্রবাহ অন্তর্মুখ হইয়া গেল। এমন বড় বড় পাথরের টুকরা দেখা দিতে লাগিল যে মনে হইল, ইহারা বুঝি প্রেতলোকের বাসনা-দেহ, এখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিশাল শান্তিও যে কতদূর অভিভূত করিতে পারে তাহার ধারণা এখানে খুব স্পষ্ট। সমস্ত ছোট ছোট পাহাড় যেন আমাদের একটা শব্দ শুনিবার জন্যই পথের দিকে তাকাইয়া থাকে। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে সামান্য একটু শব্দ করিলেই তাহারা 'হাঁ, হাঁ, এখনই এস, এখনই এস' বলিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিবে। কিন্তু উহাদের ডাকিবার সাহসই বা কি করিয়া হয়? ঐ পাহাড়-গুলি কি মধ্যরাত্রে, কেহ যখন দেখে না এমন সময়, কাপড় ছাড়িয়া সরোবরে স্নান করিতে নামে? আজ তো তাহারা নামিবে না, কারণ দুর্বিনীত চন্দ্রমা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সরোবরে দূরবীণ লাগাইয়া দেখিতে থাকিবে। আর মধ্যরাত্রির পূর্বেই শিশিরের শীতল সাম্রাজ্য আরম্ভ হইবে। আবার জানি না, উষার পূর্বে মাঘস্নান করিবার ইচ্ছা ইহাদের হইবে কি না। এইরূপ কোনও পুণ্যসঞ্চয় বিনা পাহাড়গুলিই বা এতখানি স্থিরতা কিরূপে লাভ করিয়া থাকিবে?

কে যেন পুল পার হইয়া গেল। জলে তাহাতে শব্দ হইল, তাহার মধ্য হইতে বাহির হইল লহরী, লহরীর বর্তুল বহু দূর পর্যন্ত জুটিল। লোকে থাকে নিজের নিজের গ্রামে, কিন্তু তাহাদের খবর মুখে মুখে দূর দূরান্তর যায়, তেমনই পুলের পাশে জলের যে বিক্ষোভ শুরু হইল, তাহা তীর পর্যন্ত পৌঁছাইবেই। শরীরে এক জায়গায় চোট লাগিলে যেমন সমস্ত শরীরে তাহার সাড়া চলিয়া যায়, জলের সম্বন্ধেও তেমনি। জলের শান্তি যদি ভাঙ্গে তবে তাহার ফলে তাহার উদরে প্রতিবিম্বিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দুলিতে থাকে।

এখন তারকাদের রাস শুরু হইয়াছে। জলেও তাহার অনুকরণ চলিতেছে দেখিতে পাই। কিন্তু ভূলোকের তাল তো পৃথক।

ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭

রেণুকার শাপ

রেণুকা কথাটির অর্থ বালু। তাহার অভিশাপে কোন নদী না শুকাইয়া যায়? গয়ার ফল্গুও কি এইভাবে অন্তঃসলিলা হইয়া যায় নাই? আবার ওয়াঢোয়ানের নিকটবর্তী ভোগাও নদী ঐরূপ কেন হইবে না? সৌরাষ্ট্রে ভোগাও (বর্ষার পর যে সব নদী শুকাইয়া যায়) অনেক আছে। প্রত্যেকটিকেই কি কোন না কোন রাণকদেবীর শাপ লাগিয়াছে? শেত্রুঞ্জী, ভাদর, মাছু, আজী, রঙ্গমতী, মেগল—চার দিকে এই যে সব নদী বহিতেছে ইহাদের মধ্যে কয়টিতে বারো মাস জল থাকে? ভারতবর্ষের অন্যান্য খণ্ড হইতে সৌরাষ্ট্র-কাঠিয়াওয়াড় অনেক দিক দিয়া পৃথক বলিয়া মনে হয়। উহার আকারই বা কিরূপ! চোটীলা বা বরডা, শেত্রুঞ্জা বা গিরনার পর্বত যদি জল দেয়ই, তবে কত দিবে? আর তাহাদের কন্যারাও টানিয়া টানিয়া শেষ পর্যন্ত কতটা জল আনিতে পারিবে! নীলগিরি ও সহ্যাদ্রি, সাতপুরা ও বিন্ধ্যাদ্রি, হিন্দুকুশ ও হিমালয়, নাগা, খাসিয়া, ও ব্রহ্মদেশের ইয়োমার মত সমর্থ পর্বতরাজগণই মেঘরাশির প্রধান করভার পাইয়া থাকেন। ইঁহাদের কন্যারা গৌরবে কেমন অলস-মন্থর গতিতে চলেন! ইহাদের সম্মুখে বেচারি কাঠিয়াওয়াড়ী নদীরা আর কি! বর্ষার জলই তাহাদের জল, তাহারাও বর্ষার সহিত বহিতে আরম্ভ করে। বর্ষা বন্ধ হইলেই দুরবস্থায় পড়িয়া শুকাইয়া যায়।

প্রত্যেকটি নদী দুই-একটি শহরকে আশ্রয় দিয়াছে। ভোগাও-এর জন্য ওয়াঢোয়ানের (বর্তমানে সুরেন্দ্রনগর) শোভা। রাণকদেবীর শাপ না লাগিলে এই নদীর মুখ কত না উজ্জ্বল হইত! অন্ত্যজদের শাপে ভবিষ্য-বংশীয়েরা তাহার কি দশাই না করিবে! শেত্রুঞ্জীর বক্রতা যদি দেখিতে হয় তবে তাহার ভাই বীরের শিখর হইতে দেখিয়া লউন। কুন্দফুলের সমান ছোট ছোট হরিদ্বর্ণ ঘাস উঠিয়াছে, বহুদূর পর্যন্ত গালিচার মত খেত ছড়ানো

আছে, মধ্য দিয়া শেত্রুঞ্জী ধীরে ধীরে নিজের পথ করিয়া চলিয়াছে। শেত্রুঞ্জীর এই গতি সংস্কারানুগামী ও চিত্তাকর্ষক।

আর মেগলের নাম মেগল (ময়গল ?) কেমন করিয়া হইল ? দেওধরে মকর কোনও হাতিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া কি ? না, সমুদ্র ও তাহার মধ্যবর্তী উচ্চ সিকতাপটে উহা মাথা রাখিয়াছিল বলিয়া ? সমুদ্রের সঙ্গে মিশিবার অধিকার তো প্রত্যেক নদীরই আছে। কিন্তু বেচারি মেগলের ভাগ্যে বৎসরে আট মাস খণ্ডিতার মত দূর হইতেই পতিকে দেখার সীমা। বর্ষা ঋতুতে যখন সমুদ্রকেও রাখা যায় না, তখনই উভয়ের সংগম হয়। চোরওয়াড়ের লোকেরা কি এই সংগমের উপরেই শ্মশান তৈরী করিবার সংকল্প করিয়াছে ? ইহা উচিত নয় বলি কি করিয়া ? শ্মশানও তো ইহলোক ও পরলোকের সংগম!

ভাদরও এমনই এক নদী, যাহার জন্য কাঠিওয়াড় গর্ব করিতে পারে। ভাদরের আসল নাম কি হইবে ? ভাদ্রপদী, না ভদ্রাবতী ? 'বাহাদুর' তো কিছুতেই নয়। এ নদীর মর্যাদা যথেষ্ট। জেতপুর, নওয়াগড়, নবীবন্দরের মত জায়গা ইহার তীরে অবস্থিত। নবীবন্দরে যখন বসতি হইবে, তখন তাহার নবী (নয়ী) নাম যাহারা দিয়াছিল, সেই সব লোকের মনে কত আকাঙ্ক্ষা, কত না উৎসাহ ছিল! পোরবন্দর হইতেও ইহা শ্রেষ্ঠ হইবে, বড় বড জাহাজ দূর দূরান্তরের বস্তুজাত দেশের ভিতরে আসিয়া পৌঁছাইবে। দৈব অনুকূল হইলে ভাদর কি আর টেম্‌স্‌ নদীর মর্যাদা পাইত না ? কিন্তু নদীর মর্যাদা তো তাহার পুত্রদের পৌরুষের উপর নির্ভর করে। আজ যে ভাদর নদী ভারতবর্ষের পশ্চিমবাহিনী নদীদের নেতৃত্ব পাইয়াছে ইহাই যথেষ্ট।

রঙ্গমতী, আজী ও মচ্ছুনদী যতই পরোপকারী হউক, আর নবীনগর, রাজকোট ও মোরভীর ঐশ্বর্যকে যতই অখণ্ড রূপে দেখিতে থাকুক, তাহাদের সাগরকে ছাড়িয়া ছোট খালের সহিতই মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইতে হয়।

প্রাচীন যুগ হইতেই কাঠিয়াওয়াডের এই সব নদী দেশীয় রাজ্যদের কর্তৃত্ব ও সকল ব্যাপার দেখিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি কাঠিয়াওয়াডের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষ রীতি ও প্রথাও যদি আমাদের দেখাইয়া দেন তাহা হইলে অবশ্যই চিত্তবিনোদন হইবে।

সৌরাষ্ট্রের নদীর জল যাহারা পান করে এমন কোনও সন্তানের উচিত যে সে এই নদীদের মুখ হইতে তাহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা জানিয়া লয়।

১৯

অম্বা-অম্বিকা

পিতামহ ভীষ্ম অম্বা ও অম্বিকা নামে দুই রাজকন্যাকে জয় করিয়া রাজা বিচিত্রবীর্যের নিকট লইয়া আসিলেন। কন্যাদ্বয় পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, 'আমাদের মন অন্যত্র বাঁধা আছে।' বিচিত্রবীর্য এ অবস্থায় কি করিয়া তাহাদিগকে বিবাহ করেন? আর যাহাদের উপর তাহাদের মন লাগিয়াছিল, সেই রাজারাই বা কি করিয়া বিজিত কন্যাদের গ্রহণ করেন? বেচারি রাজকন্যাদের কোনও স্বামী জুটিল না, তাহারা জীর্ণ হইয়া মরিয়া গেল।

গ্রীষ্মকালে আবু পাহাড়ের উপর হইতে সরস্বতী ও বনাস নদী দর্শন করিয়াছিলাম। বেচারিরা সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছিতেই পারিল না! মধ্য পথে কচ্ছের মরুভূমিতেই শুকাইয়া শুকাইয়া লুপ্ত হইয়া গেল। অম্বা-অম্বিকার মত কৌমার্য, স্বামী সোহাগিনীর সৌভাগ্য, এবং বৈধব্যের মধ্যে কোনও একটি দশাই ইহাদের ভাগ্যে জুটিল না। গুজরাট রাজপুতানার ইতিহাসে এই নদীগুলির যতই মাহাত্ম্য লেখা থাকুক না কেন, রাজা কর্ণের দুই বিন্দু অশ্রু ভিন্ন আমরা আর কি দিতে পারি?

২০

লাবণ্যফলা লুনী

মারচী (মারোয়াড় জংশন) হইতে সোজা হায়দ্রাবাদের পথে যাইতে লুনী নদীর দর্শন অনেকবার করিয়াছি। যোধপুর উটের বাসভূমি, সেখানে যাইবার রাস্তা লুনী জংশন হইতেই; একারণেও এই নদীর নাম স্মৃতিপটে অংকিত আছে। এখানকার স্টেশনে হরিণের ভাল ভাল চামড়া সস্তায় পাওয়া

যাইত। এমন মসৃণ মৃগাজিন এখানে কিনিয়া গুরুজন ও প্রিয়জনকে বহুবার ধ্যানের আসন উপহার দিয়াছি। জানি না, চামড়ার এই ব্যবহারে তাঁহাদের ধ্যানের কোনও পুণ্য হরিণের ভাগ্যে লাভ হইয়াছে কি না।

লূনীর নাম শুনিলেই হৃদয় বিষণ্ণ হইয়া ওঠে। এমনিতেই তো সমস্ত নদী তাহাদের সুমিষ্ট জল লইয়া লবণ সমুদ্রে গিয়া মেশে। আর এই তাহাদের জল যাহাতে না পচে তাহার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সমুদ্র সঙ্গমের পূর্ব পর্যন্ত নদীর জল মিষ্ট থাকাই বাঞ্ছনীয়.। বেচারী লূনীর না হয় সাগর সঙ্গম, না থাকে শেষ পর্যন্ত তাহায় মিষ্ট জল।

যদি এই নদী সাম্ভর হ্রদ হইতে বাহির হইত, তাহা হইলে উহার লাবণ্য (লবণ উপাদান) আমরা সহ্য করিতেও পারিতাম। কিন্তু উহার উৎপত্তি তো আজমীরের নিকটে আরাবল্লী হইতে, অরবলী বা আরাবলী বা আডাবলী পাহাড় হইতে। সেখানেও তাহার নাম সাগরমতী। সে গোবিন্দগড পর্যন্ত গেল, সেখানে পুষ্কর হ্রদের পবিত্র জল আনিয়া সরস্বতী নদী উহার সঙ্গে মিলিত হয়।

লূনীর আসল নাম ছিল লবণবারি। অপভ্রংশে লোণবারি, আজ তাহার নাম লোকমুখে লূনী। আজমীর হইতে আবু পর্যন্ত বিস্তৃত আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমের সমস্ত জল ছোট বড় স্রোতে আসিয়া লূনীর সহিত মেশে। এই জলের জন্য যোধপুর রাজ্যের অর্ধেক অংশ দ্বিদল ধান্যের চাষ করিতে পারে। পানিফলের চাষও এখানে কম নয়। লূনীর বেনো জল যেখানে যেখানে যায় সেখানে চাষী তাহাকে আশীর্বাদই করে।

লূনী যখন বালেতেরা পৌঁছায় তখন তাহার ভাগ্য—সৌভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য—তাহাকে পাইয়া বসে। যেখানে জমিই লবণাক্ত, সেখানে নদী বেচারি কি করিবে?

যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের সদ্বুদ্ধি জন্মিল। তিনি লূনী নদীর জল 'লোনা' হইবার পূর্বেই বিলাডার নিকটে এক বড বাঁধ নির্মাণ করিলেন, বাইশ বর্গ মাইলের বৃহৎ বিশাল মানুষের হাতে গডা এক হ্রদ করিয়া দিলেন। তের হাজার বর্গমাইলের জল এই হ্রদে জমে। ইহা বড জোর চল্লিশ ফুট গভীর হইবে। ইহার নাম 'যশোবন্ত সাগর' তো ঠিকই হইয়াছে, কারণ রাজা উহা নির্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু চাষীদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উহাকে 'লূনী-প্রসাদ' বলিবে।

দুই শত মাইল যাত্রা করিয়া এই নদী কচ্ছের রাণে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে দিতে লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার তিনটি মুখই লবণে এত ভরিয়া থাকে যে সমুদ্রও এই জলে আচমন করিতে সংকোচ বোধ করে।

এখন দেখিতে হইবে যে লূনী, সরস্বতী, বনাস ও এইরূপ অন্যান্য নদী যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের জল কচ্ছের রাণে ফেলিয়া দেয়, সেই শ্রদ্ধার ফল তাহারা কবে পাইবে, আর রাণের পরিবর্তনের ফসল মাটিতে কবে দেখা দিবে। আজ লূনী নদী প্রায় পাকিস্তানের সীমা পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে, কচ্ছের রাণকে দিন দিন অধিক লবণাক্ত করিয়া চলিতেছে! এরূপ লবণ-প্রধান, লবণ-সমৃদ্ধ নদীকে যদি আমরা লাবণ্যবতী বলি, তাহা হইলে বৈয়াকরণ অবশ্যই সে নাম স্বীকার করিবেন।

জানি না কাব্যরসিক এবিষয়ে কি বলিবেন।

১৯৫৭

২১

উঁচল্লীর প্রপাত

এবার জোগের নিতান্তই শুষ্ক প্রপাত দর্শনের দুঃখ লঘু করিবার জন্য অন্য এক-আধটা সুন্দর ও প্রসন্ন দৃশ্য দেখিবার প্রয়োজন তো অবশ্যই ছিল। কারোয়ার জেলার গেজেটিয়ারের পাতা উলটাইতে উলটাইতে সন্ধান মিলিল, জোগের থেকে কিছু কম হইলেও উঁচল্লী নামে এক সুন্দর প্রপাত আছে; তাহা শিরসী হইতে বেশি দূরে নয়। লাশিংটন নামে এক ইংরেজ ১৮৪৫ সনে ইহার সন্ধান করেন। তাহার পূর্বে যেন আর কেহ ইহা দেখেই নাই! ইংরেজের চোখে পড়িবামাত্র পৃথিবীতে উহার খ্যাতি ছড়াইয়া গেল!

এই উঁচল্লী কোথায়? কোন্ দিক দিয়া সেখানে যাওয়া যায়? আমরা কি করিয়া যাই? আমাদের কার্যক্রমে উহা স্থান পাইতে পারে কি না? এসব প্রশ্ন আরম্ভ করিয়াছিলাম। শ্রীশংকররাও গুলবাডীজী দেখিলেন যে উঁচল্লীর কার্যক্রম স্থির না করা পর্যন্ত শান্তি বা স্বস্তি নাই। তিনি নিজেও আমা হইতে

কম উৎসাহী ছিলেন না। তিনি বলিলেন যে যখন বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিবার দৃষ্টিতে কারোয়ার জেলার প্রপাতগুলি পরীক্ষা বা সার্ভে করা হয়, তখন ইঞ্জিনীয়ারেরা উচল্লীকে প্রথম স্থান দিয়াছিলেন, গিরসপ্পা বা জোগকে দ্বিতীয় স্থান, মাগোডাকে তৃতীয়, এবং সুপার নিকটবর্তী প্রপাতকে চতুর্থ স্থান দিয়াছিলেন।

সমুদ্রের সঙ্গে কারোয়ার জেলার বন্ধুত্ব স্থাপন করাইয়াছিল চারিটি প্রধান নদী—কালী, গঙ্গাবলী, অঘনাশিনী, শরাবতী। ইহাদের মধ্যে শরাবতী বা বালনদী হোন্নাওয়ারের নিকটে গিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে যখন আমরা দ্বিতীয়বার জোগ প্রপাত দেখি, তখন এই শরাবতী নদীর উপর নৌকায় চড়িয়া হোন্নাওয়ার হইতে উপর দিকে গিয়াছিলাম। শরাবতীর তীর দেখিয়া মনে হইয়াছিল, ইহা বুঝি বনশ্রীর সাম্রাজ্য।

এবার যখন আমরা হুবলী হইতে অংকোলা ও কারোয়ারে গিয়াছিলাম, তখন আরবেল ঘাটি হইতে 'নাগমোডি'র পথে বাহির হইবার মুখে গঙ্গাবলী দেখিয়াছিলাম, আর অংকোলা হইতে গোকর্ণ যাইবার পথে তাহার বক্ষে নৌবিহারও হইয়াছিল। কালী নদীর দর্শন তো আমি শৈশবে কারোয়ারেই করিয়াছিলাম। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের এই স্মৃতি দশবৎসর পূর্বে পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠিল, আর এবারেও কারোয়ারে পৌছিতেই কালী নদী দুইবার দর্শন করিলাম। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কারোয়ার হইতে হলগা পর্যন্ত যাওয়া-আসা দশ মাইল নৌকাতেই সারিলাম।

চতুর্থ হইল অঘনাশিনী। নামটিই কি পবিত্র! গোকর্ণের দক্ষিণ দিকে তদড়ী বন্দরের নিকটে উহা আঁকিয়া বাঁকিয়া খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সমুদ্রে পৌছিবার রাস্তাটুকু বড় ছোট। এই অঘনাশিনী যেখানে সমুদ্রে আসিয়া মিলিবার জন্য উতলা হইয়া সহ্যাদ্রি হইতে নীচে লাফাইয়া পড়ে, সেই জায়গাটি উচল্লী প্রপাত নামে পরিচিত।

আমরা সিদ্ধাপুর হইতে শিরসীর রাস্তা লইলাম। কিন্তু শিরসী পর্যন্ত না গিয়া পশ্চিমের দিকে এক রাস্তা ধরিয়া নীলকুদে পৌছিলাম। সেখানে গোপাল মাডগাঁওকরের কাকা থাকিতেন। তিনি ছিলেন খুব প্রতিষ্ঠাবান জমিদার। তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া আমরা উচল্লীর সন্ধানে বাহির হইলাম। নীলকুদ হইতে হোসতোট (নূতন বাগান) যাওয়ার কথা ছিল।

সামরিক জীপের ব্যবস্থা হওয়ায় 'জঙ্গলের রাস্তা কি করিয়া বাহির করিব' এ চিন্তা প্রায় দূর হইয়াছিল। হোসতোটে হইতে হোয়েকোম্বের (স্বর্ণশৃঙ্গের) রাস্তা আমাদের নিতে হইত। কিন্তু এ পথে মোটর দূরে থাক, গোযান বা পালকি যাওয়ারও পথ ছিল না। ইহাকে তো বাঘের রাস্তা বলিতে হয়, মানুষকেও বাঘের মত হইয়াই চলিতে হয়। আমাদের জীপ এক গাছের ছায়ায় শ্রান্তি দূর করার জন্য রাখিয়া 'অথাতো প্রপাতজিজ্ঞাসা' বলিয়া জঙ্গলে রাস্তা ঠিক করিতে শুরু করিলাম। হোসতোট হইতে স্থানীয় এক যুবক হাতে এক বড় 'কোয়তা' লইয়া আমাদের পথ দেখাইবার জন্য আগে আগে চলিল। বেচারির ধীরে ধীরে চলিবার অভ্যাস ছিল না, সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখিবার দৃষ্টি ছিল না। সে আগাইয়াই চলিল। আমাদের তাহাতে কোনই লাভ হইল না। আমরা খানিকটা অগ্রসর হইলাম, উপরে চড়িলাম, নীচে নামিলাম, আবার উঠিলাম, আবার নামিলাম। এতক্ষণে বন নিবিড় হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব অন্ধকার হইয়া গেল।

So steep the path, the foot was fain,
Assistance from the hand to gain.

আমাদের প্রধান অসুবিধা ছিল পায়ে চলার পথে। সেখানে শুকনা পাতা এত জমিয়াছিল যে, পা না পিছলাইলে তাহা ভাগ্যের কথা বলিতে হইত। ভগবানের অনুগ্রহে এই সব পাতার মধ্য হইতে সর্‌সর্‌ করিয়া কোনও সাপ বাহির হয় নাই, তাহা হইলে আমাদের উঁচল্লী যেখানকার সেখানেই থাকিয়া যাইত। যেখানে নামা কঠিন সেখানে লাঠি দিয়া পাতা সরাইয়া দেখিতে হইতেছিল, কোনও মজবুত পাথর বা কোনও গাছের এক আধটা শক্ত মূল রহিয়া গিয়াছে কি না।

দুপুর বারোটা। কিন্তু বৃক্ষের 'স্নিগ্ধচ্ছায়ার' ভিতর দিয়া রোদ প্রবেশ করিলে তো পায়ে হাঁটিয়া গরম না হইয়া ঠাণ্ডাই লাগিবে। একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছি, আর পরস্পরে বলাবলি করিতেছি, 'আমরা কতখানি রাস্তা ভাবিয়াছিলাম? এখনও কতটা বাকি আছে?' সকলেই অজ্ঞান! কিন্তু সিদ্দাপুর হইতে এক কবিরাজ ক্যামেরা লইয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটি এক বৎসর পূর্বে কোনওপথ ধরিয়া উঁচল্লীতে গিয়াছিলেন, পুরানো স্মৃতি অবলম্বনে আমাদের পথ বলিয়া দিতেছিলেন।

মাঝে মাঝে তো আমাদের নামমাত্র রাস্তাও বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু প্রকৃত অসুবিধা হইতেছিল রাস্তা বন্ধ হইলে নয়, যখন একটি পায়ে চলার পথ দুই ভাগ হইয়া যাইতেছিল, প্রকৃত পথ দেখাইবার কেহ ছিল না, আর আধো আন্দাজ করিবার একজন সঙ্গীর সঙ্গে আর একজনের আধো আন্দাজ মিলিতেছিল না, তখন 'যদ্ ভাবি তদ্ ভবতু'—যাহা হইবাব তাহা হউক—বলিয়া ভাগ্য ভরসা করিয়া কোনও একটি পায়ে চলার পথ ধরিয়া চলিতেছিলাম।

কে বলিল, দূর হইতে প্রপাতের শব্দ শোনা যাইতেছে। আমার কান তেমন তীক্ষ্ন নয়। একটি তো কত কাল হইল জবাব দিয়াছে, অন্যটি শুধু কাজের কথাই শোনে। কিন্তু কল্পনাশক্তির বিষয়ে একথা বলিব না। আমার কান ও কল্পনা, দুইয়ের সাহায্যে শুনিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু যাহাকে প্রপাতের আওয়াজ বলে, এমন কোনও আওয়াজ শোনা গেল না। কোথাও কোথাও মধুমক্ষিকাদের ভনভনানি শুনিলেও বলিতাম, 'হাঁ, হাঁ, প্রপাতের আওয়াজ সত্য সত্যই শোনা যাইতেছে।' কষ্টকর যাত্রায় সঙ্গীদের সহিত চট্ করিয়া একমত হওয়ার ধর্মে আমার পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু এখানে আমি নিরুপায়।

একদিকে যদি জঙ্গলের ভীষণ সৌন্দর্যের রস আস্বাদন করিতেছিলাম, অন্যদিকে কল্যাণীয়া সরোজের কতটা দুর্দশা হইতেছে সেই চিন্তায় তাহার প্রতি দেখিতেছিলাম। সে যখন বলিল, 'জঙ্গলের মধ্য দিয়া এই যাত্রার শেষে যদি কোনও প্রপাত দেখিতে না পাই তাহাতেও বলিব, এখানে আসা সার্থক হইয়াছে। কী মজার জঙ্গল! এই সব বড় বড় গাছ, তাদের মধ্যে পরস্পর বন্ধনরজ্জু এই সব লতা—সমস্তই সুন্দর!' তখন আমার মনে তৃপ্তি হইল।

আরও অগ্রসর হইয়া পথ চলা যখন অসম্ভব প্রায় বলিয়া মনে হইল, আর এক হাতে লাঠি অন্য হাতে কাহারও কাঁধ ধরিয়া নামাও শংকাজনক বলিয়া মনে হইল, তখনও সরোজ বলিতে লাগিল: 'আমার উৎসাহ কমে নাই। কিন্তু অন্য সকলকে অসুবিধায় ফেলিতেছি এই চিন্তায়ই দুঃখ হইতেছে। এইখানে নামিলে আবার উঠিতে হইবে, একথাও মনে রাখিতে হইবে।'

আমি বলিলাম, 'একবার উঁচণ্ডী দর্শন করিবার পর কোনও না কোনও প্রকারে ফিরিতে তো হইবেই। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিয়াই

ফিরিব। এ পর্যন্ত তো আসিয়া গিয়াছি, এখন জলপ্রপাতের আওয়াজও শোনা যাইতেছে। এজন্ত এখন তো অগ্রসর হওয়াই চাই।'

আমাদের পথপ্রদর্শক নীচে গিয়া ডাক দিলেন। ডাক্তার বলিলেন, হয়তো সে জল দেখিয়া থাকিবে। আমাদের উৎসাহ বাড়িল। আমরা আবার নামিলাম। অগ্রসর হইলাম। আবার ডান দিকে ফিরিয়া শেষ পর্যন্ত যাহা দেখিবার জন্ত চোখ পিপাসু ছিল, সেই জলপ্রপাতের উপরিভাগ দৃষ্টিতে পড়িল!

এত উচ্চ ঘাটির একদিকে আমরা দাঁড়াইয়া ছিলাম, আর সম্মুখে অঘ-নাশিনীর জল, যাহা সকালে জীপে করিয়া রওনা হইবার সময় আমরা তিন চার বার পার হইয়াছিলাম, এখানে তাহা এক বড় পাথরের তির্যক্ পটের উপর হইতে নীচে পড়িবার আয়োজন করিতেছিল। গান যেমন তানপুরার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা যায়, জলপ্রপাতের দর্শনও তেমনই নাকাড়ার মত ধব্-ধব্ আওয়াজের সঙ্গেই করা যায়।

উচল্লীর প্রপাত, জোগের রাজার মত এক লাফে নীচে পৌছায় না, ভোরের হালকা ঘুমের প্রত্যেক অংশ আমরা যেমন অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় অনুভব করি, অঘনাশিনীর জলও তেমনই এক এক সিঁড়ি হইতে লাফাইয়া সাদা রং-এর বহু আকারের আবরণ প্রস্তুত করে। এতখানি শুভ্র সলিলে সংসারের কালো হইতে কালো 'অঘ' বা পাপও সহজে ধৌত করা যায়।

ধান মাড়াইয়ের সময় যেমন তাহার ভিতরের দানা নাচিতে নাচিতে ও লাফাইতে লাফাইতে ডান দিকের কোণে দৌড়িয়া আসে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের দিকেও যায়, সেই প্রকারে এখানকার জল পাথরের উপর হইতে নামিবার সময় তেরছা হইয়াও দৌড়ায়, এবং ফেন-বলয় নির্মাণ করিয়া নীচেও লাফাইয়া পড়ে। জল এক জায়গায় নীচে নামিলে তাহা তখনই ঘুরিয়া আঙ্গরাখার ঘেরের মত বা ধুতির কোঁচার মত ছড়াইয়া পড়ে, এবং অনুকূল দিক খুঁজিয়া আবার নীচে লাফায়।

এই জল এভাবে কত খেলা করে, এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় যায়, তাহা না জানা পর্যন্ত এখন তো তৃপ্তি হইতেছিল না। আমাদের মধ্যে কয়েকজন অগ্রসর হইল, আবার নামিল, আবারও নামিল। গাছগুলির ডাল নাচিতেছিল, তাহা ধরিয়া নামিল। এইরূপে চলিতে চলিতে আমরা এক বড়

পাথরের উপর গিয়া দাঁড়াইলাম, সেখান হইতে প্রপাতটার পুরা দর্শন পাইব। তাহার উপর দাঁড়াইয়া সামনের বড় উঁচা পাথর হইতে জল পড়িতেছে, তাহার পদক্রম দেখা, জীবনের সে এক আনন্দ, তাহা দুর্লভ। আমরা এক দৃষ্টিতে জলের দিকে তাকাইয়াছিলাম, কিন্তু জলের আমাদের দিকে তাকাইবার সময় ছিল না। সে ছিল তাহার উন্মাদনায় ভরপুর। কর্পূরচূর্ণের মধ্যে শুভ্রবর্ণের যে উৎকর্ষ, তাহাই যেন এই জল বা জীবনের অবতরণের মধ্যে ছিল।

ভগবান সূর্যনারায়ণ মাথার উপরে থাকিয়া স্বয়ং আমাদের আশীর্বাদ করিতেছিলেন। আমাদের গাল বাহিয়া যতই ঘাম ঝরুক, সম্মুখের জল-প্রপাতের দিক হইতে তাহা কাহারও দৃষ্টি সরাইতে পারিতেছিল না। সূর্য-নারায়ণের আশীর্বাদ গ্রহণের যতটা শক্তি উচল্লীর প্রপাতের ছিল, আমার ততটা ছিল না। জল ঝক্‌মক্ করিয়া সাদা রেশম বা সাটিনের মত দেখাইতেছিল। A moving tapestry of white satin and silver filigree.

কটকে চাঁদির সরু তার টানিয়া তাহা দিয়া অত্যন্ত সরু ও অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ফুল, গহনা প্রভৃতি তৈরী করা হয়। তারের তৈরী পিপুলের পাতা, পদ্ম, করণ্ড প্রভৃতি অনেক প্রকারের বস্তু আমি উড়িষ্যায় প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম, এই সব গহনাতে বাস্তবিকই কটকের নাম সার্থক হইয়াছে।

প্রকৃতির হাতে গড়া ও প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল চাঁদির সুন্দর ও সজীব গহনা এখানে দেখিয়া আবার কটকের কথা মনে পড়িল। সোনার আবরণে সত্যের রূপ হয়তো আবৃত হইতে পারে, কিন্তু রূপার সজীব তারের কাজে প্রকৃতির সত্য রূপ অদ্ভুতভাবে প্রকাশ পাইতেছিল। 'এখন এই সত্য লইয়া কি করিব? কিভাবে উহা পান করিব? কোথায় উহা রাখিব? কিভাবে উঠাইয়া লইয়া চলিব?' মনে মনে এইরূপ মধুর উদ্বেগ অনুভব করিতেছি, এমন সময়ে পুরাতন অভ্যাসের বশে বিনা চেষ্টায় কণ্ঠ হইতে ঈশাবাস্যের মন্ত্র সজোরে গুঞ্জন হইতে থাকিল। সত্যই এই জগৎকে উহার ঈশের দ্বারাই আবৃত বলিয়া ধরিতে হইবে, ঠিক যেমন সামনের ঐ তেরছা পাথর জলের পরদা দিয়া ঢাকা হইতেছে, আর চৈতন্যের জ্যোতিতে আবৃত হইতেছে। যাহা যাহা দেখা যাইতেছে—চর্মচক্ষুর দৃষ্টিতেই হউক আর কল্পনার দৃষ্টিতেই হউক—

সকলই আত্মতত্ত্ব দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া চাই। তখনই নির্লিপ্তভাবে অখণ্ড জীবনের আনন্দ শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। মানুষের অন্য কোনও পথ নাই।

দৃষ্টি নিম্নাভিমুখী হইল। এক শীতল কুণ্ড তাহার পূর্ণ নীলিমার মধ্য হইতে প্রপাতের জলের ছায়া গ্রহণ করিতেছিল। আর 'অপরিগ্রহই ভাল' বলিয়া উহা অল্পক্ষণ পরেই এক সুন্দর প্রবাহে ঐ সমস্ত জলরাশি সরাইয়া বহাইয়া দিতেছিল। অঘনাশিনী তাহার বঙ্কিম প্রবাহের দ্বারা চারিদিকের সমস্ত ভূমি পবিত্র করিবার এবং মানবজাতির বক্রতা ('জুহুরাণ') পাপ ('এনস্') ধুইয়া ফেলিবার তাহার যে ব্রত তাহা অবিরাম পালন করিতেছিল। শেষে উহার নিকটে প্রার্থনা করিলাম :—

যুযোধি অস্মৎ জুহুরাণ মেনঃ
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।

হে অঘনাশিনি! আমাদের বক্র কুটিল পাপ নষ্ট করিয়া দাও। তোমাকে নানাভাবে স্তব করিব, নমস্কার করিব, প্রণতিসূচক অনেক কবিতা রচনা করিব।

জুন, ১৯৪৭

২২

গোকর্ণ

লঙ্কাধিপতি রাবণ হিমালয়ে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মা তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। শিবভক্ত মহান সম্রাট রাবণের মাতা কি মামুলি পাথরের লিঙ্গ পূজা করিবেন? তিনি ছেলেকে বলিলেন, 'যাও বৎস, কৈলাসে গিয়া শিবের নিকট তাঁহার আত্মলিঙ্গ লইয়া এস। তখন আমার এ পূজা হইতে পারিবে।' মাতৃভক্ত রাবণ যাত্রা করিলেন। মানস সরোবর হইতে প্রত্যহ এক সহস্র পদ্ম তুলিয়া কৈলাসনাথের পূজা করিতে লাগিলেন। এই তপস্যা চলিল এক হাজার বৎসর।

একদিন, না জানি কিভাবে, নয়টি কমল কম পড়িল। পূজা করিতে করিতে মাঝখানে ওঠা যায় না, আর সহস্র কমলের একটি কম পড়িলেও কাজ চলিতে পারে না। কি করা যায়? আশুতোষ মহাদেবের আবার অতি অল্পে রাগও হয়। সেবায় সামান্য কিছু ত্রুটি থাকিলে সর্বনাশ। রাবণের বুদ্ধি বা সাহস কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি তাঁহার এক একটি মুণ্ড কাটিয়া পূজা দিতে লাগিলেন। এরূপ ভক্তিতে না পাওয়া যায় কি? ভোলানাথ প্রসন্ন হইলেন। বলিতে লাগিলেন, 'বর চাও, বর চাও। তোমাকে অদেয় কিছুই নাই।' রাবণ বলিলেন। 'মা পূজাতে বসিয়াছেন। আপনার আত্মলিঙ্গ চাই।' কথাটা মুখ দিয়া বাহির করিতে যা দেরি। শম্ভু নিজের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আত্মলিঙ্গ বাহির করিলেন, এবং রাবণকে দিয়া দিলেন।

ত্রিভুবনে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেবাদিদেব মহাদেব আত্মলিঙ্গ দান করিয়াছেন! তাহা আবার কাহাকে? সুরাসুরের পরমশত্রু রাবণকে! এখন ত্রিভুবনের কি হইবে? ব্রহ্মা ছুটিলেন বিষ্ণুর নিকটে। লক্ষ্মী গেলেন সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিতে। ইন্দ্র মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বিঘ্নবিনাশন গণেশকে সকলে স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন, 'যাহা ইচ্ছা করুন। কিন্তু এমন কিছু করুন যাহাতে এই লিঙ্গ লঙ্কায় না পৌছাইতে পারে।'

মহাদেব রাবণকে বলিয়াছিলেন, 'লও এই লিঙ্গ। ইহা যেখানেই মাটিতে রাখিবে সেখানেই স্থির হইয়া বসিবে।' মহাদেবের লিঙ্গ পারদ অপেক্ষা ভারি। রাবণ উহা লইয়া পশ্চিম সমুদ্রের তীরে চলিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। রাবণের মূত্রত্যাগের বেগ হইল। শিবলিঙ্গ হাতে লইয়া বসা যায় না। মাটিতেই বা রাখা যায় কি প্রকারে? রাবণের মনে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, এমন সময়ে দেখা গেল, দেবতাদের ইঙ্গিত মত গণেশ রাখাল বালকের রূপ ধরিয়া গোরু চরাইতেছে। রাবণ বলিলেন, 'এই ছোকরা, এই লিঙ্গটা একটু ধর তো। মাটির উপর রাখিও না।'

গণেশ বলিল, 'এটা তো ভারি। ক্লান্ত হইলে তিনবার হাঁক দিব। ততক্ষণে তুমি আস তো ভাল, না হইলে তোমার কথা তুমি জান।'

ব্যাপারটা তো মূত্রত্যাগের। তাহাতে আর কত দেরি হইবে? রাবণ বসিলেন।. বসিলেন তো ঠিক, কিন্তু জানি না কেন, আজ তাঁহার পেটে সাত সমুদ্র ভরা ছিল! পৈতাটা কানে চড়াইলে আবার মুখে কিছু বলাও

যায় না। সিদ্ধিদাতা গণেশ চুক্তিমত তিনবার রাবণকে ডাক দিলেন। আর অ র্‌ র্‌ র্‌ র্‌ চিৎকার করিয়া লিঙ্গটি মাটির উপর রাখিয়া দিলেন! ভার যেন অসহ্য মনে হইল। মাটির উপর রাখা মাত্রই লিঙ্গ পাতাল পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল! রাবণ ক্রোধে লাল হইয়া গেলেন, গণেশের কুটিরের উপর কসিয়া এক ঘুষি মারিলেন। গণেশের মাথা রক্তে ভিজিয়া গেল।

তখন রাবণ ছুটিলেন লিঙ্গ টানিয়া তুলিতে। কিন্তু এখন তো টানিয়া তোলা অসম্ভব। যে লিঙ্গ একেবারে পাতালে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা কি করিয়া টানিয়া তোলা যায়! সমস্ত পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু লিঙ্গ বাহিরে আসিল না। অবশেষে রাবণ লিঙ্গ ধরিয়া তাহা মটকাইলেন। তাঁহার হাতে উহার চারিটি টুকরা আসিল, হতাশ হইয়া তিনি ঐ চার টুকরা চার দিকে ফেলিয়া দিলেন, বেচারিকে খালি হাতে লঙ্কায় ফিরিতে হইল।

মটকানো লিঙ্গের প্রধান ভাগ যেখানে পড়িল তাহা হইল গোকর্ণ—মহাবলেশ্বর। পৃথিবীতে উহার চেয়ে পবিত্র তীর্থ আর নাই।

* * * *

গোকর্ণ মহাবলেশ্বর কারোয়ার ও অংকোলা বন্দরের মধ্যে, তদড়ী বন্দর প্রায় ৬ মাইল উত্তরে, সমুদ্রের ঠিক ধারে। দক্ষিণ ভারতে ইহার মাহাত্ম্য কাশীর চেয়েও অধিক বলিয়া লোকে মনে করে। লিঙ্গের অধিকাংশ মাটির ভিতরেই। তাহার জলাধারের মাঝামাঝি এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ। তাহার মধ্যে আঙ্গুল দিলে ভিতরের লিঙ্গকে স্পর্শ করা যায়। দর্শনের তো প্রশ্নই নাই। সেখানকার পূজারী বলেন যে, লিঙ্গের শিলা অত্যন্ত মসৃণ। ভক্তদের স্পর্শে স্পর্শে যদি মসৃণতা চলিয়া যায়, তাই প্রাচীনেরা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক বৎসর পর পর শুভ মুহূর্তে জলাধারটি বাহির করা হয়, এবং চারদিকের 'চুনকাম' সরাইয়া মূল লিঙ্গের দুই তিন হাত গভীর পর্যন্ত খুলিয়া দেওয়া হয়। কয়েক মাস খোলা রাখিবার পর মোতি চূর্ণ করিয়া যে চুণ হয়, তাহা দিয়া আবার চুনকাম করানো হয়। যতদূর মনে পড়ে, যদি আমার ভুল না হয়, এই ক্রিয়াকে 'অষ্টবন্ধ' বা এরূপ কোনও নাম দেওয়া হয়।

আমরা যখন কারোয়ারে ছিলাম, তখন একবার কপিলা ষষ্ঠীর মত দুর্লভ অষ্টবন্ধের যোগ আসিয়াছিল। বাবা, মা ও আমি—আমরা তিন জন এই যোগে তীর্থযাত্রায় গিয়াছিলাম। তদড়ী বন্দরে আমাকে বহন করিবার জন্য কুলি

নিয়োগ করা হইয়াছিল, তাহার কাঁধে বসিয়া আমি গোকর্ণ গিয়াছিলাম। কোটিতীর্থে স্নান করিয়াছিলাম। গোকর্ণ মহাবলেশ্বর দর্শন করিয়াছিলাম। শ্মশানভূমি ও তাহার রক্ষক হরিশ্চন্দ্রকে দর্শন করিলাম। হাড় ফেলিয়া দিলে গলিয়া যায়, এমন গরম জল আছে, এরূপ তীর্থ দেখিলাম। অহল্যাবাইয়ের অন্নসত্রে সেই সাধ্বী মহিলার মূর্তি দর্শন করিলাম। মাথায় আঘাতের চিহ্ন, দ্বিভুজ গোপালবেশী গজাননকে দেখিলাম। ব্রহ্মার এক মূর্তি দেখিলাম। সব চেয়ে বড কথা, রাবণের সেই প্রসিদ্ধ প্রস্রাবের কুণ্ডও দেখিলাম। আজ ও তাহা পূর্ণ, এবং তাহা হইতে আজও দুর্গন্ধ আসিতেছে। আরও অনেক কিছু দেখিয়া থাকিব, কিন্তু আজ তাহা মনে নাই।

এই অঞ্চলের একটা বিশেষত্ব বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। গরিবের বাড়ি হউক আর বড় লোকের ঘর হউক, মেজে তো হইবে সাদা সিমেণ্টেরই; কিন্তু তাহা কালক্রমে কালো স্ফটিকের সমান কঠিন ও চকচকে হইবে, উহাতে সত্যই মুখ দেখা যাইবে। গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরে কিছু না বিছাইয়া সাদা সিমেণ্টের ঐ পলেস্তারার উপরে লোক আরাম করিয়া শুইয়া পড়িতে পারে। মাঝে মাঝে গোবর ও কাজল মিশাইয়া তাহা দিয়া এই মাটি লেপা হয়। কিন্তু হাত দিয়া নয়। সুপারি গাছের এক ধরণের ছাল মেজের উপর ঘসিয়া ঘসিয়া মেজে চক্চকে করা হয়। এই ছালকে ওখানকার ভাষায় 'পোয়লী' বলে।

গোকর্ণ হইতে ফিরিবার সময় তদড়ী পর্যন্ত সমুদ্রের পথে 'ওয়াচের' বা স্টীমলঞ্চে যাইব ভাবিয়াছিলাম। মৌসমী বায়ু বহিতে আরম্ভ করিবার আর বেশি দিন বাকি নাই। আট দিন পরে 'আগবোট' গুলিরও বন্ধ হইবার কথা। তাই ফিরিয়া যাইবার সময়ে যাত্রীদের সংখ্যার আর সীমা ছিল না। যাহারা তদড়া বন্দরে উঠিবে সেই সব যাত্রীর স্টীমারে জায়গা মিলিবে কি না সন্দেহ ছিল। তাই আমরা স্টীমলঞ্চে বসিয়া স্টীমার পর্যন্ত তাড়াতাড়ি যাওয়াই পছন্দ করিলাম।

গোকর্ণ বন্দরে জেটি ছিল না। তীর হইতে আমার বুকসমান জল হাঁটিয়াই যাইতে হইত। যুবকেরা নৌকা পর্যন্ত হাঁটিয়াই যাইত; কিন্তু মেয়েরা ও শিশুরা তো কুলিদের কাঁধে চড়িয়া অথবা দুইটি কুলির হাতে পালকিতে বসিয়া চলিয়া যাইত।

প্রথমেই এক দুর্ঘটনা। এক বেচারি বুড়ী দেহে কিঞ্চিৎ স্থূল ছিল। কিন্তু

দুইজন কুলি ভাড়া করিবার পয়সা তাহার কাছে ছিল না। সে একজন লোভী কুলিকে কিছু বেশি মজুরি দিবার লোভ দেখাইয়া তাহাকে কাঁধে উঠাইয়া লইয়া যাইতে রাজি করাইল। লোকটা ছিল পাতলা, দুর্বল। সে তীরে বসিয়া পড়িল। বিধবা বুড়ী আসিয়া তাহার কাঁধে বসিল। সে যখন উঠিতে গেল তখন দুজনেই ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেল। ততক্ষণে এক চটুল ঢেউ আসিয়া উভয়কে কৃতার্থ করিল।

এই বোট প্রায় শেষ বোট। তাই গোকর্ণেও যাত্রী সংখ্যা অনেক ছিল। সকলে স্টীমলঞ্চে আঁটিবে কি করিয়া? তাই একশ' লোক বসিতে পারে এমন এক বড় নৌকা স্টীম লঞ্চের পিছনে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তাহার পিছনে কাস্টম বিভাগের এক অফিসরের সাদা নৌকা বাঁধা হইল। আমি দেখিলাম, দেশী নৌকার হাল 'কডছী' বা পাখার মত গোল হয়। আর কাস্টম বিভাগের নৌকার হাল ক্রিকেট ব্যাটের মত লম্বা চেপ্টা হয়।

আমাদের যাত্রিদল যথাসময়ে রওনা হইল। দুই এক মাইল যাইতে না যাইতে আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল। জোর হাওয়া বহিতে লাগিল। ঢেউ জোরে জোরে উথলিয়া উঠিতে লাগিল, যেন ভারি নিমন্ত্রণ পাইয়াছে। নৌকা দুলিতে লাগিল। স্টীম লঞ্চের টানেরও জোর বাড়িতে লাগিল। ওরে! একি! বৃষ্টির ছিটা? বড বড ফুলের মত ছিটা যে! এখন হইবে কি? ঢেউ আরও জোরে জোরে উঠিতে লাগিল। স্টীমলঞ্চ বেহুঁশ ঘোড়ার মত উপর নীচে লাফাইতে লাগিল। পিছনের নৌকার রসিগুলি কর্র্র্ কর্র্র্ শব্দ করিতে লাগিল। ততক্ষণে স্টীমলঞ্চ ও নৌকার মধ্যে এত বড এক ঢেউ আসিয়া পড়িল যে নৌকা দেখাই গেল না।

স্টীমলঞ্চে আমি বয়লারের পাশে কাঠের তক্তার চাতালের উপরে বসিয়াছিলাম। আমাদের কাপ্তানের খুব তাড়াতাড়ি স্টীমারে পৌঁছাইবার কথা ছিল। তিনি পাগলের মত স্টীমলঞ্চ পূর্ণবেগে ছাড়িয়া দিলেন। চাতাল গরম হইয়া গেল। আমি গরমে পুড়িতে লাগিলাম। কি করিব, বুদ্ধিতে আসিল না। একটু এধার ওধার হইলেই 'সমুদ্রাস্তৃপ্যন্ত' হইবার ভয় ছিল। আর বসিয়া থাকা একেবারেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই উত্তেজনা হইতে মুক্তি পাইলাম ভীষণ এক উপায়ে। সমুদ্রের এক প্রচণ্ড ঢেউ আক্রমণ করিল, আমাকে আপাদমস্তক স্নান করাইয়া দিল। এখন আর চাতাল গরম

থাকিবে কি করিয়া? পিতা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মার তো কুলদেবতার কথা স্মরণ হইল: 'মংগেশা। মহারুদ্রা। মায়বাপা। তুঁচ আতাঁ আম্হানা তাঁর।'—'মংগেশ। মহারুদ্র। মা ও বাবা। তোমরাই এখন আমাদিগকে উদ্ধার কর।'—মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। স্টীমলঞ্চের মধ্যে তো আমরা খানিকটা সুরক্ষিত ছিলাম। কিন্তু পিছনের সেই নৌকার লোকগুলির কি হইল? প্রথম প্রথম তো স্টীমলঞ্চের জল কাটিতে হইত, তাই সহজে উহাতে জল আসিয়া যাইত। কিন্তু নৌকায় তো প্রতিটি ঢেউয়ের উপর চড়িতে হইতেছিল। তাই যতই দুলুক না কেন, জল তাহার ভিতরে আসিত না।

কিন্তু যখন বৃষ্টি ও হাওয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাব জাগিয়া উঠিল, আর উভয়ের অট্টহাস্য বাড়িতে লাগিল, এক এক ঢেউয়ে প্রায় অর্ধেক নৌকা যেন জলে ভরিয়া গেল। ঢেউ যখন সম্মুখ হইতে আসিতেছিল, ততক্ষণ তো সব ঠিকই ছিল, নৌকা তাহার উপর উঠিয়া ওপারে বাহির হইয়া যাইত। কখনও ঢেউয়ের চূড়ায়, কখনও দুই ঢেউয়ের মাঝের ঘাটিতে। কখনও কখনও নৌকা এক ঢেউয়ের পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছে, আবার নীচে নূতন এক ঢেউ উঠিয়া তাহাকে মাঝপথেই উঠাইয়া লইতেছে। এইরূপ আকস্মিক বিপর্যয়ে ভিতরে যে সব লোক দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা একে অন্যের গায়ে দুমদাম করিয়া পড়িতেছিল।

কিন্তু এবার ঢেউগুলি পাশ দিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। নৌকার ভিতরে যে সব শিশু ও স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, তাহাদের তো এখন শুধু চিৎকার করিয়া কান্নাই প্রতিকার বলিয়া বোধ হইতেছিল। যুবকেরা সকলে কলসি, বাটি, যে যাহা পায় তাহা দিয়া জল ভরিয়া ভরিয়া বাহিরে ফেলিতে লাগিল। ফায়ার ইঞ্জিনের বোমাও ইহার চেয়ে কি বেশি জোরে কাজ করিতে পারে? নৌকা খালি হইতে না হইতে এক আধটা নৃশংস ঢেউ বিকট অট্টহাস্য করিয়া 'ধ......ড়্' করিয়া নৌকা হইতে লাফাইয়া ভিতরে চড়িয়া বসিতেছিল। সে সময়ে স্ত্রী ও শিশুদের চিৎকার ও কান্নাকাটি কর্ণবিদারক। বুকও ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। যাত্রীদের কেহ কেহ অবধূত দত্তাত্রেয়ের সাহায্যের জন্য চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ ডাকিতে লাগিল পণ্ঢরপুরের বিঠোবাকে। কেহ ভবানী মাতাকে মানত করিল, কেহ ডাকিল বিঘ্নহর্তা গণেশকে। প্রথম স্টীমলঞ্চের কাপ্তান ও খালাসী আমাদের সকলকে ধৈর্য ধরিতে বলিতেছিল:

'আপনারা কেন ভয় পান? দায়িত্ব তো আমাদেরই। আমরা কতবার এরকম ঝড় দেখিয়াছি।' কিন্তু দেখিতে দেখিতে ব্যাপার এমন ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল যে কাপ্তান সাহেবেরও মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন: 'ভাই সব, কাঁদিয়া লাভ কি? মানুষকে তো একবার মরিতেই হইবে। তা সে মৃত্যু দেরি করিয়া আসুক, না একটু পরেই আসুক, শিকার করিতে গিয়া আসুক, বা সমুদ্রে আসুক। দেখিতেছেন তো যে আমরা সকল রকম চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু মানুষের হাতে কি আছে? মালিক যাহা চাহেন তাহাই হইবে।' আমি একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখিতে-ছিলাম। যাত্রার আরম্ভে যিনি গাজরের মত লাল ছিলেন তিনি এখন কচু পাতার মত সবুজ হইয়া পড়িয়াছিলেন!

আমি তখন একেবারেই বালক ছিলাম। কিন্তু বিপদের সময় বালকও প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে। প্রতি মুহূর্তে আমি জায়গা হইতে সরিয়া আসিতেছিলাম। দুই হাতের চাপে আমি অতি কষ্টে নিজের জায়গা সামলাইতেছিলাম। আমাদের জিনিসপত্র সব একদিকে পড়িয়াছিল। কিন্তু কে সে-সবের দিকে তাকাইয়া দেখে? তবে পূজার ঠাকুরের মূর্তি ও বেতের যে ঝাঁপির ('সাঁওডী') মধ্যে পূজার নারিকেল ছিল, তাহা আমি কোলে লইয়া বসিতে ভুলি নাই।

মনে তখন নানা রকমের চিন্তা আসিতেছিল। সে সময় ছিল আমার মুগ্ধ ভক্তির সময়। রোজ সকালে দুই ঘণ্টা করিয়া আমার ভজন গান চলিত। পৈতা হয় নাই, তাই সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদি কি করিয়া করি? তবু পিতামহাশয় যখন পূজায় বসিতেন, তখন তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে খুব আনন্দ পাইতাম। মনে হইল, ভাগ্যে যদি আজ ডুবিয়া মরাই ঠিক থাকে, দেবতাদের এই ঝাঁপি বুকে করিয়াই মরিব। পর মুহূর্তে মনে হইল, মার সামনেই যদি লঞ্চ হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ি তাহা হইলে মায়ের কি দশা হইবে? এই চিন্তাই এত অসহ্য বোধ হইল যে আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। বুকে এত ব্যথা লাগিল যে মনে হইল বুঝি পাথরের আঘাত লাগিয়াছে। ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানাইলাম, 'ভগবান, যদি জলে ডুবাইয়া মারিতেই হয়, তবে এইটুকু করিও যেন মা ও আমি পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া ডুবি।'

প্রত্যেক বালকের দৃষ্টিতে তাহার পিতা ধৈর্যের পাহাড়। বালকের বিশ্বাস,

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেও পারে, কিন্তু পিতার ধৈর্য টলিতে পারে না। তাই যখন এমন সময় আসে যে বালক তাহার পিতাকেও বিহ্বল, হতবুদ্ধি দেখে, তখন সেও ব্যাকুল হইয়া ওঠে। আমি ঝড়ে তেমন ভয় পাই নাই, বর্ষায়ও তেমন ভয় পাই নাই, 'মানুষের গন্ধ পাই, ধরে ধরে খাই' বলিতে বলিতে মুখ হাঁ করিয়া যে সব ঢেউ আসিতেছিল, তাহাদের দেখিয়াও তেমন ভয় পাই নাই, পিতার ক্লান্ত শ্রান্ত চেহারা দেখিয়া ও তাঁহার রুদ্ধ কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া যেমন ভয় পাইয়াছিলাম।

প্রত্যেকে কাপ্তানকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, 'আমরা কতদূর আসিয়াছি? কতদূর বাকি?' যতদূর দৃষ্টি যায়, চারিদিকেই বৃষ্টি, আঁধি ও ঢেউয়ের তাণ্ডব! এত যে জল ঝরিল, তবু আকাশ একটুও পরিষ্কার হইল না। আমি চটিয়া গিয়া কাপ্তানকে বলিলাম, 'লঞ্চটা আর একটু তীরের দিকে লইয়া চলুন না। যদি ডুবিয়াও যায়, তবু কিছু লোক তো সাঁতরাইয়া তীর পর্যন্ত যাইতে পারিবে!' তিনি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'ছেলেটা কি বোকা! তীর হইতে যতখানি দূরে আছি ততটুকু রক্ষা। একটু কাছে গেলেই পাথরে লাগিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যাইব। এখন তো জানিয়া শুনিয়াই আমরা তীর হইতে দূরে আছি, স্টীমার পর্যন্ত পৌছাইলে গঙ্গা স্নান করিলাম মনে করিও। আজ অন্য কোনও উপায়ই নাই।'

আমি ইহার পূর্বে কখনও বেশি বয়সের লোকদের পরস্পরের গলা ধরিয়া কাঁদিতে দেখি নাই। এই দৃশ্য আজ ঐ নৌকায় দেখিলাম। উহাতে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল। দুই-তিনটি শিশুর জননী তাহার সব কয়টি সন্তানকে একই সঙ্গে কোলে লইবার চেষ্টা করিতেছিল। শুধু বিশ পঁচিশজন জোয়ান প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া সমুদ্রের সঙ্গে অসমান যুদ্ধ চালাইতেছিল। ঝড এত বাড়িয়া গিয়াছিল এবং স্টীমলঞ্চ ও নৌকা এত অধিক দুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে মানুষ ভয়ে কাঁদিতে পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর কালো ছায়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞান হারায় নাই শুধু নৌকার সাহসী যুবকেরা, আর কালো রং-এর উর্দি পরিহিত স্টীমলঞ্চের খালাসিরা। আমাদের কাপ্তান হুকুম দিতে দিতে কখনও ক্লান্ত হইয়া উঠিতেন, কিন্তু খালাসিরা বরাবর একাগ্রচিত্তে অক্লান্তভাবে অভ্রান্তরূপে নিজের নিজের কাজ করিয়া যাইতেছিল। কর্মযোগ কি ইহা হইতে ভিন্ন?

অবশেষে ভদড়ী বন্দর আসিল। আমরা স্টীমার দেখার পূর্বেই স্টীমার আমাদের লঞ্চটিকে দেখিতে পাইল। স্টীমার তাহার ভেঁপু বাজাইল—'ভোঁ……!' যেন ঈশ্বরই সকলের করুণ আর্তনাদ শুনিয়া 'মা ভৈঃ' রূপে আকাশবাণী পাঠাইলেন। আমাদের স্টীমলঞ্চ তীক্ষ্ণস্বরে তাহার সাড়া দিল। সকলের মনে আশার অঙ্কুর ফুটিল। চারদিকে জয়-জয়কার পড়িল।

এই সময়ে, যেন তাহার শেষ চেষ্টা বলিয়া ও আমাদের সকলের ভাগ্যের সম্মুখে হার মানিবার পূর্বে শেষ লড়াই লড়িবার জন্য, একটা বড় ঢেউ আমাদের লঞ্চের উপরে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতামহাশয় যেখানে বসিয়াছিলেন সেখানেই পিছনের দিকে পড়িয়া গেলেন। আমি কাতর হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম। এতক্ষণ আমি কাঁদি নাই। তাহার পূর্ণ প্রতিশোধ আমার যেন এক চিৎকারেই লইবার কথা ছিল। পরক্ষণেই পিতা উঠিয়া বসিলেন এবং আমাকে বুকে করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দত্তু, ভয় পাইও না। আমার কিছুই হয় নাই।'

আমরা স্টীমারের নিকটে পৌঁছিয়া গেলাম। কিন্তু একেবারে নিকটে যাওয়ার সাহস কাহার? শুল্কবিভাগের নৌকা তো আগেই আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কারণ লঞ্চ ও বড় নৌকার ঝাঁকি সে সহ্য করিতে পারিত না। আলাদা হইয়া থাকিলেই তাহার রক্ষা। স্টীমলঞ্চ দূর হইতে স্টীমারকে প্রদক্ষিণ করিয়া লইল। কিন্তু কোনও ক্রমে তাহার নিকটে যাইবার সুযোগ পাইল না। তরঙ্গের ধাক্কায় লঞ্চ ও স্টীমারে ঠোকাঠুকি হইলে শেষ মুহূর্তে আমরা সকলে গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যাইতাম। শেষে উপর হইতে রসি ফেলিয়া দেওয়া হইল, আমাদের খালাসিরা লঞ্চের ছাতে দাঁড়াইয়া লম্বা লম্বা লগি বাঁশ দিয়া স্টীমার ও লঞ্চের ঠোকাঠুকি বাঁচাইতে লাগিল। তরঙ্গ উহাকে স্টীমারের দিকে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু খালাসিরা তাহাদের লম্বা লম্বা বাঁশগুলি নৌকার ঢাল করিয়া সমস্ত চোটটা নিজেদের হাতে-পায়ের উপর গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহাতেও শেষে স্টীমারের সিঁড়ি আসিয়া স্টীম-লঞ্চের ছাতে লাগিল, কড়্ড়্ড শব্দ করিতে করিতে একটা লম্বা তক্তা ভাঙ্গিয়া সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িল।

আমি নিকটেই ছিলাম, স্টীমারে চড়িবার প্রথম পালা আমারই। চড়িবার কেন? বলের মত উৎক্ষিপ্ত হইবার। স্বয়ং কাপ্তান ও অন্য একজন খালাসি লঞ্চের ধারে দাঁড়াইয়া, এক একজনকে ধরিয়া স্টীমারের সিঁড়ির সব চেয়ে

নীচের ধাপে দাঁড়াইয়া যে সব খালাসিরা ছিল, তাহাদের হাতে ফেলিয়া দিতেছিল। ইহাতে বিশেষ সাবধানের কথা এই যে, লঞ্চ যখন ঢেউয়ের গর্তে নামিয়া যায় তখন লোকেরা লঞ্চের দিকে তাকাইয়া থাকে, আর পরমুহূর্তেই যখন লঞ্চ তরঙ্গের শিখরে আরোহণ করে আর সিঁড়ি একবারে নিকটে আসে, তখন চট্ করিয়া যাত্রীকে সঁপিয়া দেয়। দুই দিক হইতে খালাসি যদি মানুষটির হাত ধরিয়া রাখে তাহা হইলে পরমুহূর্তেই যখন লঞ্চ তরঙ্গের গর্তে নামে তখন তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়! আমি উপরের সিঁড়িতে চড়িয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছিলাম যে মা আসিতেছেন কি না। যখন একেবারে অজানা এক মুসলমানকে আমার মায়ের হাত ধরিতে দেখিলাম তখন আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন প্রাণ বাঁচাইবার সময়। সেখানে সুকোমল মনোভাব কোন কাজে লাগিবে? অল্পক্ষণ পরেই পিতাও আসিয়া পৌছিলেন। দেবমূর্তির 'সাঁওড়ী'তো আমার কাঁধেই ঝুলানো ছিল। উপরে ভাল জায়গা দেখিয়া পিতা আমাকে বসাইয়া দিলেন এবং জিনিসপত্র আনিতে গেলেন। আমি অবশ্যই শ্রদ্ধাবান ছিলাম। কিন্তু তখন সত্যই আমার পিতার উপর রাগ হইয়াছিল। চুলোয় যাক জিনিসপত্র! প্রাণ বিপন্ন করিয়া দুইবার যাইতে হইবে কেন? কিন্তু তিনি তো তিনবারই হইয়া আসিলেন। শেষের বার আসিয়া বলিলেন, 'গোকর্ণ মহাবলেশ্বরের প্রসাদী নারিকেল জলে পড়িয়া গেল।' সমস্বরে আমি ও মা দুজনে চিৎকার করিয়া উঠিলাম; মা বলিলেন, 'আরে আরে!' আর আমি বলিলাম, 'বাস, এই তো?'

লঞ্চের যাত্রীরা সব উঠিয়া গেলে নৌকার লোকদের পালা আসিল। তাহারা সকলে উঠিল। তারপর লঞ্চ ও নৌকা নিশাচর মূর্তির মত চিৎকার করিতে করিতে তদড়ীর তীরের দিকে চলিয়া গেল, আর তীরে ধ্যানরত যাত্রীদের অল্প অল্প করিয়া আনিতে লাগিল। ঝড় এখন কিছুটা কমিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু অন্ধকার রাত আর উচ্ছল তরঙ্গের মধ্যে ঐ লোকদের যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকিবে, তাহার বর্ণনা কে করিতে পারে?

স্টীমারে যাত্রীদের ঠাসাঠাসি ভিড়। যদি কেহ কথা বলিতেছিল, তাহাও সমুদ্রে নিজেদের জিনিসপত্র যাহা ডুবিয়া গিয়াছে তাহার কথাই শোনাইতেছিল। শেষে সব যাত্রীরাই আসিয়া পৌছিল। ভগবানের দয়ায় কাহারও প্রাণ যায় নাই।

অবশেষে স্টীমার ছাড়িল এবং এতক্ষণে লোকেরা নিজেদের পূর্ব পূর্ব ভ্রমণে এমনধারা ক্ষতির কথা স্মরণ করিয়া পরস্পরকে শোনাইয়া আজকার দুঃখ লাঘব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাহারও নিদ্রা আসিল না। আমি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। পরের দিন সকালে কখন কারোয়ারের বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, কখন বাড়িতে ফিরিয়াছিলাম, কিছুই আজ মনে পড়িতেছে না। কিন্তু সেদিনের ঝড়েই সেই ঘটনা এমনভাবে স্মৃতিপটে সজীব হইয়া আছে যে মনে হয় সে বুঝি কালকার কথা। সত্যই—

দুঃখং সত্যং সুখং মিথ্যা দুঃখং জন্তোঃ পরং ধনম্।

অক্টোবর, ১৯২৫

২৩

ভরতের দৃষ্টিতে

তীরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের শোভা দেখিতে দেখিতে হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। যদি কোনও উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া সে শোভা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে আর কথা কি? জাহাজের উপর হইতে অথবা দেবগড়ের মত দ্বীপের মাথা হইতে তীরের উপর সমুদ্রের যে আক্রমণ হইতে যাইতেছে তাহা দেখিলে মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দ জন্মে। মনে এমন ভাব হয় যে আমরা বুঝি সমুদ্রের রাজা, এবং তরঙ্গের এই সৈন্য আমারই। হৃদয়ে একপ্রকারের অভিমান স্ফুরিত হইতে থাকে। ভাল করিয়া দেখিলে মনে হয়—সমুদ্রের সবুজ বা কালো কালো জল যেন পাগল হইয়া সাদা বালুর তীরে জোরে লাফাইয়া পড়িতেছে, আর শেষ মুহূর্তে 'আরে, এতো বেজায় মজা' বলিয়া হাসিতেছে। তাহার এই মিথ্যা ভাষণে আমরাও খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেছি।

সমুদ্রতীরবাসীদের এরূপ দৃশ্য হয়তো বা কখনও চোখে পড়ে। কিন্তু সমুদ্র ও বালুকাতট যেখানে অখণ্ড জলক্রীড়া করে, সেইদিকে সমকোণে উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া বালুকার এই জলবিহার ও তরঙ্গের এই সিকতাবিহার

দেখিবার সৌভাগ্য যদি কখনও জোটে, তবে মানুষ কেন গাহিবে না—'অগু মে সফলা যাত্রা, ধন্যোঽহং অপ্ প্রসাদতঃ' ?

১৮৯৫ খ্রীঃ আমি যে গোকর্ণে যাত্রা করিয়াছিলাম আর গঙ্গাধর দেশপাণ্ডের সঙ্গে দশবৎসর পূর্বে যে গোকর্ণের দর্শনলাভ করিয়াছিলাম, সেই গোকর্ণের পবিত্র তটে সংগববেলায়* সমুদ্র দর্শন করিবার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। গোকর্ণের সমুদ্রতট খুব বিস্তৃত ও সুন্দর। ডান দিকে অর্থাৎ উত্তরে কারোয়ারে পাহাড় ও দ্বীপ কুয়াসাচ্ছন্ন দিগ্‌বলয়ে অস্পষ্ট দেখা যায়; বামে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে রামতীর্থের পাহাড় ও তাহার উপর অবস্থিত ভরতের ছোট্ট মন্দিরটি দেখা দেয়। আর সম্মুখে অগাধ অনন্ত সাগর 'অমর হইয়া এস' বলিতে বলিতে অহোরাত্র আমন্ত্রণ জানায়।

হৃদয় উন্মাদনকারী এই দৃশ্য একবার দেখিলে তাহা কি আর কখনও ভোলা যায়? রামতীর্থের পাহাড়ের উপর গিয়া সেখানকার ঝরণায় স্নান করিবার সংকল্প যদি না করিতাম, তাহা হইলে সমুদ্রের এই সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে সাঁতার দেওয়াই আমার ভাল লাগিত। নারিকেলবন ও ছোট ছোট শিলাখণ্ড পার হইয়া আমি রামতীর্থ পর্যন্ত পৌঁছিলাম। সেখানকার ঝরণার নীচে বসিয়া স্নানের যে সাত্ত্বিক জীবনানন্দ বা স্নানানন্দ তাহা আপাদমস্তকে গ্রহণ করিয়া রামেশ্বর দর্শন করিলাম। শাণ্ডিল্য মহারাজ নামে এক সাধু অসংখ্য লোককে উৎসাহ দিয়া বিনামূল্যে এখানকার মন্দির নির্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন। মন্দিরটি সমুদ্রে প্রবিষ্ট এক উন্নত পর্বতের উপর অধিষ্ঠিত। মন্দিরের উপর হইতে বালুকাপট ও ঢেউয়ের পর্বত পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া ক্রীড়া করিতেছে, যোজনব্যাপী এই সৌন্দর্য আমরা দেখিতে পারিলাম। দুই একটি নারিকেলবৃক্ষ এই স্থানে দাঁড়াইয়া সাগর ও সিকতার মিলন দৃশ্যে আনন্দ উপভোগ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। নিজেদের শাখা নাড়িয়া নাড়িয়া তাহারা আমাদিগকে বলিতে লাগিল: 'আসুন, আসুন! বাস্, এইতো চমৎকার জায়গা, এখান হইতে সিকতা-সাগরের মিলনরেখা সোজা চোখের সামনে দেখা দিবে।'

* গোদোহনের এবং গোশালা পরিষ্কার করিবার পর বনে চরিবার জন্য গোরুগুলি একত্র করা হয়; সেই সময়টিকে (সকালে প্রায় নয়টার পরে) 'সংগববেলা' বলা হয়। শব্দটি বেদের সমকালীন।

এখান হইতে দেখিতে পাইলাম, জলের তরঙ্গকে সমুদ্রের গভীর জল সাহায্য করিতেছে। কিন্তু বালুকার আবরণকে সাহায্য করিবে কে? নিকটে কোনও পাহাড় ছিল না, তাই নারিকেল ও শরের মত গাছ এই দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করিয়াছে। এই উচ্চ বৃক্ষ আর সাগরের গভীর জল—উভয়ের সবুজ বর্ণের মধ্যে তো বর্ণপ্রভেদ ছিল নিশ্চয়; কিন্তু কার্যত কোনও প্রভেদ ছিল বলিয়া মনে হইতেছিল না। গাছ তাহার পায়ের নীচের বালুকাকে আশীর্বাদ দিতেছিল আর সমুদ্রের গভীর জলরাশি ঢেউগুলিকে অগ্রসর হইতে উৎসাহ দিতেছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া কাহার সাধ মেটে, বলুন।

কোনও দৃশ্য দেখিয়াই মানুষের সাধ মেটে না, তাই এক জায়গায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই সৌন্দর্য-সুধা পান করাও লোকের ভাল লাগে না। আমি দেখিয়াছিলাম রামতীর্থের ঝরণা ও রামেশ্বর মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের কর্মপ্রতিনিধি ভরত যেন এই ছোট টিলার উপর দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকেও দর্শন করিতেই হইবে। আর সম্ভব হইলে উপযুক্ত উচ্চস্থানে উঠিয়া তাঁহার দৃষ্টি লইয়াই সমুদ্র দর্শনও করিতে হইবে। উচ্চস্থানে না উঠিলে বিশাল দৃষ্টি কি করিয়া আসিবে? সোপানগুলির নিমন্ত্রণে নাচিতে নাচিতে লাফাইতে লাফাইতে বা উড়িতে উড়িতে আমি ভরতের মন্দির পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলাম, মনে হইল যেন পাখা গজাইয়াছে। সেখানে ক্ষুদ্রকায় শুভ্রবর্ণ ভরতজী সুন্দর পীতাম্বর পরিধান করিয়া সমুদ্র দর্শন করিতেছেন।

আমার দৃষ্টিতে ভরতের মূর্তির আশেপাশে মন্দির গঠন করাই ঠিক হয় নাই। তাঁহাকে রৌদ্রে, বাতাসে ও বর্ষায় তপশ্চর্যাই করিতে দেওয়া ঠিক ছিল। সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবহমান শীতল পবনে সূর্যের তাপ তিনি অনায়াসে সহ্য করিয়া লইতেন। লোকে কি করিয়া বুঝিল যে ভরত ছিলেন সূর্যবংশীয় রাজপুত্র? পবননন্দন হনুমান ও সূর্যবংশীয় রাঘবকে স্মরণ করিতে করিতে আমি সেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হৃদয়ে ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাস, সম্মুখে সমুদ্রে জোয়ার।

সেদিন সেই সুন্দর ও পাবন দর্শনের জন্য রামতীর্থ ও দিক্‌পাল ভরত মহারাজের নিকট সর্বদা ঋণী থাকিব।

মে ১৯৪৭

২৪

বেলগঙ্গা—সীতার স্নানভূমি

বেরুলগ্রামের হরিৎকুণ্ড দেখিয়া ফিরিবার সময় পথে বেলগঙ্গায় ঝরণা দেখিয়াছিলাম। ঝরণা এতই ছোট ছিল যে, তাহাকে নালা বলিতেও পারা যাইত না। কিন্তু তাহা বেলগঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। নদীর নাম শুনিলে তাহার উৎপত্তি কোথায়, সে বিষয়ে খোঁজ না করিয়া কি থাকা যায়? কিন্তু আমরাও গুহাগুলির অদ্ভুত কারিগরিতে পাগল হইয়া ঘুরিতেছিলাম; তাই বেলগঙ্গা স্মরণ পর্যন্ত করিতে পারি নাই। কৈলাসের গুহায় অলৌকিক কারিগরি দেখিয়া আমরা জৈন তীর্থঙ্করদের ইন্দ্রসভার দিকে অগ্রসর হইতে-ছিলাম, এমন সময় শ্রীঅচ্যুত দেশপাণ্ডে বলিলেন, 'বেলগঙ্গার উৎপত্তি এখানেই।' নাম শুনিয়াই বেলগঙ্গা স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল।

ইন্দ্রসভা হইতে ফিরিবার সময় আমরা ২৯ সংখ্যক গুহায় গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। গুহা হইতে গুহায় ঘুরিতেছিলাম বলিয়া ভারি ক্লান্তি বোধ হইতেছিল। শরীরের সর্বাঙ্গে ব্যথা হইতেছিল। ঠিক সেই সময় বোম্বাইয়ের নিকটস্থ ঘারাপুরীর এলিফান্টা গুহার কথা মনে পড়িয়া গেল। ২৯ সংখ্যার গুহা সৌন্দর্যের চরম। ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের পা বেশি ক্লান্ত হইয়াছিল, না, দেখিয়া দেখিয়া আমাদের চোখ বেশি ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে এখন জলযোগের সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তি দূর করিয়াই অগ্রসর হইব, এমন সময় সীতার স্নানভূমির কথা মনে পড়িল।

সীতা অযোধ্যা হইতে বনস্থান পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়াই গিয়াছিলেন। সেখান হইতে রাবণ তাঁহাকে উঠাইয়া লঙ্কায় লইয়া গিয়াছিল। দুঃখাবেগে সীতা হয়তো দক্ষিণের স্থান দেখেনই নাই। কিন্তু রাবণকে বধ করিয়া রাম যখন তাহারই পুষ্পক বিমানে বসিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যা পর্যন্ত বায়ুপথে যাত্রা করিলেন, তখন নীচের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া জননী জানকীর কতই না আনন্দ হইয়া থাকিবে! রামায়ণে বাল্মীকি কত স্থানে সীতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি

অনুরাগের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখিয়া সীতার কত অলৌকিক আনন্দ হইত, তাহার বর্ণনা ভবভূতিও করিয়াছিলেন। সীতা যদি ভারতের নয়নমনোহর, সুন্দর ও পবিত্র স্থানগুলির বর্ণনা নিজে লিখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় মনে হইত যে তাহার পর সংস্কৃত ভাষায় কোনও কবিই সৃষ্টি-বর্ণনার এক পংক্তিও লিখিবার সাহস করিতেন না।

মা জানকী পাহাড় পর্বত দেখিয়া আনন্দিত হইতেন, নদীগুলি নিজের আনন্দাশ্রুতে ধৌত করিতেন, হস্তিশাবকগুলিকে আদর করিতেন, সারস-দম্পতীকে আশীর্বাদ করিতেন, সুগন্ধি কুসুমের সৌরভে উন্মত্ত হইতেন, সর্বত্র সমস্ত আনন্দ রামময় করিয়া লইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেন। লঙ্কায় রামবিরহে ক্লিষ্টা হইয়াও সীতা একটি নদীর সহিত একাত্ম না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। আজও লঙ্কায় 'সীতাবাকা' বর্ষাকালে তাহার দুই তীরের মধ্য দিয়া বাহির হয়, আর যেসব ভূভাগ প্লাবিত করে তাহাদের সকলকে সুবর্ণময় করিয়া দেয়। সীতার জন্মইতো ধরিত্রী হইতে হইয়াছিল। ভারত-ভূমির ভক্তি রূপে আজও তিনি আমাদিগকে দর্শন দেন।

গোদাবরীর বিশাল প্রদেশে বিচরণ করিয়া সীতা ক্লান্তি অনুভব করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণকে বনফল আনিবার জন্য তিনিই হয়তো পাঠাইয়াছেন। রাম তো ধনুক লইয়া পাহারা দিতেই থাকিবেন। ততক্ষণ এই চন্দ্রাকার পাহাড়ের নীচে বেলগাঁয়ের আতিথ্য স্বীকার করিয়া সীতা একটু-আধটু জলবিহার করিয়া লইবেন না কেন?

* * *

প্রথমে তো আমাদের চেষ্টা ছিল কোনও অনুকূল স্থান হইতে বেলগাঁয়ের সুন্দর প্রপাত শুধু দর্শনই করিয়া যাই। এজন্য ২৯ সংখ্যক গুহায়, তাহার বামদিকে এবং আমাদের দক্ষিণ দিকে, যে গবাক্ষ দেখা যাইতেছিল আমরা সেখানে গেলাম। মনের মধ্যে একটা ফাঁকি ছিল অবশ্য, যে যদি নীচে নামিতে পারা যায়, তবে সেখানকার আনন্দ লুটিতে ভুল করিব না।

গবাক্ষ হইতে দেখিলাম, ক্ষীণতনু এক প্রপাত বায়ুর সঙ্গে খেলিতে খেলিতে নীচের দিকে নামিতেছে, আর আঙুল নাড়িয়া নাড়িয়া আমাদিগকে নীরবে নিমন্ত্রণ করিতেছে। ভাবিতে লাগিলাম, নীচে নামিতে পারা যাইবে কি না? আমার এই স্বচ্ছন্দ ব্যবহার সঙ্গীদের ভাল লাগিবে কি না? আমি এতখানি

ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি দেখিয়া ঘাটে যেসব ছোট ছোট পাখি দৌড়ধাপ করিতেছিল তাহারা তিরস্কারের ভাবে হাসিল,'দেখ তো লোকটা কত বেরসিক! প্রপাত কত প্রেমে ও সমাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছে, আর এ লোকটা চিন্তায় ডুবিয়া আছে। এই সব লোকের মধ্যে কেহ কেহ কাব্য লিখিতে পারে বটে, কিন্তু কাব্যের অনুভবী লোক কচিৎ দেখা যায়। আর এই লোকটি তো নিজেকে প্রচার করে প্রকৃতির বালক বলিয়া। বড বড় চোখ করিয়া জল-প্রপাতের দিকে তাকাইয়া আছে! নীচেকার স্ফটিকের মত নির্মল জল দেখিয়া ইহার হৃদয়ও অধীর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু লোকটা সংকল্প কাজে পরিণত করিতে পারিতেছে না। তাহার পা উঠিতেছে না। তাহাকে তো কেহ শাপ দেয় নাই যে তুই পাথর হইয়া দাঁড়াইয়া থাক। তবু লোকটা পাথর হইতেও নিশ্চল।'

পাখিদের এই কঠোর তিরস্কার শুনিয়া আমার লজ্জা হইল, জ্ঞান হইলে অমনি সোপান বাহিয়া নামিতে লাগিলাম। ভাবিতেছিলাম ডানদিকের ছোট গর্তটা লাফাইয়া অন্য পার হইতে প্রপাতের নিকট যাইব, না বাঁ দিকে পাহাড়ের পিছন দিয়া ২৮ সংখ্যক ছোট গুহা পর্যন্ত পৌছিয়া সেখান হইতে প্রপাতের জলকণায় আনন্দ গ্রহণ করিব? ডাইনের রাস্তা ছিল দীর্ঘ ও সুরক্ষিত, বাঁ দিকের রাস্তায় ছিল কাব্য। স্নানের আয়োজন করিয়াই আমি আসিয়াছিলাম, সুতরাং ভিজিবার প্রশ্নই ছিল না।

২৮ সংখ্যক সেই ছোটমত গুহায় দুই একটি মূর্তি আছে; কিন্তু সে গুহার ভিতরে বিশেষ কোনও কাব্য নাই। কাব্য তো আছে বাহিরে ছড়াইয়া। এই গুহায় বসিয়া যদি কেহ বাহিরের দিকে তাকায় তবে জলের পাতলা আবরণের মধ্য হইতে দৃষ্টির সম্মুখে বিস্তৃত জলরাশির দেখা পাইবে। প্রপাত সেখানে ঝরিতেছিল বটে, কিন্তু এত ঘন হইয়া নয় যে প্রপাতের ধারায় অন্য-পারে কিছু দেখাই যায় না। এই গুহা জলের পরদার পিছনে ঢাকা থাকিলেও মোটেই জল আসিতেছিল না, কারণ ক্রীড়াশীল পবনও জলকণাগুলি গুহার ভিতরে লইয়া যাইতে সক্ষম হয় নাই। গুহা হইতে কিছু বাহিরে যদি আসেন, তবে এ অভিযোগ যেন না করেন যে পবনদেব আপনাকে কেন ভিজাইয়া দিল।

এই গুহা হইতে আমরা নীচে নামিলাম। বলা বাহুল্য যে পাহাড়ের

চতুষ্পদ জন্তুর মত হইয়াই নামিতে হইল। যে পাথরের উপর প্রপাত পড়িতে-ছিল সেখানে নিজের আসন করিয়া লইলাম। এক শ' ফুট উঁচু হইতে যেখানে জল পড়িতেছে, সেখানে শুধু ভিজিয়া সন্তোষ হয় না। প্রথমে মাথায় চাপড় মারিতে শুরু করিল, পরে কাঁধে চড় মারিল, তাহার পর পিঠে রপ্ রপ্ রপ্ রপ্ শব্দে চড়্ বৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহাতে পথের সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া গেল। আমি সর্বদাই প্রথমে অঙ্গ মার্জন করিয়া পরে স্নান করি। এখানে তো অঙ্গ মার্জনই স্নান, আর স্নানই অঙ্গ মার্জন। সীতা মা এখানে তাঁহার চুল খুলিয়া জলে ধুইয়া লইয়া ছিলেন।

কিন্তু এ কী! আমি কি ভবঘুরে যাত্রী, না দুনিয়ার বাদশা? আমার জোড়াসনের নীচে এই রত্নখচিত আসন কোথা হইতে আসিল? না, রত্নকণা নয়, চারদিকের জলকণা ছড়াইয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে যেন মোতির মালা! আর সামনে নীচে নীচে দুইটি সুন্দর ইন্দ্রধনু ;—আমাকে সম্রাটের প্রতিষ্ঠা দান করিতেছে! আজ এই মুহূর্তে যক্ষপুরীর কুবের হইতে আমার ঐশ্বর্য কোন্ বিষয়ে কম? রামধনুর বর্ণ যে আসনের ধারে ধারে, রূপার ছাপ যে আসনের মধ্যে, তাহাতে বসিয়া আছি, আর মোতির মালার উত্তরীয় পরিধান করিয়া এখানে আনন্দ করিতেছি। মাথায় সূর্যনারায়ণের জ্যোর্তিময় ছত্র, আর চারিদিকে উড্ডীন দ্বিজগণ জগন্নাথের স্তোত্র গাহিতেছে।

শরীর ধৌত করিবার জন্য নহে, ব্যায়ামের আনন্দ ভোগ করিবার জন্য, পাথরের উপর চড়িয়া প্রপাতের নীচে সমস্ত দেহ মার্জন করিলাম। স্নান-পানের প্রচুর আনন্দ লাভ করিলাম, রামরক্ষা স্তোত্র স্মরণ করিলাম। সীতা মা যে স্থান পছন্দ করিয়াছিলেন, সেখানে রামরক্ষা স্তোত্রগানের স্ফুরণ হওয়া তো স্বাভাবিক ছিল। আর মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহ মার্জনা করিয়া পরিষ্কার করিবার সময় 'শিরো মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্মজঃ' ইত্যাদি শ্লোক স্মরণ করিবার অভ্যাস বড়ই স্বাভাবিক ছিল।

স্বর্গে গিয়াও মানুষ যখন মৃত্যুলোক হইতে ফিরিয়া আসে, তখন এ প্রপাতে স্নানের নেশা বা উন্মাদনা সত্ত্বেও তাহা হইতে ফিরিয়া পুনরায় গন্তময় জীবনে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন বুঝিতে পারিলাম, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? এইজন্য শেষে এত সব আনন্দ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিবার যে সংযমশক্তি তাহার জন্য গর্ব অনুভব করিতে করিতে আমি ফিরিয়া আসিলাম। নূতন বস্ত্র পরিয়া জলযোগের

জন্য প্রস্তুত হইলাম। জলযোগ আর কি, উহা তো কলা-নিরীক্ষণের জন্য দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তপস্যা, আর প্রপাতস্নানশান্তির পর অমৃতভোজন ও বেলগাঁয়ের কৃপা-প্রসাদ। গুহাদ্বারে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান দ্বারপালদের যদি চোখ থাকিত, তবে নিশ্চয় তাহারা আমাদের দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইত।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

২৫

কৃষক নদী ঘটপ্রভা

ঘটপ্রভা ও মলপ্রভা আমাদের কর্ণাটক অঞ্চলের দুইটি প্রধান নদী। উহারা স্বভাবে কৃষক নারী; যেখানে যায়, চাষ করে, জমিকে স্বাদু করে, জল দেয়, পরিশ্রমী লোকদের সমৃদ্ধি দেয়। তাহার উপর গোককের নিকটে এক বড় বাঁধ দিয়া লোকে এই নদীর শক্তি বাড়াইয়া দিয়াছে। ফলে যেখানে নদীর জল পৌঁছাইত না সেখানেও আজ এই বাঁধের জন্য জল পৌঁছায়। ঘটপ্রভার নাম করিতেই গোককের নিকটবর্তী লম্বা বাঁধ অবশ্য মনে পড়িবে। বড় বড় নদী যেখান সেখান হইতে পঙ্ক টানিয়া লইয়া চলিয়া যায়, আর এই সব ছোট নদী সম্ভব হইলে সেখান থেকে অল্প অল্প করিয়া মহামূল্য পঙ্ক নিজের জলের সঙ্গে কৃষককে বিনামূল্যে দিয়া সন্তানদের পালন করে। সত্যই ঘটপ্রভা কৃষক জাতির নদী। বোসগাঁও হইতে এত নিকটে হইলেও গোককের নিকটে ঘটপ্রভার প্রপাত দেখা এখনও বাকি আছে।

২৬

কাশ্মীরের দুধগঙ্গা

আচ্ছা, শ্রীনগরে জলের অভাব কি করিয়া হয় ?

সতীসর নামে পৌরাণিক সরোবর ভাঙ্গিয়াই তো কাশ্মীর প্রদেশ নির্মাণ করা হইয়াছে। ঝিলম নদী যেন এই উপত্যকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপিতে মাপিতে সর্পাকারে বহিয়া যাইতেছে। এ ছাড়া যেদিকে চাই পদ্ম, কচুরিপানা ও নানা জাতীয় শাক সব্‌জি উৎপন্ন করিবার 'দল' (সরোবর) ছড়াইয়া আছে। যেবার জলপ্লাবন না হয় সে বৎসর সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই প্রদেশে গাড়ির সংকীর্ণ রাস্তার মত ছোট প্রবাহের কথা কে জিজ্ঞাসা করে ?

তবু এমনি এক প্রবাহ কাশ্মীরেও সম্মান পাইয়াছে।

ইহাতে জল হয়তো বেশি নাই, কিন্তু ইহা অখণ্ডরূপে বহিয়া যাইতেছে। কমও হয় না, বেশিও হয় না। ইহার জলের রং শাদা, তাই হয়তো ইহার নাম দুধগঙ্গা রাখা হইয়া থাকিবে। যে নারায়ণাশ্রমে আমি থাকিতাম, তাহার নিকট দিয়াই দুধগঙ্গা বহিয়া যাইত। এক খণ্ড লম্বা কাঠ ফেলিয়া উহার উপর পুল তৈরী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্নানের পক্ষে দুধগঙ্গা বড অনুকূল। উহাতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্নান করাও চলিত, আর দরকার হইলে কিছুটা সাঁতার দেওয়াও চলিত। পিসীমা অসুস্থ ছিলেন, তখন বাসনমাজা, কাপড়-কাচা কি অন্য কাজে দুধগঙ্গা আমাকে বড়ই সাহায্য করিয়াছিল। সেই অপরিচিত প্রদেশে যখন আমরা দুজনেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন যদি দুধগঙ্গার সাহায্য না পাইতাম তাহা হইলে আমাদের কি দশা হইত ?

কৃতজ্ঞতার জন্য দুধগঙ্গার মাহাত্ম্য খুজিবার ইচ্ছা হইল। সাধারণ পুস্তকালয়ে গিয়া আমি অনেক পুস্তক খুজিয়া বাহির করিলাম। ইহা জানিয়া আশ্চর্য লাগিল যে এত ছোট দুধগঙ্গা অনেক দূর হইতে আসে, অনেক দূর পর্যন্ত যায়। কোন ঋষি দুধগঙ্গার জনক, কে কে তাহার তীরে তপস্যা করিয়াছিলেন, ইত্যাদি তথ্য আমি খুজিয়া খুজিয়া সংগ্রহ করিলাম।

ইতিহাসের অনন্ত ঘটনাবলীর মত এই জ্ঞানও বিস্মৃতির প্রবাহে আবার ভাসিয়া গেল, অবশিষ্ট থাকিল শুধু অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

এইটুকু মনে আছে যে রোজ সকালে মঠের সাধুরা স্নান করিতে নদীতে একত্র হইতেন। আর রাত্রে যখন সকলে শুইয়া পড়িতেন তখন আমি দুধগঙ্গার তীরে বসিয়া আকাশের ধ্রুবতারার ধ্যান করিতাম। আমার ধ্যানও বেশি দূর অগ্রসর হইত না। কারণ কাশ্মীরে ধ্রুব এতখানি উঁচুতে ছিল যে তাহার দিকে তাকাইতে গেলে ঘাড ব্যথা করিত। সেখানে সপ্তর্ষির মধ্য হইতে অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠকে ঠিক মাথার উপরে বিরাজমান দেখিয়া কত আশ্চর্য লাগিত।

কাশ্মীরতলবাহিনী সতীকন্যা দুধগঙ্গাকে আমার প্রণতি জানাই।

১৯২৬-২৭

২৭

সুরধুনী বিতস্তা

'সংসারে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে,
তবে তা এখানেই, এখানেই, এখানেই।'

সম্রাট জাহাঙ্গীর ঝিলম নদীর উৎপত্তিস্থান দেখিয়া উপরোক্ত কথা কয়টি বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই কথাগুলি সেখানকার অষ্টকোণী পুষ্করিণীর নিকটে পাথরে খুদিয়া রাখা হইয়াছে। সত্য সত্যই এই স্থান ভূস্বর্গ নামের উপযুক্তই বটে। বৈদিক যুগে ইহার নাম ছিল বিতস্তা।

যেখানে অঙ্গে অঙ্গে রোমে রোমে প্রাণসঞ্চারকারী শীতল মধুর পবন সঞ্চরমান, যেখানে বনশ্রী তাহার যৌবনের মত্ততা সম্পূর্ণ প্রকটিত করে, যেখানকার পাহাড তাহার নিজের সৌন্দর্য দিয়া মনে সন্দেহ জাগাইয়া দেয় যে উহা সত্যই পাহাড় না রঙ্গভূমির যবনিকা, যেখানকার শান্তি একেবারে চৈতন্যে পরিপূর্ণ—সেখান হইতে ঝিলমের উৎপত্তি। জাহাঙ্গীর এই উৎপত্তিস্থানের উপর এক অষ্টকোণ, পুষ্করিণী নির্মাণ করাইয়াছেন। আর ভিতরের জল? সে

তো নীলমণির অমৃতরস। দেখিলেই মনে হয় যে, এখানে বুঝি নীলরঙে রঙ্গানো কাপড় কেহ ধুইয়াছে। কিন্তু এমন স্বচ্ছ ও মিষ্ট জল আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

এই পুষ্করিণীর এক দিক দিয়া যে সুন্দর সরলগতি জলপ্রণালী বহিয়া যাইতেছে, তাহাই আমাদের বিতস্তা-ঝিলম। এই স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই যেন গন্ধর্বেরা মৎস্যের আকার ধারণ করিয়া এই পুষ্করিণী ও নালায় স্নান করিতে নামিয়াছে, এমনই তাহার শোভা। এই প্রদেশে যদি মাছধরার কঠোর নিষেধ না থাকিত, তবে এই সৌন্দর্যের কি দশা হইত? আমি এক বড় রকমের পাত্র নালায় ডুবাইয়া দিয়াছিলাম, উহাতে নালার পাঁচ সাতটি মাছ আসিয়া ঢুকিয়াছিল—উহারা এতই ভোলা। আমি তাহাদের আবার নালাতেই ছাড়িয়া দিলাম।

এই স্থানের নাম বেরী নাগ। ইহার সম্মুখে খনবল নামে একটি স্থান। এখান থেকে ঝিলম নদী নৌকা চলিবার মত বড় হইয়া উঠিয়াছে। খনবলের নিকটেই অনন্ত নাগ নামে এক সুন্দর পুষ্করিণী আছে। আর একটু অগ্রসর হইলে সমস্ত জমি সমতল। কাশ্মীরের সমস্ত ঘাটি এইরূপে চারদিকে সমতল।

ঝিলমের সোজা চলা অভ্যাস নাই। বারবার মোড় ফিরিতে ফিরিতে সে মন্দমন্দ গতিতে অগ্রসর হইতেছে। তাহার তীরে এক বড় বৈভবশালী সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছিল, অস্তও হইয়াছে। কিন্তু আজও বিতস্তা পূর্বের মতই বহিয়া চলিয়াছে।

খনবল ছাড়াইয়া বীজব্যারা নামে এক স্থান। সেখানে চিনারের একটা গাছ আমরা বিশেষ করিয়া দেখিলাম। নয়জন লোকে হাত বাড়াইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বেড় মাপিল। উহার বেড় হইল ঠিক চুয়ান্ন ফুট।

বীজব্যারার মন্দির সম্বন্ধে আমরা একটা কৌতুকাবহ জনশ্রুতি শুনিলাম। ইংরেজ লেখকেরাও ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ধর্মান্ধ মুসলমানেরা যখন এই মন্দির ভাঙ্গিতে আসিল, তখন এখানকার পুরোহিতেরা তাহাদের কোনও বিরোধিতা করিল না। ধনরত্ন দিয়া মন্দির বাঁচাইবার কথাও কিছু বলিল না। তাহারা বলিল, 'আসুন, আসুন আপনারা, মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলুন। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, যবনেরা আসিবে ও মূর্তি নষ্ট করিয়া মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আমাদের শাস্ত্রে যাহা

আছে তাহা মিথ্যা হইবার নহে।' বুৎশিকন (মূর্তিধ্বংসক) গাজীর মনে হইল, 'ইহাদের মন্দির যদি ভাঙ্গি তবে এই সব কাফেরের শাস্ত্র যে সত্য তাহা প্রমাণ হইবে। তার চেয়ে ভাল হইবে যদি এই একটা মন্দির ছাড়িয়া দিই।' এই কাহিনী কতদূর সত্য তাহা জানি না। কিন্তু এই কাহিনী আমাদের দেশে তৈরী চালাকির কাহিনীর মত বটে। একথাও সত্য যে মুসলমানদের অধিকার বা আক্রমণ যতদিন ছিল ততদিন বীজব্যারার মন্দির ভাঙ্গে নাই।

এখান হইতে কিছু দূরে অনন্তপুর নামে এক প্রাচীন শহর মাটির নীচে চাপা পড়িয়া ছোট পাহাড় হইয়া গিয়াছে। জমি চাষ করিতে করিতে পুরানো সুন্দর কারিগরি, অনেক প্রাচীন ঘরবাড়ি আর কয়লায় পরিণত চাউল এখানে পাওয়া যায়, ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি।

নদী এদিক ওদিক ঘুরিতে ফিরিতে এত ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে যে, জলের গতি বোঝাই যায় না। নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে যাইতে হইলে দাঁড় না চালাইয়া ডোঙ্গার গলুইতে খুব লম্বা দড়ি বাঁধিয়া দুই একজন লোক তীর হইতে টানিয়া নিয়া চলে। ডোঙ্গা স্রোতের মধ্যে চলে, তীরে যাহাতে না আটকাইয়া যায়, সেজন্য মাঝি নৌকায় বসিয়া হালটা বাঁকা করিয়া ধরিয়া রাখে।

কাশ্মীরি শালের কোণে আমের বা কাজুর মত দেখিতে যে নক্সা হয়, তাহা হইল এখানকার কারিগরদের বৈশিষ্ট্য। লোকে বলে যে ঝিলমের মোড় দেখিয়া এখানকার কারিগরেরা কল্কার আভাষ পায়। একবার আমরা নদীতে এক বন্দর হইতে চৌদ্দ মাইল যাই। ততক্ষণে পরের বন্দরটি হইতে একটু দেরিতে যাত্রা করিয়া লোকে পায়ে হাঁটিয়া আমাদের ধরিয়া ফেলিল। তাহাদের কেবল আড়াই মাইলই হাঁটিতে হইয়াছিল। এ নদী এতবার মোড় ফিরিয়া বহিতেছে।

এইসব মোড ফিরিবার জন্য স্রোতের জোর কমিয়া যায় এবং নদীর পাড ধ্বসিয়া যায় না। বন্যা আসিলে তখনও শুধু 'সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে'-মত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এখানকার প্রাচীন ইঞ্জিনীয়র রাজারা বন্যার সময় নদীকে বশে রাখার জন্য এমন অনেক মোড় ও নালা খুঁড়িয়া রাখিয়াছেন।

এই প্রতিকার এত ফলদায়ী যে, আজও তাহার অনুকরণ করিতে হয়।

একটা বড় ডোঙ্গা হইতে শূকরের দন্তের মত এক বিরাট লাঙ্গল নদীতলের জমি বিদীর্ণ করিতে করিতে যায়, এবং ভিতরের আবর্জনা বিজলীর পাম্প দ্বারা বাহিরে ফেলিতে ফেলিতে অগ্রসর হয়। এই সমগ্র প্রচেষ্টা 'বরাহমূলম্' (আজকালকার 'বারামূল্যা') ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

বারামূল্যা কাশ্মীরের ঘাটীর ওপারের মাথায়। সেখান হইতে ঝিলম্ জোরে ছুটিতেছে।

এই সমস্ত প্রদেশের মাঝামাঝি কাশ্মীরের রাজধানী। শ্রীনগর শহর নদীর দুই ধারে অবস্থিত। নদীর উপর অল্প অল্প ব্যবধানে সাতটা পুল ('কদল') নির্মাণ করা হইয়াছে। এ ছাড়া, দুই দিক হইতে নদীর ভিতর পর্যন্ত নদীর মধ্যে নালা খনন করা হইয়াছে বলিয়া অনায়াসে শান্তভাবে প্রবহমান জলপথ পাওয়া যায়। নদীর মূল স্রোতই হইল রাজপথ। অন্য সব নালা হইল গৌণ পথ, এই রাজপথে আসিয়া মিশিয়াছে। অন্যান্য রাস্তার উপরে যেমন গাড়ির দৌড়াদৌড়ি, এখানে তেমনি লম্বা ও সরু 'শীকার' নৌকা তীরের মত ছোটে। নদীতে ডিঙ্গিগুলির যতই ধূমধাম হউক, তাহা নীরবেই হয়।

দ্বিপ্রহরে যখন মহারাজার মন্দিরের পূজা শেষ হইয়া যায়, আর পূর্বদিনের নির্মাল্যফুল নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তখন সে ফুল প্রায় ধীরগতিতে আধ মাইল পর্যন্ত লম্বা একটি হারের মত ভাসিতে থাকে, তাহা বড় সুন্দর দেখায়।

আর এই নদীর তীরে তীরে কত বিচিত্র প্রকারের কর্মচেষ্টাই না চলিয়াছে। কোথাও শতরঞ্চি বোনা হইতেছে, কোথাও অতুলনীয় গালিচা। এক জায়গায় আখরোটের কাঠের উপর সুন্দর হাতের কাজ করা হইতেছে, অন্যত্র রেশমের কারখানায় শ্রীহীন পোকাগুলি জাল দিয়া সুন্দর মসৃণ রেশম তৈরী হইতেছে। চীন, তিব্বত, সমরখন্দ ও বোখারার সদাগরেরা এখানে কত মাস আড্ডা করিয়া পড়িয়া থাকে, আর চতুর পাঞ্জাবী তাহাদের নিকট সুদে টাকা লাগাইতে ব্যস্ত। যে দিকে তাকাও, হাতের চেয়ে বেশি লম্বা ঝুলওয়ালা কোট পরিয়া লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পাইবে।

আর একটু অগ্রসর হইলে এই ঝিলমকে দেখিব, সবচেয়ে বড় হ্রদ বুলারে গিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে বিলীন হইয়াও গুপ্তভাবে দীর্ঘ পথ বাহিয়া অন্য তীর হইতে আবার বাহির হইয়াছে এবং বারামূলার অভিমুখে চলিয়াছে।

সেখানে ঐ নদী হইতে এক কৃত্রিম পুষ্করিণী তৈরী করিয়া যে বিজলী উৎপন্ন হয়, তাহাই কাশ্মীর রাজ্যকে পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক শক্তি দেয়। এবটাবাদের নিকট এই নদী দিক পরিবর্তন করে, আর ছুটিতে ছুটিতে অগ্রসর হয়। ঝিলমের সমস্ত তটদেশ তাহার সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

লোকে বলে, আকবর বাদশাহ এই ঘাটগুলির সৌন্দর্যে মত্ত হইয়া উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা কবিকল্পনা হইতে পারে, কিন্তু ঘাটগুলি দেখিলে ঐ ধরণের উন্মাদনা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এরূপ কিংবদন্তী কোনও রাজার গৌরব বর্ণনা করা অপেক্ষা নদীর মনোহর সৌন্দর্য প্রশংসা করিবার জন্য অর্থবাদরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস যখন লেখা হইবে, তখন তাহাতে বড় বড় নদী অনুসারে দেশকে পৃথক পৃথক ভাবে ভাগ করা হইবে। এরূপ ইতিহাসে ঝিলমের দিব্য সংস্কৃতির বিভাগ গতানুগতিক হইবে না। সত্য সত্যই ঝিলমের সুরধুনী নামই শোভা পায়।

১৯২৬-২৭

২৮

সেবাব্রতা রাবী

সিন্ধুনদের কর যোগান পাঁচটি নদী; তাহাদের মধ্যে বিতস্তা বা ঝিলম্ ও শতদ্রুর নামই গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়। অন্য নদীগুলি নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ নম্রতার সহিত নিষ্পন্ন করে। যেমন কোনও পুরুষশ্রেষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য শিষ্টসজ্জনেরা অগ্রসর হন, সেইভাবেই এই সব নদী ধীরে ধীরে একত্র হইয়া পরিণামে সিন্ধুতে গিয়া মিলিত হয়। ব্যাস গিয়া মেশে শতদ্রুর সঙ্গে, চিনাব গিয়া মেশে ঝিলমের সঙ্গে, রাবী মেশে গিয়া এই দুইটির সঙ্গে। মুলতানের নিকটে তিনটি নদীর জলভার আনিতে আনিতে ঝিলম হিন্দুস্থানের ওপার হইতে আগন্তুক শতদ্রুর সহিত মেশে। সর্বশেষে পঞ্চনদ নামে এই সকলের জলধারা সিন্ধুতে মিশিয়া কৃতার্থ হয়। সিন্ধুকে আদর-

আপ্যায়ণ সম্ভাষণ করিবার জন্য যে সজ্জনবর্গ অগ্রসর হইয়াছেন তাহার অধ্যক্ষের স্থান তো শতদ্রুই পাইতে পারে, কারণ সেও সিন্ধুর মত 'পরলোক' হইতেই—হিমালয়ের ওপার হইতেই—আসে।

এই পাঁচটি নদীর মধ্যমে স্থান হইল ইরাবতী বা রাবীর। বেদে 'ইরা'র অর্থ হইল জল, যাহা পান করিলে আনন্দ হয়। এমনিতে তো নদীতেই জল থাকে। এই নদীর বিশেষ গুণ দেখিয়া ঋষিরা উহাকে ইরাবতী নাম দিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মদেশের ঐরাবতীর (ইরাবান্ সমুদ্র) সমুদ্রের মত বিস্তার দেখিয়া নামকরণ হইয়াছিল? রাবী অতটা প্রশস্ত নয়।

স্বামী রামতীর্থের জীবনে রাবীর উল্লেখ বহুবার করা হইয়াছে। রাবীকে দেখিয়া স্বামী রামতীর্থের চোখ প্রেমাশ্রুতে ভরিয়া আসিত। বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের সংকল্প তিনি এই নদীর তীরেই দৃঢ় করিলেন। কিন্তু রাবীকে তো শিখগুরু অর্জুনদেব ও শিখমহারাজ রণজিৎ সিংহের জন্যই অশ্রু বিসর্জন করিতে দেখা গিয়াছে।

আমি যখন লাহোরে গিয়াছিলাম তখন ইরাবতীর পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তখন সে কত শান্ত ছিল! তাহার বিশাল পটে সমস্ত লাহোর প্রতিবিম্বিত হইত। লোকের ধূমধাম ও ধনীদের অর্থের আড়ম্বর ও বিলাসের সামনে রাবীর শান্তরূপ বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিত। রাবীকে দেখিয়া মনে হইত, সে বুঝি সমস্ত লাহোরকে কোলে করিয়া খেলা দিতেছে।

নিজে পবিত্র ও পুষ্টিকর জল দেওয়া ছাড়া রাবী তাহার সন্তান শিশুদের বিশেষভাবে সেবা করে। হিমালয়ের গহন অরণ্য মধ্যে চীড, দেবদারু, বাঁঝ, সফেদা প্রভৃতি আর্য বৃক্ষদের ঘন নগর বসিয়া আছে। কোথাও কোথাও দুপ্রহরের সময়েও সূর্যের আলো ধরণীতে পৌছাইতে খুবই অসুবিধা হয়। আর বয়োবৃদ্ধ বৃক্ষগুলির এক-আধটি পিতামহ যখন উন্মূলিত হইয়া পড়িয়া যায়, তখনও তাহার মাটি পর্যন্ত পৌছানো প্রায় অসম্ভব হয়। আশপাশের বৃক্ষগুলি তাহাদের বলিষ্ঠ ভুজে অন্তরীক্ষেই তাহাকে ধরিয়া ফেলে। মনে হয়, ভীষ্মদেব বুঝি শরশয্যায় শুইয়া আছেন। বৎসরের পর বৎসর এইভাবে মধ্যপথে থাকিয়াই শীত রৌদ্র বর্ষা সহ্য করিয়া অন্তকালে এই ভীষ্মাচার্যের বিশাল শরীর ছিন্ন-ভিন্ন ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া লুপ্ত হয়।

এইরূপ জঙ্গল হইতে বাড়িঘরের জন্য কাঠ কাটিয়া লইয়া আসা সহজ নয়।

এ কাজের জন্য লোকে রাবীর আশ্রয় লয়। রাবীর তীরে যেখানে বড় বড় জঙ্গল আছে সেখানে কাঠুরিয়ারা যায়, আর কাঠের বড় বড় গাঁঠ কাটিয়া রাবীর স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। বাস, 'হো' 'হো' চীৎকার করিতে করিতে তাহারা চলিতে আরম্ভ করে। কোথাও কোথাও পাঠশালায় যাওয়ার পথে অলস ছেলেরা যেমন করে তেমনই ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া চলে। কোথাও কোথাও সন্ধ্যাবেলায় গৃহাভিমুখে ধাবমান ষণ্ডদের মত তাহারা নাচিতে নাচিতে লাফাইতে লাফাইতে উঠিতে পড়িতে পরস্পরকে ঠোকর মারিতে মারিতে ছুটিয়া চলে।

জীবন্ত পশুদেরও ডাকিতে গেলে রাখালের প্রয়োজন হয়, নির্জীব কাঠের ঘোষণা এইভাবে কেহ কোনও প্রকারে দেখাশুনা না করিয়াও গন্তব্য স্থানে পৌঁছায় কি করিয়া? কোথাও নদী বাঁক ফিরিলে সকলে থামিয়া যায়। একজন থামিল তো অন্য জনও থামিল। দেখাদেখি তৃতীয়টিও থামিল। 'আর আগে যাইবার পথ নাই' বলিয়া চতুর্থটি থামিল। 'এরা কি দেখিয়া থামিল, একবার দেখি তো গিয়া!'—বলিয়া পঞ্চমটি থামিল। রাতটা কাটানোর জন্য এখানে ছাউনি হইবে, একথা সত্য সত্য মনে করিয়া সপ্তম, অষ্টম ও নবম থামিল। পরে যাহারা আসিল তাহারা মনে করিতে লাগিল, এই তো আমাদের বাসা, আর যাইতে হইবে না, যাত্রা শেষ হইল। যেখানে সকলে আসিয়া থামিল, 'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।'

ভোর হইতেই এই সকল কাঠের গাঁটের চালকেরা আসে, সকলকে ডাকিয়া হাঁকিয়া লইয়া চলে। 'আরে ভাই, চল চল' বলিতে বলিতে যাত্রীদল পুনরায় যাত্রা শুরু করে। নদীর প্রবাহ ভাল থাকিলে এ যাত্রা ঠিকই চলে, কিন্তু যেখানে নদীর স্রোত বেশি, নদীতে পাথর বেশি বা নদী অগভীর, সেখানে বড় বিপদ। এক-আধটা লম্বা বোঝা দুইটা বড় পাথরের আশ্রয় পাইলে সেখানেই থামিয়া গিয়া বলিত, 'আমি আর এখান হইতে হটিতেছি না। অন্যকেও এখান হইতে যাইতে দিব না।' এইরূপ ঐসব গাঁঠের যাইবার জন্য হয়তো পাঁচ সাতটি সুয়েজ খাল আছে। তাহারা আটকাইয়া গেলে মনে করুন সমস্ত যাত্রীদলই আটকাইয়া গেল। চালকেরা এই সব জায়গায় সাঁতরাইয়া যাইবার সাহসও করিবে না; কারণ তাহাদের নিকট এই সব গাঁঠের চেয়ে নিজের মাথাটাই বেশি আদরের। তীরে দাঁড়াইয়া লম্বা লম্বা বাঁশ দিয়া ঠেলা দিয়া

দিয়া কয়েকটা বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহারা মাঝামাঝি আটকাইয়া গিয়াছে, তাহাদের কী?

মানুষ এই বিপদেরও প্রতিকারের পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। হিমালয়ে মহিষের সমান বড় বড় জানোয়ার বাস করে। তাহাদের সমস্ত চামড়া খুলিয়া লইয়া তাহা দিয়া থলি করিয়া লয়। গলার দিকে হাওয়া ভরিয়া তাহাও সেলাই করিয়া লয়। তাহাতে এই জানোয়ারের দেহ অস্থিমাংস-বিহীন অপ্সরার দেহের মত হাওয়ায় ভরিয়া যায়, আর জলের উপর দিয়া সাঁতার দেওয়ার শক্তি তাহার থাকে। তাহার চারখানা পা-ও হাড় বাহির করিয়া যেমনকার তেমন রাখিয়া দেওয়া হয়। আবার এইভাবে সন্তরণশীল 'ফুগ্‌গে' বা মশক জলে ভাসাইয়া চালকেরা তাহার পেটের উপর নিজেদের বুক রাখিয়া দেয়, এবং পা নাড়িতে নাড়িতে নির্দিষ্ট বাসস্থানে গিয়া পৌঁছায়। 'ফুগ্‌গে'র জন্য জলে সাঁতার দেওয়া সহজ হয়। ফুগ্‌গে দিয়া পা ধরিয়া রাখিলে তাহা বুকের নীচ হইতে খুলিয়া আসে না, এবং প্রবল স্রোতে কোথাও পাথর ঠেকিলে আঘাত আসিয়া লাগে চামড়ায়, তাহার উপর যে লোকটি বসিয়া আছে তাহার লাগে না।

এতখানি আয়োজন হইলে পর ঐ সব বোঝা কি করিয়া ঠিক পথে নেওয়া যায়? একে একে তো অগ্রসর হইতেই হইবে। পাহাড়ের ঘাঁটিগুলি পার করিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়িলে এইসব গাঁঠ যেমন খুশি পৃথক পৃথক না হইয়া যায়, সেজন্য তাহাদের চালকেরা সবগুলি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসে ও তাহাদের চালাইয়া লইয়া যায়।

লাহোরে রাবীর বুকের উপর দিয়া এইরূপ কাঠের কয়েক দল গাঁঠ জলে ভাসিয়া চলিতেছে দেখা যায়। তাহাদের শত্রু তাহাদের জল হইতে টানিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে, আবার মানুষকে তাহার বাড়িঘর বা আসবাবপত্র তৈরী করিবার জন্য তাহাদিগকে দধীচি ঋষির মত নিজেদের শরীর সমর্পণ করিতে হয়। তাহার পার্বতীয় সহোদরদের মানুষের সেবায় এইভাবে আনিয়া লাগাইবার সময় রাবীর মনে না জানি কেমন লাগে; রাবী হয়তো এইটুকু বলে—ভাই, এ শরীর তো পরোপকারের জন্যই, 'পরোপকারায় ইদং শরীরম্।'

জুন, ১৯৩৭

২৯

স্তন্যদায়িনী চেনাব

কাশ্মীর হইতে ফিরিবার সময় পা আর উঠিতেছিল না। যাওয়ার সময় মনে যে উৎসাহ ছিল, ফিরিবার সময় তাহা আর থাকে কি করিয়া? তাই যাওয়ার সময় যে পথ গ্রহণ করিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় তাহা ছাড়িয়া পীর পুঞ্জাল পার হইয়া আমরা জম্মুর রাস্তা ধরিয়া আসিতেছিলাম। শ্রীনগর হইতে জম্মু পর্যন্ত গাড়ির রাস্তাও নাই। সাহস থাকিলে পায়ে হাঁটিয়া চলুন, বরং কাশ্মীরী টাট্টুর উপর চড়িয়া রওনা হন। পথে চলিতে চলিতে প্রতি পদক্ষেপে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও জাহাঙ্গীরের বিলাসিতা অনুভব করিতে হয়। যেদিকে তাকান দেখিতে পাইবেন দীর্ঘিকা ও পাহাড়ে তৈরী রাস্তা। শিমলার আজ যে প্রতিষ্ঠা, তাহাই বা তাহার চেয়ে অধিক প্রতিষ্ঠা ছিল জাহাঙ্গীরের সময়ে শ্রীনগরের। ঐরূপ বাদশাহী পাহাড়িয়া রাস্তা দিয়া ফিরিবার সময় ভগবতী চন্দ্রভাগাকে দর্শন করিয়াছিলাম। লোকে আজ তাহাকে 'চেনাব' বলিয়া ডাকে।

যদি আমার ভুল না হয় তবে আমরা ছিলাম রামবনের কাছাকাছি কোনও জায়গায়। সারাদিন ও সারারাত হাঁটিবার কথা ছিল। সুন্দর জ্যোৎস্না। ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া আমরা রাস্তায় মাতালের মত ঢুলিতে ঢুলিতে হাঁটিতেছিলাম। পায়ের তালু হইতে চামড়া উঠিয়া গিয়াছিল। পায়ে ব্যথা হইয়াছিল, নিদ্রা নিরাশ হইয়া অর্ধ ক্লান্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। নিদ্রা সুখের হয়, তন্দ্রা সেরূপ হয় না।

আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম, এমন সময়ে গভীর পর্বতমধ্য হইতে গম্ভীর ধ্বনি শোনা গেল। সম্মুখের পর্বতশৃঙ্গ হইতে নত হইয়া হাওয়া আসিতেছিল, তাহা শীতল ও সুগন্ধি বলিয়া মনে হইতেছিল। তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। জ্ঞান হইল। দৃষ্টি চলিল কলধ্বনির উৎপত্তির সন্ধানে। কী চমৎকার দৃশ্য! উপর হইতে দুগ্ধধবল জ্যোৎস্নার বৃষ্টি হইতেছিল। নীচে চন্দ্রভাগায় পাথরে পাথরে

ঘর্ষণ হইতে হইতে শ্বেতশুভ্র ফেনপুঞ্জ উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। তাহার আস্বাদে পরিতৃপ্ত পবন আমাদের দেহে সেখানকার শৈত্য সঞ্চার করিতেছিল।

সঙ্গী একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কি কোনও নদী, না পাহাড়ের ঝরণা?' সে বলিল, 'দুই-ই। এতো মাতা চেনাব।' আমি চেনাবকে প্রণাম করিলাম। নীচে তো নামিতেই পারা যাইতেছিল না। সুতরাং দূর হইতেই দর্শন করিয়া পবিত্র হইলাম। প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম ও অগ্রসর হইতে থাকিলাম।

ইনিই কি সেই বেদের সময়কার চন্দ্রভাগা! কত ঋষি না জানি এখানে তাঁহাদের ধ্যান ও তাঁহাদের গোধন পুষ্ট করিয়া থাকিবেন! আজও উদ্যোগী লোকেরা এই নদীমাতাকে কম দোহন করে না। আমার জীবনস্মৃতির আরম্ভেই পাহাড়ের মত সবল দেহ পাঞ্জাবীরা এই নদীর ধারে নালা খনন করিতেছিল। আজ পঁচিশ লক্ষ একর জমি ইহারই রসধারায় পুষ্ট হইয়া পাঞ্জাবী বীরদের পালন পোষণ করিতেছে। বেদের সমকালীন চেনাবের প্রাণ আর্যদের উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করিয়াছিল। রণজিৎ সিংহের সময়ে এই জল 'গুরুজীর জয়' 'গুরুজীকী ফতে' ধ্বনি করিয়াছিল। আজকার বর্ণও শেষ কথা নয়। চেনাবের জল একেবারে প্রাণহীন হয় নাই। পঞ্চনদের প্রতিষ্ঠা আবার জাগিবে, সপ্ত-সিন্ধুর প্রদেশ ভারতবর্ষের ভাগ্যের পথ দেখাইবে।

১৯২৬-২৭

[চেনাবের স্রোত আজ পাঞ্জাবের ভাগ্যরেখার পরিবর্তে দেশবিভাগের সীমারেখা হইয়াছে, দৈবের কি বিড়ম্বনা!]

জম্মুর তবী বা তাবী

কোনও নদীর সম্বন্ধে বলিবার মত যদি কিছু না থাকে, তাহাতে কি? তাহাতে আর সে নদীতে স্নানের আনন্দ বড় কম হয় না। নদীর মহত্ত্ব তো স্বতঃসিদ্ধ। সে নদীর নামের সঙ্গে যদি কোনও ইতিহাস জড়িত থাকে তবে সেই ইতিহাস ধন্য, নদীর তাহাতে কি? ইতিহাসের সম্পর্ক বিরোধ বা সংগ্রামের সহিত বেশি—নদীর কাজ হইল সন্ধি বা মিলনের। কৃষক ও পথিক, পশু ও পক্ষী, জলদানে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া নদী যখন বহিতে থাকে তখন মনে হয় সে যেন 'আত্মরতি, আত্মক্রীড় ও আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট।' নদীকে জিজ্ঞাসা করুন, 'তোমার ইতিহাস কি?' সে উত্তর করিবে, 'আমি পর্বতদুহিতা। অসংখ্য মানব ও তির্যক যোনির মাতা। আমি সাগরের সেবিকা, আকাশের মেঘই আমার স্বর্গ। এইটুকু ইতিহাসই আমার দৃষ্টিতে মহত্ত্বপূর্ণ।'. বেশি প্রশ্ন করিলে তাবী বলিবে, 'চারদিকের নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলিকে খাওয়াইয়া আমার যেটুকু জল বাঁচে তাহা আমি চেনাবকে দিয়া দিই। চেনাব তাহার জল বিসর্জন করে ঝিলমে। ঝিলম গিয়া সিন্ধু নদের সহিত মিলিত হয়। সিন্ধু আমাদের সকলের জল সমুদ্রে ঢালিয়া দিয়া নিজেকে ও আমাদের সকলকে কৃতার্থ করে। উহাই হইল আমাদের সাযুজ্য মুক্তি। বাকি তোমাদের পাগলামির ইতিহাস তোমরা জান। শত্রুতা ও পাগলামির ইতিহাস বল কবে লিখিয়া ফেলা সম্ভব? উহা তো ভুলিয়া যাইবার কথা, ভুলিয়া যাইবার পরিবর্তে তোমরা কি শত্রুতা ও বিষ স্থায়ী করিবার জন্য ইতিহাস লিখিতেছ? এই ইতিহাসকে কবর চাপা দাও, বা ধুইয়া মুছিয়া ফেল। সেবার ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস। ত্রিগর্তবাসী ডোগরা, গদ্দী ও গুজ্জর—প্রজারাই আমার সন্তান। উহাদের জীবনই আমার জীবন।'

কাশ্মীর যাত্রা শেষ করিয়া আমরা জম্মুতে আসিলাম, রঘুনাথজীর মন্দিরে

গিয়া থাকিলাম। নিকট দিয়াই তাবী বহিয়া যাইতেছিল। জম্মুর দিকে তাবীর ধার বেশ উঁচা। অনেক নদী যেমন হইয়া থাকে, তাবীও তেমনই। উহার অসাধারণ গুণ কিছু নাই। একজন মহারাষ্ট্রীয় ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, 'তাবীর উপর বিদ্যুতের চক্র লাগানো হইয়াছে। এই বিদ্যুৎ দিয়া অনেক কিছু কাজ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাবীর তাহাতে কি? সে তো বহিয়াই চলিয়াছে।

১৯২৬-২৭

৩১

সিন্ধুর বিষাদ

হিমালয়ের পরপারে, পৃথিবীর এই মানদণ্ডের প্রায় মধ্যদেশে, কৈলাসনাথ-জীর নয়নের নীচে চিরহিমাচ্ছাদিত পুণ্যবান এক প্রদেশ আছে। তাহার ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে আর্যাবর্তের চারিটি লোকমাতার উদ্ভবক্ষেত্র। এপার আর ওপারের কথা যদি না ভাবি, তবে বলিতে পারি যে উত্তর ভারতের প্রায় সকল নদীই এই স্থান হইতে উৎসারিত হয়।

হিমালয় হিন্দুস্থানেরই, অন্য কোনও দেশের নয়, একথা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন হিমালয়ের উত্তরবাহী জল বিন্দু বিন্দু একত্র করিয়া হিমালয়ের দুই পার্শ্ব ঘুরিয়া তাহা ভারত মহাসাগর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার কাজ সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র এই দুই নদ অবিরাম করিতেছে। এই দুই নদ যেন কৈলাসনাথের দুই বাহু, তিনি ভারতবর্ষকে নিজের হাতে লইবার জন্য কারুণ্যময় দুই বাহু প্রসারিত করিয়াছেন। হিমালয়ের বাধা যেন আর সহ্য হইতেছে না, এই ভাবে শতদ্রু ও ঘর্ঘরা হিমালয়ের ক্রোড়দেশ হইতেই সোজা রাস্তা বাহির করিয়া মানস সরোবরের জল ভারতবর্ষের দুই বিশাল প্রদেশকে পান করাইতেছেন। গঙ্গা যমুনা ও তাহাদের ভগ্নী অসংখ্য স্রোতস্বতী পিতার মুখ রাখিয়া এদিকে সেই কাজই করিতেছে। পাঞ্জাবের পাঁচ নদী ও সংযুক্ত বা উত্তর প্রদেশের পাঁচ নদী মিলিয়া ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি দশগুণ বাড়াইয়াছে।

এই দশটি নদী ভারতবর্ষেরই। শুধু সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রকে অতি-ভারতীয় বলা যাইতে পারে।

ভারতবাসী গঙ্গামাকে পাইয়া সিন্ধুকে যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল। সিন্ধুর তীরে আর্যদের তীর্থস্থান আছে কিনা সন্দেহ। বৈদিক দেবতা ইন্দ্রকে যেমন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, তেমনি যেন সপ্তসিন্ধুর প্রধান সিন্ধুকেও ভুলিয়া গিয়াছি। দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রাচীন আর্যেরা বায়ুকোণের সম্বন্ধে খানিকটা উদাসীন হইয়া পড়িলেন, এবং এজন্য চিরকালই অনিষ্ট হইতে থাকিল। উত্তরদিকে তো হিমালয়ই রক্ষক ছিলেন। পশ্চিম দিকের একেবারে ভিতর পর্যন্ত রাজপুতানার মরুভূমিও রাজপুত ও ডোগরাদের বাহুবলে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ছিল। তাহার বাহিরে রক্ষক ছিল বেগবতী সিন্ধু নদী। তাহারও অগ্রভাগ করতার (খিরথর) হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুকুশ পর্যন্ত প্রচণ্ড পর্বতমালার প্রহরা ছিল। প্রতিবেশী পার্বত্য আফগানদের স্বাধীনতাপ্রীতিও বিদেশীদের এদিকে আসিতে দিত না। কিন্তু যেখানে দেশবাসী স্বয়ং উদাসীন, সেখানে পাহাড়ের দেওয়াল ও নদী কতখানি রক্ষা করিতে পারে? প্রতিবেশীদের সঙ্গে যবনেরা আসিয়া মিলিল। বাহ্লীকের নিকটে হিন্দুস্থানের বিধানমত যে সামরিক সীমা নির্দিষ্ট ছিল, তাহা সরিয়া সরিয়া আটকের কাছে গিয়া আটকাইয়া গেল। আর আটকাইয়া গেলেও বিদেশীদের ভারতের মধ্যে আসিবার পথ না আটকাইয়া ভারতবাসীদের বাহিরে যাইবার পথই রুদ্ধ করিল। রাণী সেমিরামিসের ভারত আসিবার পথ আটকাইল না। পারস্যের সম্রাট দরায়ুসের পাঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে সুবর্ণকর ভার লইবার পথ আটকাইল না। য়ুয়েচী ও হূণদের ভারতে আসিবার পথ আটকাইল না। সিকন্দরের পঞ্চনদী পার হইবার পথ আটকাইল না। মহম্মদ ও বাবরের পথও এই আটক আটকাইতে পারিল না। আমাদের বোঝা উচিত ছিল, যে নদী কাবুল নদী হইতে জল গ্রহণ করিয়াছে সে নদী পশ্চিম পথে আগত লোকদের আটকাইবে না।

পশ্চিম তিব্বতে কৈলাসের তলদেশে সিন্ধুর উৎপত্তি। এখান হইতে সরলপথে সে ছুটিল বায়ুকোণে, কারণ শেষটায় তাহাকে যাইতে হইবে নৈঋর্তে। কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া, 'লেহ'র সৈন্যনিবাস পরিদর্শন করিয়া, কারাকোরাম পাহাড় রক্ষার জন্য সে সোজা আগাইয়া গেল। স্কার্দুর নিকটে

আসিয়া তাহার হুঁস হইল যে তাহাকে ভারতবর্ষে যাইতে হইবে। দূর হইতে গিলগিটের কেল্লা দেখিয়া সে দক্ষিণে ঘুরিল। চিত্রলের দিকে তো সে নিজে যাইতে চায় নাই, কিন্তু ওখানকার জল কেমন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সে স্বাত নদীকে নিজের কাছে ডাকিয়া আনে। স্বাতই বা একা কি করিয়া আসে? তাহার মন পড়িয়া আছে কাবুল নদীর উপর। কাবুল নদী 'কোহে'র সাদা জল বহিয়া আনে, তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সে আটকের নিকট সিন্ধুতে আসিয়া মেশে। এতক্ষণে সিন্ধু সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় হইয়া গিয়াছে। স্বাত ও কাবুলের নিকটে শুনিবার মত যথেষ্ট ইতিহাস পড়িয়া আছে। কাহারা খাইবার ঘাট হইতে আসিল আর কাহারা গেল, ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীকেরা কোন পথে আসিল আর কর্নেল ইয়ংহাজব্যাণ্ড ওখান হইতে চিত্রলের চড়াইতে কি করিয়া গেলেন—সমস্ত ইতিহাস এই দুই নদী বলিতে পারে। আমীর আমানুল্লা উৎকট পাগলামীতে প্রতিবেশীর উপর যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলে তাহার কথাও ইহারা বলিতে পারিবে। আর কোহাটের ক্রূরতাও সিন্ধুর অজানা নহে। ওয়াজিরিস্থান ও বন্নুতে ক্ষাত্রধর্মকে লজ্জা দিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহার কাহিনী কুরমের মুখে শুনিয়া সিন্ধুর বুক কাঁপিয়া ওঠে। ক্রুমু বা কুরম নদী সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইলে তখন তাহার স্রোত নষ্ট হয়। পাহাড়ের অভাবে সে মর্যাদা রাখিতে পারে না। ছোট বড় চর সৃষ্টি করিতে করিতে সিন্ধু ডেরা ইসমাইল খাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া ডেরা গাজী খাঁ পর্যন্ত যায়।

এখন সিন্ধু পাঁচটি নদীর জলধারার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ছুটিল। জম্মুর দিক হইতে আসিয়া কাশ্মীরের ঝিলম নদীর সঙ্গে চিনাব 'আসিয়া মিলিল। লাহোরের ঐশ্বর্যভোগে তৃপ্ত হইয়া রাবী এই উভয়ের সঙ্গে মিলিল। ব্যাসের জলে পুষ্ট শতদ্রু এই তিনটির জলে আসিয়া মিশিল। তাহার পর উন্মত্ত হইয়া পঞ্চনদের প্রবাহ পূর্ণবেগে মিট্টনকোটের নিকট সিন্ধুর উপরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিয়া ও তাহা হজম করিয়া, নিজেরই নাম স্থায়ী রাখিবে বলিয়া সিন্ধুর শক্তিও সেই পরিমাণে বেশি হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

সিন্ধু শুধু নিজের নামই ধরিয়া রাখে নাই, এখান হইতে তাহার জীবনের উদার কৃপা বহুভাবে বিস্তার করিয়া চারিদিকের প্রদেশকেও নিজের নাম অর্পণ করিতেছে। 'ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাম্' কথাটির উদাহরণ হিসাবে আর্যনৃপতিদেরও

সে অনুসরণ করিতেছে। বড় বড় সাত ঘাটের জল সে অবশ্য একত্র করিতেছে, কিন্তু তাহা কেবল সমস্ত জল অনেক মুখ দিয়া মহাসাগরকে অর্পণ করিবার জন্যই। আর যদি কোনও স্বার্থপর লোক মধ্যপথে উহা হইতে নিজের ইচ্ছামত কোথাও তাহার জল লইয়া যাইতে চায় তবে সিন্ধুর তাহাতেও কোনও আপত্তি নাই।

তাহা হইলেও গঙ্গামায়ের উদারতা সিন্ধুতে নাই। এইজন্য আটক ও সক্কর হইতে আরম্ভ করিয়া হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত তাহার উপর পুল বাঁধা হইয়াছে। সক্করের পুল সামরিক দিক দিয়া খুব মহত্বপূর্ণ। সিন্ধুর মধ্যবর্তী এক চরজমি হইতে লব্ধ অর্থে এই পুল নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু রোহরীর নিকটে জল যেখানে গভীর, সেখানে এই পুল কোনও সময়ে পাখার মত সাঁটিয়া একত্র করা যাইতে পারে। যদি সামরিক কারণে সিন্ধু পারাপার অসম্ভব করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে একবার মন্ত্র বলিলেই সমস্ত পুল লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। তখন আবার শিকারপুর-সক্কর পৃথক, এবং রোহরী পৃথক।

একথা সত্য নয় যে ইংরেজরাই শিকারপুর-সক্করকে বড় করিয়া তুলিয়াছে। এখানকার হিন্দু ব্যবসায়ীরা প্রাচীনকাল হইতে বোলনঘাটের পথে কান্দাহার দিয়া মধ্য এশিয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে। হিরাত বা মরোয়া, বোখারা বা সমরকন্দ, যেখানেই যান, শিকারপুরের ব্যবসায়ী আপনি অবশ্যই দেখিতে পাইবেন। শিকারপুরের হুণ্ডী মস্কো ও পিটর্সবর্গ (লেনিনগ্রাড) পর্যন্ত লোকে স্বীকার করিবে। সক্করের কথা মনে করিব, আর বড় জাহাজের মত জলে সাঁতার দিতে পারে এমন সাধুবেলা নামক চরজমি বা দ্বীপ মনে পড়িবে না, তাহা অসম্ভব। সাধুদের কাব্যময় রুচি সর্বদাই সুন্দর হইতে সুন্দর স্থান পছন্দ করে। সম্রাট্ পর্যন্ত সাধুবেলার সৌন্দর্য দেখিয়া হিংসা করিবেন।

জানি না, সিন্ধুর বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হইল, না কচুরীপানা খাইবার ইচ্ছা হইল, সে এখান হইতে মঞ্চর সরোবরের দিকে ছুটিল। কিন্তু সময়ে সাবধান হইয়া অথবা খিরতর (করতার) বলায় সে ফিরিয়া আসিল, আর শোবন হইতে আগ্নেয় দিকে ফিরিয়া হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত গেল। এই প্রদেশ বহু যুদ্ধের সাক্ষী। জানি না, জয়দ্রথের সময়ে এখানকার অবস্থা কিরূপ ছিল। কিন্তু দাহির ও জচ্চের সময়ে এই প্রদেশ বেশ পিছাইয়া ছিল বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্রগুপ্তের

পূর্বে ইরানী সাম্রাজ্যকে সোনা দিয়া দিয়া নিঃসত্ত্ব হইয়া যাওয়ার জন্যই হউক, আর সেখানকার ব্রাহ্মণ রাজাদের অনাচারেই হউক, এখানকার প্রজারা একেবারেই কাঙ্গাল ও দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। ইরানের বাদশাহই আসুন আর সেকন্দর শাহই আসুন, বোগদাদের মুহম্মদ-বিন-কাসিমই আসুন আর স্যর চার্লস নেপিয়ারই আসুন, সিন্ধুতটবাসী লোকেরা সর্বদা হারিয়াই গিয়াছে।

যখন সেকেন্দর জাহাজে করিয়া সিন্ধু পার হইলেন, তখন তিনি তাঁহার রক্ষার জন্য দুইতীরে তাঁহার সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ ইংরেজেরা সিন্ধুর রক্ষার জন্য নয়, পাঞ্জাবের গম বিলাতে চালান দিবার জন্য সিন্ধুর দুই তীরে রেল চালাইয়াছে। সিন্ধুর প্রবাহ যথেষ্ট বেগবান হওয়ায় গঙ্গার মত তাহাতে জাহাজ চলাচল করিতে পারে না। তাই করাচীর নিকটে কেটী বন্দরের কোনও মূল্য নাই।

সিন্ধুর মোহানার প্রদেশ সিন্ধুরই শক্তিতে নির্মিত হইয়াছে। বহুদূর হইতে বালু ও আবর্জনা আনিয়া আনিয়া সিন্ধু সেখানে ফেলিয়া দিয়াছে। ফলে আরব সমুদ্রকে সর্বদা অত্যন্ত কৌশলে বা সূক্ষ্মভাবে পিছনে হটিতে হইয়াছে।

সিন্ধুর প্রবাহ সিন্ধু নামের শোভা দান করিবে বলিয়াই উহা এত বিস্তীর্ণ ও বেগবান। গ্রীষ্মকালে যখন গলিত বরফের জলরাশি উহাতে আসিয়া পড়ে, তখন ঘোড়া বা হাতি কাহার উপমা তাহাকে মানায় তাহা বুঝিতেও পারা যায় না। তাহাকে জল-প্রলয় বলিতেই হইবে। সাগরের ঢেউ যেমন উত্তাল হইয়া ওঠে, সিন্ধুর ঢেউও তেমনই উছলিয়া ওঠে। মকর মৎস্যের গুরু হইতে পারে, এমন সাঁতারুও জল বাড়িবার সময় জলে লাফাইতে সাহস করে না।

প্রেম-পাগলিনী সতী সুহিণীরই মাটির কলসী অবলম্বন করিয়া এরূপ প্রবাহে লাফাইয়া পড়িবার সাহস হইতে পারিত। প্রেমের প্রবাহ, প্রেমের বেগ, ও পরিণামে প্রেমের অনাসক্তি, মহাসিন্ধু হইতেও বড়।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

৩২

মঞ্চুরের জীবনবিভূতি

যিনি জলকে জীবন বলিয়াছিলেন, তিনি কি কবি ছিলেন, না সমাজশাস্ত্রী? আমার মনে হয় তিনি দুই-ই ছিলেন। বিনা জলে বনস্পতি বাঁচিতে পারে না, পশুপক্ষীও বাঁচিতে পারে না। তাহা হইলে উভয়ের আশ্রিত মনুষ্যই বা বিনা জলে টিঁকিতে পারে কি করিয়া? ঈশ্বর পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল করিয়া দিয়া এই কথাই প্রমাণ করিতেছেন যে জলই জীবন। লুপ্তচেতন ব্যক্তির চোখে এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল দিলেই তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে অনন্ত বিন্দুর মধ্য হইতে সরোবর যে উচ্ছল হইয়া উঠিতেছে তাহা দেখিয়া যদি লোকে জীবন কৃতার্থ বলিয়া আনন্দ অনুভব করে তবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

অনন্ত সাগর আর তাহার অনন্ত তরঙ্গ দেখিয়া মানুষের উন্মাদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যাহার সম্মুখের তটদেশের অল্পটুকুই দেখা যায়, আর সেই জন্য চোখে যাহার বিশাল বিস্তারের পরিমাপ পাইবার আনন্দ মেলা সম্ভব, এমন শান্ত সরোবরের দর্শন মিত্রদর্শনের মতই আনন্দদায়ক। সাগর আমাদের ডাকে অজানার মধ্যে লাফাইয়া পড়িবার জন্য, আর সরোবর তাহার দর্পণের মত শীতল স্বচ্ছ শান্তিদ্বারা মানুষকে আত্মজ্ঞান লাভে উৎসাহিত করে। সরোবরে আমাদের জীবনের প্রসন্নতার দর্শনলাভ হয়, সাগরে হয় জীবনের ক্ষুব্ধ বিরাট ভাবের সাক্ষাৎকার। সাগরের তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া যে ব্যক্তি বলিবে—

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম

সেই ব্যক্তিই বিশাল সরোবরের তীরে পৌছাইয়াই থামিয়া গাহিবে—

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।

এইভাবে দেখা যায়, সাগর ও সরোবর, জীবনের দুই প্রধান ও ভিন্ন বিভূতি।

আমি জানিতাম—কখন যেন জানিতাম—জীবনবিভূতির এমন একটি

সুন্দর পরিচয় সর্বকালের জন্য সিন্ধুদেশে প্রসারিত হইয়া আছে। কিন্তু তাহা দেখিবার সৌভাগ্য এ পর্যন্ত হয় নাই। যখন আমার লোকসেবক সংস্কৃতিবান্ রসিক বন্ধু শ্রীনারায়ণ মলকানীজি আমাকে এবার সিন্ধু প্রদেশে ভ্রমণ করিবার নিমন্ত্রণ জানাইলেন, তখন আমি তাঁহার সঙ্গে এই শর্ত করিলাম যে এবার যদি জীবন ও মরণ উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করাইবার জন্য আপনি প্রস্তুত থাকেন তবেই আমি আসিব।

এই রহস্যময় কথার সন্দেহদোলায় বন্ধুবরকে বেশিক্ষণ রাখা পছন্দ হইল না। আমি তাঁহাকে লিখিলাম, যেখানে একে একে তিন যুগ চাপা পড়িয়া গিয়াছে, মৃত্যু যেখানে সবচেয়ে নিজের বড় মিউজিয়াম খুলিয়া রাখিয়াছে, সেই মোহন্-জো-দড়ো আমাকে আবার দেখিতে হইবে। সেইরূপ আবার কমলকন্দের মূল হইতে উড্ডয়মান অসংখ্য কমল, এই কমলদের মধ্যে মধ্যে নর্তনশীল ছোটবড় মৎস্যগুলি, মৎস্যগুলির উপর নির্ভরকারী বিচিত্রবর্ণের পক্ষীসমূহ, আর কমলকন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া পক্ষীগুলি পর্যন্ত সকলকেই বিনা ওজর আপত্তিতে কোনও পক্ষপাত না করিয়া নিজের উদরে স্থান দেয় এরূপ সর্বভুক্ মনুষ্যেরা যেখানে নিশ্চিন্তভাবে বৃদ্ধি পায়, সেই জীবন-রাশি বা জল-রাশি মঞ্চর সরোবরও আমাকে দর্শন করিতে হইবে। নারায়ণের দশাতো 'বৈদ্য যাহা ভাল লাগিবে তাহাই খাইতে বলিয়াছেন'—গোছের হইয়া থাকিবে। তিনি সিন্ধুর সুফী দর্শন পালন করিয়া প্রথমে লারকানার পথে 'মৃত্যুর টীলা' দর্শন করাইলেন, আর তাহার পরেই জীবনের বা জলের এই রাশির দিকে আমাদিগকে লইয়া গেলেন!

সিন্ধুর পশ্চিম তীরে, যেখানে পঞ্জাবের গম করাচি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য রেলওয়ে ছোটে, সেখানে দাদ্ ও কোঠরীর মাঝামাঝি বুবক স্টেশন পড়ে। লোককে জিজ্ঞাসা না করিয়াও বোঝা যায় যে আবুবকর নামের দুই প্রান্ত অক্ষর বাদ দিয়া বুবক নামের সৃষ্টি হইয়াছে! স্টেশন হইতে পশ্চিম দিকে চার মাইল ধূলাভরা রাস্তা পার হইয়া আমরা বুবক পৌঁছিলাম। সেখানকার লোকেরা বাজনা, সানাই ও অল্পবিস্তর দক্ষিণা লইয়া আমাদিগকে লইতে আসিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে সমস্ত গ্রামটা ঘুরিয়া গলিঘুঁজি দেখিয়া সকলে আমাদের গৃহপতি শ্রীযুক্ত গোধূমলজীর বাড়িতে আসিলাম। তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া খাওয়াদাওয়া সারিয়া দশ পনেরো মিনিট স্বপ্নরাজ্যে

বিচরণ করিয়া ও স্থানীয় গালিচা ও রং-এর কাজের প্রশংসা করিয়া মন্দির দর্শন করিবার জন্য বাহির হইলাম। দুই মাইল ধূলাভরা রাস্তা আমরা আবার চলিতে বাধ্য হইলাম। তাহার পরেই খেতগুলির মাঝে আসিল একটি 'নহর' বা খাল। তাহার ধরণ ছিল আঁটসাঁট, আর গড়রিদের কুটিরগুলি সে দেখিয়া যাইতেছিল। যেখান হইতে তাহার আরম্ভ, সেখানেই ছিল ময়লা ও কাদার মধ্যে একসার নূতন ও পুরাতন নৌকা। আমরা তাহার মধ্য হইতে একটা বড় নৌকা বাছিয়া লইয়া তাহাতে সওয়ার হইলাম। (সওয়ার বা 'অসওয়ার' বা অশ্বারোহী, আমরা তো সকলে নৌকারোহী!) এইভাবে আমরা আরও দুই মাইল চলিয়া গেলাম। দুই দিকে দেখিলাম, উট জলক্রীড়া-ছলে জপমালা ঘুরাইবার পুণ্য অর্জন করিতেছে। চাষীরা খোলা বাতাসে নিজেদের জীবন, নিজেদের আমোদ-কৌতুক, নিজেদের কাজকর্ম চালাইতেছে, ইহাও আমরা দেখিলাম। জমি ও জলের মধ্যে আসা-যাওয়া করিতেছে এমন 'বনজারে' পাখিও দেখিলাম।

আমাদের যাত্রীদলের কুড়িজন আনন্দের উপাসক হইয়া গেলাম। কেহ কেহ মাঠের গান ধরিল—'চল্‌রে নৌজোয়ান, রুকনা তেরা কাম নহীঁ চলনা তেরী শান'। ইহাতে হাসির এইটুকু ছিল যে আমরা নৌকায় চড়িয়া যাইতেছি, পায়ে চলিয়া যাইতেছি না, লম্বা লম্বা বাঁশ দিয়া কাদা ঠেলিয়া ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছি। আমাদের পা কোনও গণ্ডগোল না করিয়া অজগরের উপাসনা করিতেছিল। কিন্তু সকলের যখন খোশমেজাজ, তখন কথা ও গানের ঠিক ঠিক ব্যাকরণ কেহ গ্রাহ্য করে না।

যখন কল্যাণীয়া শ্রীমতী রৈহানা বহেনকে 'বেনোয়া ফকির কে' মুরলীর সুরে আনিবার নিমন্ত্রণ দেওয়া হইল, তখন জমিয়া উঠিল ; ঠিক এই সময় আমাদের খাল তাহার মুখ চওড়া করিয়া আমাদের নৌকাটিকে সরোবরের মধ্যে ধাক্কা দিয়া আনিল। তাহার পরে কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়! যেখানে তাকাও জীবন আর জীবন! পনেরো হইতে বিশ মাইল লম্বা ও দশ মাইল চওড়া জীবনের কাব্যময় বিস্তার!! বিস্তীর্ণ জলরাশির কান্তি, আর মাঝে মাঝে হরিদ্বর্ণ ধান্যে ভরা দ্বীপের শান্তি। প্রকৃতির এতখানি কাব্য কি করিয়া বোঝা যায়? গোধূমলজীকে বলিলাম, 'এখানে তো আমার হৃদয় গলিয়া যাইতেছে।' তিনিও ততখানি রসিকতার সঙ্গে বলিলেন, 'যদি আপনি নভেম্বরে এখানে

আসিতেন তবে এখানকার লক্ষ লক্ষ কমলের মধ্যে চাপা পড়িয়া যাইতেন। যদি এই উল্লাস দেখিতে হয় তাহা হইলে আপনি বিষ্ণুশর্মাকে কোনও বৎসর লিখিয়া পাঠাইবেন, তিনি আমাকে লিখিবেন এবং আমি আপনার জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিব। আমাদের প্রদেশ এতটা দূরে পড়িয়া রহিয়াছে যে আপনাদের মত লোকেরা কদাচিৎ এখানে পদার্পণ করেন। যতদূর মনে পড়ে, ইহার পূর্বে এখানে একজনমাত্র মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপক আসিয়াছিলেন, তিনিও আপনার মত আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য প্রতিবৎসর সৈন্যবিভাগের কিছু গোরা এখানে আসেন ; আসেন মাছ ধরিতে বা শিকারের জন্য। কিন্তু তাহাতে আমাদের কি লাভ!'

দূরে এক নৌকা দেখা গেল। গ্রামের কোনও পরিবার হয়তো অন্য স্থানে যাইতেছে। তাহাদের কমলা রংএর ওড়না ও নীল রংএর পায়জামার প্রতিবিম্ব জলে কেমন সুন্দর দেখা যাইতেছিল। যেন গ্রামের মধ্যেই আনন্দের বশে জলবিহার করিতেছিল! সুদূরে কালো কালো জলকুক্কুট জলস্রোতে সাঁতরাইবার সময় উদরপূজন করিতেছিল। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নৌকার উপরে বসিয়া জলে পা ধুইতে লাগিল। তাহারা খবর আনিল, কোথাও জল একেবারে ঠাণ্ডা, কনকনে। উহার কারণ কি, লোকে তো তাহা আমাকেই জিজ্ঞাসা করিবে? এইরূপ আনন্দময় দলে আমিই সর্বজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। আমি অবিলম্বে কারণ খুঁজিয়া বাহির করিলাম আর সকলকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া সন্তুষ্ট করিলাম।

'ঐ যে সামনে পাহাড়গুলি দেখা যাইতেছে, উহাদের নাম কি?' চারিদিকের লোকদের জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য বোধ করিল। তাহারা যেন বোঝেই নাই যে স্বদেশী পাহাড়গুলির আবার নাম থাকিতে পারে। এদিকে আবার প্রত্যেক রূপের সঙ্গে যদি নাম না যোগ করিতে পারি তাহা হইলে আমার দার্শনিক আত্মা সন্তুষ্ট হয় না। আমাদের দলে যুবকের এক ছোট, ভাবুক ও লাজুক স্বভাবের ছেলে এক কোণে বসিয়াছিল, আমি তাহাকে ঈশ্বরদাস নামে ডাকিলাম। পাঠশালায় যে ভূগোল পড়া হইয়াছিল তাহা তাহার কাজে লাগিল। সে তখনই বলিয়া উঠিল, 'সামনের পাহাড়গুলির নাম হইল খিরতর'। আমি হাসিয়া উঠিলাম, মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, 'ধন্য করতার।' ছেলেবেলায় হলো

ও সুলেমান পর্বতের নাম মুখস্থ করিয়াছিলাম। পরবর্তী কালে হলো পর্বত কর্‌তার নাম ধারণ করিয়াছিল। তাহার কারণ এই ছিল যে ইংরেজরা খিরতরের বানান করিয়াছিলেন Kirthar। বিদেশী লিপির জন্য আমাদের দেশে যে কত অনর্থ হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। ইহা সেইসব অনর্থের অন্যতম। খিরথরের পাহাড়গুলি এই তীর হইতে দশ বারো মাইল দূরে। সেখানে সিন্ধুর সীমানা শেষ হইয়া বেলুচিস্থান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

এতক্ষণে সূর্যদেব ক্লান্ত হইয়া খিরথরে আশ্রয় লইবেন বলিয়া ভাবিতেছিলেন। আমরাও ভাবিলাম, এখন ফিরিয়া বাড়ি যাই এবং সাতটা বাজিবার পূর্বেই জঠরাগ্নিতে আহুতি দেওয়া যাক। নৌকা মুখ ফিরাইল, আমরা পূর্বদিকের সৌন্দর্য দেখিতে লাগিলাম। 'ঐ যে সম্মুখে দূরে নৌকা দেখিতেছি, ও এখন পশ্চিমে কোথায় যাইতেছে', ভাই গোধূমলজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বুঝাইলেন, ওপার খিরথরের নিকটে এক গ্রাম আছে। সেখানে মহাশিবরাত্রির মেলা বসে। সেদিন হিন্দুরা মহাশিবরাত্রির জন্য সেখানে একত্র হয়। যে মেলা বসে তাহা খুব বড়। ইহারা সম্ভবত মেলার জন্যই যাইতেছে।' আমরা যেদিন যাই সেদিন ছিল ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ। মহাশিবরাত্রির সময় একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে ; অর্থাৎ ২৪শে। আমাদের কার্যক্রম অদলবদল করা সম্ভব ছিল না। 'আজ যদি ২৪ তারিখ হইত, তাহা হইলে আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া অবশ্যই ঐ গ্রামে যাইতাম। আমি মহা-শিবরাত্রিব্রত পালন করি। হাজার হাজার হিন্দুমুসলমান একহৃদয় হইয়া একই স্থানে সমবেত হইয়াছে, এই দৃশ্য দেখিয়া নিজের হৃদয় পবিত্র করিবার সুযোগ আমি ছাড়িতাম না। শিবরাত্রির দিন যে মনোভাবে হিন্দুমুসলমান প্রেমভরে একত্র হয়, সেই মনোভাব যদি ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে আমাদের সব বাধা দূর হয়। সেইদিন ভারতবর্ষের পক্ষে সুদিন হইয়া উঠিবে, শিবদিন হইয়া উঠিবে।'

এই পর্যন্ত বলিয়া আমি নীরব রহিলাম। এখন আর কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে মন চাহিল না। আমি সুদূরের পানে চাহিয়া থাকিলাম। পৃথিবীতে বা আকাশের দিকে তাকাইয়া নয়, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তাহাই দেখিতে থাকিলাম। কলম্বাস যে শ্রদ্ধা লইয়া আমেরিকার পথ খুঁজিতেছিল, সেই শ্রদ্ধা লইয়া আমি খুঁজিতে লাগিলাম, শিবরাত্রি কবে শিবদিন হইবে।

'এই যে সামনে সবুজ সবুজ খেত দেখা যাইতেছে ইহাদের পিছনে আছে তামাক বা ভাঙ্গের খেত।' বুবকের এক সঙ্গী এই বলিয়া আমার ধ্যান ভঙ্গ করিল। আমরা সরোবর হইতে খালে প্রবেশ করিয়াছি। খালের ধারে ধারে, বাঁশের দাঁড়ির উপর, পা বাঁধিয়া বক দাঁড় করানো হইয়াছে। তাহারা মৎস্যদের ধ্যান করিতেছে। ঝুপড়িগুলির ভিতর হইতে উনানের ধুঁয়া বাহির হইতেছে। চোখ বুবকের উঁচা উঁচা চার মহল বাড়িগুলির স্থাপত্য সৌন্দর্য দেখিতে লাগিল। এই সব বাড়ির কিছু 'মংঘ' বকের মত মাথা উঁচু করিয়া বায়ু সেবনের উদ্দেশে দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা তামাক ও ভাঙ্গের খেত পার হইলাম। ভাঙ্গের বিষয়ে সরকারি নীতির ইতিহাস শুনিলাম। আর বাড়ি ফিরিয়া সময়মত আহারে বসিলাম।

কিন্তু আমার মন তো মঞ্চরের 'ঢংঢ' বা বাঁধের উপর মহাশিবরাত্রির আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিল।

মার্চ, ১৯৪১

৩৩

ঢেউয়ের তাণ্ডব

[করাচীর নিকটে কীয়ামারি হইতে একটু দূরে মনোরা নামে এক দ্বীপ আছে। সেখানে আছে এক সুন্দর মন্দির। দ্বীপের অধিবাসীরা বেশির ভাগ পোর্টট্রস্টের কর্মী, অল্প কিছু সেনাবিভাগের। মনোরা দ্বীপ করাচীর গহনা, আর সমুদ্রের খেলনা। ইহার দক্ষিণ সীমায় একটা বড় গর্ত আছে, সেখানে সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া ঠেকে। ইহার আগে অনেকদূর পর্যন্ত বড় এক দেওয়াল বা প্রাচীর নির্মাণ করিয়া ঢেউগুলি আটকানো হয়। এখান হইতে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত ঢেউগুলির অখণ্ড সত্যাগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য আমি একবার গিয়াছিলাম।

হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য এবার করাচী গিয়াছিলাম, তখন এই দৃশ্য দ্বিতীয়বার দেখিয়াছিলাম। ঢেউগুলির প্রভাব ঐ পাথরগুলির উপর

পড়ুক আর নাই পড়ুক, হৃদয়ের উপর তাহাদের প্রভাব না পড়িয়া থাকিতে পারে না। হৃদয় ও সমুদ্র, উভয়ই স্বভাবত তরঙ্গ-সঙ্কুল।]

কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রথমবার দেখিলে হৃদয়ে তাহার যে প্রভাব হয় দ্বিতীয়বার দেখিলে তাহা হয় না। প্রথমবার সমস্তই একেবারে নূতন। তখন অজ্ঞাতবস্তুর সহিত পরিচয় করিতে হয়। প্রতি পদক্ষেপে আশ্চর্য ও চমৎকার কিছু অনুভব করিতে হয়। দ্বিতীয়বার সেই জায়গায় গেলে পরে কি দেখিব, মানুষের মনে তাহার একটা ধারণা থাকে। তাই চমৎকার কিছু দেখিবার অভাব বোধ কম থাকে, ঠিক পূর্বের মত থাকে না। পরিচিত বস্তুর প্রতি প্রেম থাকিতে পারে ; আশ্চর্য ও চমৎকার বোধ তো অপরিচিতের জন্যই হয়।

এমনই মনোভাব লইয়া—ভালবাসা আছে কিন্তু ঔৎসুক্য নাই—আমি করাচীর নিকটে মনোরার ঢেউ দেখিবার জন্য এবার গিয়াছিলাম। মনে মনে আশা ছিল, পুরাতন কিন্তু যুবক বন্ধুদের সঙ্গে এই রম্য স্থানে আসিলে অবশ্য অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হইবে। ঢেউ তো ওখানে আছেই, এবং তাহা দেখিয়া আনন্দ অবশ্য হইবে। ইহা হইতে বেশি কিছু হইবে না—মনকে এইভাবে বুঝাইয়া সেখানে গেলাম।

পূর্বে যখন গিয়াছিলাম, তখন উচ্ছল ঢেউয়ের ধবল হাস্যের রকম রকম ফটো তুলিবার জন্য বারবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু একটাও ভাল ছবি উঠিল না। তাই ঐ ঢেউগুলির প্রতি মনে অল্প বিরাগ থাকিলেও এতখানি বিশ্বাস ছিল যে কথাবার্তার জন্য সেখানে অনুকূল আবহাওয়া অবশ্য পাওয়া যাইবে।

কিন্তু সেখানে গিয়া কি দেখিলাম ? গতবার যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম এবং যাহার কাব্যময় চিত্র আমি চিত্তমধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা নিষ্প্রভ করিয়া চিত্তমধ্য হইতে আগুনে ঘৃতাহুতির মত ঢেউয়ের এক অখণ্ড তাণ্ডব চোখের সামনে দেখিতে পাইলাম! এখন কোথায় রহিল বার্তালাপ, কোথায় রহিল অন্তরঙ্গ কথা! নেশা যেন আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। আমি যদি সেখানে একা থাকিতাম তাহা হইলে এই সব ঢেউয়ের তাণ্ডবে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইবার জন্য ভিতর হইতে যে একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলাম তাহা থামাইতে পারিতাম কিনা সে কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

একজন গান গাহিলে আর একজনেরও গাহিতে ইচ্ছা করে। একটি শৃগাল যদি রাত্রির শান্তিভঙ্গ করে তাহা হইলে অন্য বিপ্লবী শৃগালও অবশ্যই তাহার কণ্ঠের অনুশীলন করিবে। তার-বাঁধা সেতারের আসল তারটি নিজের প্রাণের সঙ্গে জুড়িয়া দিন, অমনি নিচের তার আপনা আপনি তাহার আনন্দঝঙ্কার আরম্ভ করিয়া দিবে। তাহা হইলে আমার মত প্রকৃতিপ্রেমিক জীব যদি প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শন করিয়া তাহার সহিত নিজের ভেদ ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে মানুষের চতুরতার দৃষ্টিতে উহাতে আশ্চর্যের কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু উহা অসম্ভব কিছু নয়।

হাতির সমস্ত শোভা যেমন তাহার গণ্ডস্থলে কেন্দ্রীভূত, দুর্গের সম্পূর্ণ শোভা তাহার গজেন্দ্রমোহন বুরুজে বিদ্যমান, জাহাজের শোভা তাহার উপরের ডেকে পরিপূর্ণভাবে দেখা যায়, সেইরূপ মনোরার এই সীমানায় দুর্গের সমান যে প্রাকার দাঁড়াইয়া আছে, তাহাই হইল এই দ্বীপের বিশেষ শোভা; আর সমুদ্রের ঢেউগুলিও এখানেই বপ্রক্রীড়া করিয়া তাহাদের কণ্ডূয়ন শান্ত করে। এই কণ্ডূয়নবিনোদ সর্বদা চলিতে থাকিলেও দর্শকের ইহাতে ক্লান্তি নাই। তাই এই দৃশ্য সর্বদা মনোহারী তো হয়ই, উপরন্তু এখানে লোকে এক দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করিয়া সমুদ্রের ঢেউগুলির সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে; এত বৎসর হইয়া গিয়াছে তথাপি ঢেউগুলি আজ পর্যন্ত এই অপমান সহ্য করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও কখনও পারিবে না। যতবার এই অপমানের কথা তাহাদের মনে পড়ে, ততবার তাহারা প্রচণ্ড সৈন্যদল লইয়া এই দেওয়ালগুলির উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে, আর এই সব পাথরের বাধা দূর করিবার জন্য একে অন্যকে ঠেলিয়া দেয়। কী তাহাদের উন্মাদনা! কী দৃঢ় তাহাদের এই প্রতিজ্ঞা, কী প্রাণঘাতী তাহাদের এই আক্রমণ! অদ্ভুত তাহাদের এই ক্রোধ চরম সীমায় পৌছিয়াছে। আর জিজ্ঞাসা করিবার কি আছে! স্বয়ং বীরভদ্র যেন ভূত প্রমথ ইত্যাদি সমস্ত শিবদাস লইয়া ঢেউয়ের আকার গ্রহণ করিয়া প্রলয়কাল সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে।

এক একটা ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া একটা পাহাড়ের মত বোধ হইতেছিল। একের উত্তুঙ্গ শোভা দেখিয়া অমনই অন্য ঢেউয়ের তাহার প্রতি কয়েকমুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তাহার পরিবর্তে, দুইয়ে এক হইয়া এক নূতন উচ্চতায় আসিয়া পৌছিতেছিল, চারিদিকের ঢেউগুলিও

ততখানি উচ্চতায় পৌঁছিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। আর এই তাণ্ডব নৃত্য মুহূর্তের জন্য না থামিয়া চলিতেছিল অখণ্ডরূপে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়। একাগ্রচিত্ত হইয়া যদি এই তাণ্ডব দেখিতে থাকেন, তাহা হইলে উহা এক বিশাল হ্রদ বলিয়া মনে হইবে। মনে হইবে যেন শিবতাণ্ডব স্তোত্রের প্রমাণিকা বৃত্ত তাহার শক্তি প্রয়োগ করিতেছে; আর প্রাণ ভরিয়া আসিলে প্রবাহবেগ বাড়িয়া গেলে দেখিতে না দেখিতে প্রমাণিকার পঞ্চচামর ছন্দ আসিয়া যায়। পুনরায় সম্বিৎ হারাইয়া পুষ্পদন্তও ঐ তালের সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে।

যেদিকে ঢেউয়ের আক্রমণ বেশি প্রবল, আর যেখানে আঘাতকারী ঢেউগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, আর আকাশে তাহাদের ইন্দ্রধনুতে লাগাইবার মত বড় বড় পাখা তৈয়ার হয়, সেখানে কতকগুলি সোপান অখণ্ড স্নানে রত ঋষিদের মত ধ্যান করিতে বসিয়াছে। ঢেউয়ের জল তাহাদের মাথায় পড়িয়া হাসিতে হাসিতে গোমূত্রিকাবন্ধ রচনা করিতে করিতে সোপানগুলি বাহিয়া নামিয়া যায়। দিল্লীতে আগ্রায় ও কাশ্মীরে বা মহীশূরের বৃন্দাবনে মানুষের বিলাসের যে উপকরণ নির্মাণ করা হইয়াছে এবং জলের প্রবাহ শ্রাবণ-ভাদ্রের বিশাল বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়া চালিত হইয়াছে, এখানে তাহাদের কথা মনে না করিয়া থাকা যায় না।

কিন্তু কিছু কিছু ঢেউতো সেই দীর্ঘ প্রাচীরের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া তাহার মাথার উপর দিয়া সুদীর্ঘ জলধারা ফেলিতেই ব্যস্ত। ঢেউ ধাক্কা দেয়, প্রাচীরের উপর ওঠে, প্রাচীরের প্রস্থ তুচ্ছ করিয়া সম্মুখে লাফাইয়া পড়ে আর হোলির পিচকারির মত দূর হইতে আমাদের লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসে—এই দৃশ্য সর্বপ্রকার উন্মাদনার সৃষ্টি করে। আর এই মহোৎসব পালন করিতে আগত আমরা, আমাদের স্বাগত-অভিনন্দন করিবার ভার তাহাদেরই উপর, একথা মনে করিয়া ধারাগুলি ও ঐ পাখার মধ্য হইতে পতিত জলকণাগুলি সমস্ত হাওয়াকে শীতল করিয়া তোলে। যখন এই সমস্ত হিম চোখের পাতার উপর, নাসারন্ধ্রের উপর ও বিস্ময়-বিস্ফারিত ওষ্ঠের ওপর আসিয়া জমে, তখন মনে হয় যে আমরা নগরবাসীও নই, গ্রামবাসীও নই, শুধু বরুণদেবের সমুদ্ররাজ্যের প্রজা।

আর মহাসাগরের উপর হইতে ছুটিয়া আসিতে আসিতে বিশুদ্ধ পবন বলে—

'এই দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্ত হইবার শক্তি তোমাদের ক্ষীণ পাষণ্ড-হৃদয়ে কোথা হইতে থাকিবে! চল, তোমাদিগকে সুদূর হইতে আনীত "ওজোন"-এর দীক্ষা দান করি, পাথেয় দিই। ওজোন যখন তোমাদের প্রাণমন পরিপূর্ণ করিয়া দিবে, তখন তোমাদের শ্বাসযন্ত্র হইবে প্রাণপূর্ণ, পবিত্র। তাহার পরেই তোমরা এখানকার জল হাওয়া সহ্য করিতে পারিবে।' আর সত্যই তাই। প্রাণবায়ুর শ্বাসোচ্ছ্বাস হইতে প্রত্যেকের মুখের উপর উষার লালিমা ছাইয়া গেল। আমরা আটজন আটদিকে তাকাইয়া তাকাইয়াও তৃপ্তি পাইতে পারিলাম না।

এই স্থানে আমাদের পূর্বে এক সিন্ধী ভদ্রলোক এক বৃহৎ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া নিঃশব্দে এই কাব্যে ওতপ্রোত হইয়া চিন্তায় যেন মগ্ন হইয়া ছিলেন।

তিনি না বলিতেছিলেন কথা, না নড়াচড়া করিতেছিলেন, না হাসিতে-ছিলেন, না গাহিতেছিলেন। অধীর হইয়া একটু একটু দুলিতেছিলেন। আমরা কথা কহিতেছিলাম, হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতেছিলাম। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটির তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি মানুষের স্ফূর্তি গ্রাহ্য করিতে-ছিলেন না, ঢেউগুলির উন্মাদনা গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা পান করিতে আসিয়াছিলেন। এক পা অন্য পায়ের উপর দিয়া তাহার উপর কনুই রাখিয়া, মাথাটা ঝুঁকিয়া তিনি সমুদ্রের ধ্যান করিতেছিলেন। তাঁহার চুলগুলির মাঝে মাঝে সীকরবিন্দুর মুক্তামালা চিকমিক করিতেছিল। বরুণদেব যেন তাঁহার বরদ হস্ত তাঁহার মাথায় রাখিয়া দিয়াছেন।

আমরা জায়গা বদল করিয়া করিয়া অনেক দৃষ্টিকোন হইতে এই দৃশ্য দেখিলাম। তাহাতে ঢেউগুলির মনে আমাদের প্রতি সদ্‌ভাব জাগিয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল, 'এস, এস, এতদূর হইতে কি দেখিতেছ, তোমরা তো পর নও। কাছে এস, স্ফূর্তি কর, ঢেউয়ের আনন্দ লুটিয়া লও, হাস আর খেল। এই বর্তমান ক্ষণ আর অনন্তকাল—ইহাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। এস, চলিয়া যাই।' ঢেউয়ের শিষ্টতা একটু অন্যরকমের হইয়া থাকে। নিমন্ত্রণ করিবার সময় যে হাত ধরেনা, পা ধুইয়া দেয়। আমরা সভ্যরীতি অনুযায়ী এই অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া বলিলাম, 'সত্যই প্রাণ আসিতে চায়। কিন্তু এখন নয়। এখনও আমাদের কাজ শেষ হয় নাই। অনেক বাকি আছে। আমাদের মনের অনেক সংকল্প এখনও অপূর্ণ। যে ভারতমাতার চরণ তোমরা অখণ্ডরূপে প্রক্ষালিত করিতেছ, তিনি এখনও

স্বাধীন হন নাই। মানুষে মানুষে কলহবিবাদ শান্ত হয় নাই। দরিদ্র ও অবদমিত জনসাধারণের সহিত যতক্ষণ সম্পূর্ণ একাত্ম অনুভব না হয়, ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে ঐক্যবোধের অধিকার আমরা পাইব কি করিয়া? তোমরা মুক্ত, তোমরা অখণ্ড কর্মযোগী, সর্বদা কর্মে রত বলিয়া কর্তব্যরূপে তোমাদের কিছু অবশিষ্ট নাই। আমরা তো কর্তব্যের পাহাড় সামনে দেখিয়াও আলস্তে পড়িয়া আছি। তোমাদের পংক্তিতে দাঁড়াইয়া নাচিবার অধিকার আমাদের নাই। তোমরা আমাদের প্রেরণা দাও। আমাদের মনে তোমাদের উন্মাদনা ভরিয়া দাও। তোমাদের বেদান্তভাবনা আমাদের চিত্তভূমিতে বপন কর। তাহা হইলে আমাদের কাজ শেষ করিতে, ভারতকে স্বাধীন করিতে আমাদের আর বিলম্ব হইবে না। আর এই একটি সংকল্প যদি পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কোনও কিছুতে বিষণ্ণ না হইয়াই আমরা তোমাদের নিকট ছুটিয়া আসিব। তোমাদের সঙ্গে অদ্বৈতজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করিব। আর তাহাতে যদি অস্থি মাংস বা চর্ম আপত্তি করে, তাহা হইলে কাপড় পরিলে অসুবিধা হইলে তাহা যেমন ছিঁড়িয়া ফেলা হয় তেমনি ভাবে এই শরীর আমরা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং পিণ্ডীভূত শরীরটাকে নূতন নূতন আকারে দেখিয়া হাসিতে থাকিব।'

"ঠিক কথা। যখন সুবিধা হইবে তখন আসিও। তোমরা আস আর নাই আস, আমাদের এই তাণ্ডব নৃত্যতো চলিতেই থাকিবে। জীবনের রাস শেষ করিয়া গোপীরা এখানে আসিয়া মিলিয়াছে। সংসারের চক্রব্যূহ হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত সাধুসন্ত, ফকির ও বাউল ইহাতে আসিয়া মিলিয়াছে। বিজ্ঞানীরা ও সত্যের উপাসকেরা ইহাতে আসিয়া শান্ত হইয়া গিয়াছে। কারণ আমাদের এই সংঘ বিরামহীন অশান্তির কলরোলের মধ্যেও তাহার শান্তির সাগর সংগীত শোনাইতে পারে।

"তোমরা কি এই সংগীত শুনিতে পাইতেছ?"

জুন, ১৯৩৭

সিন্ধুর পরে গঙ্গা

১৫ বা ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতের পশ্চিমদিকে ও রোহরী-সক্করের মধ্যে সিন্ধুর বিশাল পর্বে জলবিহার করিবার পর, আর ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে কোটরীর নিকটে ঐ সিন্ধুর শেষদর্শন করিবার পর, চোদ্দপনের দিনের মধ্যেই পূর্বদিকে পাটলীপুত্রের নিকট গঙ্গার পুণ্যপ্রবাহ দেখিতে পাইলাম। ইহা কতখানি সৌভাগ্যের কথা। আর্যদের বৈদিক মাতা সিন্ধু, ও সেই ভারতীয় সনাতন মাতা গঙ্গার দর্শন এইভাবে একের পর এক হইতে পারিলে সেই সৌভাগ্যকে কোন নদীমাতৃক বরণ করিয়া লইবে না? গঙ্গার ঐ জল কাজে লাগাইবার জন্য ভগীরথ যেমন গিয়াছিল, ঐ ভাবে যদি সিন্ধুরও কেহ মিলিত, তাহা হইলে রাজস্থান ও সিন্ধুদেশের ইতিহাস অন্য প্রকারে লিখিত হইত। সিন্ধু কেহ কিছু না বলিলেও বহু দিক দিয়া বহিতেছে; তাহার পাত্র বদলাইতে সঙ্কোচ নাই। তবু ভগীরথ ও জহ্নু মুনির মত ভক্ত ইঞ্জিনীয়ার যদি তাহার মিলিত, তাহা হইলে সে সিন্ধু ও সৌবীর দেশের জন্য কতই না করিত! আজও কি রোহরী ও সক্করের মধ্যস্থলে নিজের জল একত্র করিয়া নালায় নালায় সাতটি প্রবাহ দ্বারা এই স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী সিন্ধু সিন্ধুদেশকে তাহার স্তন্য পান করাইতেছে না?

সিন্ধু নদী পঞ্জাবের সপ্ত প্রবাহের জল একত্র করিয়া মিটনকোট ও কাশ্মীর পর্যন্ত যুক্তবেণী হইয়া আছে। সেই সিন্ধু সক্কর-রোহরীর পরে সর্বপ্রথমে মুক্তবেণী হইয়া যায়, আর কোট্‌টীর পর কেটী বন্দর পর্যন্ত না জানি মুক্ত বেণীগুচ্ছের মত কত ধারায় সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়াছে!*

* যে প্রদেশে অনেকে প্রবাহ এক নদীতে আসিয়া মেশে, সেই প্রদেশকে ইংরাজিতে 'region of tributaries' বলে। আর যেখানে এক নদীর মধ্য হইতে অনেক প্রবাহ বাহির হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে সেই প্রদেশকে বলে 'region of distributaries'। এই স্থানে সেই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য 'যুক্তবেণী' ও 'মুক্তবেণী' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

নদী যখন সমুদ্রে যাইবার জন্য দুই বা ততোধিক মুখে ভাগ হইয়া যায়, তখন মধ্যের সেই ত্রিকোণ অঞ্চলকে উক্ত আকৃতির গ্রীক অক্ষর অনুসারে 'ডেল্টা' (বাংলায় বদ্বীপ) বলে। আমরা ঐরূপ অঞ্চলকে 'নদীর পাখা' বলিতে চাই।

গোয়ালন্দ পর্যন্ত গঙ্গা যুক্তবেণী। গোয়ালন্দে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র মিলিত হইলে তাহাদের অসংখ্য স্রোত এমন উচ্ছৃঙ্খল ভাবে পরস্পর মিশিয়া বহিতে থাকে যে মুক্তবেণীর ও যুক্তবেণীর ভেদই আর করা যায় না। কলিকাতার পর সুন্দরবনে অবশ্য পদ্মা 'ডেল্‌টা' (ব-দ্বীপ) দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গঙ্গার বিস্তার যে শুধু অতখানি, তাহা বলা যায় না।

গান্ধী-সেবাসংঘের শেষ অধিবেশনের জন্য আমরা মালিকান্দা গিয়াছিলাম। সেবার আসাম প্রদেশের শিলং-এর পথে সুরমা উপত্যকা হইয়া গিয়াছিলাম। যাইতে আসিতে ভগবতী গঙ্গাকে বিচিত্রভাবে দর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্রাট অশোকের পাটলিপুত্রের (বর্তমান পাটনার) নিকটে গঙ্গার যে শোভা তাহার তুলনা নাই। পাটনার নিকটে বিভিন্ন সময়ে আমি অন্তত তিন চারবার গঙ্গা পার হইয়াছি। তথাপি সেখানে গঙ্গা দর্শনের নবীনতা কম হইয়া যায় নাই। আমার ধারণা, নেপাল যাত্রা শেষ করিয়া আমি মজঃফরপুর দিয়া যখন কলিকাতা যাই তখন সর্বপ্রথম পাটনায় গিয়াছিলাম। তখন ফাল্গুন মাস। যেখানে যাই আম্রমুকুলের গন্ধে হাওয়া ভরপুর। আর নিজেরই অজ্ঞাতসারে আমি পাটনার ছোটবড় রাস্তায় মাতালের মত অন্তরে অন্তরে বসন্তোৎসব পালন করিতেছিলাম। সেখানে মনের উপর প্রথম যে ছাপ পড়িল, তাহা আজও মোছে নাই। তাহা হইলেও ইহার পর যখনই পাটনায় গিয়াছি তখনই কিছু না কিছু নবীনতা অবশ্যই পাইয়াছি।

রাজেন্দ্রবাবু যেখানে থাকেন ও যেখানে বিহার বিদ্যাপীঠ চলিতেছে সেই সদাকত আশ্রম গঙ্গার ঠিক ধারেই অবস্থিত। আশ্রমের সম্মুখের রাস্তা পার হইয়া তিনফুট বাঁধের উপর চড়িলেই চোখে পড়ে পশ্চিম হইতে আগত পূর্ববাহিনী গঙ্গার বিস্তীর্ণ জলধারা। যদি ওপারের তীর দেখিতে চেষ্টা করি তবে মাটির এক সরু রেখা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। চমকাইয়া গিয়া আপনি যদি পাশের কাহাকেও বলেন, 'গঙ্গা এতখানি চওড়া'! তাহা হইলে সে তাড়াতাড়ি হাসিয়া বলিবে, 'ঐ যে আপনার সামনে দেখিতে পাইতেছেন, উহা তো কেবল একটা দ্বীপ। উহা ছাড়াইয়াও গঙ্গার স্রোত আছে। ওপাড় হইতে এপাড় দেখা যায় না।'

সামনে যে সরু এক রেখা দেখা যাইতেছে উহা একটা বিস্তীর্ণ দ্বীপ, একথা শুনিয়াও বিশ্বাস হয় না যে এতখানি বিস্তৃত জলরাশির পরে, রেখার ওপাড়ে

আরও জলের বিস্তার থাকিতে পারে। সন্দেহ একবার মনে জাগিলে তাহা অবশ্যই কৌতূহলের রূপ ধারণ করে। কৌতূহল পরিপক্ক হইলে তাহার মনে সংকল্প জাগে। মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিতে সংকল্পের মত আর কি থাকিতে পারে?

সদাকত আশ্রমে থাকিতে থাকিতে রোজ গঙ্গার ধারে বেড়ানো আমার কাজ ছিল। কারণ গঙ্গার সংস্কৃতিপূত মোহিনীশক্তি না থাকিলেও পুরাণপুরুষের মত তটস্থ দণ্ডায়মান বৃক্ষশ্রেণী আমাকে আকর্ষণ না করিয়া পারে না। সহ্যাদ্রি বা হিমালয়ের উত্তুঙ্গ বৃক্ষ যে দেখিয়াছে, তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার শক্তি সাধারণ বৃক্ষে কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু গঙ্গার তীরে, পাটনার চারধারে, যোজনের পর যোজন চলুন—চারদিকে উঁচু উঁচু গাছগুলি তাহাদের পুষ্টশাখা চারিদিকে উপরে ও নীচে বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া রাখিয়াছে দেখা যায়। এককালে পাটনা ছিল সম্রাট অশোকের রাজধানী। আজ সেই পাটনা বৃক্ষরাজির এক বিশাল সাম্রাজ্য পোষণ করিতেছে।

এরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া, খুব দূর হইতে নয়, খুব নিকট হইতেও নয়, এই সকল বড় বড় বৃক্ষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা যদি মন দিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাদের স্বভাব, তাহাদের চিত্তবৃত্তি, তাহাদের কৌলীন্যের ধারণা স্পষ্ট না হইয়া পারে না। সমস্ত বৃক্ষই তপস্বী নয়। কোনও কোনও বৃক্ষ মৌনী ও ধ্যানী বলিয়া মনে হয়, কেহ কেহ ক্রীড়াপ্রিয়, কেহ বিয়োগী বিরহীর মত, কেহ কেহ উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মত। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাহারা নিজেদের সত্তা ত্যাগ করে না। কোনও কোনও বৃক্ষের শাখা উপরে এতখানি ছড়াইয়া আছে যে মনে হয়, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাহা বাঁচাইবার কাজ বুঝি তাহাদের দায়িত্ব।

চারজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক শান্তির সহিত গম্ভীরভাবে কথা বলিতেছেন আর শিশুরা তাঁহাদের কোলে লাফালাফি করিতেছে, এমন দৃশ্য আপনি কখনও দেখিয়াছেন কি? বৃদ্ধরা শিশুদের তিরস্কার করিতেছেন না—আদর করিয়া তাহাদের কোলে করিতেছেন। তথাপি তাঁহাদের গম্ভীর আলোচনায় ঢিলা পড়ে নাই। গঙ্গার তীরে এই যে সনাতন বৃক্ষগুলি আলোচনা করিতেছে ইহাদের মধ্যে যখন ছোটবড় পাখি মধুর কলরব করিয়া ওঠে, তখন ঠিক সেই বৃদ্ধ ও শিশুর মিলনদৃশ্য নূতনরূপ লইয়া চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা নিকটবর্তী। সন্ধ্যাকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতাম, তখন গাছের আড়াল হইতে চাঁদামামা দর্শন দিতে থাকিতেন। আমরা এখানে এক নূতন আনন্দের সন্ধান করিলাম। দেখিলাম ভিন্ন ভিন্ন আংটির মধ্যে রাখিলে হীরা যেমন নূতন নূতন শোভা ধারণ করে, ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের অন্তরাল হইতে চাঁদও তেমনি নূতন নূতন রূপে দেখা দেয়।

একবার দেখিলাম দুই ডালের মধ্যে চাঁদও শিং-এর মত খাড়া হইয়া আছে। পরে দেখিলাম, গোল কীপারের মত একটা বড় গাছ যেন চাঁদকে ফুটবলের মত ছুঁড়িয়া দিতেছে। দীঘা ঘাটের নিকটে এক জায়গায় দুইটা গাছের মাঝামাঝি চন্দ্র এমন ভাবে বসিয়া ছিল যে, মনে হইতেছিল, গাছ দুইটি বুঝি 'এ চাঁদ তোমার নয়, আমার' বলিয়া নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিতেছে। শেষকালে এই দুই গাছের ঝগড়া মিটাইবার জন্য চাঁদ মুখবিকৃতি করিয়া বলিল, 'তোমাদের দুইজনের মধ্যে আমি কাহারও নই, যাও।' এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিল না, সোজাসুজি উঁচুতে উঠিয়া গেল। চন্দ্রের এই তটস্থভাবের প্রশংসা করিয়া আমরা সামান্য একটু আগে গিয়াছি, ইহার মধ্যেই সে তাহার জজিয়তি (বিচারকের গৌরব) ভুলিয়া গিয়া একটা গাছে আটকাইয়া গেল, আর শেষে বহু শাখায় জড়াইয়া গিয়া হাসিতে লাগিল।

মনে মনে সংকল্প জাগিল—এইরূপ জ্যোৎস্নায় কিছুটা সময় যদি সম্মুখের ঐ নির্জন চরে কাটাইতে পারি তাহা হইলে কী সুন্দর হয়! হোলি ও ধুলটের দিনতো ছাড়িয়াই দিতে হইল, কারণ লোকে হোলিতে পাগল হইয়া গিয়াছিল. দুইদিন পর্যন্ত গঙ্গাতীরের আবর্জনা ও গাছের রং অনুকরণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। যখন তাহারা ইহা হইতে নিবৃত্ত হইল তখন আমরা একটা নৌকার ব্যবস্থা করিয়া রওনা হইলাম।

চন্দ্র উঠিবার পূর্বে রওনা হইলে আর মজা কি? কিন্তু চন্দ্রের মোটেই উঠিবার তাড়াতাড়ি ছিল না। যদি বা উঠিল তবে আলো দিল না। কেহ না জানিলেও যেমন নূতন ধর্ম স্থাপিত হয়, ঠিক সেইভাবে চন্দ্র উঠিল। তাহার আলো এত মৃদু ছিল যে স্বাতিরও যেন তাহাকে দেখিয়া ভয় লাগিত। চন্দ্রের আলোই যখন এত মৃদু তখন তাহার চিত্রা যে অদৃশ্য থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? শক্তি ও গুরু মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছিলেন। তারকাঙ্কিত কুটিরের গৃহস্বামী অগস্তি দক্ষিণ দিকে আরোহণ করিতেছিলেন।

আমাদের নৌকা চলিতে আরম্ভ করিল। জলে চন্দ্রের এক দীর্ঘ স্তম্ভ দেখা যাইতে লাগিল। প্রথমে স্থির, পরে চঞ্চল। আমরা যেমন যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই জলের উপরিভাগ ক্রমেই চঞ্চল হইতে লাগিল, আর চন্দ্র-প্রতিবিম্ব নানাপ্রকারের আকৃতিতে দেখা দিতে থাকিল।

আমার মনে হইল, জলের পরিমাণও গতির মন্দবেগের সঙ্গে ঐ সব আকৃতিরও বদল হয়। তাহা হইলে ইহাদের দেখিয়া শুনিয়া প্রত্যেকের পৃথক পৃথক নাম দিয়া এমন পরিকল্পনা কি করা যায় না যে নদীর গতিবেগ দেখাইবার জন্য ঐসব আকৃতির নাম বলিয়া দেওয়া যায়? উচ্চ ও নীচ ধ্বনির যদি আমরা 'সা রে গ ম প ধ নী' নাম দিতে পারি অত্যন্ত উগ্রতাপকে সূর্যকান্তি উষ্ণতা বলিতে পারি, তাহা হইলে নদীর গতিবেগকে গোমুত্রিকা বেগ, বলয়বেগ, আবর্তবেগ, বিবর্তবেগ ইত্যাদি নাম কেন দিতে পারি না?

এই কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আমি চিন্তার আবর্তে তলাইয়া গেলাম। চিত্রা কখন উঠিল তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। আমরা নদীর মাঝখানে গেলে আমার প্রার্থনার কথা মনে হইল। এমন জায়গায় চোখ বুঝিয়া কি আর অন্ধকারে প্রার্থনা করা যায়? আমাদের প্রার্থনার স্বামী যখন আমাদের সামনে নানারূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান, তখন, আমরা চোখ বুজিয়া কি প্রকারে গুহা প্রবেশ করিব? 'রসো বৈ সঃ' বলিয়া আমরা যাঁহাকে জানি, তিনি যখন রসপূর্ণ ভূমি, পবিত্র জল, সৌম্য তেজ, আনন্দদায়ী পবন ও পিতৃবাৎসল্যে আমাদের পর্যবেক্ষণ করিতেছে যে এই আকাশ তাহার বিস্তার প্রভৃতি নানারূপে দর্শন দিতেছেন আর আমরা 'বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ, রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে' এই শ্লোক গাই, তখন সমগ্র জীবনদর্শন নূতনভাবে করিতে হয়। গভীর চিন্তা যে দীর্ঘ হইবেই, এমন কোনও কথা নয়। রসের নিবর্তন কখন হয় আর পরিবর্তন কিভাবে হয়, ইহার সমস্ত মীমাংসা আমি তিনচার মুহূর্তেই করিয়া লইলাম, দেখিতে দেখিতে প্রার্থনায় নবীনতা আসিল। 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' ধ্বনি আরম্ভ হইল, চঞ্চল মন জীবনরসের গভীর মীমাংসা ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'রামচন্দ্র গুহকের সাহায্যে কোন জায়গাটিতে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন? গুহকের নৌকা আমাদের নৌকার মত চওড়া ছিল, না কোনও গাছের কাণ্ড দিয়া তৈরী ছোট একটা ডিঙ্গীর মত ছিল?'

কথায় কথায় আমরা সেই চরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সলিল-বিহার ছাড়িয়া সিকতা-বিহার আরম্ভ করিলাম। ঝিকমিক করিতেছিল জল, ঝিকমিক করিতে করিতে বালু, তাহা অপেক্ষা কম আনন্দ দিতেছিল না। চরের ধারে অল্প কিছু দূর্বা গজাইয়াছিল। মুহূর্ত চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম এখানে সাপ, বিছা, কাঁটা কিছুই থাকিতে পারে না। শুধু অখণ্ড বালুকাই বিছানো আছে। যদি কোনও চিহ্ন থাকে তবে তাহা শুধু অস্থিরগতি পবনের ঢেউয়ের জন্য। গঙ্গার ঢেউ বালুকার মধ্যে যে সব আকৃতি করিয়া রাখিয়াছে খেয়ালী পবন তাহা কি করিয়া নষ্ট করে তাহার হিসাব বা ছবি এখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। বালুকার উপর আকৃতিগুলি দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন পাঠশালার শিশুরা ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের খাতা, শ্লেট, বই সব এদিক ওদিক ছড়াইয়া আছে। কোথাও ঢেউ পবনের লেখা দেখাইয়া দিতেছিল, কোথাও ঢেউয়ের স্বরলিপি বালুকায় আঁকা দেখা যাইতেছিল। ইহার মধ্যে আমার পদরেখা আঁকিতে আমার মন চাহিতেছিল না। কিন্তু বালুর ক্ষণভঙ্গুর স্তূপ যখন পায়ের নীচে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তখন পাপড় খাওয়ার মত মজা লাগিতেছিল। পায়ের আনন্দ সমগ্র শরীরে অনুভব করিতেছিলাম; তাহাতে মনে হইতেছিল, প্রকৃত মুষলের মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চলার পূর্ণ আনন্দ নাই। 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত' বলিয়া দাবি করিবে এমন গর্দভ ওখানে কেহ ছিল না। তাই নির্ভয়ে বালুকার উপর শুইয়া পড়িবার কথা ভাবিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সঙ্গীরা সকলে এ বিষয়ে একমত হইলেন না। কাহারও আত্মসম্মানে ঘা লাগিল, কাহারও প্রতিকূল হইল মলিন আবর্জনা। আমাদের খালাসীরা তো আমাদের ওখানে নামাইয়া দিয়া কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার জন্য চরের অন্য প্রান্তে চলিয়া গিয়াছিল। মদের দোকানের ভৃত্য যেভাবে পানাসক্তদের দেখে, সেই দৃষ্টিতে তাহারা আমাদের মত সৌন্দর্যপিপাসু লোকদের দিকে হয়ত দেখিয়াছিল।

গয়া কংগ্রেসের পর আমরা চম্পারণের দিকে গিয়াছিলাম; তখন এই জায়গায় আমাদিগকে গঙ্গা পার হইতে হইয়াছিল। তখন আশ্রমের দুইজন ছাত্র এক মধুর ভজন গাহিয়াছিল, 'মঙ্গল করহু দয়া-আ-আ করী দেবী।' এই জায়গায় আসিবামাত্র সেই সমস্ত কথা মনে পড়িল আর আমি ভীমসেনের অনুকরণে মুক্তকণ্ঠে গাহিতে লাগিলাম। সঙ্গীরা উদারতার সঙ্গে সে সমস্ত

সহ্য করিল। ইহাতে আমি আরও প্রশ্রয় পাইয়া গেলাম, মথুরাবাবুকে বলিতে লাগিলাম, 'আমাকে ছাপরা হইতে মুঙ্গের পর্যন্ত নৌকায় যাইতে হইবে। কত সময় লাগিবে?' এরূপ ভ্রমণ আমার অদৃষ্টে আছে কিনা ঈশ্বর জানেন! কিন্তু কল্পনাতে তো আমি ইহা করিয়াও ফেলিয়াছিলাম।

আকাশে ব্রহ্মহৃদয় অস্ত যাইবার আয়োজন করিতেছিল। মহাশ্বান তাহার মৃগয়ায় বিভোর ছিল। অগস্তির কুটির এখন তাহার জায়গায় গিয়াছিল। আর কৃত্তিকা তটস্থভাবে ঈষৎ হাস্য করিতেছিল। পুনর্বসুর নৌকা তাহার অগ্রভাগ একটু উঁচা করিয়া দক্ষিণদিকে যাত্রা শুরু করিল, আর আমাদিগকে মনে করাইয়া দিল যে আমরা এই চরের অধিবাসী নহি; এখান হইতে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং পরীদের সৃষ্টি ছাড়িয়া মানুষের জগতে থাকিতে হইবে। আমরা শীঘ্রই চরের কিনারে আসিয়া পৌঁছিলাম, পুনর্বসুর মত নিজেদের নৌকা দক্ষিণ দিকে ফিরাইলাম।

'এখানে আবার কবে আসিব!' এরূপ বিষাদের ভাব মনের মধ্যে জাগে নাই। গঙ্গোত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত বহুবার গঙ্গা-দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়াছি, মাতার কৃপায় ভবিষ্যতেও অনেকবার দর্শন হইবে। এখন এই পূর্ণানন্দের মধ্যে ঘাটতি-বাড়তির কোনও সম্ভাবনা নাই। তাই ফিরিবার সময় আপনা হইতেই মুখ দিয়া শান্তিবচন বাহির হইয়া পড়িল :

ওঁ পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

এপ্রিল, ১৯৪১

৩৫

নদীর উপর খাল

শ্রাবণ পূর্ণিমার অর্থ হইল উপবীত ধারণের দিন ; আর যদি ব্রাহ্মণ্যের কথা ভুলিয়া যাই তবে রাখীর দিন। সেদিন আমরা রুড়কি পৌছিলাম। দেখিতে দেখিতে ফুর্তিবাজ বেণীপ্রসাদ আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া লইল আর বলিল ; 'ও কাকাজী, আজতো আপনার হাত হইতেই পৈতা লইব। আপনিই আমাকে পৈতা দিবেন।' বেণীপ্রসাদের মামা ছিল আমার পরম ভক্ত। তাহার সঙ্গে পৈতা লইয়া আলোচনা চলিল। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণেরা চাহেন যে শুধু তাঁহারা নন, দ্বিজ তিন বর্ণই নিয়মিতরূপে উপবীত গ্রহণ করেন এবং সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম করেন। কিন্তু এখানকার লোকদের বড় অনাস্থা। ইহার ঠিক বিপরীত, দক্ষিণে যদি ব্রাহ্মণেতর বর্ণ উপবীত চায় তখন মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণেরা 'কলৌ আদ্যন্তয়োঃ স্থিতিঃ' বচন অনুসারে এমন অন্যায় জিদ ধরিয়া বসেন যেন মাঝের দুই বর্ণ একেবারেই নাই (সৌভাগ্যের বিষয়, আজ আর এরূপ অবস্থা নাই)। যাহাদের উপবীত গ্রহণের অধিকার আছে, তাহারা উহা গ্রহণে উদাসীন, আর যাহারা হাতে পায়ে ধরিয়াও উপবীত গ্রহণের অধিকার পাইতে চায় তাহাদের দ্বিজত্ব প্রমাণের পথে বাধা ও অসুবিধার সৃষ্টি করা হইতেছে। এই আলোচনা শুনিয়া বেণীপ্রসাদের মনে হইল 'আজ আমার পৈতা হইবে না।' সে আরজি পেশ করিল : 'কলিযুগে কি এমন আছে যাহা হইতে পারে না? নদীর উপর যদি নদী চড়িতে পারে, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণও আমাদিগকে পৈতা দিতে পারেন।' আরজি মঞ্জুর হইল। কিন্তু আলোচনার বিষয় পরিবর্তিত হইল। কলিযুগে ভগীরথদের নৈপুণ্যের উদাহরণ স্বরূপে গঙ্গার খালের কথা হইতে লাগিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা মানুষের এই প্রতাপ দেখিতে বাহির হইলাম। গঙ্গার খাল শহরের নিকট দিয়া চলিয়াছে। ছেলেরা উহাতে মাছের মত খেলা করিতেছিল। খালের ধার দিয়া আমরা সেই বিখ্যাত পুল পর্যন্ত

গেলাম। দৃশ্যটি সত্যই সুন্দর ছিল। পুলের নাচ দিয়া গরিব ব্রাহ্মণীর মত সোলানা নদী বহিয়া যাইতেছিল আর উপর দিয়া গঙ্গার খাল তাহার বিস্তার একটুও সঙ্কুচিত না করিয়া পুলের উপর দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল। পুলের উপর জলের ওজন এত বেশি ছিল যে মনে হইতেছিল এখনই বুঝি দুই দিকের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িবে আর দুই দিক হইতে হাতির দলের মত বড় প্রপাত পড়িতে আরম্ভ হইবে। পুলের দেওয়ালের উপর দাঁড়াইয়া খালের স্রোত দেখিতে দেখিতে মনের উপর তাহার প্রভাব পড়িতেছিল। দুঃখী ব্যক্তির যেমন উদ্বেগের নূতন নূতন আবেগ আসে, খালের জলেও তেমনি আবেগ আসিতেছিল। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে আসিয়া নববধূ নূতন পরিবেশে যেমন তাহার সকল ভাবনা চাপিয়া রাখে, গঙ্গার এই পরাধীন পুত্রীও তেমনই তাহার সকল আবেগ চাপিয়া রাখিতেছিল। তাহার বিস্তার দেখিয়া প্রথম দর্শনে মনে হইতেছিল এ বুঝি কোনও ধনগর্বিত শেঠানী। কিন্তু নিকটে আসিয়া দেখিলে শ্রীমতীর আকৃতিতে পরাধীনতার দুঃখই চোখে পড়িতেছিল।

উপর হইতে নীচে দেখিলে নিম্নবাহিনী সোলানার ক্ষীণ কিন্তু স্বতন্ত্র প্রবাহের দুই দিক দিয়া আকর্ষণ বোঝা যাইতেছিল। ব্যথা শুধু এইটুকু ছিল যে খালের দুই দিকের প্রাচীরে পরিবাহক রূপে কয়েকটি ছিদ্র রাখা হইয়াছিল তাহাতে খালের প্রশস্ত জল এইভাবে সোলানাতে পড়িতেছিল যে মনে হইতেছিল উহা বুঝি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

আমরা পুল হইতে নীচে নামিলাম এবং সোলানার তীরে গিয়া বসিলাম। উপর হইতে কৃত উপকার অস্বীকার করিবে, সোলানা এতখানি মানিনী ছিল না। যদি কৃপাবৃষ্টি হয় তাহার জন্য লুব্ধ হইয়া থাকিবে এতখানি হীনও সে ছিল না। হীনতা তাহার মধ্যে এতটুকুও ছিল না। আর মানিনী বৃত্তি তাহাতে শোভাও পাইত না। তাহার সরল স্বাভাবিকতা, প্রযত্নবিকশিত উদাত্ত চরিত্র অপেক্ষাও বেশি মানাইয়াছিল।

ভগীরথ বিদ্যায় (ইরিগেশান ইঞ্জিনীয়ারিং) জলের প্রবাহ লইয়া যাইবার ছয়টি উপায় নির্দিষ্ট আছে। তাহার মধ্যে এক প্রবাহের উপর দিয়া অন্য প্রবাহ লইয়া যাওয়ার পরিকল্পনা অদ্ভুত ও অত্যন্ত কঠিন উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়। রেল বা মোটরের এইভাবের পথ আমরা অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু যতদূর জানি ভারতবর্ষে এই প্রকারের জলপ্রবাহের ইহাই একমাত্র

দৃষ্টান্ত। সংস্কৃতির প্রবাহের দিক দিয়া যদি ভাবি, তাহা হইলে দেখিব যে সমস্ত ভারতবর্ষ এই প্রয়োগেই পরিপূর্ণ। এখানে প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ সংস্কৃতি আছে, আর অনেকবার এদিকে ওদিকে মিলিলেও তাহারা পরস্পর হইতে অনেক দূর পর্যন্ত অস্পৃষ্ট থাকিতে পারিয়াছে।

১৯২৬-২৭

৩৬

নেপালের বাঘমতী

কাশ্মীরের যেমন দুধগঙ্গা, নেপালের তেমনি ওয়াঘমতী বা বাঘমতী। এতটুকু ছোট নদীর প্রতি আর কাহারও দৃষ্টি পড়িবে না। কিন্তু বাঘমতী ইতিহাসে এমন এক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে লক্ষ লক্ষ যুবকের মুখে তাহার নাম। নেপালের উপত্যকা অর্থাৎ আঠারো ক্রোশ জুড়িয়া বেষ্টনীর মধ্যে চারদিকে পাহাড়ের দ্বারা সুরক্ষিত রমণীয় ডিম্বাকৃতি ময়দান। দক্ষিণ দিকে ফরপিগনারায়ণ তাহার রক্ষক। উত্তর দিকে গৌরীশঙ্করের ছায়ার নীচে চঙ্গুনারায়ণ উহাকে সামলান ; পূর্বদিকে আছেন বিশঙ্কুনারায়ণ, এবং পশ্চিমদিকে ইচঙ্গুনারায়ণ।

হিমালয়ের ক্রোড়ে সমাসীন স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের এই সীমানায় তিনটি রাজধানী আছে, এমন ভাবে আছে যে মনে হয় বুঝি তিনটি খণ্ড কেহ রাখিয়া দিয়াছে। ললিতপট্টন হইল সুপ্রাচীন রাজধানী ; তাহার পরে ভাদগাঁও আর আজকালকার কাঠমাণ্ডু বা কাষ্ঠমণ্ডপ। নেপালের মন্দিরের রচনা-নৈপুণ্য হিন্দুস্থানের অন্যান্য জায়গা হইতে ভিন্ন। মন্দিরের ছাদ হইতে যেখানে বর্ষার জলধারা বহিয়া পড়িতেছে, নেপালীরা সেখানে ছোট ছোট ঘন্টি ঝুলাইয়া রাখে। আর মাঝখানে যে গোলকটি ঝোলে তাহাতে পিতলের 'পিপুলপান' লাগাইয়া দেয়। একটু বাতাস লাগিলেই তাহা নাচিতে শুরু করে। এই কলা তাহাদিগকে শিখাইতে হয় না। একসঙ্গে অনেক কয়টি ঘণ্টা কিঙ্কিণীর শব্দ করিতে থাকে। এই মনোজ্ঞ ধ্বনি মন্দিরের শান্তি ভঙ্গ করে না। বরং শান্তিকে

আরও গম্ভীর করে, আরও মুখরিত করে। ভাদগাঁওয়ের কয়েকটি মূর্তি তো শিল্পকলার অদ্ভুত নিদর্শন। শিল্পশাস্ত্রের নিয়মগুলি রক্ষা করিয়াও কলাকার তাহার প্রতিভাকে কতখানি স্বাধীনতা দিতে পারে, তাহার নিদর্শন যদি দেখিতে হয় তবে এই মূর্তিগুলি দেখুন। মনে হয় যে এখানকার কলাকার শিল্পী, কলাকে অতিমানুষী বলিয়াই মনে করে।

ক্ষেতের মধ্যে দূরে দূরে সুদর্শন স্তূপ এমনই সুন্দর, মনে হয় যেন সমাধির ভাবে নিমগ্ন রহিয়াছে।

আর কাঠমাণ্ডু তো আজিকার নেপাল রাজ্যের ঐশ্বর্য। নেপালে যাইবার অনুমতি সহজে পাওয়া যায় না। এজন্য পর্দার পিছনে কি আছে, অবগুণ্ঠনের মধ্যে কি ধরনের সৌন্দর্য আছে তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল যেমন আপনিই উৎপন্ন হয়, নেপালের বিষয়েও সেই কথা খাটে। আট দিন থাকিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। যাহা কিছু আছে তাহা দেখিয়া লও। ফিরিয়া গেলে আর আসিতে পারা যাইবে না। মনের এই অবস্থায় যে দিকে তাকাও সেখানে দৃষ্টিপথে কাব্যই ভাসিয়া আসে।

পশুপতিনাথের মন্দির কাঠমাণ্ডু হইতে দূরে নয়। উহা দেখিলে মনে হয়, মন্দিরের ভিড়ের মধ্যে বড নন্দী বা বৃষ বুঝি বসিয়া আছে। নিকটেই বাঘমতী রহিয়াছে। বালুমাটির উপর দিয়া তাহার জল বহিয়া যায়, তাই উহা সর্বদাই একটু কাদা কাদা বলিয়া মনে হয়। উহাতে সাঁতার দেওয়ার ইচ্ছা অবশ্যই হয়, কিন্তু জলটা ততখানি গভীর হইলে তো? গুহেশ্বরী ও পশুপতিনাথ, উভয়ের মধ্যে এই নদী বহিয়া যাইতেছে, এইজন্য তাহার মহিমা।

পশুপতিনাথ হইতে আমরা সোজা পশ্চিম দিকে শিঙ্গুভগবানকে দর্শন করিতে গেলাম। পথে দেখা হইল বাঘমতীর ভগ্নী বিষ্ণুমতীর সঙ্গে। এই নদীর উপর যেখানে সেখানে পুল আছে। পুল কেন? নদীর উপর জল হইতে এক হাত উঁচুতে কাঠের এক এক বিঘত চওডা তক্তা। যদি কেহ সামনে দিয়া আসে, তবে দুজনে এক সঙ্গে ঐ পুল দিয়া পার হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে কোনও একজনকে জলে নামিতে হয়। কোথাও কোথাও জল বেশি গভীর ; সেখানে বড জোর গুল্‌ফ পর্যন্ত ডুবিয়া যায়।

শিঙ্গুভগবানের তল্লাটে ধ্যানী বুদ্ধের এক বড মূর্তি স্বর্যের তপস্যায় রত। শৃঙ্গের উপর এক মন্দির। তাহাতে তিনটি মূর্তি আছে। এক বুদ্ধ ভগবানের,

দ্বিতীয়, ধর্ম ভগবানের ; তৃতীয়, সংঘ ভগবানের। প্রত্যেকটির সামনে ঘিয়ের বাতি জ্বলিতেছে। আর এক কোণে কাঠের তৈরী এক চৌকাঠে পিতলের এক হল্‌দে ফলক দাঁড় করানো, তাহাতে 'ওম্ মামে পামে হুম্' (ওম্ মণিপদ্মে হুম্) এই পবিত্র মন্ত্র কয়েকবার খোদাই করা আছে। হাত ঘুরাইলে উহা গোল হইয়া ঘুরিতে থাকে। রুদ্রাক্ষ বা তুলসীর মালা ফেরানোর চেয়ে ইহাতে অনেক সুবিধা। চক্র প্রত্যেকবার ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে যতবার মন্ত্র লেখা আছে ততবার নিজের মন্ত্র জপ করা হইল। আর ততটা পুণ্য নিজের আপনা আপনি লাভ হইল! ইহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। 'নাত্র কার্যবিচারণা!' তথাগত যে তাঁহার বাণীর এই স্বরূপ দেখিতে পান নাই, ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি! এই মন্দিরের নিকটে পিতলের তৈরী ইন্দ্রের বজ্র এক চত্বরের উপর রক্ষিত আছে। ইহার আকার ভগিনী নিবেদিতার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পতাকার উপর ইহার চিত্র যেন অঙ্কিত থাকে।

বাঘমতীর তীরে ধান, গম, মকাই যথেষ্ট উৎপন্ন হইতেছে। অড়হর সেখানে হয় না। জানি না, ইহারা তাহা উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিনা। তুলা উৎপাদন করিবার চেষ্টা এখন কিছু কিছু হইতেছে।

বাঘমতী নেপালীদের গঙ্গামাতা। গোরক্ষনাথ তাহাদের পিতা।

১৯২৬-২৭

৩৭

বিহারের গণ্ডকী

ছেলেবেলায় এইটুকু শুনিয়াছিলাম যে গণ্ডকী নদী নেপাল হইতে আসে, আর উহার মধ্যে শালগ্রাম পাওয়া যায়। শালগ্রাম এক ধরনের শংখের মত প্রাণী ; উহা তুলসী পাতা খুব ভালবাসে। জলে তুলসীর পাতা ফেলিয়া দিলে উহা ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া পাতা খাইতে আরম্ভ করে ; তখন লোকে উহাকে ধরিয়া উহার ভিতরে প্রাণীটিকে মারিয়া ফেলে, এবং পাথরের মত ঐ শংখ

পরিষ্কার করিয়া পূজার জন্য বিক্রয় করে ; কিন্তু আধুনিক যুগের ধূর্ত লোকেরা কালো রং-এর এক টুকরা শিলা লইয়া উহার মধ্যে ছিদ্র করিয়া নকল শালগ্রাম তৈরী করে। এরূপ কয়েকটি উদাহরণ আমরা শুনিয়াছি। এইজন্য কতবার মনে হইয়াছে, যাই, এমন একটি নদী একবার দেখিয়া আসি।

মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ কোথাও লিখিয়াছিলেন, নর্মদার পাথর মহাদেবের বাণলিঙ্গ, এবং বিষ্ণুর শালগ্রাম বৌদ্ধস্তূপের প্রতীক হিসাবে গণ্ডকী হইতে আনীত প্রস্তরখণ্ড। প্যারিসের সুবৃহৎ প্রদর্শনীর সময় তিনি কোনও বক্তৃতা বা লেখায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বাণলিঙ্গ ও শালগ্রাম বৌদ্ধ জগতের দুই স্তর সূচিত করে।

গঙ্গার যেখানে উৎপত্তি সেখান হইতেই সে দুই দিক হইতে কর-ভার লইয়া অগ্রসর। উহার মণ্ডলীর নদীগুলি অধিকাংশই উত্তর দিকের অথবা বাঁ দিকের। চম্বল ও শোণের কথা ছাড়িয়া দিলে, দক্ষিণ হইতে উত্তর অভিমুখে আর কোনও বড় নদী যায় না। দক্ষিণবাহিনী মাণ্ডলিক নদী গণ্ডকী গঙ্গার জন্য বিহারের জল লইয়া আসে।

আমরা সকলে মজঃফরপুর গিয়াছিলাম ; একদিন গণ্ডকীতে স্নান করিতে গেলাম। বিহারের ভূমি হইল অনাসক্তির আদি প্রবর্তক সম্রাট জনকের কর্মভূমি, অহিংসাধর্মের মহান্ প্রচারক মহাবীরের তপোভূমি, অষ্টাঙ্গিক মার্গের সংশোধক ভগবান বুদ্ধের বিহার-ভূমি। এই সকল ধর্মসম্রাট এই নদীর তীরে তীরে রাতদিন বিচরণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের অসংখ্য সহকারী ও অনুযাত্রীরা ইহাতে স্নান-পান করিয়া থাকিবেন। মাতা জানকী শৈশবে ইহাতে কত জলবিহার করিয়া থাকিবেন। সেই গণ্ডকী আমাকে তাঁহার শৈত্য ও পাবনত্ব দিয়া কৃতার্থ করুন—এই সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহাতে স্নান করিলাম। নদীর জলে কোনও প্রকার ত্বরা ছিল না। কোনও প্রকার উৎপাত ছিল না। উহা শান্ত ভাবে বহিয়া যাইতেছিল, উহা যেন মারকে পরাজিত করিবার পর ভগবান বুদ্ধের প্রবর্তিত অখণ্ড ধ্যান।

১৯২৬-২৭

৩৮

গয়ার ফল্গু

সংস্কৃত ভাষায় ফল্গু শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফল্গু অর্থে (১) নিঃসার, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ; আর (২) সুন্দর। গয়ার নিকটবর্তী নদীর নাম ফল্গু দুই অর্থেই ঠিক বা সঙ্গত। পুরাণে বলে যে সীতার শাপ উহাতে লাগিয়াছে। সীতার অভিশাপে যাহা হইবার তাহা তো হইবেই ; কিন্তু আমরা নিজের চোখে দেখিতে পারি যে উহাতে সিকতারও অভিশাপ লাগিয়াছে। যেদিকে তাকাই, সিকতা আর সিকতা। নদীর ক্ষীণ প্রবাহটুকু ইহাতে মাথা উঁচু করে কি করিয়া ? যাত্রীরা এখানে ওখানে খুঁড়িয়া গর্ত করে। কাঠের বড় বড় টুকরা লম্বা দড়িতে বাঁধিয়া লাঙ্গলের মত এই সব গর্তে চালায়, যাহাতে নিচের ময়লা বাহির করিয়া গর্ত অধিক গভীর হয় ও অধিক জল দেয়।

অসংখ্য শ্রদ্ধাবান যাত্রী ফল্গুর উপর স্নান করিয়া পিতৃ-পুরুষের জন্য রাঁধিয়া পিণ্ড তৈয়ার করে। চাউল, জল, মটকী, ঘুঁটে আদির পরিমাণ পাণ্ডারা সর্বদাই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দেয়। নিয়মমত পয়সা দিন, পাণ্ডা সমস্ত জিনিস লইয়া আসিবে। ঘুঁটের চুলা জ্বালাইয়া তাহার উপর চাউলের হাঁড়ি রাখিয়া দিন ; পণ্ডিতদের বিধি পূর্ণ হইলে ভাত তৈয়ারী হইয়া যাইবেই।

ফল্গুর তীরে মন্দির ও ধর্মশালার সৌন্দর্য অনেক। ইহাদের মধ্যেও শ্রীগদাধরজীর মন্দিরের চূড়া তো সহজেই আমাদের চোখে পড়ে।

গয়া হইতে বৌদ্ধগয়ার দিকে যাইবার সময় ফল্গুর সত্যকারের শোভা দেখিয়া লউন। বালুর লম্বা চওড়া পাড়, আশপাশে তালের বড় বড় গাছ, আর তাহাদের মধ্যে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে ফল্গুর ক্ষীণ প্রবাহ। কিন্তু তাহাকে ক্ষুদ্র বা নিঃসার বলিবে কে ? এখানে রামচন্দ্র ও সীতা আসিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ এখানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কত শত সজ্জন এখানে শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। এই মহাতীর্থকে নিঃসার তো বলাই যায় না। শেষে ফল্গু অর্থাৎ সুন্দর—এই অর্থ ই ঠিক।

১৯২৬-২৭

৩৭

গর্জনকারী শোণভদ্র

অয়ং শোণঃ শুভজলোঽগাধঃ পুলিনমণ্ডিতঃ।
কতরেণ পথা ব্রহ্মন্ সংতরিষ্যামহে বয়ম্?
এবমুক্তস্তু রামেণ বিশ্বামিত্রোঽব্রবদীদ্ ইদম্।
এষ পন্থা ময়োদ্দিষ্টো যেন যান্তি মহর্ষয়ঃ।

সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের কথা একসঙ্গে চিন্তা করিতেছেন ক্ষত্রিয় গুরুশিষ্য; উভয়ের মনে শোণ নদ পার হইবার সময় কোন্ কোন্ কথা জাগিয়াছিল? প্রকৃতির কবি বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র ও রাম উভয়ের নিসর্গপ্রীতি মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনজনই জনগণের হিতকারী। তাঁহাদের চিন্তাস্রোতও শোণভদ্রের মতই প্রবাহিত হইয়া চারিদিকের ভূমি মুখরিত করিয়া থাকিবে।

অমরকণ্টকের আশপাশের উন্নতভূমি ভারতবর্ষের প্রায় মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। সেই স্থান হইতে তিন দিক অভিমুখে মাতা তাঁহার করুণার স্তন্য উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন। ভৌগোলিক সংস্থানের দৃষ্টি হইতে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট সাম্য আছে, কিন্তু অন্য দিক হইতে সম্পূর্ণ বৈষম্য আছে, এমন দুইটি প্রদেশে তিনি দুইটি নদী উৎসারিত করিয়াছেন—গুজরাতের ভাগে পড়িয়াছে নর্মদা, মহানদী পড়িয়াছে উৎকলে।

অমরকণ্টকের তৃতীয় স্রোত হইল পীবরতনু শোণভদ্র। নর্মদা সুদীর্ঘা, মহানদী অষ্টাবক্র, শোণভদ্র সুঘোষ। প্রায় পাঁচশত মাইল ব্যাপী ভূমি প্রবল বেগে আসিয়া সে পাটনায় গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। শোণের জন্যই শোণপুর প্রসিদ্ধ। লোকে বলে, গজকচ্ছপের যুদ্ধ গঙ্গা-শোণের নিকট দহের মধ্যেই হইয়াছিল। যেন এই প্রসঙ্গকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই এখন শোণপুরে লক্ষ লক্ষ লোকের মেলা হইতেছে, তাহাতে শত শত হাতি বিক্রয় হইতেছে।

সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে শোণভদ্রকে পুরুষের নাম দিয়া প্রাচীন ঋষিগণ

তাহার সমুচিত সমাদর করিয়াছেন। কাশী হইতে গয়ায় যাইবার সময় এই মহাকায় ও মহাশব্দকারী নদ দর্শন করিয়াছিলাম। গাড়ি চলিতেছিল বড় পুলের উপর দিয়া, শোণের পুলিনমণ্ডিত মহাপট দেখা যাইতেছিল। সংকীর্ণ ঘাটিতে নিজের অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ায় অধীর হইয়া ছুটিতে ছুটিতে যখন সে একাকী বিশাল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছিল তখন 'কোথায় যাই, আর কোথায় না যাই' এই ভাব তাহার চেহারায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। 'নাল্পে সুখমস্তি যো বৈ ভূমা তৎসুখম্'—এই মতাবলম্বী মহর্ষিগণ শোণের তীরে যখন নামিবার পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মনে কোন্ কোন্ চিন্তার উদয় হইতেছিল? সে কথা তো বিশ্বামিত্র ও তাঁহার যজ্ঞরক্ষাকারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রই জানিয়া থাকিবেন।

৪০

তেরদালের মরীচিকা

আমার বিবাহের অল্প কয়দিন পরেই আমরা শাহপুর হইতে জমখণ্ডী গেলাম। আমার পিতা আমাদের পূর্বেই সেখানে পৌছিয়া গিয়াছিলেন। আমরা যখন কুচড়ী স্টেশনে নামিলাম তখন রাত্র হইয়াছে। রাত্রেই সেখান হইতে গোরুর গাড়িতে রওনা হইলাম। গোরু দুইটিই শ্বেতবর্ণ ও দৃঢ়কায় ছিল। বর্ণ, শৃঙ্গের আকার, মুখমুদ্রা, চলিবার ধরন—সকল বিষয়েই উভয়ে সমান ছিল। আমাদের দেশে এমন জোড়ার নাম 'খিল্লারী।' গোরু দুইটি আমাদিগকে ২৪ ঘণ্টায় ৩৫ মাইল পৌছাইয়া দিল।

জমখণ্ডী যাওয়ার পথে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তেরদাল পড়ে। আমরা যখন তাহার নিকটে গেলাম, তখন মধ্যাহ্ন বেলা। দক্ষিণ দিকে বহু দূর পর্যন্ত ক্ষেত পড়িয়া আছে। অনেক দূরে, প্রায় দিগ্বলয়ের নিকটে এক নদী বহিয়া যাইতেছিল। জলের উপর কড়া রৌদ্র পড়িয়া চমকাইতেছিল। জল যে কত বেগে বহিতেছিল তাহাও কিছু কিছু অনুমান করিতে পারিতেছিলাম। এত সুন্দর নদীর ধারে গাছের সংখ্যা এত কম কেন, তাহার কারণ কিছু বুঝিতে

পারিতেছিলাম না। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই নদীর নাম কি? কত বড় দেখা যাইতেছে! কৃষ্ণা নদী নয় তো?' গাড়োয়ান হাসিয়া ফেলিল; বলিল, 'এখানে নদী আসিবে কোথা হইতে? ও তো মরীচিকা। জলের এই দৃশ্য দেখিয়া বেচারি পিপাসী হরিণ ধোঁকায় পড়ে, ও রৌদ্রে ছুটাছুটি করিয়া জলের জন্য লাফাইয়া লাফাইয়া মরিয়া যায়। তাই উহার নাম মৃগমরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণা।'

মরীচিকার সম্বন্ধে আমি তো পুস্তক পড়িয়াছিলাম। মরীচিকার উপরের গাছের প্রতিবিম্বও দেখা যায়, মরুভূমিতে চলিতে চলিতে উটের প্রতিবিম্বও দেখা যায়, ইত্যাদি অভিজ্ঞতা ও তাহার চিত্র আমি পুস্তকে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু আমি জানিতাম যে মরীচিকা শুধু আফ্রিকাতেই দেখা যাইতে পারে। হয়তো সাহারার মরুভূমিতে একুশ দিনের যাত্রাতেই এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। যদি কল্পনায় ধরিতে পারিতাম যে ভারতবর্ষেও মরীচিকা দেখা যাইতে পারে, তাহা হইলে হয়তো এত সহজে এবং এত রূঢ়ভাবে ঠকিতাম না।

এখন দেখিতে পাইলাম, আমরা গাড়িতে যতই অগ্রসর হইতেছি, জলও ততই আগে আগে সরিয়া যাইতেছে। ইহাও দেখিতেছিলাম যে ঐ জলের আশে পাশে সবুজ কিছুই নাই। জলের ধার কাছাকাছি মাটির নীচেও নাই। জমির উপর দিয়াই জল বহিয়া যাইতেছিল। উপরের হাওয়াতেও রৌদ্রের প্রভাব দেখা যাইতেছিল। পুনরায় মরীচিকার কৌতুক দেখিতে ও তাহার স্বরূপ বুঝিতে বড়ই আনন্দ হইল। বেচারা গোরুরা অর্ধমুদ্রিত নেত্রে নিজের গতির তালে তালে চলিতেছিল। কোনও কোনও গোরু চলিতে চলিতে মূত্রত্যাগ করিতেছিল, তাহা পড়িতেছিল মাটিতে, আর তাহা শীঘ্রই শুকাইয়া যাইতেছিল। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর কুঁজো হইতে জল লইয়া খাইতেছিলাম, তবু পিপাসা মিটিতেছিল না।

এই ভাবে চলিতে চলিতে অবশেষে তেরদালে আসিলাম। ধর্মশালা ছিল পাথরের। দেশীয় রাজ্যের গ্রাম; তাই ধর্মশালা ভালই তৈরী হইয়াছিল। কিন্তু কড়া রৌদ্র ছিল বলিয়া তাহাও তেমন প্রীতিকর বলিয়া মনে হইতেছিল না। বাড়িতে পৌছিয়া পুকুরে গিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। সঙ্গে বিগ্রহ ছিল। বেতের চুপড়ি হইতে বাহির করিয়া পূজার আয়োজন করিলাম। তাহার মধ্যে শালগ্রাম ছিল। তাহা তুলসীপাতা মিলাইয়া তবে কিছু ভোজন

করিত, নতুবা নয়। তাই আমি সিক্তবস্ত্রে নগ্নপদে তুলসীপত্রের সন্ধানে বাহির হইলাম। একটি বাড়ির আঙ্গিনায় শ্বেত করবীর ফুলও পাওয়া গেল, তুলসী পত্রও মিলিল। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। পেটে ক্ষুধা, পা জ্বলিতেছিল, মাথা গরম হইয়া গিয়াছিল,—এই ত্রিতাপের মধ্যে পূজা করিতে বসিলাম। দেবতার সংখ্যা বড় কম ছিল না। ঈশ্বর অবশ্য এক, কিন্তু সকলের দিক হইতে একই দেবতার পূজা করিলে তো চলিবে না। পূজা করিতে গিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। খুব কষ্টে পূজা শেষ করিলাম। ভোজন করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

স্বপ্নে দেখিলাম, একদল হরিণ ভেড়ার মত দৌড়িতে দৌড়িতে জল খাইতে গেল।

দাণ্ডী অভিযানের সময় এমনই এক মৃগ-মরীচিকা নাউসারি হইতে দাণ্ডী যাওয়ার পথে দাণ্ডীর সমুদ্রতীরের দিকে যাইতে যাইতে দেখা গিয়াছিল। ইহা মরীচিকা বলিয়া বিশ্বাস করিলেও চোখের ভুল একটুও কম হয় নাই। বেদান্তের জ্ঞান, চোখ কি করিয়া স্বীকার করে?

আজকাল কলিকাতার পীচ দেওয়া রাস্তার উপরেও দ্বিপ্রহরের সময় এমন মরীচিকার সৃষ্টি হয়। ভুল হয়, বুঝি বৃষ্টি পড়িয়াছে। মোটর গাড়ি ছুটিতেছে এমন ছায়াও সেখানে বুঝি পড়ে। ভগবান সম্ভবত এইজন্য মরীচিকা সৃষ্টি করিয়াছেন যে জ্ঞান হইলেও মানুষ কি করিয়া মোহের বশে থাকিতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তর উহা হইতে পাওয়া যায়।

১৯২৫

৪১

চর্মণ্বতী চম্বল

যে সকল নদীর জলে স্নান করিয়াছি বা যে জল পান করিয়াছি, তাহাদের এখানে পূজা করা আমার সংকল্প। তথাপি ইহাতে একটা নিন্দার কথা না থাকিয়া যায় না। মধ্যদেশের চম্বল নদী দর্শন করিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ নাই। কিন্তু পৌরাণিক কালের চর্মণ্বতী নামের সঙ্গে এই নদী সর্বদাই আমাদের

স্মৃতিপটে অংকিত হইয়া আছে। নদীগুলির নাম তাহাদের তীরের পশুপক্ষী বা বৃক্ষ অনুসারে রাখা হইয়াছে, ইহার বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে। দৃষদ্বতী, সরস্বতী, গোমতি, বেত্রবতী, কুশাবতী, শরাবতী, বাঘমতী, হাতমতী, সাবরমতী, ইরাবতী প্রভৃতি নাম এই সকল নদীর প্রজাদের বুঝায়। নদীর নাম হইতেই আহার সংস্কৃতির প্রকাশ। তবে চর্মণ্বতী নাম কি সূচিত করে? এই নাম শোনামাত্র প্রত্যেক গো-সেবকের রোম খাড়া হইয়া উঠে।

প্রাচীন রাজা রন্তিদেব অমর কীর্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতের মত বিরাট্ গ্রন্থে রন্তিদেবের কীর্তি গাহিতে ক্লান্তি নাই। রাজা এই নদীতীরে বিস্তর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সব যজ্ঞে যত পশু নিধন করা হইত তাহাদের রক্তে এই নদী সর্বদা রঞ্জিত থাকিত। সে সকল পশুর চামড়া শুকাইবার জন্য এই নদীর তীরে ছড়াইয়া রাখা হইত; তাই এই নদীর নাম ছিল চর্মণ্বতী। মহাভারতে পরম উৎসাহের সহিত এই প্রসঙ্গের বর্ণনা করা হইয়াছে। রন্তিদেবের যজ্ঞে এত বেশি ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণদের মিনতি করিয়া সুপকারদের বলিতে হইয়াছে, "ভগবান্, আজ কম মাংস রান্না হইয়াছে। আজ শুধু পঁচিশ হাজার পশুই বধ করা হইয়াছে। এই জন্য একটু বেশি করিয়া ব্যঞ্জন গ্রহণ করুন।"

তখনকার হিন্দুস্থান ও এখানকার হিন্দুস্থানে কত বেশি প্রভেদ! তুলনায় গ্রীকদের হেকাটোম-ও (Hekatomb) অকিঞ্চিৎকর। বড় বড় যজ্ঞ করিয়া আমরা স্বর্গের দেবতাদের ও ভূদেবদের তৃপ্তিসাধন করিব, এ আশা তখনকার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। পরবর্তী যুগে লোকেরা প্রশ্ন করিল :

বৃক্ষান্ ছিত্বা, পশূন্ হত্বা, কৃত্বা রুধিরকর্দমম্
স্বর্গশ্চেৎ গম্যতে মর্ত্যৈঃ নরকঃ কেন গম্যতে?

'গাছ কাটিয়া পশুহত্যা করিয়া রক্তে কর্দম করিয়া যদি স্বর্গে যাওয়া যায়, তবে নরকে যায় কোন্ উপায়ে?' অতীতে এই চর্মণ্বতীর তীরে কতই না যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে! মানুষের কত রক্তপাত মানুষ করিয়া থাকিবে! কিন্তু চম্বলের নাম করিলেই রাজা রন্তিদেবের যুগের কথা মনে পড়ে।

যদি আজও আমাদের মনে এতখানি উদ্বেগ হয়, তাহা হইলে প্রাণিগণের মাতা চর্মণ্বতীর তখন কতই না ব্যথা-বেদনা হইয়াছিল!

১৯২৬-২৭

৪২

নদীর সরোবর

আমাদের দেশে সুন্দর সুন্দর জায়গার এত ছড়াছড়ি যে তাহার কোনও হিসাব নাই। প্রকৃতি যে অমিতব্যয়িতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহার জন্যই মানুষ যেন তাহাকে দণ্ড দিতেছে। আশ্রমে যাহাদের চব্বিশঘণ্টা বাপুজীর সঙ্গে থাকিবার ও কথা বলিবার সুযোগ মিলিয়াছে, তাহারা যেমন বাপুজীর মহত্ত্ব বুঝিত না, তাঁহার চিন্তার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসু ছিল না, আমাদের দেশেও প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাহা ঘটিয়াছে।

মানিকপুর হইতে ঝাঁসী যাইতেছিলাম। পথে হরপালপুর ও রোহার মাঝখানে হঠাৎ আমাদের চোখে এক বিশাল সুন্দর দৃশ্য পড়িল। উহা নদী না সরোবর তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। চারিদিকের গাছপালা তীরের এত কাছে আসিয়া গিয়াছে যে ইহা নদী নয়, অন্য কিছু, তাহা অনুমান করিতেই পারা যায় না। কিন্তু সরোবরের চারিদিক তো উঁচু হওয়া চাই। এখানে সামনেই এক উঁচু পাহাড় আশপাশের জঙ্গলকে আশীর্বাদ দিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, যাহারা জলের দিকে তাকাইয়া আছে তাহাদের উল্‌টা দর্শন দিতেছে।

মাথা মুড়াইয়া দাড়ি রাখিলে যেমন দেখায়, তেমনই এই পাহাড় নিজের তলদেশে জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া শিখর মুণ্ডন করিয়াছিল।

পুলের বাঁ দিকে জলের মাঝামাঝি ছোট একটা দ্বীপ ছিল—এক ফুট লম্বা আর এক হাত চওড়া, আর জলের উপর হইতে অন্ততঃ ছয় ইঞ্চি উঁচু। তাহার গর্ব দেখিবার জিনিস। সে যেন পাশের পাহাড়কে বলিতেছিল—'তুই তো তীরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছিস; আমাকে দেখ, আমি জলে কি সুন্দর বিহার করিতেছি।'

তবে এটি নদী, না সরোবর? এইমাত্র বেলাতাল স্টেশন গেল। এইজন্য মনে হইয়াছিল যে এই প্রদেশে জায়গায় জায়গায় পুষ্করিণী থাকে। কিন্তু বিশ্বাস হইল না। রেলগাড়ির কামরায় যাহারা বসিয়াছিল তাহাদের অবশ্য

জিজ্ঞাসা করা চলিত। কিন্তু একে তো প্যাসেঞ্জার গাড়ি হইলেও দেওয়ালির দিন বলিয়া তাহাতে স্থানীয় যাত্রী কেহ ছিল না; থাকিলেও তাহাদের মধ্য হইতে বেশি অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যাইবে, এমন আশা বড় একটা করিতে পারা যাইত না। যুগ যুগ ধরিয়া জীবনযাত্রা বিষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে এইজন্য মানুষের জীবন হইতে সকল কাব্যরস শুকাইয়া গিয়াছে। তাই যে প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা যাক, তাহারই জবাব পাওয়া যায় বিষাদময় উপেক্ষার সঙ্গেই। লোকদের ভালমানুষি এখনও কিছুটা বাকি আছে, কিন্তু কাব্যে, উৎসাহ ও কল্পনার উত্তেজনার এখন স্মৃতিমাত্রই বাকি আছে।

কিন্তু এতখানি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া কি দুঃখের বা বিষাদের চিন্তা করা যায়? কোনও জায়গায় বেড়াইতে গেলে আমি তো সর্বদাই দুই একটা মানচিত্র সঙ্গে সঙ্গে রাখি। বর্তমান যুগকে বলিহারি, এরূপ উপকরণ অনায়াসে পাওয়া যায়। আমি 'রোড ম্যাপ অফ ইণ্ডিয়া' বাহির করিলাম। হরপালপুর ও মণিরামপুরের মাঝামাঝি এক দীর্ঘ নদী দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে ছুটিতেছে, বেতোয়ার সঙ্গে মিলিয়া বেতোয়ার সাহায্যে হিমতপুরের নিকটে নিজের জল যমুনার চরণে ঢালিয়া দিতেছে। "কিন্তু এই নদীর নামটি কি?" আমি মানচিত্রকে প্রশ্ন করিলাম। সে অলস ভাবে উত্তর করিল, 'দেখ, কোথাও লেখা টেখা থাকিবে।' তখনই সত্য সত্য নামটা পাওয়া গেল—ধসান। এত সুন্দর ও শান্ত জলপ্রবাহের নাম 'ধসান' হইবে কেন? ইহাতে তো নদীর অপমান। আমি ইহার নাম রাখিতাম প্রসন্না। 'মন্দস্রোতা' বলিয়া ডাকিতাম, আর হিমালয়ের নিকট হইতে মাপ চাহিয়া উহাকে মন্দাকিনী নামে ডাকিতাম।

কিন্তু আমরা কি জানি যে সেই লোক-কবি যিনি এই নদীর নাম রাখিয়াছিলেন ধসান, তিনি কোন্ ঋতুতে ইহা দর্শন করিয়াছিলেন? মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, চারিদিকের পাহাড় মেঘগুলিকে টানিয়া নীচে ফেলিয়া দিতেছে, উন্মাদনার ঘোরে জলরাশি হাতির মত উত্তর দিকে বেগে ছুটিতেছে; মনে মনে ভয়, বুঝি নিকটের টিলাগুলিও এখনই পড়িয়া যাইবে—এমন দিনে লোকটি বলিয়া থাকিবেন, "দেখতো এই ধসান নদীর গৌরব, যেন মহারাজ পুলকেশীর ফৌজ উত্তর দিক জয় করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিয়াছে।"

কিন্তু এখন এ-নদী এমনই শান্ত বলিয়া মনে হইতেছে যেন গোকুল বিজয়

করিবার পর মাতা যশোদার সামনে কানাই দাঁড়াইয়া বেচারী গরুগুলির পরিচর্যা করিতেছে।

সকালে জলখাওয়ার সময় এতখানি অপ্রত্যাশিত আতিথ্য পাইলে কে তাহা ছাড়িয়া দেয়? ভোজন অর্ধসমাপ্ত হইলে বন্ধু-বান্ধবদের কথা মনে পড়িবেই; এখন কি ভাবে প্রিয় বন্ধুদের এই ধসানের মঙ্গলদর্শন করানো যায়? না আছে নিকটে ক্যামেরা, না ট্রেন হইতে ফোটো তুলিবার কোনও সুবিধা। আর ফোটোরই বা শক্তি কতখানি? ফোটোতে যদি সমস্ত আনন্দ ভরিয়া দেওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে ভ্রমণের কষ্ট কেহ তো করিত না। আমি যদি কবি হইতাম তাহা হইলে এই দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়ের আবেগ দিয়া এক নদীই বহাইয়া দিতাম। কিন্তু তাহাও ভাগ্যে নাই। তাই দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটানো নীতি অনুসারে এই পত্র লিখিতেছি। ভারতে ভক্তিমান সমধর্মা কেহ যদি ঝাঁসী হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল ভিতরের দিকে আসিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে এই স্থান দর্শন করিবার জন্য অবশ্যই যেন আসেন।

স্টেশন বরোয়াসাগর, ১৪।১১।৩৯

১৬।১১।৩৯

ধসান ছাড়াইয়া আসিয়া ওরছার নিকট বেতোয়া নদী দেখিলাম। এই নদীও খুব সুন্দর। উহার জলস্রোতে অনেকগুলি পাথর ও গাছ ছিল। উহার লাবণ্যের মধ্যে নির্জীব বা ফিকা বলিয়া কিছু ছিল না। সুদূর হইতে ওরছার মন্দির ও প্রাসাদ দেখা যাইতেছিল; কোথাও এতটুকু ময়লা দেখিতে পাইলাম না। এই অনাবিল নদী দেখিয়া আমরা ঝাঁসী পৌঁছিলাম। সেখানে মৈথিলীশরণজীর ভাই—সিয়ারামশরণজী ও চারুশীলা শরণজী সপরিবারে অন্যান্য লোকের সঙ্গে খাদ্যবস্তু লইয়া আসিয়াছিলেন। আমার মনে সন্দেহ ছিল, কাব্যে পড়িয়া পড়িয়া কাব্য যাঁহারা রচনা করেন আমাদের সেই জাতীয় কবিরা যেমন হৃদয় দিয়া প্রকৃতির প্রত্যক্ষ দর্শন করেন না, তেমনই এই সব কবি বন্ধুরাও হয়তো ধসান ও বেতোয়ার কিছু না লিখিয়া থাকিবেন। তাই উঁহাদের পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছিলাম, 'আপনারা যদি এই দুই নদীর বিষয় কিছু না লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের নিন্দা করিব।' সিয়ারাম-

শরণজী বিনয়ে আমাকে হারাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, 'ভাইয়াজী' (মৈথিলীশরণজী) এই সব নদীর বিষয় রচনা করিতে করিতে বলিয়াছেন, সৌন্দর্যে বুন্দেলখণ্ডের এই সকল নদী গঙ্গাযমুনাকেও অতিক্রম করিয়াছে। তাই আমার দাদা তো আপনার তিরস্কারের গণ্ডির বাহিরে। কিন্তু আমি তো এখনও বুড়া হই নাই। আমার তো এখনও অনেক লিখিতে হইবে।

তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিলাম, ধসানের মূল নাম ছিল দশার্ণ। আর বেতোয়ার নাম যে বেত্রবতী তাহাতো আমি জানিতাম। দশার্ণ= দশাঅণ=দশাণ=ধসান। এতখানি নজরে আসার পর ধসান নামের বিষয়ে আমি যে আকাশপাতাল কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহা তাসের ঘরের মত পড়িয়া গেল। কোনও প্রকারের প্রমাণ বিনা শুধু কল্পনার সাহায্যে গবেষণা চালাইবার আমার মত অনেক লোক এদেশে হয়তো আছে। তাহাদের ভুলভ্রান্তি দূর করিবার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার অভাবে এরূপ নিছক কল্পনাও ইতিহাসের নামে চলে, আর পরবর্তীকালে সভ্যতাভিমানী লোকেরা সানন্দে এরূপ কল্পনাও আঁকডাইয়া ধরিয়া থাকে।

আমি একবার 'বতী-মতী' নাম-যুক্ত নদীগুলির নাম একত্র করিয়াছিলাম। তাই বেত্রবতীর কথা মনে মনে ছিল। যাহার তীরে বেত জন্মিত তাহাই বেত্রবতী। দৃষদ্বতী (প্রস্তর বহুল), সরস্বতী, গোমতী, হাতমতী, বাঘমতী, ঐরাবতী, সাবরমতী, বেগমতী, মাহিষ্মতী (?), চর্মণ্বতী (চম্বল), ভোগবতী (?), শরাবতী। এই সব নদীর কথা তো আজ মনে পডিতেছে। আরও একটু খুঁজিলে অন্য পাঁচ দশটি নদীর নাম পাওয়া যাইবে। মহাভারতে যেখানে তীর্থযাত্রার প্রসঙ্গ, সেখানে একসঙ্গে অনেকগুলি নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। পরশুরাম, বিশ্বামিত্র, বলরাম, নারদ, দত্তাত্রেয়, ব্যাস, বাল্মীকি, সূত, শৌনক আদি ভীষণ ভীষণ ভূগোলবেত্তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তবে তাঁহারা অনেক নাম বলিবেন বা সৃষ্টি করিয়া লইবেন। আমাদের নদীগুলির নামের পিছনে যে জ্ঞান, কল্পনা, কাব্য ও ভক্তি আছে সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত কেহ খোঁজ করে নাই। তাহা হইলে আর কি করিয়া ভারতীয় জীবন সমৃদ্ধ হইবে?

নভেম্বর, ১৯৩৯

৪৩

নিশীথ যাত্রা

জব্বলপুরের নিকটে ভেড়াঘাটের কাছে নর্মদার জলস্রোত রক্ষা করিবার জন্য স্ফটিকের পাহাড় আমরা রাত্রে দেখিয়া আসিব, এই খেয়াল হয়তো মধ্যরাত্রের স্বপ্নেও আসে নাই। কিন্তু 'সবিন্দু-সিন্ধু-সুস্খলদ্ তরঙ্গভঙ্গ রঞ্জিতম্' বলিয়া যাহার বর্ণনা আমরা কখনও কখনও সন্ধ্যাবন্দনার সময় গান করিয়া থাকি, সেই শর্মদা নর্মদার দর্শনের জন্য উহা এক কাব্যময় স্থান হইবে, এই জাতীয় একটা অস্পষ্ট কল্পনা মনের এক কোণে পড়িয়া ছিল।

হিমালয় ভ্রমণের সময়ে আমি পথে জব্বলপুর নামিয়াছিলাম। কিন্তু সে সময় ভেড়াঘাটের নর্মদার কথা মনে পর্যন্ত পড়ে নাই। গঙ্গোত্রী ও তাহার পথবর্তী শ্রীনগরের কথা ভাবিতে ভাবিতে নর্মদার কথা কি করিয়া মনে পড়িতে পারে? মহাদেবকে নর্মদাতটের গভীরতায় ছাড়িয়া দিয়া আমি গঙ্গোত্রী যাত্রা করিয়াছিলাম।

ফৈজপুর কংগ্রেসের সময় আমরা শুধু অজন্তা যাওয়ার কথাই ভাবিয়া-ছিলাম। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানি আঞ্চলিক টিকিট বাহির করিল, আমাদের মধ্যে এদিক ওদিক বেড়াইবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিল। জব্বলপুর ভ্রমণে যদি আর অর্থব্যয় না হয়, তবে কেনই বা যাইব না?—একথা ভাবিয়া আমি রওনা হইলাম। সত্য, কোনও বিশেষ কার্যের জন্য জব্বলপুর যাইতে ছিলাম না; কিন্তু একদিন শুধু আনন্দ করা, এমন মনোভাবও আমাদের ছিল না।

দেশের বিভিন্ন তীর্থস্থান, ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান, কলামন্দির ও প্রকৃত সুন্দর দৃশ্য দেখা আমি কখনও শুধু নয়নের তৃপ্তি বলিয়া মনে করি নাই। মন্দিরে গিয়া আমরা যে ভাবে দেবতা দর্শন করি, ভূমাতার এই সকল বিবিধ বিভূতি সেই ভাবে দর্শন করিবার জন্য আমি আসিয়াছি, এই চিন্তা লইয়া আমি এ-পর্যন্ত নিজের সকল ভ্রমণ সম্পন্ন করিয়াছি। নিজের দেশের প্রতিটি অংশের জ্ঞান

আমাকে অর্জন করিতে হইবে, আর এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির বৃদ্ধিও হইবে, আমি এইরূপ আশা পোষণ করি।

আমি যেখানেই যাত্রা করি আর এমন সব দৃশ্য দেখি যাহাতে হৃদয় অভিমান ও প্রেমে পূর্ণ হয়, সেখানেই একটি চিন্তা আমাকে অস্থির করিয়া ফেলে; আমার এত সুন্দর ও সভ্য দেশ পরাধীন, ইহার জন্য আমি দায়ী। অধীনতার চিহ্ন লইয়া আমি এই অদ্‌ভুত সুন্দর দেশকে ভক্তিই বা কি প্রকারে করিতে পারি? আমি কি বলিতে পারি যে এ দেশ আমারই? আমি দেশের, এ বিষয়ে তো কোনই সন্দেহ নাই; কারণ দেশ আমাকে সৃষ্টি করিয়াছে; আমার পালন পোষণ অখণ্ড ভাবে করিয়া আসিতেছে; আমাকে থাকিবার স্থান, আহারের অন্ন, বিশ্রামের আশ্রয় দিতেছে; তাহারই ভরসায় আমার শিশুসন্তানদের আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ছাড়িয়া দিতে পারি; অতীতের যে উজ্জ্বল ইতিহাসের জন্য আমি সংসারে মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারি, আর্যদের সেই প্রাচীন ইতিহাসও এই দেশই আমাকে দিয়াছে। এইরূপে আমার যথাসর্বস্ব দেশের নিকট হইতেই পাইয়াছি। কিন্তু এই দেশ আমার, একথা বলিবার মত আমি দেশের জন্য কি করিয়াছি? জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমি দেশের; কিন্তু 'এ দেশ আমার' একথা বলার পূর্বেই আমার সমস্ত জীবন ভরিয়া পরিশ্রম করিয়া ইহার জন্য জীবন যাপন করা উচিত।

মনে যখন এই প্রকার চিন্তার আবর্ত ওঠে তখন আমি মুহূর্তের জন্য অস্থির হইয়া যাই, কিন্তু এই অস্থিরতা হইতে ধর্মনিষ্ঠা উৎপন্ন হইয়া দৃঢ় হয়। এই অস্থিরতা হইতে স্বরাজের সংকল্প বলবান হয়, আর দেশের জন্য—দেশে অসহ্য কষ্ট যাহাদের সহিতে হয় সেই সব গরীবের জন্য—সামান্য কষ্টও সহিবার যখন সুযোগ পাই তখন মনে হয়, আমিই উপকৃত হইয়াছি। আর যখন যখনই দেশভ্রমণই করিতে থাকি, তখন তখনই মনে নব শক্তির সঞ্চার হইতে থাকে। যুবকদের সর্বদাই বলিয়া থাকি যে 'স্বদেশ ঘুরিয়া দেশ ও দেশের লোকদের দর্শন করিবার কোনও সুযোগ তোমরা ছাড়িও না।'

হৃদয়ে যখন এই প্রকার তীব্র ভাবনার উদয় হয় তখন এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, নিকটে কেহ না থাকিলে ভাল। নিজের অকেজো চিন্তা শব্দে লিখিয়া লোকের সামনে প্রকাশ করা ততটা কঠিন নহে। কিন্তু এই সব চিন্তায় অস্থির হইলে আমাদের যে বিহ্বল দশা হয় আর আমরা উন্মত্ত হইয়া

উঠি, উহা কেহ দেখিলে আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না। এই জন্য যখনই ভক্তির ভ্রমণে বাহির হই তখনই মনে হয় যে যদি একাই যাই আর একান্তই প্রকৃতির নিকট প্রার্থনা করি, তাহা হইলে ভাল হয়।

কিন্তু আমার জাতি হইল কাকের জাতি। একা একা সেবন করিলেও কোনও কিছুই হজম হয় না। তাই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলকে বলিয়া দিই, 'আমি তো এখন আর ঘরে থাকিতে পারি না, আমি এই চলিলাম।' ফলে কেহ না কেহ আমার সঙ্গী হয়। লোকের মনে হয়, ইহার সঙ্গে গেলে আমাদের চর্মচক্ষুর সাহায্য হইবে ইহার প্রেমচক্ষু দিয়া; আর আমাদের দেশ আমরা চার চক্ষু দিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাইব। আমার এই অবস্থার বর্ণনা আমি এক বন্ধুকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম 'খুঁজি একান্ত, পাই লোকান্ত।'

অবশেষে, এই সকলের ফলে দাঁড়ায় এই যে, আমাকে বহু লোকের সঙ্গে যাত্রা করিতে হয়, এই জন্য আমার উদ্‌গতপ্রায় মনোবৃত্তি দমন করিতে হয়। আর একদিকে মনকে অন্তর্মুখ করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেও অন্য দিকে আমাকে বাহিরের লোকদের বাতাবরণের অনুকূল হইয়া থাকিতে হয়।

দেশভ্রমণই হউক আর কোনও গুরুতর কার্যেই হউক, মঙ্গলাচরণে কোনও বিঘ্ন না ঘটিলে কি যেন হারাইলাম বলিয়া মনে হয়। নির্বিঘ্ন চেষ্টা যদি আমার স্বপ্নসৃষ্টিতেও না দেখি, তাহা হইলে জাগরণে তাহা কোথা হইতে আসিবে? বড়ই উৎসাহের সঙ্গে ভুসওয়াল রওনা হইয়াছিলাম, প্রথম আঘাত পাইলাম ইটারসিতেই। পূর্ব হইতে জানাইয়া রাখিলেও ইটারসির স্টেশন-মাস্টার আমাদের জন্য কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। নূতন কামরা জুড়িয়া দিলে তাহা টানিবার শক্তি ইঞ্জিনের থাকিত না; কারণ ইটারসির পূর্ব হইতেই গাড়িতে অনেক কামরা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর সকল কামরাই ঠাসাঠাসি ভরা ছিল।

তবে কি এখন এখান হইতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে? কতখানি আশা-ভঙ্গ! ভাবিলাম, মনকে অন্য দিকে মোড় ফিরাইয়া দিই, মনকে বুঝাইবার জন্য এখান হইতে হোসেঙ্গাবাদ পর্যন্ত মোটর গাড়িতে গিয়া নর্মদা-মাকে দর্শন করিয়া লই, আর ফৈজপুরের দিকে ফিরিয়া যাই। কিন্তু এতখানি সাহস হইল না বলিয়া—হারিবারও সাহস চাই—অবশেষে যে গাড়ি আসিয়া পৌঁছিল তাহাতেই আমরা কোন না কোন প্রকারে ঢুকিয়া পড়িলাম।

জব্বলপুরে পৌছাইয়া দুই একজন স্থানীয় ভদ্রলোকের সাহায্যে নিকটের ধর্মশালায় উপস্থিত হইলাম এবং মোটর গাড়ির ব্যবস্থার চেষ্টায় লাগিয়া গেলাম।

একটা বড় যাত্রিদল সঙ্গে লইয়া তীর্থযাত্রা করিতে যে সংগঠন-শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা যুদ্ধে বড় সৈন্যদল এক হইতে অন্যস্থানে লইতে গেলেও লাগে। কোনও আশ্রম, প্রতিষ্ঠান, মন্দির বা ছোট বড় ব্যাপার চালাইতে যে সকল গুণ বা শক্তির বিকাশ হয়, তাহারই পরিচালনা হয় কোনও রাজ্য বা সাম্রাজ্য চালাইতে গেলে। কোনও হুঁশিয়ার কৃষক সুযোগ পাইলেই উত্তম শাসক বা ব্যবস্থাপক হইতে পারে; আর বড বড় কলকারখানা যাহারা চালায় সেই সব পরিকল্পনাকারী বা সংগঠক কারখানার মালিকেরা কোনও সাম্রাজ্যের সূত্র অনায়াসে ধরিতে ও চালাইতে পারে। ভ্রমণে মানুষের সর্বপ্রকার কুশলতার পরীক্ষা হয়। আর তাহাতে উপযুক্ত পুরুষ—স্ত্রীলোকেরাও—নিজেরাই অগ্রসর হইয়া যায়।

এ চিন্তা এখানে কেন প্রবেশ করিল, তাহা বুঝাইবার জন্য থামিব না। আমাদিগকে সময়মত ভেড়াঘাটে পৌছিতে হইবে, আর বর্ষা তো যেন 'এই আসিলাম' বলিয়া ভাঙ্গিয়া পডিবার জন্য প্রস্তুত। এমনিতে তো ইহা বর্ষাকাল নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের চারদিক হইতে লোকে ফৈজপুর কংগ্রেসে যাওয়ার জন্য চলিয়াছে, ইহা দেখিয়া বর্ষারও মনে হইয়াছে, 'চল আমরাও নানা স্থান দেখিতে দেখিতে ফৈজপুর হইয়া আসি।' কিন্তু শীতকালে বর্ষার পায়ে চলার আর শক্তি থাকে না; তাই দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাস্তায় পড়িয়া যায়, ফৈজপুর পর্যন্ত আর পৌছিতে পারে না! তাহার হাতে যদি স্বরাজের শক্তি থাকিত, তাহা হইলে হয়তো লোকে উহাকে উঠিয়া অগ্রসর হইবার জন্য সাহায্য করিত।

ভাল; আমাদের দুখানি মোটর তৈলযোগে রওনা হইল, আর সন্ধ্যার সময় আমরা ভেড়াঘাটে গিয়া পৌছিলাম। স্ফটিকের শিলাতল দেখিবার জন্য ইহার পূর্বে হয়তো কেহ এ সময়ে আসিয়াও থাকিবে। কিন্তু প্রকৃতি-পাগলের আবার সময়ের সঙ্গে লেন-দেন কি?

এখানে আসিয়া আমরা বড় ধাঁধায় পড়িয়া গেলাম। নিকটেই এক টিলার উপর মহাদেবজীর মন্দির ঘিরিয়া চৌরাশী যোগিনী তপস্যা করিবার জন্য

বসিয়াছিলেন। তপস্যা করিতে করিতে তাঁহারা হয়তো অহল্যার মত পাথর হইয়া গিয়া থাকিবেন। রামের চরণ স্পর্শ হওয়ার পরিবর্তে মুসলমানদের লাঠির স্পর্শে ইঁহাদের অনেকের বড়ই দুর্দশা হইয়াছিল। এই টিলার অন্য পারে ধুয়াঁধার নামে এক প্রসিদ্ধ প্রপাত আছে। উহা দেখিতে যাইব, না স্ফটিক শিলা দেখিবার জন্য নৌকাবিহার করিব?

বিহার করিবার জন্য মাত্র দুইটি নৌকা ছিল। তাই আমরা সকলে এ বিষয়ে একমত হইলেও লাভ ছিল না। অগত্যা আমরা দুই দলে বিভক্ত হইলাম। এই জায়গাটি ছিল স্ফটিক শিলার জন্য প্রসিদ্ধ, তাই বড় দল সেই দিকে যাওয়া পছন্দ করিল। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে তখনও যে অল্প আলো ছিল তাহাতে ঐ জায়গা দেখিতে যাওয়া বিশেষ বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল না। আমাদের দ্বিতীয় দল যোগিনীদের দর্শন করিয়া ধুয়াঁধার যাওয়া স্থির করিল, এবং আমরা সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলাম। আমরা নিজের নিজের হাতে যে বিদ্যুতের এক ছোটখাটো মশাল ছিল তাহার সাহায্যে সমস্ত যোগিনীদের দর্শন করিলাম। মূর্তিগুলি ছিল সুন্দররূপে নির্মিত এবং কারুকার্যপূর্ণ। মন্দিরের ভিতরে বিরাজমান মহাদেব এবং তাঁহার বৃষটিও দেখিবার মত।

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যখন কোনও লডাইয়ে আমরা আহত হই তখন শীঘ্র চিকিৎসা করিয়া সুস্থ হই। গ্রামে রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে আমরা তাডাতাডি তাহার দেহ দাহ করি অথবা কবর দিই। যখন মাটিতে দুধ পড়িয়া যায় তখন আমরা তাহার শুভ্রতা অকল্যাণের চিহ্ন বলিয়া ঐ মাটিতে তাহা থাকিতে দিই না, তাহা মুছিয়া লই। মানুষের স্বভাব এইরূপ হইলেও আমরা ভগ্নমূর্তি ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকিতে দিই কেন? ধর্মান্ধ মুসলমানদের অত্যাচারের কথা মনে করাইয়া দিবার জন্য কি? না নিজের ভীরুতা ও সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা স্বীকার করিবার জন্য? অতুলনীয় মূর্তি নির্মাণের কলা যদি দেশ হইতে নষ্ট হইয়া যাইত; তাহা হইলে এই ধরনের প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন সুরক্ষিত রাখা উচিত বলিয়া মনে হইত। কিন্তু দেখিয়াছি আবুতে দেলোয়াড়ের মন্দিরগুলিতে স্ফটিক প্রস্তরের কারিগর পরিবার সর্বদা লাগিয়া থাকিত; মন্দিরের কোনও অংশে কিছু ভাঙ্গিলে তাহা অবিলম্বে মেরামত করিয়া পূর্বের মত করা হইত। এই ভাবে লাহোরের জাদুঘরেও দেখিয়াছি,

মূর্তিগুলির কোনও নিপুণ সার্জন আহত মূর্তিগুলির হাত পা নাক ঠোঁট প্রভৃতি সিমেণ্টের সাহায্যে এমন ভাবে ঠিক করিয়া দেয় যে কেহ বুঝিতে পারে না। কিন্তু আমাদের মন্দির যোগ্য ও উদ্‌যোগী লোকের হাতে আর কোথায়? আমাদের সমাজের অবস্থা বেপরোয়া জন্তুর মত।

যোগিনীদের আশীর্বাদ লইয়া আমরা পাহাড় হইতে নীচে নামিতে লাগিলাম। এখনও কিছুটা আলো ছিল। তাই আমরা হাসিতে হাসিতে খেলিতে খেলিতে কিন্তু দ্রুতগতিতে ধুয়াঁধারের সন্ধানে বাহির হইলাম। যে সঙ্গী আগে আগে দৌড়াইতেছিলেন তাঁহাকে লাগাম টানিবার ও যিনি পিছনে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে চাবুক মারিবার কাজ একই জিহ্বা দিয়া করিতে হইতেছিল। আমার অভিজ্ঞতা এই যে নূতন স্বাধীনতায় বিপথগামী বাছুর ও ভেড়ার দল যেমন যেমন কাছে আনিবার চেষ্টা করা হয়, তেমন তেমনই সংঘ ছাড়িয়া দূরে দূরে পালানোতেই তাহাদের মনে হয় বড় বাহাদুরি, কিন্তু তাহাদের উপর রাগ করিয়া তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার কষ্ট সহ্য করিতে হয় বলিয়া সংঘপতির কৃতিত্ব বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। পরস্পর টানাটানির কষ্টে যে আনন্দ আছে, তাহা উভয়পক্ষের কেহই ছাড়িতে পারে না।

যেদিকেই তাকাই, শুধু সাদা পাথর আর পাথর। ইহা জব্বলপুরেরই অন্তর্গত। কিন্তু এক জায়গায় তো আমরা স্ফটিকমণির খেতই পাইয়া গেলাম। স্ফটিকমণি এক অদ্ভুত বস্তু। উহা পাথর অবশ্য, তবে একেবারে সরু সরু, যেন পেনসিলের সীসা। ছোটবেলায় একবার আমার গ্রহণী হইয়াছিল। তখন এই স্ফটিকমণির গুঁড়া ছাঁকিয়া বরফিতে মিশাইয়া আমাকে খাওয়ানো হইয়াছিল। তখন হইতে আমার উহার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়াছিল। আমার যখন পেটের মধ্যে ঘা হইয়া যায় তখন উহা ভরিবার জন্য এই চূর্ণ সাহায্য করে; আর ঘা ভরিবার পর উহা নিজে নিজে পেটের বাহিরে আসিয়া পড়ে। পাথরের চূর্ণ তো আর হজম হয় না। পেটে থাকিলে তো রোগ দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু নিজের কাজ শেষ হইতেই উপকারের ঋণ উসুল করিবার জন্যও বেশি দিন থাকিবার ভুল করে না।

এতক্ষণে চারিদিকে ঘোর অন্ধকার ছাইয়া গিয়াছিল। সর্বত্র ভয়ানক নীরবতা। আমাদের দল এই নীরবতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, যেন অনন্ত সমুদ্রের ভিতর দিয়া কোনও নৌকা চলিতেছে। হাওয়া যেন বন্ধ হইয়া

গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। কখন বৃষ্টি পড়িবে তাহা বলা যাইতেছিল না। উপরে আকাশের দিকে তাকাইলাম, কালো কালো মেঘের মাঝে এক দিকে শুধু একমাত্র তারকা জ্বল জ্বল করিতেছিল। কেন চমকাইতেছিল? বেচারা বড দুঃখের সহিত তাকাইতেছিল, যেন কোনও বড় বাড়ির জানলা হইতে কোনও অসহায় বৃদ্ধ নির্মল পথে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম। এখনও মাটি বেশ ভিজা ভিজা ছিল। মাঝে মাঝে জল ও আবর্জনায় ভরা গর্ত ছিল।

অন্ধকার খুব বাড়িয়া গেল। গর্তের মধ্য হইতে পথ বাহির করা কঠিন বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। অগ্রসর হইবার উৎসাহ বড় কম হইয়া গেল। এমন কঠিন স্থানে অন্ধকার রাত্রে আমরা এ পর্যন্ত আসিলাম। এই যাত্রার আনন্দ স্বীকার করিয়া আমরা ফিরিয়া যাইবার কথা ভাবিলাম। মনে ভয়ও জন্মিল—এই নির্জন ও ভয়ানক স্থানে কোনও চোরের সঙ্গে দেখা হইয়া না যায়।

একা একা যাওয়ার সময় কাহারও কাহারও চোর ডাকাতের ভয় দেখা যায়। যখন দল বড হয় তখন এই ভয় যেন সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং প্রত্যেকের ভাগে অনেক কম পড়ে। আবার পরস্পরের সাহায্যে প্রত্যেকে নিজের নিজের ভয় মনে মনে দমন করিতেও পারে। কাহারও কাহারও একেবারে বিপরীত হয়। একা হইলে তাহারা কোনও কিছু গ্রাহ্য করে না, নিজেদের যাহাই হউক। মারপিটের কথায় তো প্রাণ ভরিয়া লড়িতে লড়িতে উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত শরীরে মার খাওয়ার বিশেষ লোকসান মনে হয় না। আর যদি অহিংসার বৃত্তি হয়, তবে রাগ না করিয়া, ভয়ে না পলাইয়া, মার খাওয়ায় অপূর্ব আনন্দ আছে। সত্যাগ্রহী ন্যায়ে মার দিলে যে মারিয়াছে তাহারই উপর প্রভাবটা পড়ে, কারণ অহিংসাবাদী মানুষকে যে মারে সে নিজেই মনের কাছে অনবরত লাঞ্ছিত হয়।

কিন্তু যখন বড় দলের সঙ্গে আছি, তখন কে কি প্রকার ব্যবহার করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। শিশু ও স্ত্রীলোকেরা যদি সঙ্গে থাকে তবে অন্য প্রকারের চিন্তা হয়; পরস্পরের মধ্যে অসুবিধা সৃষ্টি করার যে মজা আছে তাহা এরূপ সময়ে অনুভব হয় না। সকলে সত্যাগ্রহী হইলে তো আলাদা কথা। কিন্তু বড় দল এবং নানাপ্রকারের লোক লইয়া যে দল গঠিত, তাহা লইয়া

বিপজ্জনক স্থানে যাওয়া কখনও উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়দের ও স্ত্রীসমাজকে লইয়া যাওয়ার পথে বীর অর্জুনেরও কী দশা হইয়াছিল তাহা তো আমরা পুরাণে পড়িয়াছি।

এই অন্ধকারে পাথরের মধ্য দিয়া কতদূর যাইব আর কি দেখিতে পাইব, তাহার কোনও কল্পনাই ছিল না। সুতরাং মনে হইল এখান হইতে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল হইবে। এতক্ষণে ডানদিকে ক্ষুদ্রকায় জীর্ণশীর্ণ এক কুটির দেখিলাম। এরূপ নির্জন স্থানে চোরই বা চুরি করিবে কেন? কিন্তু চুরি করিয়া ক্লান্ত হইলে শান্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে বসিবার পক্ষে স্থানটি বড়ই সুন্দর। যাহারা চোর ধরিতে বাহির হয় তাহাদের এপর্যন্ত আসার কথা মনেও হয় না। তাহা হইলে কি এই কুটিরে নিরঞ্জনের ধ্যানরত কোনও অলখ উপাসক সাধু বাস করিতেছেন? আমরা কুটিরের নিকটে গেলাম। ভিতরে কেহই নাই। তাহা হইলে ত এ কুটির কোনও সাধুর হইতে পারে না। ফকির সারাদিন কোথাও না কোথাও ঘোরেন, রাত্রে মসজিদে আসিতে কখনও ভোলেন না; আর বাবাজী রাত্রিটা বাহিরে কোথাও না কাটাইয়া তাঁহার সঙ্গী ধুনির সঙ্গেই কাটান।

তাহা হইলে এই কুটিরগুলি মাছ মারিয়া যাহারা খায় সেই সব জেলেদের হইবে। যাহারই হউক, আমাদের তাহা দিয়া কি কাজ? আজ রাতটা কি আর আমরা এখানে কাটাইব? একটু অগ্রসর হইলে জ্ঞান হইল, রাস্তা ঠিক না করিয়া অন্ধকারে অগ্রসর হইলে বিপদ ডাকিয়া আনা হইবে। সুতরাং হুকুম দিলাম, 'চল, এখন ফিরিয়া যাই।' এতক্ষণে যেন শক্তির পরীক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই ভাবনায় মেঘ একটু সরিয়া গেল এবং ঠিক আমার মাথার উপর বিরাজিত চন্দ্র 'পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত!' বলিয়া চারিদিকের অঞ্চল আলোকিত করিয়া দিল। সূর্য সব কিছু প্রকাশ করে, তাই তাহার আলোতে কাব্য কিছু হয় না। অন্ধকার রাত্রে তারায় তারায় যে দৃষ্টি ঘুরিয়া বেড়ায়, চন্দ্র তাহা পৃথিবীর দিকে পাঠায়, বলিয়া দেয়, 'সামান্য কিছু চোখে দেখ, আর বাকি সমস্ত কল্পনায় ভরিয়া দাও।'

চন্দ্র কিছুটা সাহায্য করিল, আর সুদূর ধুয়াঁধারের শব্দও শোনা যাইতে লাগিল। আমার হুকুম একদিকে থাকিয়া গেল, আর সকলে জোরে পা চালাইতে লাগিল। একটু আগে গিয়া দেখিতে পাইলাম ধুয়াঁধার। দুধের

স্রোত যেন বহিয়া যাইতেছে !! সর-সর-ধব-ধব ! ঝুলঝুল্ ধব-ধব ক-র-র-র-র ধব-ধব ! ধব-ধব-ধব-ধব ! উন্মত্ত জল বহিয়াই যাইতেছে। আর তাহার মধ্য হইতে জলকণা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। বৃষ্টি কেন? তুষারের ফোয়ারাই ধরিয়া নিন। কত অতিথিবৎসল ! এই সূক্ষ্ম জীবনকণা আমাদের এই জীবনক্ষণকে সার্থক করিয়া দিয়াছে। চন্দ্র প্রসন্ন হইয়া হাসিতেছে, খেলিতেছে, তুষার উড়িতেছে, হাওয়া স্তব্ধ হইয়া আছে আর আমরা নেশায় ঢুলিতেছি। এদিকে দেখুন, ওদিকে দেখুন, কত মজা ! এরূপ মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রপাতের শব্দ শুরু হইয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ধুয়াঁধার দেখিতে কেমন, আমাদের সঙ্গে যে স্বেচ্ছাসেবক পথপ্রদর্শক ছিলেন, তিনি তাহা বর্ণনা করিতে শুরু করিলেন। এখানে লোকেরা কি করিয়া সাঁতার কাটে, কোথা হইতে লাফায়, গ্রীষ্মের দিনে ধুয়াঁধার কতখানি উঁচা হয়, ইত্যাদি অনেক জ্ঞান তিনি আমাদিগকে দিলেন। আর তাঁহার জ্ঞান ও রসিকতার জন্য আমাদের দিয়া তাঁহার নিজের মূল্য নিরূপণও করাইলেন। এখন সকলই শান্ত, একমনে ধুয়াঁধারের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনায় সকলে মগ্ন। কী সুন্দর ও পবিত্র দৃশ্য ! অরণির ঘর্ষণে প্রথমে উষ্ণতার সৃষ্টি হয়, পরে ধুয়াঁ বাহির হয়, ধুয়াঁ বাড়িলে তাহার মধ্য হইতে স্ফুলিঙ্গ ওড়ে, আর পুনরায় নিভিয়া বাহির হইয়া আসে। এই ভাবে প্রকৃতি দর্শনে বাহির হইলে প্রথমে কৌতূহলের সৃষ্টি, কৌতূহল হইতে অদ্ভুত ভাব, অদ্ভুত ভাব যথেষ্ট পরিমাণে একত্র হইয়া জমাট বাঁধিলে অকস্মাৎ ভক্তির তরঙ্গ বাহিরে আসে। 'চল, আমরা এই শিলার উপর বসিয়া প্রার্থনা করি।' প্রার্থনার পক্ষে এতখানি পবিত্র স্থান ও এতখানি শুভ মুহূর্ত সর্বদা পাই না। সকলে তাড়াতাড়ি বসিয়া গেল, আর 'যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্র·· ···' ধ্বনি ধুঁয়াধারের কানে আসিয়া ঠেকিল।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যেমন ভিন্ন রাগ গাওয়া হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন স্তব আমার নিকটে আবির্ভূত হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণে কন্যাকুমারীতে আমি তিনবার গিয়াছি, তখন আমার নিকটে গীতার দশ ও একাদশ অধ্যায় ফুটিয়া উঠিল। বিভূতিযোগ ও বিশ্বদর্শনযোগের প্রাণখোলা পাঠের পক্ষে উহাই ছিল উচিত স্থান। আর যখন সিংহলের মধ্যভাগে—অনুরাধাপুরের নিকটে—মহেন্দ্র পর্বতের শিখরের উপর সান্ধ্যকালীন অস্তের সময় পৌঁছিয়াছিলাম, তখন পাটলিপুত্র হইতে আকাশপথে আসিয়া এই শিখরের উপর

নামিয়া 'মহেন্দ্র'কে মনে করিয়া আমি ঈশাবাস্তোপনিষদ গাহিয়াছিলাম। ঈশোপনিষদ শুনিয়া অনাত্মবাদী বুদ্ধশিষ্যদের আত্মার কেমন লাগিয়াছিল তাহা ভগবানই জানেন। আর পুণা হইতে যখন শিওনেরী যাই, তখন মসজিদের উঁচু দেওয়ালের সিঁড়ি চড়িয়া দূর হইতে শিবজী মহারাজের বাল্যকালের ক্রীড়া-ভূমি দর্শন করিবার সময় জানি না কেন মাণ্ডুক্যোপনিষদ গাওয়া আমার কাছে ভাল লাগিয়াছিল। এই উপনিষদটি শ্রীসমর্থের প্রিয় ছিল এ কথা মনে করিবার কোনও প্রমাণ নাই। আবার 'নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনম্ ন প্রজ্ঞং না প্রাজ্ঞম্' এই কণ্ডিকা বলিবার সময় আমি শিবাজীর সমকালীন মহারাষ্ট্রের সঙ্গে ও আত্মারামের অভেদে ভক্তিমান সাধুসন্তদের সঙ্গে একেবারে একরূপ হইয়া গিয়াছিলাম। সেই সময়ে মনে হইয়াছিল—'আমি চাই না এই পৃথক ব্যক্তিত্ব ; একরূপ সর্বরূপ হইয়া যাক এই সকল দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে।' ধুয়াঁধারের উন্মাদনা ও সেখানকার তুষারের হাস্য দেখিয়া এখানে স্থিতপ্রজ্ঞের শ্লোক গাওয়া ঠিক বলিয়া মনে হয়।

তীব্র ভাবনা দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে থাকা আবশ্যক নহে। একবার আলাপে এক অখিল চিন্তাজগতের স্থান হইতে পারে। এক জলবিন্দুতে প্রচণ্ড সূর্যেরও প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে, এক দীক্ষামন্ত্রে বহুযুগের অজ্ঞান দূর করা যাইতে পারে। এক মুহূর্তে আমরা ধুয়াঁধারের বাতাবরণ নিজস্ব করিয়া লইলাম। চোখের শক্তি কি অদ্ভুত ! মুখ দিয়া ধুয়াঁধার পান করা ছিল অসম্ভব। আমরা তো আর কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য ছিলাম না? কিন্তু আমাদের দুইটি ছোট চোখের মণি অখণ্ডবহমান এই প্রপাত আকণ্ঠ পান করিল। আমার মনে হয়, এই দৃষ্টিপানকে 'আকণ্ঠ' না বলিয়া 'আ-পলক' বলা উচিত। আমরা সকলে নিজের নিজের চোখে এই লুটের ভাণ্ডার মুহূর্তের মধ্যে ভরিয়া লইয়া চলিলাম। আমাদের এই ভূতসংঘ নানা প্রকারের কথা বলিতে বলিতে ও গর্জন করিতে করিতে মোটরের আড্ডায় আসিয়া পৌঁছিল।

এখানে ভেড়াঘাটের স্ফটিক প্রস্তরের শিলাগুলি দেখিয়া যে দল ফিরিতেছিল তাহার সঙ্গে দেখা হইল। পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করিয়া আমরা এই দলকে মুরুব্বির মত পরামর্শ দিলাম, 'এই সময় ধুয়াঁধার যাওয়ার কোনও অর্থ নাই। আপনারা মোটরে করিয়া সোজা জব্বলপুর চলিয়া যান। আপনারা যেখান হইতে আসিয়াছেন সেখানে অল্প কিছুক্ষণ নৌকায় বেড়াইয়া

আমরা এখনই ফিরিব।' জানি না আমাদের এই পরামর্শ তাহাদের পছন্দ হইল কিনা। কিন্তু মানিয়া লওয়া ছাড়া তাহাদের আর কোনও উপায় ছিল না।

পথের দিকে নামিতে নামিতে আর অন্ধকারে হোঁচট খাইতে খাইতে আমরা নদীর ধারে আসিয়া পৌছিলাম, আর দুই দলে ভাগ হইয়া দুই নৌকায় চড়িয়া বসিলাম। আমাদের নৌকা অগ্রবর্তী হইল। সর্বত্র শান্তিরই সাম্রাজ্য ছিল। তাহার গভীরতার অন্ত মাপিবার জন্যই যেন মাঝে মাঝে আমাদের নৌকার দাঁড়গুলি তালে তালে শব্দ করিতেছিল। চন্দ্র তাহার মৃদু মশাল মাথার উপর রাখিয়া যেন ইহাই বুঝাইতেছিল 'আশপাশের এই শোভা দিনের সময় কেমন লাগিবে তাহা কল্পনা করিয়া নিন।' অনেক স্থানে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। মাঝে মাঝে চাঁদনীর শুভ্র আচ্ছাদন দেখা যাইতেছিল। আকাশ মেঘহীন ছিল না। তাই জ্যোৎস্না হইয়া গিয়াছিল ঘোলের মত পাতলা। আকাশের মেঘের মাঝে মাঝে মলমলের মত পাতলা দেখাইতেছিল, সুতরাং তাহার দিকেও মন টানিতেছিল। দুইদিকে স্ফটিকের শিলাগুলি কত উঁচু মনে হইতেছিল। উঁচুও ভীষণ! যেন দলে দলে রাক্ষস বসিয়া আছে! আর এই পাথরগুলির মাঝে মাঝে নর্মদার প্রবাহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের চক্রব্যূহ রচনা করিতেছিল।

উঁচু উঁচু পাথর বা পাহাড় যেখানে পরস্পরের অতি নিকটে আসিয়া যায়, সেখানে 'প্রাচীনকালে এক সরদার তাহার ঘোড়াকে রেকাবের খোঁচা মারিয়া এই শিখর হইতে সামনের শিখর পর্যন্ত লাফ দেওয়াইয়াছিল' এরূপ জনশ্রুতি চলিয়াই থাকে। বানর তো সত্যসত্যই এই প্রকারে লাফাইতে পারে। এখানে এইরূপ জনশ্রুতি নৌকাওয়ালাদের মুখ হইতে শুনিতে পাইবেন।

এই সকল পাথরের মাঝে মাঝে অনেকগুলি গুহাও আছে। মুনিঋষিরা অবশ্যই এখানে ধ্যান করিবার জন্য থাকেন। আর মধ্যযুগে রাজবংশীয় বিপন্ন ব্যক্তিরা ও স্বাধীনতার সাধনায় ব্রতী দেশভক্তেরাও আত্মরক্ষার জন্য এখানেই হয়তো লুকাইয়া থাকিতেন। আবার ছুছুন্দরীর মত নৌকা করিয়া এই সব লোককে গুপ্তভাবে আহার, সংবাদ ও আশ্বাস পৌছাইয়া দেওয়া হইত। এই গুহাগুলি যদি কথা বলিতে পারিত তাহা হইলে ইতিহাসে যাহার উল্লেখ নাই, এমন কত বৃত্তান্তই না আমাদের বলিতে পারিত।

খোয়াইয়ের মাঝে মাঝে নৌকায় যাইতে যাইতে এমন এক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে শান্তির গর্ভগৃহ। এখানে আমরা দাঁড় বন্ধ করাইয়া দিলাম, কোথাও যেন শান্তিভঙ্গ না হয় তাই শ্বাসও মৃদু করিয়া দিলাম। প্রার্থনার শ্লোক সেখানে গাহিয়াছিলাম কিনা তাহা স্মরণ নাই। কিন্তু মনে মনে ষোল ঋকের পুরুষসূক্ত অত্যন্ত গভীর ভাবে গাহিলাম। পরে মনে হইয়াছিল যে এতখানি শান্তির মধ্যে আপনা আপনি সমাধিই আসা উচিত। নৌকাবিহারে কতখানি সময় কাটিল তাহা জানি না। ইতিমধ্যে শব্দ করিতে করিতে দ্বিতীয় নৌকাও সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাতে যে দল ছিল তাহারা এক রম্য গীত আরম্ভ করিয়া দিল। চারিদিককার খোয়াই ইহার প্রতিধ্বনি করিবে কি করিবে না, এই দ্বিধায় সংকোচে উত্তর দিতেছিল।

মাঝিরা বলিল, ‘এখন আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ; এখান হইতে ফেরাই চাই।’ সুতরাং যে মন আগের দিকে ছুটিতেছিল তাহা পিছনে টানিয়া বলিলাম, ‘চল, পুনরাগমনায় যাই।’

আবার যদি যাইতে হয় তো বর্ষার শেষে, জ্যোৎস্নার সময় দেখিয়া, রাত্রিদিন এই মূর্তিমান কাব্যে সন্তরণ করিবার জন্যই যাওয়া উচিত। সত্য, এই রমণীয় স্থান দেখিয়া মনে হইল যে যদি আবার কখনও এখানে ফিরিয়া আসা না হয়, তাহা হইলে এখান হইতে বাহির হওয়াই উচিত নয়।

অক্টোবর, ১৯৩৭

৪৪

ধুয়াঁধার

এক, দুই, তিন। ধুয়াঁধার এইমাত্র তিনবারের বার দেখিলাম। ধুয়াঁধার নামটি সুন্দর। এই নামেই সমস্ত দৃশ্য সুন্দর হইয়া যায়। কিন্তু একবার এই প্রপাতটি দেখিতে দেখিতে মনে হইল, ইহাকে ধারধুয়াঁ বলিব না কেন? ধার পড়ে, ফোয়ারা ওড়ে, তখন তখনই তুষার কুয়াশার মেঘ হাওয়ায় ছুটিতে

থাকে। তাই ধারধুয়াঁ নামই সার্থক মনে হয়। কিন্তু এ নাম চলিতে পারে না।

জব্বলপুর হইতে গোল গোল পাথর ও ভয়া-ভয়া পুষ্করিণী দেখিতে দেখিতে আমরা নর্মদার তীরে আসিয়া পৌছিলাম। পথের দৃশ্য বলিয়া দিতেছিল যে ইহা কাব্যভূমি, চারদিকে ছোট বড় গাছ খেলাধুলা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। পাশে একটা বড টিলা ভাঙ্গিয়া পডিয়া আছে। কিন্তু তাহার চূড়ায় যে গাছটি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার অর্ধেক মূল আলগা হইয়া গেলেও শোকমগ্ন বা চিন্তাকুল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ গাছ হইতে জীবনদীক্ষা লইয়াই অগ্রসর হইতে পারা যায়।

টিলা তো ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু যে অংশ ভাঙ্গিয়াছে তাহা সহজে ভূতলস্থ হয় নাই। এই টিলা দুই একটা মিনার আর শিখর বানাইয়া রাখিয়াছে। যেন বলিতেছে, বিনাশের মধ্য হইতেও যদি নূতন সৃষ্টি রচনা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা 'কল্পনার কবি' কি করিয়া হইলাম? টিলার উপর হইতে নীচের পাথর ও জলের দৃশ্য যুগপৎ দৃঢ়তা ও তরলতার চিন্তা মনের মধ্যে সৃষ্টি করিতেছিল। পুল পার হইয়া অগ্রসর হইতেই যোগিনীদের পাহাডের নীচে বহুবার দৃষ্ট সাধারণ দৃশ্য আবার দেখিলাম। সে দৃশ্য এতই সাধারণ যে তাহা দেখিয়া মনে দাগ পডে না। এখানে গরিব কারিগর পাথর দিয়া ছোট বড জিনিস তৈরী করিয়া বিক্রয় করিবার জন্য বসিয়া থাকে। সাদা, কালো, লাল, হলুদ, আসমানী ও অন্য নানা রঙ্গের মার্বেল পাথরের শিবলিঙ্গের ধারে স্ফটিক বাটী, স্ফটিকমণি, শিবমন্দির, হাতি ও অন্যান্য ছোটবড খেলনা যেন স্বয়ম্বরের আয়োজন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল লাগে সে তাহা উঠাইয়া লইয়া যায়। আজ এ সব খেলনা এক আসনে স্থান পাইয়াছে। জানি না, কাল কোন্ খেলনা কোথায় যাইবে? কিন্তু কিছু তো ভারতবর্ষের বাহিরেও যাইবে, আর সেখানে বহু বৎসর ধরিয়া ধুয়াঁধারের ধারাবাহিক সঙ্গীত মনে করিয়া চুপে চুপে শুনাইবে।

এখান হইতে ধুয়াঁধার পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইবার তপস্যা দুইবার করিয়াছিলাম। প্রথমবার রাত্রে যাত্রা করিয়াছিলাম। পরের বার করিয়াছিলাম সকালে স্নানের সময়। প্রত্যেক বারের কাব্যময় চিত্র পৃথক পৃথক ছিল। আজ তৃতীয় প্রহর বাছিয়া লইলাম। এবার অধিক তপস্যা করিতে হইল না।

ব্যেওহার রাজেন্দ্র সিংহজী তাঁহার মোটর গাড়ি দিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা প্রায় ধুঁয়াধার পর্যন্ত বিনা কষ্টে পৌঁছিয়া গেলাম। স্ফটিকমণির খেতের নিকটে নামিয়া, সেখানকার তিন দোকান পার হইয়া পাথরের মধ্যে দিয়া আমরা ধুঁয়াধার পৌঁছিলাম। পাথর যেমন অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছিল, তেমনই যাওয়ার স্ফূর্তিও বাড়িয়া চলিতেছিল। এরূপ করিতে করিতে আমরা ধুয়াঁধারের নিকটে গিয়া পৌঁছিলাম।

প্রপাত অর্থাৎ জীবনের অধঃপাত। কিন্তু এখানে সেরূপ মনে ছিল না। কিন্তু এখানে ওরূপ মনে হয় না। প্রথমবার গিয়াছিলাম ডিসেম্বরে, অন্ধকারের সময়। আকাশের মেঘ চন্দ্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া বসিয়াছিল। সুতরাং রাত্রি চাঁদিনী হইলেও অমাবস্যার মত ভয়ঙ্করী ছিল। অমাবস্যার রাত্রিতে আকাশের তারা এই ভীষণতাকে হাসিয়া উড়ায়। কিন্তু মেঘ থাকায়, সে আশাও রহিল না। ফলে সেই রাত্রিকে স্বয়ং ধুয়াঁধারের নিজস্ব সৌন্দর্যে আমাদিগকে প্রসন্ন করিতে হইল। রাত্রির প্রার্থনা সারিয়া আমরা সেই আনন্দ উপভোগ করিলাম, তাহার পর ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয়বার যাই ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর প্রায় নয়টা দশটা বেলায় 'চড়ন্ত' রৌদ্রকে স্বাগত জানাইতে জানাইতে। ধুয়াঁধারের সম্পূর্ণ দর্শন আমরা সেবার করিতে পারিয়াছিলাম। মার্চ মাস, সুতরাং জলে গ্রীষ্মকালের প্রভাবের অভাব ছিল না। পাহাড়ের কিছু আঁকাবাঁকা কাটা-কাটা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আমরা নীচ হইতে ধুয়াঁধারকে পড়িতে দেখিয়াছিলাম। জলের সে গতি আর ফোয়ারার সে চঞ্চলতা মনকে অদ্ভুতভাবে স্থির করিয়া দিতেছিল। জলের দিকে অনিমেষ নয়নে দেখিতে থাকিলাম। মনে হইতেছিল যেন নব নবোন্মেষ-শালিনী জলধারা বেগের সমাধিভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়ে দেখিতে পাইয়াছিলাম যে সেখানকার কাদামাখা পাথর, উপর হইতে যে ভাবেই দেখা যাক, ভিতরে ভিতরে তাহাতে প্রেমের লাল রংই খেলা করিতেছিল। জোরে জল পড়িতেছিল বলিয়া পাথরের এক টুকরা উড়িয়া গিয়াছিল, আর ভিতরের গোলাপী লাল রং পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল, যেন উহাতে আলতা লাগানো হইয়াছিল।

ধুয়াঁধার দেখিতে যাইবার সবচেয়ে ভাল সময় দীপাবলী। বৃষ্টি না হওয়ায় পথে কোনও ময়লা ছিল না। বর্ষাকাল আসিলে সমস্ত প্রদেশ জলে

ভরিয়া যাওয়ায় প্রপাতের জন্য কোনও ক্ষতি হইত না। যেখানে হৃদয়কে নাড়া দিবার মত প্রপাত আছে, সেখানেই বর্ষাকালে মাথা ঘুরিয়া যায় এমন ঘূর্ণিও নিশ্চয় দেখা যায়। এই ঘূর্ণিগুলির রুদ্র রূপ দেখিতে যদি এ পর্যন্ত আসিতে পারা যায় তাহা হইলে আমি না আসিয়া পারিব না। ঘূর্ণি বিপ্লবের প্রতীক। তাহার আকর্ষণ কিছুটা অপূর্ব হইয়া থাকে ; এমন কি, কখনও কখনও মৃত্যুর আমন্ত্রণও আনিয়া দেয়।

দীপাবলীর সময় জলরাশি সবচেয়ে অধিক পুষ্ট, প্রপাতের শোভা সবচেয়ে অধিক সমৃদ্ধ, আর মিঠা রৌদ্র সেবনের পর তুষারের মেঘের কণাগুলি সবচেয়ে অধিক আনন্দ দেয়। আমরা যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, অন্ধকার দৃশ্য সেরূপই ছিল। তুষারের মেঘ দূর হইতেই চোখে পড়িতেছিল। রান্নাঘরের ধুয়াঁ দেখিয়া অতিথির যেমন আনন্দ হয়, এই ধুয়াঁর মেঘ দেখিয়াও আমি কল্পনা করিতে পারিলাম যে আজ কি ধরনের আতিথ্য পাওয়া যাইবে। আর ধুয়াঁর মত প্রপাত যখন দেখিতে যাই, তখন সেখানকার তৈরী কাঠের কাজ-চলা গোছের ছোট পুলেও কলা ও আতিথেয়তার পরিচয় যেন পাইতে থাকি। পরিচিত কোণে গিয়া বসিলাম, আর স্নেহার্দ্র পবন তুষারের এক ফোয়ারা আমাদের দিকে পাঠাইয়া দিয়া বলিল 'স্বাগতম্' 'সুস্বাগতম্' ; মুহূর্তে আমাদের পথের গ্লানি সমস্তটাই দূর হইল, আমরা নবীন হইয়া গেলাম। নূতন চোখে ধুয়াঁধার দেখিতে লাগিলাম।

ধুয়াঁধার মানে পাথরের বিস্তারের মধ্যে নির্মিত অর্ধচন্দ্রাকার ঘাট। তাহার মধ্য হইতে যখন জলরাশি নীচে লাফাইয়া পড়ে, তখন মধ্যপথে যে কাচের মত সবুজ রং দেখা যায় তাহা হইতে যেন বিষ বাহির হইতেছে। তাহার বাম-দিকে ও আমাদের ডানদিকের শিলা হস্তীমুণ্ডের মত সম্মুখের দিকে বাহির হইয়া আছে। তাহার উপর হইতে জল যখন নীচে পড়ে, তখন মনে হয় যেন অসংখ্য অসংখ্য হীরার হার এক একটা সিঁড়ির উপর হইতে লাফাইতে লাফাইতে পরস্পরের সংগে জড়াজড়ি করিতেছে। যেমন যেমন লাফাইতেছে তেমনি তেমনি হাসিতেছে। জল পিঁজিয়া পিঁজিয়া তাহার মধ্য হইতে সাদা সাদা রং তৈয়ার করিতে করিতে যায়। মাঝখানের মুখ্য প্রপাত মাটিতে পড়িতেই এত জোরে উপরের দিকে ছলক দিয়া ওঠে যে আতসবাজির 'বাণে'রও তাহাতে হিংসা হইতে পারে। ফোয়ারা উপরে উঠিয়া একটু আলগা

হইয়া পড়িলেই অন্য একটা ফোয়ারা নবীন উৎসাহে তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া ধাক্কা দিয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে এবং উহার জলকণা পৃথিবীর আকর্ষণ ভুলিয়া ধুঁয়ার আকারে ব্যোমে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিতেছে। এই তুষার একটু উপরে উঠিলেই পবনের প্রবাহ তাহাকে উডাইয়া উড়াইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। ধুঁয়ার এই তরঙ্গ যখন হাওয়ায় কখনও লঘু কখনও গভীর রূপে দৌড়ায় তখন মেঘের এক সুন্দর ভেলভেট দেখা যায়।

আর নীচে! নীচের জলের পাগলামির বর্ণনা তো সম্ভব হইতেই পারে না। জল যেন অদ্বৈতানন্দে উথলিয়া উঠিতেছে। যতখানি নীচে পডিতেছে ততখানিই উপরে উঠিতেছে। উহা হরিৎ হইতে সাদা ফেন তৈরি করিতেছিল, আর প্রাণ যেমন চায়, তেমন বিহার করিতেছিল। এই অপূর্ব আনন্দ স্মরণ করিয়া নীচের জল বার বার উপরে আসিতেছিল। ধোবাঘাটের উপরে সাবানজলের উপমা যদি রসের বিরোধী না হইত, তাহা হইলে নীচের জলের উপরে উঠার তুলনা তাহার সঙ্গে করিতাম। কিন্তু ধোবার সাবান জল দুর্গন্ধ। তাহাতে গতিও নাই, উন্মাদনাও নাই, বেপরোয়া ভাব ও তাণ্ডবও নাই। আর হাসি না মিলাইতেই চেহারায় পুনরায় নির্মলভাবে ধারণ করিবার কলাও তাহার জানা নাই। এখানকার জল দেখিয়া ধোবাঘাটের কথাই বা মনে পডিল কেন? উভয়ের মধ্যে কোনও প্রকারের সঙ্গতি তো ছিল না।

মানুষ যদি সমাধিতে মত্ত থাকিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে এখানে আসিতে হইবে। এখানে আসিলে কোনও মতেই সে নিরাশ হইবে না।

এদিকে (দক্ষিণে) টিলার দুই সিঁডি এবার পুনরায় নামিলাম। এবার এখানে উপনিষদের কথা মনে পডিল। উপরে সূর্য তাপ দিতেছিলেন, আর আমি গাইতেছিলাম—"পূষন্নে কর্ষ! যম! সূর্য! প্রজাপত্য! ব্যূহ রশ্মীন্; সমূহ তেজঃ।" পাঠের প্রায় শেষে আসিয়া যখন বলিলাম "ওঁ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর" তখন হঠাৎ গত তিন চার বৎসরের সমস্ত জীবন একসঙ্গে এই জীবনধারার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল আর মনে হইল যেন আমি আমার জীবন এই উন্মত্ত জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করিতেছি, এবং তাহা সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হইতেছে না দেখিয়া ক্লেশ বোধ করিতেছি। পর মুহূর্তেই এই তিন বৎসরের স্মৃতিও তুষার হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল; আমি প্রপাতের সহিত একাত্ম হইয়া গেলাম। সত্যই এই প্রপাত পূর্ণ। আমিও এই পূর্ণেরই এক অংশ, তাই

তত্ত্বের দিক দিয়া পূর্ণ। আমরা উভয়ে বিসদৃশ নই ; একই পরম তত্ত্বের ছোট বড় বিভূতি। এই বোধ জাগিবামাত্র চিত্ত শান্ত হইল, উপরে উঠিয়া আসিলাম।

কল্যাণীয়া সরোজিনীও এই সমগ্র দৃশ্য অতৃপ্ত নয়নে পান করিতেছিল। এই সমগ্র আনন্দ কিরূপে অনুভব করিবে, কি ভাবে প্রকাশ করিবে, এই ভাবনার মধুর ক্লান্তি তাহার চোখে দেখা যাইতেছিল।

এখান হইতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চৌষট্টি যোগিনী দর্শন করিবার ছিল ; নর্মদা নদীর রক্ষক সাদা, হলুদ, নীল পাহাড় দেখিবার ছিল। তাই নববধূ যেমন বাপের বাড়ি হইতে শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় দুইদিকের সুখ দুঃখ একত্র মিলাইয়া অনুভব করিতে করিতে যায়, তেমন করিয়া ধুয়াঁধারকে হৃদয়ের সহিত প্রণাম করিয়া আমরা উঠিয়া আসিলাম।

ভারতবর্ষে এই প্রকারের অনেক প্রপাত অখণ্ডরূপে বহিতেছে এবং মানুষকে সৌন্দর্যের ও উন্মত্ত অবস্থার পাঠ শিখাইয়া আসিতেছে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া—লক্ষ লক্ষ বৎসর যে নয় তাহাই বা কে বলিতে পারে—ধুয়াঁধার সর্বদা এই ভাবে পড়িতেছে। শ্রীরামচন্দ্র হয়তো এখানে আসিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ হয়তো এখানে স্নান করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের সৈন্যরা এখানে আসিয়া হয়তো জলবিহার করিয়া থাকিবে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য হয়তো এখানে বসিয়া তাঁহার স্তব রচনা করিয়াছিলেন। কলচুরি ও বাকাটক বংশের বীরেরা এই জলে তাঁহাদের ক্ষতস্থান হয়তো ধৌত করিয়াছিলেন, আর অল্‌হনা দেবী এইখানেই বসিয়া চৌষট্টি যোগিনীর স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর ভবিষ্যৎকালে ধুয়াঁধারের তীরে কি কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? স্বয়ং ধুয়াঁধারেরই একথা জানা নাই। সে তো সর্বদা উপর হইতে নীচে পড়িতেছে এবং তুষার হইয়া উড়িয়া যাইতেছে।

নভেম্বর ১৯৩৯

শিবনাথ ও ঈব

কলিকাতায় যাওয়া আসার পথে অনেক নদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এই প্রদেশের ইতিহাস আমার জানা নাই, সেজন্য লজ্জাবোধ করি। এখানকার লোকেরা কত সরল ও ভালমানুষ বলিয়া মনে হয়। তাহারা যদি মানুষ সংহারের কলা-কৌশল আয়ত্ত করিত, তবে তাহাদের নাম ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিত। কেহ কেহ মানুষ মারিয়াছে বলিয়া অমর হয়—মালিক কাফুর, কালাপাহাড ইত্যাদি শ্রেণীর লোক।

এই সব নদীর ধারে লডাই হইয়া থাকিলে তাহা আমার জানা নাই। তাই আমার দৃষ্টিতে ইহাদের জল এখন বিশেষ পবিত্র। চর্মণ্বতীর জল যজ্ঞ-পশুদের রক্তে লাল হইয়া গিয়াছিল। শোণ ও গঙ্গা, সম্রাটদের গৌরবাকাংক্ষী রক্ত হজম করিয়াছিল। এই সকল নদী তাহাদের মত করিয়া থাকিলে তাহাতে আশ্চর্য কিছু নাই। কিন্তু যতক্ষণ আমি তাহা জানি না, ততক্ষণ এই সন্দেহের সুফল তাহারা ভোগ করুক। কিন্তু এই সকল নদীর তীরে বহু সাধু অবশ্য তপস্যা করিয়া থাকিবেন এবং কৃতজ্ঞতাপূর্বক তাহাদের স্তন্যও পান করিয়া থাকিবেন। ইহাও আমার জানা নাই। তথাপি আমি নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিই!

* * *

একবার আমি দ্রুগ গিয়াছিলাম, তখন শিবনাথ নদীর সঙ্গে সামান্য পরিচয় হইয়াছিল। সে নদীর মধ্যে আছে গোঁড, ভীল প্রভৃতি পার্বত্য জাতির মত্ততা। সে তো সমগ্র ছত্রিশগডের স্তন্যদায়িনী। তাহার করুণ কথা চিত্তকে উদাসীন করে। পুণ্যশালিনী নদীর কাহিনী কি এমনি হইতে পারে? কিন্তু নদী বেচারী কি করিবে? বিজয়ী আর্যেরা যদি তাহার কথা রচনা করিত, তবে তাহাতে উল্লাসের উপাদান মিলিত। ইহা তো পরাজিত, নিপীড়িত,

ক্লিষ্ট আদিবাসীদের স্মৃতির সংগে বহিয়া যাইতেছে, [illegible] নদী। ইহার কাহিনী তো এমনিতেই করুণ হইবে।

কলিকাতার পথে শিবনাথ নদীর সঙ্গে বার বার দেখা হয়। আর নদী বলে : "রাজাদের ও সাধুদের ইতিহাসে তুমি সন্তুষ্ট হইও না। বিজেতাদের ও সম্রাটদের ইতিহাসে তুমি লোকহৃদয়ের পরিচয় পাইবে না। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, মোল্লা ও মিশনারী, কেহই যাহাদের দুঃখের কথা জানে না, এমন সব পার্বত্য জাতির দুঃখদুর্দশার সঙ্গে পরিচয়ের দীক্ষা আমি তোমাকে দিতেছি। এই দীক্ষা গ্রহণ করিবার সাহস তোমার আছে কি?"

ভারতবর্ষের মূক জনসাধারণকে ভাষাগত ঐক্য দিবার জন্য আমি হিন্দুস্থানী প্রচার করিতেছি। এই কার্যের উপলক্ষে আমি এখনই পুনা হইতে আসিয়া এখন রামগড যাইতেছি। সেখানে কংগ্রেসের সকল প্রদেশের লোকেরা আসিবে। গান্ধীজীর আগ্রহের জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন এখন গ্রামে হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সকল ভাল। কিন্তু রামগডেও কি পাহাড়ীরা থাকিবে? বিহারের সাঁওতাল ও 'হো'রা হয়তো আসিবে। কিন্তু শিবনাথের সন্তানেরা আসিবে কিনা জানি না।

* * *

আজ সকাল হইতে অনেক নদী দেখিলাম। লম্বা চওড়া পাথর পড়িয়া আছে এমন নদীও দেখিলাম, আবর্জনা পূর্ণ নদীও জানিলাম। তীরে একটাও গাছ নাই এমন নদীও দেখিলাম, আবার এক তীরে গাছপালার এক ঘন প্রাচীর আছে এমন নদীও দেখিলাম। সাদা সাদা বক পাখি তাহার ভিতরে বালুর মধ্যে পায়ের আকৃতি আঁকিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই চরণ লিখার মধ্যে আমি কোনও ইতিহাস পাইতে পারিলাম না, কোনও জনশ্রুতির সমাধান খুঁজিতে পাইলাম না। নদী আশায় আশায় লিখিয়া চলে, নিরাশায় নিজের লেখা লিখিয়া মুছিয়া ফেলে, আর নূতন নূতন লেখক ও পাঠকের পথ চাহিয়া থাকে।

আমরা ঝারসুগডা স্টেশনের পাশ দিয়া যাইতেছি। এক ছোট স্টেশনের নিকটে আসিয়াছি। ইতিমধ্যে এক সুন্দর নদী চোখে পড়িল। আমাদের পথের নীচে দিয়া বহিয়া যাইতেছে। সকল নদী সুন্দর, কিন্তু এই নদীর মধ্যে অসাধারণ সুন্দর আকৃতি রচনা করিবার কলা দেখিতে পাইলাম। জলের স্রোতে ঘূর্ণির সৃষ্টি হইয়া যাইতেছে, কাদার জন্য তাহা বিশেষ আকার ধারণ

করিতে করিতে যাইতেছে। উপর হইতে এইসব দেখিয়া আমার রবীন্দ্রনাথের ছবি মনে পড়িল। এই নদীর আকৃতিও কিছু না বলিয়া কিছু না বুঝাইয়া হৃদয় স্পর্শ করে এবং সেখানে চিরকালের জন্য তাহার মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া যায়। ইহার নাম হইল প্রকৃত কলা।

কিন্তু এই নদীর নাম কি? পরিচয় হইল, অথচ নাম জানিলাম না, কি বিচিত্র অবস্থা! এতক্ষণে ঈব স্টেশনে আসিলাম। লোকদের জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই নদীর নাম কি?" তাহারা বলিল "ঈব।" নদীর নাম হইতেই স্টেশনের নামকরণ হইয়াছে। ইহা যে উচিত হয় নাই এ কথা কে বলিবে? কিন্তু মনে সন্দেহ অবশ্যই জাগিয়া থাকিবে। এখানে ভোডন নামে এক নদী আসিয়া ঈবের সঙ্গে মিশিয়াছে। স্টেশন ভোডনের তীরে। ঈব একটু বড়, তাই ভোডনের প্রতি অন্যায় করিয়া তাহার নামে স্টেশনের নাম হয় নাই। ভোডন সাধারণ নদী নয়, যথেষ্ট চওড়া। দূর হইতে আসিতেছে। কিন্তু সে কোনও অহঙ্কার না করিয়া নিজের জল ঈবকে সমর্পণ করিতেছে এবং নিজের নামকে ধরিয়া রাখিবার আগ্রহও তাহার নাই। আমি ঈবকে জিজ্ঞাসা করিলাম: "দেখ, আগ্রহ ও উদারতায় এই ভোডন কি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়?" ঈব একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "সে কথা তোমরা মানুষরা জান। ভোডন তাহার নাম ত্যাগ করিয়া নিজের জল আমাকে সমর্পণ করিয়াছে এই উদারতার প্রশংসার পরিবর্তে তাহার নিকট সমর্পণের দীক্ষা লইয়া তাহার মত হওয়াই আমার বেশী ভাল লাগে। দেখ, তাহার ও আমার জল একত্র করিয়া মহানদীকে দিবার জন্য আমি সম্বলপুর যাইতেছি। সেখানে আমিও নাম ত্যাগ করিব। এইভাবে উত্তরোত্তর নামরূপ ত্যাগ করিয়াই আমরা সকলে মহানদীর মহত্ত্ব পাইয়াছি, তাহাও সমুদ্রে অর্পণ করিবার জন্যই।" আর যাইতে যাইতে ঈব অনুষ্টুপ্ ছন্দে একটা পংক্তি গাহিয়া শুনাইল:

সর্বে মহত্ত্বমিচ্ছন্তি কুলং তৎ অবসীদতি।
সর্বে যত্র বিনেতারঃ রাষ্ট্রং তন্নাশমাপ্নুয়াৎ॥

ঈবের এই কথা শুনিয়াই আমি রামগড় গেলাম।

মার্চ, ১৯৪০

হতভাগ্য শিবনাথ

['শিবনাথ ও ঈব' লেখাটিতে যে জনশ্রুতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সারবস্তু বেমেতরা-দ্রুগ হইতে লেখা নীচের পত্র হইতে পাওয়া যাইবে।]

কাল ও আজ শিবনাথ নদী দর্শন করিলাম। এমনিতে তো কলিকাতা যাওয়া আসার সময় শিবনাথ দুই একবার পার হইতেই হয়। সেখানে বড় উঁচু পুলের উপর হইতে শিবনাথের স্রোত উঁচু উঁচু টিলার মধ্য হইতে বহিতে দেখা যায়। কাল সন্ধ্যায় বালোর হইতে ফিরিবার সময় বিশেষ করিয়া শিবনাথের তীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

চাতুর্মাস্য চলিয়া গিয়াছে, নদীতে কিন্তু এখনও জল আসে নাই। ফলে, শিবনাথ বিরহিণী নারীর মত মলিনবদন বলিয়া মনে হইল। শ্রাবণ ভাদ্রে যে নদী দুই তীর অতিক্রম করিয়া অনেক মাইল পর্যন্ত ছড়াইয়া যায়, সেই নদীকে এইভাবে নিজেরই স্থানে অজগরের মত এক কোণে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কাহারও মন বিষণ্ণ না হইয়া পারে না।

দ্রুগের লোকদের শিবনাথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম: এই নদী কোথা হইতে আসিতেছে? কত দীর্ঘ? ইহার সম্মুখে কি আছে? কোনও জনশ্রুতি শোনা যাইতেছে কি? একটি প্রশ্নেরও উত্তরে 'হাঁ' শুনিলাম না। নদীর কথা জানিতে গেলে কি এমনই হয়? রোজ সকালে উহার সেবা গ্রহণ করি; এই পর্যন্ত, এর বেশী সম্বন্ধ আমাদের জীবনে উহার সহিত আর কি আছে?

অবশেষে দ্রুগ জেলার গেজেটিয়ার চাহিয়া পাঠাইলাম। উহাতে উপরের সাধারণ প্রশ্নের উত্তর তো দিয়াছেই—তা ছাড়া শিবনাথের বিষয়ে এক জনশ্রুতিও দেওয়া আছে। সেই কথাই আমি আজ এখানে আমার ভাষায় বলিতে চাই।

শিবা নামে গোঁড়দের একটি বালিকা। জঙ্গলী গোঁড় জাতির মেয়ে, তথাপি তাহার সংস্কারলব্ধ জ্ঞান ছিল, রসজ্ঞানও ছিল। তাহার উপর গোঁড় জাতিরই একটি ছেলের মন পড়িয়া গেল। মেয়ের চিত্ত জয় করিবার মত তাহার মধ্যে

একটিও সদ্‌গুণ ছিল না। ইচ্ছামত আচরণ করা ও লোককে ধমক দিয়া কাজ হাসিল করা, ইহাই শুধু সে জানিত। সে শিবার ধ্যান করিত, আর তাহাকে পাইবার কোন পথ না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিত। অবশেষে তাহার জাতির রীতি অনুসারে সুযোগ মা দেখিয়া শিবাকে হরণ করিল, রাক্ষস পদ্ধতিতে তাহাকে বিবাহ করিল।

বিবাহ-বিধি সম্পূর্ণ করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল, শিবাকে আপনার করিয়া লওয়া সহজ কাজ ছিল না। শিবার মত সংস্কারবতী ও চিন্তাশীল মেয়ে তাহার মধ্যে আর কি দেখিবে? আর জড় ও মূঢ় ছেলে অনুনয়ের ব্যাপার কি বুঝিবে? সে পতির অধিকার চালাইবার চেষ্টা করিল। মেয়ে অবলার শক্তি দেখাইল। যে যুবক শিবাকে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিল, সে তাহার রুদ্ধ হৃদয়ের নিকট হার মানিল। তাহার ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল। শরীরকেই যে সব কিছু বলিয়া মনে করিত, সে শরীরের বাহিরে যাইতে পারিল না। অবশেষে সে শিবাকে মারিয়া ফেলিল! তাহার শরীরের অংশ, পাহাড়ের নীচে এক গভীর গর্তে ফেলিয়া দিল!

শিবার দেহ যেখানে পড়িল, সেখান হইতে অবিলম্বে এক নদী বহিতে লাগিল। তাহাই আমাদের শিবনাথ, তাহা অগ্রসর হইয়া মহানদীর মধ্যে নিজের জল ছাড়িয়া দিতেছে।

আজ সকালে আমরা বেমেতরা যাত্রা করিব বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম। পথে এক দুর্ঘটনা। আমাদের মোটর গাড়ি ছুটিতে ছুটিতে এক গরুর গাড়ির সংগে ঠোকর খাইল। একটি বলদের শিং ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা থামিয়া গেলাম। তাহার সাহায্য করিবার জন্য ছুটিলাম। আমাকে পরামর্শ দিতে হইল, বলদের শিং ঝুলিতেছিল, তাহা কাটিয়া ফেলা হউক। যেখান হইতে রক্ত ঝরিতেছিল, সেখানে পেট্রোলের পটি বাঁধিতে হইল। সমস্ত বাতাবরণ করুণ ও স্তব্ধ হইয়া গেল। এ অবস্থায় পুনরায় শিবনাথের দর্শন লাভ হইল। এখানে নদীর প্রসার সুন্দর। আশপাশের পাথর জামুনী লাল রং এর। নদীর গর্ভও সুন্দর ছিল। প্রতিবিম্ব কাব্যময় মনে হইতেছিল। কিন্তু শিবার করুণ কথা মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাই এই দর্শনের মধ্যেও ছিল বিষাদের ছায়া।

হয়তো শিবনাথের ভাগ্যই এইরূপ। শেষটায় মনের বিষাদ লাঘব করিবার জন্য এই পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। এখন মনটা কিছু হালকা লাগিতেছে।

মে, ১৯৪০

সূর্যার স্রোত

বর্ষা হইতেছে, আমরা কাসার সর্বোদয় কেন্দ্র দেখিতে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পক্ষে দিনটা ভাল ছিল না। এইজন্যই আমরা গেলাম। বর্ষার দিনে ছোট ছোট 'নদী' রাস্তার উপর দিয়া বহিয়া যায়, তাহার জল বাড়িলে মোটর বাসও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ হইয়া থাকে। আমরা ভাবিলাম, আমাদের সর্বোদয়সেবক আমাদের আদিবাসী ভাইদের মধ্যে কেমন কাজ করিতেছে তাহা দেখিবার ইহাই তো সময়।

ভারতের পশ্চিম তীরে এক সুন্দর স্থানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। বোম্বাইয়ের উত্তরে প্রায় এক শত মাইল দূরে বোরডী ঘোলওয়াড়ের কথা বলি। সেখানে আমি এক মাস পর্যন্ত ছিলাম। সেখানে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে রোজ খেলিতাম। সমুদ্রের জলও যখন ভাটার জন্য পিছনে সরিয়া যাইত তখন এক মাইল দেড মাইল পর্যন্ত পিছনে চলিয়া যাইত। আর সমস্ত সমুদ্রের তীর ভিজা টেনিস কোর্টের মত হইয়া যাইত। আমরা পাঁচ দশজন এই ভিজা বালুর ময়দানের উপর দিয়া সমুদ্রের ঢেউ খুঁজিতে চলিয়া যাইতাম। জোয়ারের সময় জলের ঢেউ আমাদের ধাওয়া করিত, আমরা তীরের দিকে দৌড়িয়া আসিতাম। জলের ঢেউ ধাওয়া করিত, আর আমরা প্রাণ লইয়া তীর পর্যন্ত দৌড়িয়া আসিতাম। এই খেলা ছিল বড মজার। দেখিতে দেখিতে সমস্ত খোলা ময়দান বড় সরোবরের রূপ ধারণ করিত আর বাতাস জলের সঙ্গে খেলা করিত। এরূপ লবণ জলের মধ্যে ও বালুকার মধ্যেও এক জায়গায় ছোট তালগাছ জন্মিয়াছিল। তাহার চিকন চিকন পাতা দেখিয়া আমি বলিতাম ইহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

এই বিশাল সরোবর-ময়দানে জলজ প্রাণীর খুব প্রকাণ্ড বসতি। রকম রকমের শংখ, রকম রকমের কাঁকড়া, আর তাহাদের মত ছোট ছোট প্রাণীর ওখানে বাস, তাহাদের খোলা ও হাড় সমুদ্রতীরে দেখিতে পাওয়া যাইত।

বোরডীতে যখন বাড়িতে যাই, তখন সেখানে একটাই ভাল হাইস্কুল ছিল। এখন সেখানে হইয়া গিয়াছে একটা ভাল ও বড় শিক্ষাকেন্দ্র। শিশু-শিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষা, নয়ী তালিম, আদিবাসীদের শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্র ইত্যাদি অনেক প্রতিষ্ঠান এখানে স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। এখন তো বোরডী রাজনৈতিক জাগরণ, শিক্ষা ও সমাজসেবার এক প্রধান কেন্দ্র হইয়া গিয়াছে।

বোরডীর দক্ষিণে একবার টিঁচণীতে গিয়াছিলাম। ওখানকার কারিগর কানের মাকড়ি প্রস্তুতের বিদ্যায় ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কাচের চুড়িও এখানে ভাল তৈয়ারী হইত।

এবার টিঁচণী ও বোরডীর মাঝে ডহাণু হইয়া আসিলাম। এই স্থানও সমুদ্রের তীরে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বোরডীর অপেক্ষা কম সুন্দর নয়।

পঞ্চাশ পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে ইরান হইতে আগত কিছু কিছু ইরানী সম্রান্ত লোক এখানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। বাড়ীতে ইহারা ইরানী বলে। এখন ইহারা ইরান হইতে প্রাচীনকালে আগত পারশীদের সঙ্গে কিছু কিছু মেলামেশা করে। গুজরাটি ও মারাঠি ভাল বলে। এই সব ইরানীদের বাগান ও বাড়ী বিশেষ করিয়া দেখিবার যোগ্য। চাষবাসের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা ইহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছে। আমাদের দেশে বাস করিয়া ইহারা এ দেশের আয় বাড়াইয়াছে, আর এখানকার চাষীদের খুব ভাল বস্তুজ্ঞান শিখাইয়াছে। ইহারা আমাদের ধন্যবাদভাজন।

* * *

ডহাণু হইতে ষোল মাইল পার হইয়া কাসা গেলাম। আমার এক পুরাতন ছাত্র শ্রীমুরলীধর ঘাটে চৌদ্দ পনের বৎসর ধরিয়া গ্রামসেবার কাজ করিয়া আসিতেছে। এ বৎসর সে ও তাহার সুযোগ্য ধর্মপত্নী কাসার কেন্দ্র নিজেদের হাতে নিয়াছে, আর দেখিতে দেখিতে এখানকার সাংস্কৃতিক পরিবেশ উন্নত করিয়াছে। আচার্য শ্রীশংকর রাও ভীসের প্রেরণায় এসব কাজ চলিতেছে।

ডহাণু হইতে কাসা যাইবার পথে এক সু-উচ্চ পর্বত শিখর চোখে পড়ে। শিখরের আকার দেখিতে গেলে পর্বতটিকে ঋষ্যশৃঙ্গ বলিতে হয়। সন্ধান লইয়া জানা গেল, শিখরের শৃঙ্গের পাথর মজবুত নহে। পাথর ধরিয়া ধরিয়া কেহ উপরে উঠিতে গেলে পাথরের টুকরা হাতে খসিয়া আসে। আমার ভয় হয়, এক হাজার দুই হাজার বৎসরের ভিতর সমস্ত শৃঙ্গ হাওয়া, জল, ও রৌদ্রে ক্ষয়

হইয়া যাইবে এবং পর্বতের উচ্চতা একেবারে কমিয়া যাইবে। এই পাহাড়ের শিখরের উপর আছে মহালক্ষ্মীর মন্দির। লোকে বলে যে কোনও গর্ভবতী স্ত্রী মহালক্ষ্মীর দর্শনের জন্য উপর পর্যন্ত গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মহালক্ষ্মী পূজারীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, তাঁহার ভক্তদের এই কষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে নীচে লইয়া যাওয়া হউক। এখন এই পাহাড়ের তরাই বা নিম্নদেশে মহালক্ষ্মীর দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে।

কাসার নিকটে এক সুন্দর নদী বহিয়া যাইতেছে, ইহার নাম সূর্যা। এই নদীর সম্বন্ধেও কিংবদন্তী আছে।

পাণ্ডবেরা যখন তীর্থযাত্রায় এই পথ দিয়া গিয়াছিলেন, তখন ভীমের ইচ্ছা হইল যে স্থানীয় দেবতা মহালক্ষ্মীকে তিনি বিবাহ করেন। জিজ্ঞাসা করিলে মহালক্ষ্মী বলিলেন যে অনেক যোজন দূরে সূর্যা নদী বহিতেছে, তাহার জলরাশি যদি তুমি ঘুরাইয়া আমার এই পাহাড়ের তলদেশে আনিয়া দাও তবে তোমাকে বিবাহ করিব। শুধু এইটুকু শর্ত যে এ সমস্ত শেষ করিতে হইবে এক রাত্রির ভিতর। যদি সকালে মুরগির ডাক শোনা যায় আর তোমার কাজ শেষ না হয়, তাহা হইলে আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে না। ভীম রাজি হইলেন। বড় বড় পাথর আনিয়া নদীর স্রোত বন্ধ করিয়া দিলেন। সামান্য একটা জায়গা বাকি ছিল, তাহার জন্য পাথর না পাওয়ায় পিঠ দিয়া আটকাইলেন। আর কি বলিতে হইবে? নদীর জল বাড়িতে আরম্ভ করিল। মহালক্ষ্মী ঘাবড়াইয়া গেলেন, এখন নিতান্ত এই একটা মানুষকে বিবাহ করিতে হইবে। দেবতারা চালিয়াৎ কম নন। হারিবার ডাক আসিলে একটা না একটা রাস্তা খুঁজিয়াই বাহির করেন।

এদিকে বাঁধের পাথরের মধ্যে পিঠ দিয়া ভীম পথের পানে চাহিয়া আছেন, কতক্ষণে জল পাহাড় পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইবে। ততক্ষণে মহালক্ষ্মী মুরগির আকার ধারণ করিয়া ভোর হইবার পূর্বেই 'কুকুর-কু' করিয়া শব্দ করিলেন। বেচারা ভালোমানুষ ভীম হতাশ হইয়া পড়িলেন, নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর তাঁহার পণ রক্ষা করিতে পারা গেল না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর ঐটুকু জায়গা পাইয়াই যে জল বাড়িয়াছিল তাহা জোরে বহিতে আরম্ভ করিল, আর জলের সঙ্গে ভীমের কৃতিত্বও ভাসিয়া গেল!

এইভাবে দেবতাদের ও বলশালী অসুরদের কলহ তো অসংখ্য জনশ্রুতির মধ্যে ও পুরাণের মধ্যে পাওয়া যায়।

আমরা অনেক সবুজ সবুজ খেত পার হইয়া পূর্ণার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বর্ষার দিন। জল খুব বাড়িয়াছিল, ভীমবাঁধের উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িতেছিল। বড়ই সুন্দর দৃশ্য। যেখানে জল জোরে বহিতেছিল, সেখানে আমরা কল্পনার চক্ষে দেখিলাম, ভীম বসিয়া আছেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িলেন। তাহার পর পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন।

বাসায় ফিরিলাম। সেখানকার কাজ দেখিলাম। আদিবাসীদের জীবন-যাত্রা কি ভাবে চলে তাহা দেখাইবার জন্য যে প্রদর্শনী ছিল তাহা দেখিলাম। কিছু খাইয়া লইলাম, লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিলাম, পুনরায় বাসে চড়িয়া মহালক্ষ্মীর মন্দির দেখিতে গেলাম। পথে আদিবাসীদের কুটীর ও চাষের খেত দেখিলাম। ইহারা জীবনে অনগ্রসর বটে, কিন্তু জীবনের আনন্দ হারায় নাই। পাহাড়ের নীচে এক রমণীয় স্থানে মহালক্ষ্মীর মন্দির। দেবীর ভক্তেরা বহু দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। প্রতি বৎসর এক প্রকাণ্ড মেলা হয়, দেখিতে দেখিতে এক লক্ষ লোকের উৎসবের স্থান হইয়া দাঁড়ায়। সকল যাত্রীর থাকিবার জন্য বহু লোক মিলিয়া এখানে এক ভাল ধর্মশালা করিয়া দিয়াছে। গিয়া উহা দেখিয়া আসিলাম। মার্বেল পাথরের উপর দাতাদের নাম খোদাই করা আছে। নাম পড়িয়া বড়ই আশ্চর্য লাগিল। সমস্ত নামই আফ্রিকার দক্ষিণ রোডেশিয়ার অধিবাসী গুজরাতী ধোবাদের। কেহ দিয়াছে এক শিলিং, কেহ বা দিয়াছে এক হাজার। কোথায় দক্ষিণ রোডেসিয়া, কোথায় গুজরাত, আর কোথায় থানা জেলায় মারাঠীদের মধ্যে গুজরাতীদের নির্মিত এই বিশ্রামালয়!

স্বরাজ গভর্মেণ্টের সাহায্যে এই আদিবাসী নবযুবকেরা এখন নূতন নূতন উৎসাহে নূতন নূতন কথা শিখিতেছে এবং নিজেদের জাতির উদ্ধারের কথা ভাবিতেছে। আমি তাহাদের বলিলাম, তোমরা এতখানি পিছাইয়া আছ যে তোমাদের নিজের জাতির উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করাই তোমাদের পক্ষে সঙ্গত। কিন্তু আমি তো সেদিনের আশায় আছি যেদিন তোমরা শুধু নিজের জাতির জন্য নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের উদ্ধারের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিবে; শুধু নিজের জাতির নয়, সমস্ত দেশের নেতা হইবে। যে শুধু নিজেদের জ্ঞাতি-কুটুম্বের কথা

ভাবে, সে বরাবর পিছাইয়াই থাকে। যে সমস্ত পৃথিবীর কথা ভাবে, সমস্ত পৃথিবীর সেবা করে, সে নিজের ও অন্যের প্রকৃত উন্নতি করে।

আমি নিজের মনে প্রশ্ন করিলাম, যদি ইহাদের মধ্যে ভীমের মত দৈহিক শক্তি আসে, আর ইহাদের চারিপাশে সবর্ণ শুভ্রবস্ত্রপরিহিত লোকদের মধ্যে স্থানীয় দেবতা মহালক্ষ্মীর মত প্রবঞ্চনার ক্ষমতা হয় তবে পরিণামে কি হইবে! আবার তো শুধু জলের স্বর্যা নদী বহিবে না!

কলিযুগের মাহাত্ম্য মনে করিয়া নয়, সত্যযুগের প্রতিষ্ঠার জন্য, এই সব আদিবাসীর মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করা উচিত। চাতুর্বর্ণ্যের পুনরায় প্রতিষ্ঠার কথা ও আদিবাসীর 'উদ্ধারে'র 'মুরুব্বির' ভাষা এখন আমাদের ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহাদের ও আমাদের মধ্যে কোনও ভেদই রাখা উচিত নয়।

সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

৪৮

অভ্রের ঈব

কলিকাতা হইতে ওয়ার্ধা যাইতেছিলাম। গাড়ীতে রাত্রে কিছু গায়ে না দিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। গায়ে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না; তবু কিছু গায়ে দিলে চলিত। ভোর পাঁচটায় যখন জাগিয়া উঠিলাম তখন হাওয়াটা বেশ একটু ঠাণ্ডা মনে হইল, চাদর গায়ে দিই নাই কেন সেজন্য পসতাইতে ছিলাম। শেষে 'এখন আর কি হইবে' বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। ভবিষ্যৎ কালে কবিদের যতখানি দৃষ্টি পড়ে, বাহিরের দৃশ্য ততটুকুই দেখা যাইতেছিল—সমস্ত দৃশ্য ছিল প্রসন্ন, কিন্তু খুব স্পষ্ট ছিল না।

এতক্ষণে একটা নদী আসিল। পুলের দুই ধারের মধ্যে তাহার স্রোত বহু রেখায় ভাগ হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক নদীর বেলায় এইরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে স্পষ্টই মনে হইতেছিল, এই নদীর একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে। ক্ষীণ অন্ধকারের মধ্যে প্রভাতের আকাশ ইহা স্থির করিতে পারিতেছিল না যে

জলকে চাঁদি বা রূপার করিবে, না সেকালের ঝকঝকে লোহার আয়না করিবে।

আমরা পুলের মধ্যে আসিলাম। নদীস্রোতের সৌন্দর্য দেখিতে লাগিলাম। ইহারই মধ্যে মনে হইল যেন জলের উপর সাদা রং ছিটাইয়া দিয়াছে এবং উহ' ধীরে ধীরে মার্বেল রঙের হইয়া গিয়াছে। এইরূপ দেখিয়া আমি খুশি হইয়া গেলাম। এইতো সেদিন দিল্লীতে জামিয়া মিলিয়ায় ছোট ছোট শিশুদের কাগজ লইয়া মার্বেল কাগজ করিতে দেখিয়া আসিলাম। প্রকৃতির এই সব রূপান্তর আমার খুবই ভাল লাগে।

এই নদীর নাম কী? কে বলিবে? নাম না জুটিলে উহাকে অভ্রের নদী বলিব।

নদী চলিয়া গেল, উহা কোথাকার তাহা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলাম। কারণ তাহার পর দুই একটি চিমনি দেখিলাম, ধুঁয়া ছাড়িতেছে। নিকটের গ্রামে বিজলী বাতিও দেখা যাইতেছে। রেলওয়ে টাইম টেবল বাহির করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখনই পাঁচটা বাজিল। আমরা কোথায় আছি?' তাহার উত্তর শুনিয়াই মুখ হইতে পরিচয়ের জন্য আনন্দধ্বনি বাহির হইল—'ওহো এ তো আমাদের ঈব!' রামগড যাওয়ার পথে উহার আকৃতি কত সুন্দর ছিল! কৃতজ্ঞতার অঞ্জলিও তাহাকে দিয়াছিলাম। ঈবকে চিনিতে পারিলাম না কেন? মার্বেল কাগজের এই সৌন্দর্যকলা কি করিয়াছিল, সমস্ত নদী কি বলিতে পারিবে!

তাহা হইলে ঈব নদী এই কলা কোন ওয়ার্ধা আশ্রমে শিখিয়াছে? না, সারা পৃথিবী এই কলা ইহার নিকটেই শিখিয়া থাকিবে।

মে ১৯৪১

তেন্দুলা ও সুখা

আজ আমি এক অচিন্তনীয়, অসাধারণ সৌন্দর্য অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম।

আমরা ওয়ার্ধা হইতে দ্রুগ আসিয়াছি। নিকটবর্তী দুই গ্রামে 'বেসিক এডুকেশন' শুরু করিবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ এক প্রতিষ্ঠান উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য আমরা ভোর চারটায় দ্রুগে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্নানাদি শেষ করিয়া প্রাতরাশ সমাপন করিলাম, তাহার পর বালোড় যাত্রা করিলাম।

দ্রুগ হইতে বালোড় ঠিক দক্ষিণে ৩৭ মাইল দূরে। রাস্তা সোজা চলিয়াছে। যেন দড়ি দিয়া রেখা আঁকিয়া বানানো হইয়াছে। মাইলের পর মাইল সরল রেখায় ছুটিতে ছুটিতে যেমন একটা ভাব হয়, ঐ ভাবের একরকম নেশাও হইতেছিল। বালোড়ের নিকটে পৌঁছিলে কে যেন বলিল, ইহার নিকটেই তেন্দুলা বাঁধ ও কেনাল আছে। সাধারণ বস্তুও স্থানীয় লোকদের দৃষ্টিতে অতিশয় গৌরবের হইয়া দাঁড়ায়। ভাই তামাস্কর যখন বলিলেন যে বক্তৃতার পর আমরা এই বাঁধ দেখিতে যাইব, তখন বিশেষ উৎসাহ বিনাই আমি 'হাঁ' বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। এখানে দর্শনীয় বস্তু কিছু আছে, একথা আমার মনেই হয় নাই। 'হাঁ' বলিয়াছিলাম শুধু স্থানীয় লোকদের আতিথ্যের উৎসাহ ভঙ্গ যাহাতে না হয়, তাই ভালোমানুষির জন্য।

খাঁটি ৩৭ মাইলের এই পথে গর্ত জাতীয় কিছুই ছিল না। জমি সর্বত্র সমতল ছিল। গুজরাতের মত এখানকার জমিতে বন্যার উপদ্রবও ছিল না। এইরূপ সমতল জমি দেখিবার পর এক আধটা নদীনালা দেখিতে পাইলে, এক আধটা বাঁধ চোখের সামনে আসিলে মনের অনেকটা খোরাক পাওয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া আমি যাইব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম। যে ব্যক্তি পুনায় ব্যাণ্ডগার্ডেন হইতে আরম্ভ করিয়া ভাটঘরের প্রচণ্ড বাঁধ পর্যন্ত অনেক বাঁধ দেখিয়াছে, তাহার কৌতূহল সহজে জাগ্রত হইতে পারে না।

বেজোয়াড়ায় কৃষ্ণা নদীর সুন্দর বাঁধ, বাল্যকাল হইতে পরিচিত গোককের

নিকটে ঘটপ্রভার বাঁধ, লোনাওয়ালার দুই তিনটি মনোরম বাঁধ, মহীশূরে বৃন্দাবনের পুষ্টির জন্য বাদশাহী কৃষ্ণসাগর, দিল্লীর নিকটে যমুনার উপর রমণীয় 'ওখলার' বাঁধ, আর নাসিক হইতে পঞ্চাশ মাইল মোটর রাস্তায় গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলাম প্রবরা নদীর সুন্দরতম ও রোমাঞ্চকারী বাঁধ—এমন অনেক জলাশয় যে দেখিয়াছে, সে 'সিংহগড়ের' খডক-বাসলার মত বাঁধ দেখিয়া যতই সন্তুষ্ট হোক, কিন্তু তাহার কৌতূহল বাল্যাবস্থায় থাকিতেই পারে না।

ভাবনগরের নিকটে বোর দিঘির বর্ণনা লিখিয়াছি। বেজোয়াডার কৃষ্ণা নদীর উদ্দেশে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছি। অন্যগুলির সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কিছু লিখি নাই, এজন্য আমার দুঃখ আছে। পুনরায় আর কোনও সুন্দর জলরাশি দেখিতে পাইব, এরূপ আশা আমার ছিল না। ব্যাখ্যান, সম্ভাষণ ও ভোজন শেষ করিয়া আমরা তেন্দুলা কেনাল দেখিবার জন্য যানারূঢ় হইয়া বাঁধের দিকে দৌড়াইতে লাগিলাম। বাঁধের উপর দিয়া মোটর গাডি লইয়া যাইবার অনুমতির জন্য একজন আগেই গিয়াছিলেন। তাঁহার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিব এরূপ ধৈর্য আমাদের ছিল না। অনুমতি পাওয়াই যাইবে, এই ধারণায় আমরা জোরে গাড়ি চালাইয়া বাঁধের নিকটে পৌছিলাম। বাঁধের উপর গেলাম, আর—

আমি তো অবাক হইয়া গেলাম।

জলরাশির বিস্তার দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কত বিশাল! জলও কত নির্মল! আকাশ যেন আনন্দাতিশয্যে গলিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে। আর জলের রং? বেগুনী, নীল, ফিরোজা, সাদা, গোলাপী! তাহার মধ্যে কোনওটিই আবার স্থায়ী নয়। আকাশের মেঘ যেমন যেমন ছুটিয়া চলিতেছিল, জলের রংও তেমন বদলাইতেছিল। ছোট ছোট ঢেউয়ের জন্য জলের তরলতা তো স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, উহাতে উপরের এই বর্ণপরিবর্তনের চঞ্চলতা আবার আসিয়া জুটিল। বাস, আর কথা নাই। যেখানে তাকাও সেখানে কাব্য দুলিতেছে, চমৎকার নাচিতেছে। নিজেদের মহত্ত্ব কোথায় তাহা এই দুই তীরই জানে। সুতরাং তাহারা সবিনয়ে জলরাশির খোশামোদ করিতেছে।

এই বাঁধের মহত্ত্ব ইহার বিস্তার ছাড়া অন্য এক বৈশিষ্ট্যেও আছে। তেন্দুলা ও সুখা দুই নদী দুই বোন। তেন্দুলা বড় বোন, ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূর হইতে আসিতেছে। তাহার তুলনায় সুখা বালিকা মাত্র। তিন মাইল দৌড়াইয়াই

সে এখানে আসিয়া পৌঁছাইতেছে। দুইটি যেখানে পরস্পরের নিকট আসিল, সেখানেই এই প্রেমঘনমূর্ত বাঁধ যেন 'তোমরা যদি আমাকে ছাড়িয়া যাও তো আমার দিব্য রহিল' এই কথা বলিয়া আড় হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। প্রায় তিন মাইল লম্বা বাঁধ নদী দুইটিকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। আর নিজের খেয়ালখুশিতে অল্প অল্প জল ছাড়িয়া দিতেছে। কাঁচা মাটির এত বড় বাঁধ শুধু ভারতবর্ষে কেন, সারা জগতে আর কোথাও পাওয়া যাইবে না! বাঁধের নীচের ১৫ মাইল পর্যন্ত মাটি এইরূপ উপকারের জল লইতে চায় না। সুতরাং এই নালা তাহার পরের যাট সত্তর মাইল পর্যন্ত দুই ধারের খেতের সেবা করে। বাঁধের জন্য উপরের অনেকটা জমি মাটিতে ডুবিয়া গিয়াছে, এ কল্পনা শুধু চোখে কি করিয়া সম্ভব? খোঁজ করিলে জানা যাইবে প্রায় তিনশত কুড়ি বর্গ মাইল জমির উপর পড়িতে পারে এতখানি জল এখানে সঞ্চিত হইয়া আছে। জলের বিস্তার ষোল বর্গ মাইল। ১৯১০ খ্রীঃ এই বাঁধের কাজ আরম্ভ হয়, আর পঁচাত্তর লক্ষ টাকার বেশি খরচ হইলে তবে ইহা শেষ হয়। বর্ষাকালে এই দুই নদীর জল একত্র হয়। সমস্ত জলমগ্ন দৃশ্য দেখিয়া 'সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে'র কথা স্মরণ হয়। যখন মাঝখানের দ্বীপ তাহার মাথা একটু উঁচু করিতে চায় তখন তাহার এই ক্লান্তি দেখিয়া আমাদের হাসি পায়। আজ এই দ্বীপের উপর কিছু কিছু উঁচু গাছ 'যদ্ ভাবি তদ্ ভবতু' ভাবে এই বন্যার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

উহারা কি এই লাল তীরের ধারে বসিয়া পলাইয়া যাইতে পারিবে? এরূপ গাছ যতক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারে, ততক্ষণ ভাল করিয়াই বাঁচে। অন্তকালে শিকড়গুলি খসিয়া গেলে জলে পড়িয়া যায়।

গ্রীষ্মকালে দুই নদী যখন পৃথক পৃথক খাতে বহিতে থাকে, তখন রৌদ্র ও বিরহের কারণ তাহারা যেন বেশী শুকাইয়া না যায় সেজন্য মাঝখানে এক নালা খুঁড়িয়া উভয়ের জল যাহাতে পরস্পর মেশে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে নদীরও হৃদয় থাকে। তাহাদের মধ্যে বাৎসল্য আছে, চরিত্রবল আছে, উন্মাদনা ও অনুতাপও আছে। এখানে এই দুই বোন যাহা কিছু করে তাহাতে হিংসার নামগন্ধও নাই। মাৎসর্য বা শত্রুভাব তাহাদের চেহারায় কিছুই দেখা যায় না। উহাদের এই জ্ঞান আছে যে বাঁধরূপী জবরদস্ত সংযমের জন্য তাহাদের শক্তি অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে।

শুধু বহিয়া যাওয়াই নদীর ধর্ম নহে। ছড়াইয়া পড়া ও কল্যাণ সাধন করাও নদীর ধর্ম, সমস্ত নদীকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই যেন ইহারা এখানে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

নদীর তীরে গাছ থাকিলে সেখানে এক ধরনের শোভা নজরে পড়ে। আর এই গাছ যখন নদীর খাত ঢাকিবার বৃথা চেষ্টা করে তখন এই বিফলতা হইতেও সার্থক শোভার সৃষ্টি হয়।

আমরা এই তীরের গাছগুলি দেখিতে গেলাম। বেলা দ্বিপ্রহর। নিদ্রালু বৃক্ষ নদীর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে নিদ্রায় ডুবিয়া ছিল, চারিদিকে উষ্ণ শীতল শান্তি ব্যাপ্ত হইয়াছিল। শুধু নানা প্রকারের পক্ষী মন্দ মঞ্জুল কলরব করিয়া পরস্পরকে এই কাব্যের আনন্দ লুটিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছিল।

আর লাল মকোড়া, মারাঠীতে যাহাকে বলে 'বাঘ মুংগ্যা' বা 'উম্বীল', যাহা একপ্রকার চিকন পদার্থ, তাহা দিয়া গাছের চওড়া পাতাগুলি পরস্পরে লাগাইয়া এই সমস্ত কাব্য ভরিয়া রাখিবার জন্য থলি প্রস্তুত করিতেছিল। আমার দৃষ্টিও মনকে থলি করিয়া তাহাতে সম্মুখের দৃশ্য ভরিয়া রাখিবার জন্য সমস্ত দিকটা আকর্ষণ করিতেছিল।

ইহাতে নদীর কোনও আপত্তি ছিল না।

মার্চ, ১৯৪০

৫০

ঋষিকুল্যার সহনশীলতা

আজ মহাশিবরাত্রির দিন। প্রতিদিনের সব কাজ একদিকে রাখিয়া সরিতা, সরিৎপিতা ও সরিৎপতির ধ্যান করিব বলিয়া বসিয়া আছি। সরিৎগুলি তো লোকমাতা। তাঁহাদের 'জীবনলীলা' নানা প্রকারে মনে করিয়া আমি পবিত্র হইয়াছি। পূর্বপুরুষেরা বলিয়াছেন, স্নান, দান ও পান—এই তিন ভাবে নদীর পূজা করিতে হইবে। আমার মনে হইল, শুধু স্নান, দান ও পানই বা কেন? ভক্তিই যদি করিতে হয় তবে তাহা চতুর্বিধ রূপে নয় কেন? এইরূপ চিন্তা

করিয়া আমি নদীর গান করিব স্থির করিলাম। 'লোকমাতা' ও বর্তমান 'জীবনলীলা' এই দুই গ্রন্থে এ গান শুনিতে পাওয়া যাইতে পারে।

এখন যখন প্রবাসকাল কমিয়া গিয়াছে ও সরিৎপতি-সাগরের নিমন্ত্রণও কানে কম আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আমি মনে মনে ভাবিতে ছিলাম যে সরিৎপিতা পর্বতদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিব। ততক্ষণে এক ক্ষুদ্রকায় পবিত্র নদী আসিয়া কানে কানে বলিল, "আমাকে কি একেবারে ভুলিয়া গেলে?" আমি লজ্জা পাইয়া গেলাম। শীঘ্র তাহার উদ্দেশ্যে স্মৃতির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া তাহার পরই পাহাড়গুলির দিকে মোড় ফিরিব স্থির করিলাম। এ নদী কলিঙ্গ দেশে শুধু সওয়া সাত মাইল বিচরণকারিণী ঋষিকুল্যা।

ঋষিকুল্যার নাম পর্যন্ত আমি পূর্বে শুনি নাই। অশোকের শিলালেখের পিছনে পিছনে পাগল হইয়া ছিলাম। জুনাগড়ের শিলালেখ দেখিয়াছিলাম। তবে উড়িষ্যার শিলালেখও দেখিব না কেন? মনে এখন একটা খেয়াল হইল। কলিঙ্গদেশের হাতীর মত মুখ ধৌলীর শিলালেখ দেখিয়াছিলাম। আবার ইতিহাসের দৃষ্টি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, অল্প একটু দক্ষিণে গিয়া সেখানকার বিখ্যাত জৌগড়ের শিলালিপি কি করিয়া ছাড়িয়া আসা সম্ভব হয়? সেই দৃষ্টিকে তৃপ্ত করিবার জন্য গঞ্জামের দিকে যাইতে হইল। সেবারকার ভ্রমণ কাব্যরসে সিঞ্চিত ছিল। কিন্তু যদি তাহার বর্ণনা করিতে বসি তবে তাহা ঋষিকুল্যা হইতেও দীর্ঘ হইয়া যাইবে।

এই নদী হ্রদের সঙ্গে না মিশিয়া গঞ্জাম পর্যন্ত কি করিয়া গেল, সমুদ্রের সঙ্গেই বা কি করিয়া মিশিল, ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। হয়তো সাগর-পত্নীর সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবার জন্য সে গঞ্জাম পর্যন্ত দৌড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখানকার সমুদ্রের মধ্যে সেজন্য কোনও উৎসাহ দেখা যায় না। বালুর সঙ্গে খেলিতে থাকাই উহার কাজ।

ঋষিকুল্যা এমনিতে ছোট নদী, কিন্তু হয়তো তাহার নামের জন্যই প্রতিষ্ঠা বেশি। কারণ এতটুকু ছোট নদীকে করভার দিবার জন্যই পথমা ও ভাগুয়া নামে দুই নদী আসিতেছে। আরও দুই তিনটি নদী আসিয়া উহার সঙ্গে মেশে। কিন্তু দারিদ্র্যের সমবায়ে সমৃদ্ধির সৃষ্টি হয় না। গ্রীষ্মকাল আসিলে সবই ঠনঠন, শুকাইয়া যায়।

ঋষিকুল্যার তীরে আস্কা নামে এক ছোট গ্রাম আছে। ছোট গ্রাম বলিয়াই সে সুন্দর হইতে পারে না, এমন নয়। যেখানে নদী নদীতে সঙ্গম, সেখানে সৌন্দর্যকে পৃথক করিয়া আবাহন করিতে হয় না। আর এখানেও ঋষিকুল্যার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য মহানদী আসিয়াছে। দুইয়ে মিলিয়া চাউল জন্মায়, লোককে মধুর ভোজন শেখায়। আর যাহাদের পাগল হইতেই হইবে, তাহাদের জন্য এখানে মদেরও সুবিধা আছে। এই দেবভূমিতে মানুষের সুরাপানকে উচিত বলিব, না অনুচিত? যে সুরা পান করে সে সুর অর্থাৎ দেব, আর যে পান করে না, সে অসুর—ইরানের লোকেরা সুরাসুরের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন।

ঋষিকুল্যা নামটি কাহার দেওয়া? ইহার প্রতিবেশী দুই নদীর নামও এইরূপ কাব্যময় ও সংস্কৃত। 'বংশধারা' ও 'লাঙ্গল্যা'—এইরূপ নাম ওখানকার আদিবাসীদের দেওয়া যে নয় তাহা মনে হয়।

এই সমগ্র প্রদেশ কলিঙ্গের গজপতি, অন্ধ্রের চেঙ্গী ও দক্ষিণের চোল রাজাদের মহত্ত্ব কামনার যুদ্ধভূমি। তাহা হইলে এসব নাম চোলের রাজেন্দ্ররা রাখিয়াছেন, না কলিঙ্গের গজপতিরা, এ কথা কে বলিতে পারে?

জৌগড়ের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শিলালিপি দেখিয়া ফিরিবার পথে সন্ধ্যার সময় ঋষিকুল্যার দর্শন হয়। সংস্কৃতসাহিত্যে দধিকুল্যা, ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা প্রভৃতি নাম পড়িয়া মুখে জল আসিত। ঋষিকুল্যার নাম শুনিয়া ভক্তিতে নত হইলাম। তাহার তীরে সায়ংকালীন প্রার্থনা করিলাম।

ছোটনদী পার করিবার নৌকাও ছোটই হইবে। সেদিন আমাদের ভাগ্যও এমন বিচিত্র ছিল যে এই ছোট নৌকাতেও অর্ধেকের বেশিভাগে জল উঠিয়াছিল। ভিতরের জল বাহির করিবার জন্য নিকটে কোনও ঘটিবাটিও কিছু ছিল না। তাই জুতা হাতে লইয়া খালিপায়ে নৌকায় চড়িলাম। ইচ্ছা ছিল যে নদীতে পা না ভিজিয়া যায়। শেষে নৌকায় যে জল ছিল তাহাই আমাদের পা ধুইয়া দিল। যদি দাঁড়াইয়া থাকি তবে নৌকা একপেশে হইয়া যায়। বসিলে কাপড় ভিজিয়া যায়। উভয় সংকট হইতে বাঁচিবার জন্য নৌকার দুই প্রান্ত হাত দিয়া ধরিয়া কুক্কুটাসনের আশ্রয় লইলাম, এবং সেই অবস্থায় বসিয়া বসিয়া বেদ ও পুরাণের সমসাময়িক ঋষিদের স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের এই কুল্যা পার হইলাম। সেই হইতে এই ঋষিকুল্যা নদীর বেলায়

মনে প্রগাঢ় ভক্তি দৃঢ় হয়। কুক্কুটাসনের 'স্থিরমুখ' যতদিন মনে থাকিবে, ততদিন নিশীথকালের এই প্রসঙ্গও কখনও ভুলিতে পারিব না।

স্থানীয় একজন শিক্ষকের নিকট হইতে ঋষিকুল্যার বিষয়ে জানিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি ওড়িয়া ভাষায় লেখা এক দীর্ঘকাব্য পরিশ্রম করিয়া নকল করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এ পর্যন্ত সে কাব্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারি নাই। ঋষিকুল্যার প্রতি ভক্তিভাব দৃঢ় করিবার জন্য আধুনিক কাব্যের প্রয়োজনও নাই। আমার মনে হয়, মহাশিবরাত্রির দিনে কৃত ঋষিকুল্যার এই অপরাধভঞ্জন স্তোত্র গ্রাহ্য হইবে, এবং তিনি পর্বতরাজির পূজায় রত হইবার আন্তরিক ও সুদীর্ঘ আশীর্বাদ দিবেন।

মহাশিবরাত্রি
২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭।

৫১

সহস্রধারা

পুরাতন ঋণ হয়তো বা কখনো শোধ হইতে পারে; কিন্তু পুরাতন সংকল্প দূর হয় না। পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেরাদুনে থাকিতে সহস্রধারা দেখিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলাম। খুবই আগ্রহ ছিল। কিন্তু তখন যাইতে পারি নাই। কিছু কাল ধরিয়া মনে এজন্য ক্ষোভ ছিল, কিন্তু পরে কখন তাহা দূর হইয়া গেল। সহস্রধারা নামে সংসারে কোথাও যে একটা জায়গা আছে, তাহার স্মৃতিও বিলুপ্ত হইল। কিন্তু সংকল্প কি করিয়া দূর হয়?

আচার্য রামদেওজীর খুবই আগ্রহ ছিল যে আমি তাঁহার কন্যা-গুরুকুল একবার দেখিয়া যাই। এই যে প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিতেছিল, ইহা আমারও দেখিবার ইচ্ছা ছিল। গত বৎসর যাইতে পারি নাই। তাই এই বৎসর প্রতিশ্রুত হইয়া সেখানে গেলাম। এখন তো মন নানা ধারায় চঞ্চল হইয়া অগ্রসর হইতেছিল—এখন প্রকৃতির পিছনে পিছনে পাগল হইয়া ফিরিলে চলিবে না। নানা লোকের সঙ্গে মিশিতে হইবে, নানা প্রতিষ্ঠান দেখিতে হইবে,

রাজনৈতিক নানা লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে হইবে, ভাল ভাল লোক খুঁজিয়া লইয়া তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে হইবে। কর্মীদের সঙ্গে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করিতে হইবে। তাহা হইলে বলুন, সহস্রধারার কথা আর কি করিয়া মনে পড়িবে? আমি তো হিন্দী-হিন্দুস্থানীর আলোচনাতেই বিভোর ছিলাম, এমন সময় যুবক রণবীর আমার কাছে আসিল, কেহ তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিল। সে নিজেই আমাকে বলিল, দেরাদুনে দেখিবার মত জায়গা এই কয়টি, ফরেস্ট কলেজ, সামরিক বিদ্যালয় আর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে গুচ্ছুপাণি ও সহস্রধারা। শেষেরটির নাম শোনামাত্র পঁচিশ বৎসরের বিস্মৃতির প্রস্তরের আবরণ ভাঙ্গিয়া পুরাতন স্মৃতি ও পুরাতন সংকল্প ভূতের মত চোখের সামনে দাঁড়াইয়া গেল। তখন আর এই সংকল্পকে কার্যে রূপ দেওয়া ছাড়া উপায় রহিল না।

তৈলবাহনের (মোটর) ব্যবস্থা হইল। উত্তরদিকে পাঁচ-সাত মাইল রাস্তা পার করিয়া আমরা রাজপুর পৌছিলাম। এখান হইতে উপরে মুসৌরী যাইবার পথ। আমরা রাজপুর হইতে প্রায় আড়াই মাইল পূর্বের দিকে জঙ্গলে হাঁটিয়া চলিলাম। ঠিক পঁয়ষট্টি মিনিট চলিবার পর আমরা সহস্রধারায় আসিয়া পৌছিলাম। সন্ধ্যাবেলা। পিছনের দিকে অস্তগামী সূর্য, তাঁহার দীর্ঘায়িত কিরণে আমাদের সম্মুখের পথ আরও অনেক দীর্ঘ দেখাইতেছিল। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে আমরা মানবসভ্যতার গণ্ডী ছাড়িয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। জলস্রোতের জন্য মাটিতে গভীর গর্ত হইয়া ছিল। তাহার মধ্য দিয়া আমাদের পথ, আমরা ছিলাম চার জন। কথাবার্তা কহিতে কহিতে, চারিদিকের সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে, সময়ের হিসাব করিতে করিতে আমরা পথ চলিতেছিলাম। অমরনাথ, তুঙ্গনাথ, বদরী বিশালের মত স্থান যে দেখিয়াছে, তাহার নিকট মুসৌরী পাহাড় আর এমন কি। তবু অনেক বৎসর পরে আবার হিমালয়ের তলপ্রদেশে যাওয়া হইল, তাই এই দৃশ্যও চোখে সুন্দর লাগিল।

মুসৌরী পাহাড়ে 'টেকরি' বা বড় বড় পাথর বহুবার ধ্বসিয়া পড়ে, ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'ল্যাণ্ডস্লিপ' বা 'ল্যাণ্ড স্লাইড'। দেখিলে মনে হয়, যেন কোনও বিশালকায় যোদ্ধা সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে। বড় বড় পর্বত ছোট বড় বৃক্ষে আবৃত—মাঝখানেই তাহার এক বড় অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়া খোলা

পড়িয়া আছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়ে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব জাগে। এরূপ ধ্বংসের অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব বড় রকমের হয়। আর এ দুর্ঘটনার কোনও প্রতিকার নাই। সুতরাং ঐরূপ আঘাত আশ্চর্য বলিয়া মনে হয় না; বরং পর্বতাঞ্চলের সমাদরণীয় ঐশ্বর্য বলিয়া মনে লাগে।

আমরা নীচে নামিলাম, আবার উপরে উঠিলাম। আবার নামিলাম। অনেকটা চড়িলাম। সেখান হইতে চক্রাকারে আসিয়া নামিলাম।

আমরা নিজেদের পছন্দমত আস্তে আস্তে নীচে নামিলাম। পথে যেখানে নামিলাম, সেখানেই পাথরের এক প্রশস্ত শুষ্ক নদী অবশ্য ছিল। বর্ষাকালে এইসব দৃষদ্বতী নদী এতই কোলাহল করে যে, সমস্ত পার্বত্যপ্রদেশ সহস্র কণ্ঠে গর্জিয়া ওঠে; কিন্তু আজ তো চারিদিকে ভীষণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল। ছোট ছোট পক্ষী দূর দূর হইতে যদি পরস্পরকে ইশারা না করিত, তাহা হইলে এখানে দাঁড়াইয়াও মনে ভয় হইত। অবশেষে নামিয়া গেলাম, এবং চারিদিকে শ্লেট পাথর চোখে পড়িল। প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যখন এক আধখানি টুকরা ধরিতে যাইতাম, তখনই উহা গুঁড়া হইয়া গিয়া হাতে আসিয়া লাগিত।

কোনও রকমে নীচে নামিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া চলিতে থাকিলাম। যাহার মোটরে আসিয়াছিলাম সেই ভাই বলিতে লাগিল, 'আমি এখানে বসিয়া থাকি, আপনারা আগাইয়া যান।' আমি বলিলাম, আপনার সঙ্গে স্থির হইয়াছিল যে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিব, কিন্তু সহস্রধারা পৌঁছাইতেই এক ঘণ্টার বেশি লাগিবে। সুতরাং আপনারা ফিরিয়া যান, মোটরে ঠিক সময়ে দেরাদূন পৌঁছান। আমরা ভাড়াটে বাসে ফিরিব। রণবীর বলিল, আমরা তো এখন আর দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছিয়া যাইব। সামনের টিলায় ঐ যে সাদা কুঠি দেখা যাইতেছে, উহার নিকটেই সহস্রধারা।

এত দূরে আসিয়াছি, আর মাত্র কয় মিনিটের ব্যাপার; একথা ভাবিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। পিছন ফিরিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল। দেখি যে সূর্য আকাশে ঝুলিতেছে, আর নীচের পাহাড় তাহার দুই হাত তুলিয়া সূর্যকে স্বাগত অভিনন্দন জানাইতেছে, যেন বল ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আবার চঞ্চল শিশু যেমন মায়ের হাতে পড়িতেই হাসিতেছে, মারও মুখে প্রসন্নভাব দৃশ্যটি ঠিক যেন এ প্রকারের ছিল। এমন সময় মার প্রেমের ঋণ মনে মনে অনুভব করিব, না, শিশুর সরল বিকশিত হাস্যের কথা চিন্তা করিব,

দুইটির মধ্যে কোন্ আনন্দকে প্রাণের সহিত অনুভব করিব, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। এ দৃশ্য এমনই সুন্দর ছিল যে, ইহা দেখিবার জন্যই এ পর্যন্ত আসা চলিত। কিন্তু সংকল্প তো ছিল সহস্রধারা দেখিবার। তাই দীর্ঘ সূর্যকিরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া আমরা অগ্রসর হইলাম।

এতক্ষণে চোখে পড়িল, একটা বড় জলপ্রপাত প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে আসিতেছে। উঁচু হইতে নির্মল জল কঠিন মাটির প্রাকৃতিক দেওয়ালে ধাক্কা পাইয়া উপরে উঠিতেছে, শব্দ করিতেছে, এবং অদ্ভুত উন্মাদনার সহিত একমনে নীচে নামিতেছে। নিকটে কেহ আছে কিনা দেখিবার তাহার সময় কোথায়? কি যে হইতেছে সে বিষয়ে তাহার কোনও কিছু গ্রাহ্যই নাই। সে তো ধব্-ধব ধব্-ধব্ শব্দ করিয়াই চলিয়াছে। পাথরের উপর হইতে যখন জল পড়ে তখন এমন কিছু আশ্চর্য বোধ হয় না। কিন্তু এখানে তো জল পড়ে মাটির উপর হইতে, সে মাটি তাহার নিজের জিদ ছাড়িতে চায় না। আমি দেখিতেই থাকিলাম। জলের এই চমৎকার দৃশ্যে এতখানি নেশা ধরিয়া যায় যে, মাতালেরা জানিতে পারিলে মদের নেশা ছাড়িয়া অহরহ এখানেই আসিয়া বসিয়া থাকিত। মুহূর্তের জন্য ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে। ক্ষণেকের জন্য হইলেও, যখন আমরা প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়া যাই, তখন উহাই তো সত্যকারের অদ্বৈতানন্দ। বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া গেলে আনন্দ ছাডা আর কিছু তো থাকিতেই পারে না।

তবে কি আমরা যাহাকে জড় সৃষ্টি বলি তাহা জড নয়, অদ্বৈতানন্দের সমাধিতে একমনে পডিয়া আছে? ইহার উত্তর আর কে দিবে, কে-ই বা শুনিবে?

রণবীর বলিতে লাগিল, 'এবার আমরা আর একটু অগ্রসর হইব।' এখন আর আমার দেরি করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সামান্য একটু বাকি রহিয়া গেল, এমন দুঃখ মনে না থাকে সেজন্য অগ্রসর হইলাম। নীচে জল বহিয়া যাইতেছিল। ধীরে ধীরে আমরা নীচে নামিলাম, ছিদ্রগুলি হইতে গন্ধ আসিতে লাগিল। নীচে নামিয়া একটু জল খাইলাম। লোকে বলে যে চর্মরোগীর পক্ষে এই জল খুবই হিতকর। এই জল ও তাহার অদ্ভুত গুণের কথা আমি ভাবিতে লাগিলাম; কিন্তু মন তখনও তো পড়িয়া থাকিল এখনই যে প্রপাত দেখিয়া আসিয়াছি তাহার ধব্-ধব্ শব্দের সঙ্গে তালে তালে

এতক্ষণে দেখিলাম, দক্ষিণ দিকে উপরের এক ঝুঁকিয়াপড়া খোয়ার ছাদ হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে। তাহার শব্দটা লাগিতেছিল যেন নিতান্ত শান্ত ও মৃতপ্রায় জলতরঙ্গ অথবা 'বৃন্দগায়ন' অর্থাৎ শিশুদের সমবেত কণ্ঠের গীতি।

ইহাই হইল প্রকৃত সহস্রধারা। হাজার হাজার জলবিন্দু এই গুহার উপর হইতে ও ভিতর হইতে টপটপ করিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহার শব্দ নাই। শান্তভাবে এই বিন্দুগুলি অহরহ পড়িয়াই চলিয়াছে। একদিক দিয়া আমরা উপরে চড়িলাম। সেখানে এক গভীর গুহা ছিল। মাঝখানে বড় বড় পাথরের যেন এক একটা স্তম্ভ। আমরা তাহার চারিদিকে ঘুরিলাম। চারিদিকে সহস্রধারার বর্ষণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল, সমস্ত পাহাড় বুঝি গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। আমরা খুব ভিজিয়া গেলাম। এক ঘণ্টা জোর হাঁটিয়া শরীর গরম ছিল। তাই ভিজিবার সময় বিশেষ আনন্দ হইল। এখানকার আবহাওয়া কি ঠাণ্ডা! মানুষ এখানে থাকিয়া কোনও কাজ করিতে পারে না। এখানে তো চাতুর্মাস্যে বেদমন্ত্র পাঠ করিবার জন্য ভেকের অবতার হইয়া থাকা উচিত। যে হৃদয় কিছুকাল পূর্বে শক্তিশালী প্রপাতের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিল, তাহাই এখানে এক মুহূর্তের মধ্যে এই রিম্‌ঝিম্‌ সহস্রধারার চালুনৃত্যে তন্ময় হইয়া গেল। রণবীরকে প্রাণভরা ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, 'এতখানি যদি দেখা বাকি থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে সত্যই বড় পস্‌তাইতে হইত। অসংখ্য গুহা দেখিয়াছি—বর্ষায় আশ্রয় দান করিবার উপযোগী। কিন্তু গ্রীষ্মকালেও নিজের উদরে বর্ষা সংগ্রহ করিয়া রাখে, এমন গুহা তো এই প্রথম দেখিলাম। সিংহলের মধ্যভাগে একস্থানে এক বড় গুহা আছে, তাহার ভিতরে অনেক চিত্র অঙ্কিত; তাহাতে এক ক্ষুদ্রকায়া ঝরণা হইতে জল ঝরে। কিন্তু এই জাতীয় অখণ্ড বর্ষা তো এই প্রথম দেখিলাম। আমাদের ফিরিবার তাড়া ছিল। কিন্তু এই বর্ষার কোনও তাড়া ছিল না। সে তাহার নিজের জীবনের কাজ পাইয়া গিয়াছিল। পাথরের উপর শ্যাওলা জমিয়াছিল, তাহাতে পা পিছলাইয়া যাইতেছিল। আর, এখানে সৌন্দর্য, শান্তি ও পবিত্রতার জন্য পা আটকাইয়া যাইতেছিল। মনে হইতেছিল, যত বেশি কাল এই অবস্থায় কাটে ততই লাভ।

শেষ পর্যন্ত ওখান হইতে ফিরিতেই হইল। এখন তো দ্বিগুণ বেগে যাইতে হইল। পথে দেখিলাম, অনেক মজুর ও গোয়ালা তাড়াতাড়ি চলিয়াছে।

গরীব বেচারীরা। কত অসুবিধার মধ্যে তাহারা এখানে জীবন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু আমাদের তো এই কথা মনে করিয়া হিংসা হয় যে ইহারা সহস্র-ধারার অমৃতময়ী দৃষ্টির নীচে থাকিবার সুযোগ পায়।

নামিবার সময় তো নামিয়া গেলাম। কিন্তু অন্ধকারে উঠিব কি করিয়া, ইহা ছিল প্রশ্ন। মনে হইল, এক আধটা লাঠি পাইলে ভাল হয়। সেখানে একটা দেহাতি দোকান ছিল। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই, ভাল একখানা লাঠি দিতে পার? আমি না হয় এক কানে শুনি না, দোকানদার যে দুই কানেই শুনিতে পায় না—একেবারে বদ্ধ কালা! আমার কথা তাহার মাথায় ঢুকিল না। আমার ধৈর্যে কুলাইল না। শেষে সঙ্গীদের একজন তাহাকে ইশারা করিয়া বুঝাইয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি ভিতর হইতে তাহার বাঁশের লাঠিগাছ আনিয়া দিল। পয়সা দিলাম, সে লইতে অস্বীকার করিল। আর লাঠিটা লইয়া আমিই যেন তাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছি, এইরূপ কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, লইয়া যান, আপনি লইয়া যান। রণবীর তাহার কানে কানে জোরে বলিল, ইনি তো মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম হইতে আসিতেছেন। তখন লোকটির কৃতজ্ঞতা ও আমার সঙ্কোচের কোনও সীমা থাকিল না। লাঠিটা লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

এখন আমার কথা বলা বন্ধ হইয়া গেল। পা ছুটিতেছে, আর আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতে করিতে চলিয়াছি। আকাশে গুরু ও শুক্র চন্দ্রকে কিছু টিপ্পনী কাটিতেছে।

মোটরওয়ালা ভাই পাহাড়ের চূড়ার উপর আমাদের পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন। দেখা হইলে বলিলেন, আপনারা ছুটিয়া গেলেন, ছুটিয়া আসিলেন; আর আমি সেই সময়টুকু শান্তিতে এই পাহাড়ের সুন্দর প্রসার, অস্তমান সূর্যের শোভা আর পরিবর্তনশীল রং দেখিয়া দেখিয়া আনন্দ লুটিতেছিলাম। এখন আপনি বলুন, অধিক আনন্দ কে লুটিয়াছে?

আমি প্রতিধ্বনির মত জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সত্যই তো, কে বেশি আনন্দ লুটিল?'

ডিসেম্বর, ১৯৩৬

৫২

গুচ্ছুপানি

গুচ্ছুপানি প্রকৃতির এক সুন্দর খেলা। আমি ১৯৩৭ সনে দেরাদুন গিয়াছিলাম, তখন একদিনের অবকাশ ছিল। সঙ্গীদের মধ্যে অনেকে বলিলেন, 'চলুন, গুচ্ছুপানি দেখিতে যাই।' অন্যান্য সঙ্গীরা সহস্রধারা দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। গুচ্ছুপানি নামটি তো ভালই লাগিল, কিন্তু বিস্মৃতির আবরণের নীচে অবদমিত পুরাতন সংকল্প সহস্রধারার অনুকূলে মত দিল। তাই সেবার আর সহস্রধারার জন্য গুচ্ছুপানি দেখা হইল না।

১৯৩৯ সনে কন্যা-গুরুকুলের উৎসবে দেরাদুনে যাইতে হইয়াছিল। এবার গুচ্ছুপানি কি আর আমাকে না ডাকিয়া পারে? দেরাদুন হইতে গুচ্ছুপানি সচ্ছন্দে যাইতে হইলে দুই তিন ঘণ্টাই যথেষ্ট। মোটরের কথা দূরে থাক, পায়ে হাঁটিয়া আসা যাওয়াতে তিন ঘণ্টা সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশি লাগে না। প্রথমে তো প্রায় দেড় মাইল মোটরের জন্য তৈরী নীচের পীচের রাস্তা ধীরে ধীরে উঁচু উঁচু গাছের মধ্য দিয়া উপরে পৌছাইয়া দেয়, সম্মুখের পাহাড়ের উপরে মুসৌরীর গন্ধর্বনগরীও দর্শন করায়। সেখানকার বাংলোর আঁকা-বাঁকা সারি যখন সন্ধ্যার আলোতে ঝিক্‌মিক্‌ করিতে থাকে, সে আলোতে তখন মনে হয় বুঝি উজ্জ্বলতার নির্যাস সমান চার টুকরায় ভাগ হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

রাস্তা ছাড়িয়া আমরা বাঁ দিকে খেতের মধ্যে নামিয়া পড়িলাম। সম্মুখে নজরে পড়িল নবীন শালের বন। এই বনের মধ্য দিয়া পাহাড়ের এক কন্যা পাথর লইয়া খেলিতে খেলিতে দক্ষিণ দিকে ছুটিয়া যাইতেছে দেখিলাম। এই সময়ে নদীগর্ভে জল ছিল না। উহাতে ইতস্তত ছড়ানো ছিল শুধু টেরা-বাঁকা উজ্জ্বল শাদা পাথর। সাধারণত জলহীন নদী আমরা পছন্দ করি না। কিন্তু যখন দুই দিকে উঁচু উঁচু পাহাড় আর সমস্ত স্থানটি নির্জন ও সুন্দর, তখন শুষ্ক নদীও ভীমকান্ত রূপ ধারণ করে। জলের স্রোত না-ই থাকুক, সবুজবর্ণ

জঙ্গলের মধ্য হইতে শুভ্রধবল প্রস্তরের পটী যখন পাহাড়ের মধ্য হইতে তাহার পথ করিয়া অগ্রসর হয়, তখন মনে সহজেই ধারণা জন্মে যে এই পাথরগুলি ইস্কুলের ছেলেদের মত খেলায় ছুটাছুটি করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে।

আমরা অগ্রসর হইলাম, আবার উপরে উঠিলাম, আবার নীচে নামিলাম। খোয়াই হইয়া চলিতে হইবে, তাই দূরে দূরে না তাকাইয়া আকাশের দিকেই শুধু তাকাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। মাঝে মাঝে হলদে ও শাদা ফুলের বাতাসে দোলা দেখিয়া মনে হইতেছিল, এখানে বুঝি কাহারও বাংলো আছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিশ্চিত ভাবে বোঝা যাইত যে এইরূপ দৃশ্য দেখিয়াই শহরের বাংলোর মালিকদের বাংলোর এদিকে ওদিকে ফুলগাছ লাগাইবার ধারণা মাথায় আসে। বাংলোর চারদিকের দেওয়াল তো প্রকৃতির কোল হইতে যে মানুষ সরিয়া গিয়াছে তাহারই জন্য। এখানে তো প্রকৃতির বিশাল ভবন। চার দিক হইল তাহার চার দেওয়াল, আকাশের কটাহ হইল তাহার ছাদ। রাত্রি হইবার পূর্বেই এই ছাদে চন্দ্র ও তারকার চাঁদোয়া টাঙানো হয়। হাওয়া খারাপ হইলে চাঁদোয়া যাহাতে ময়লা না হয়, সেজন্য কখনও কখনও তাহার উপর মেঘের পর্দা ঢাকিয়া দেওয়া হয়।

ফুলগুলি খুশিতে হাসিতেছিল। কে জানে, কাহাকে দেখিয়া হাসিতেছিল! আমাদের আসার কথা তাহাদের তো আমরা ইঙ্গিতেও জানাই নাই, জানাইলেও শিকার করিতে আসিতেছি বলিয়া তাহারা ভাল বুঝিত কি না জিজ্ঞাস্য।

মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কুটির ও তাহাদের ব্যঙ্গ করিবার জন্য চূণকাম করা মাটির ঘরও দেখা যাইতেছিল। রাস্তা ও মিউনিসিপ্যালিটির সুবিধা ছিল না বলিয়া ঘরগুলি বনশ্রীর সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশিয়া গিয়াছিল, আর সেখানকার পল্লীজীবনের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিল। গোরাদের সামরিক বিভাগে চাকুরি হইতে অবসর লইয়া গুর্খা সৈন্যেরা এখানে প্রকৃতির কোলে নিবৃত্তির আনন্দ অনুভব করিতেছে ও নিজেদের বৃদ্ধ পাহাড়ি হাড়গুলিকে বিশ্রাম করিবার সুযোগ দিতেছে।

আমরা অগ্রসর হইলাম। অগ্রসর, তবে সোজাসুজি অগ্রসর নয়। পাহাড়ি পায়ে চলার পথে চক্রব্যূহে যেমন যেমন রাস্তা পাওয়া যায় তেমন ভাবে

অগ্রসর হইতে হয়। বাঁ দিকে যাইতে হইলেও কখনও কখনও ডান দিকের পথে চলিয়া তাহার খোসামোদ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়। চন্দন বলিল, 'চারিদিকের সুন্দর দৃশ্য ও পলে পলে আকাশের পরিবর্তন আমাদের দৃষ্টি তাহার দিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু পলকের জন্য পা যদি পিছলায় তবে এই পাহাড়ি নদীর পাথরের মত গড়াইতে হইবে।' তাহার কথা সত্য। বড় বড় পাথরে পা রাখিয়া চলিতে খুব মজা লাগিতেছিল। কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব তো আর সমান ছিল না। তাই কোন পাহাড় কোথায় মানুষের পায়ের বোঝা মাথায় আসিয়া পড়িলেও নিজের জায়গা হইতে সরিবে না, এমন ধীরোদাত্ত পাথর কোথায়—এইভাবে 'সার্ভে' করিতে করিতে যেখানে অগ্রসর হইতে হয়, সেখানে প্রতি পদে নিজের মনকে সতর্ক রাখিতে হয়। হাতে পাঁজ লইয়া সুতা কাটিবার সময়ে যেমন প্রতিক্ষণ আমাদের মনও সুতা কাটে, তেমনই এ ভাবের পাহাড়ি যাত্রায় পায়ে পায়ে আমাদের চিত্ত যাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়, আর ইহাতেই যাত্রার আনন্দ গভীর হইয়া ওঠে।

এতক্ষণে এক দীর্ঘ ও প্রশান্ত নদী নীচে দেখা দিতেছে। ডান দিকের গুহা হইতে আসিয়া উহা বাম দিকে দুই শাখাতে বিভক্ত হইয়া যাইতেছিল। সামনের পাহাড়ের টিলার উপর হইতে টেলিগ্রাফের থামগুলি পাঁচ সাতটি তার জড়াইয়া এপারে দূরে পাহাড়তলীতে যে ভাবে ঝুলিতেছিল, তাহাতে মনে হইতেছিল, কোনও শিশু যেন তাহার হাত ও চোখ যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া নদীর চওড়াটা দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

ঐ নদীর মধ্য দিয়া দুইটি ছোট প্রবাহ কোনও রাজার অস্তমিত বিভবের মত মন্থর গতিতে চলিতেছিল। জল তো শিশুদের হাসিকান্নার মতই নির্মল ছিল। ইচ্ছা হইল, সামান্য একটু জল পান করি। কিন্তু ধর্মদেবজীর রসিকতা বাদ সাধিল। তিনি বলিলেন, 'ঐ দেখুন, সামনে ঝরণা দেখা যাইতেছে। এক সময়ে আমি নিত্য আসিয়া উহার জল পান করিতাম। চলুন, ওখানেই যাই।'

আমরা সেখানেই গেলাম। সেখানে এক ছোট পাহাড়ের কটিদেশে এক ছোট তাকের মত ছিল। অমৃতসমান ঝরণার জল সেখান হইতে পড়িতেছে দেখিলাম। কোনও পরোপকারী ব্যক্তির ঐ তাকের নিকটে এক কাঠের নল

লাগাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই আমাদের জলদান গ্রহণে কোনও অসুবিধা হয় নাই। জল পান করিবার পূর্বে পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়া সূর্যকে মানসিক অর্ঘ্য দিতে ভুলি নাই।

এখন তো যে দিকে সূর্যকিরণ ছড়াইয়া পড়িতেছিল, সেই দিকে নদীর মধ্য হইতে আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। উঠিয়া কি দেখিতে পাইব তাহার বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কল্পনা করিতে পারিতেছিলাম না। নদীর উৎস দেখিব? উপর হইতে জল পড়িতে দেখিব? না, সহস্রধারার মত জলে গন্ধক থাকিবে? এমনধারা অনেক কল্পনা মনে উঠিতেছিল। এই ঝরণার নামের রহস্যও আমার পক্ষে গোপন ছিল। গুচ্ছু শব্দ গুহ্য হইতে আসিয়াছে, ইহা ধরিয়া লওয়া হয়।

দূরে এক কোটর দেখা যাইতেছিল। সে জায়গায় পৌঁছিয়া আরও কয়েকটি দেখিতে পাইলাম। সেখানে গিয়া বুঝিতে পারিলাম, গুচ্ছুপানির অর্থ কি।

রেলওয়ে লাইন পাতিবার জন্য পাহাড় ভাঙ্গিয়া যেমন সুড়ঙ্গ বা টানেল খোঁড়া হয়, তেমনি এক ব্যাকুল ঝরণা সমস্ত পাহাড়টার এপার ওপার ভেদ করিয়া নিজের পথ বাহির করিয়াছিল। না, না, এ তো ভুল উপমা দেওয়া হইল। যেভাবে ইস্পাতের কাঠ বা 'পোরবন্দরী', পাথর কাটিয়া কাটিয়া নীচের দিকে নামিতে থাকে, তেমনি এই ঝরণাও পাহাড়ের এক অংশ সোজা কাটিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে কোনও যন্ত্র লাগে নাই। বজ্রকায় পাষাণ বিঁধিয়া জল যখন ওপারে বাহির হইয়া যায়, তখন আশ্চর্যচকিত হইয়া মন জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, সামর্থ কাহার বেশি? দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় ও তাহার প্রাচীন পাথরের অভেদ্য প্রাচীরের, না মুহূর্তও বিচার না করিয়া আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত চঞ্চল ও তরল জলের?

ঐ গর্ত বা গুহায় প্রবেশের চেষ্টা করিতে করিতে মন যদি অল্পক্ষণের জন্য কাঁপিয়া ওঠে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই—সে দৃশ্য এতই ছিল অদ্ভুত। সে সাহস যে মৃত্যুবরণ করিবার সাহস। ভিতরে প্রবেশ করিতেই মনে পড়িতে লাগিল গীতার একাদশ অধ্যায়ের শ্লোক। আবার পাহাড় ও জলের শক্তির দ্বারা যে প্রকৃতিজননী নিজের সামর্থ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহার স্বভাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা ভিতরে উপস্থিত হইলাম।

ঐ পাহাড়ের প্রকৃতিদত্ত আবরণের মধ্যে বাছা বাছা কালো সাদা লাল গোল পাথরগুলি সিমেণ্টে তৈরী বলিয়া মনে হইতেছিল। জলের নিম্নগামী নম্র স্রোত পায়ের নীচে ছোট ছোট পাথরের উপর দিয়া নিজের বিজয় গাথা গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া চলিতেছিল। মাথা উঁচু করিয়া দেখিলাম, জল দিয়া পাহাড় কাটিয়া তৈরী প্রায় বিশ ত্রিশ ফুট উঁচু দুই দেওয়াল তাহাদের লক্ষ লক্ষ বৎসরের ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে। আমার পরিবর্তে কোনও ভূতত্ত্ববিদ্ এখানে আসিলে তাঁহার প্রথম প্রশ্ন হইত, এই পাথর গ্র্যানাইট্ না স্যাণ্ডস্টোন? আবার দেওয়াল কেন উঁচু, জলের ঢাল কতখানি? প্রতি দশ বৎসর জল কতখানি গভীরে যায়, এ সকল হিসাব করিয়া তিনি প্রকৃতির হাতে গড়া এই সুড়ঙ্গের বয়স স্থির করিয়া বলিতেন। 'এই পাহাড়িয়া নদীর খেলা আজ পঞ্চাশ হাজার বৎসর কি দুইলক্ষ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।' পার্শ্ববর্তী দেওয়ালে নিহিত নানা বর্ণের প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া তিনি তাহাদের বয়স সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইতেন, এবং তাহাদের সাঁটিয়া যে মাটির শক্ত প্রলেপ বসিয়াছে, সিমেণ্টে পরিণত হইতে তাহার কত বৎসর লাগিবে, হিসাব করিয়া পাহাড়ের বয়সও আমাদের জন্য স্থির করিয়া দিতেন। আর যদি এখানকার ভূমিকম্পের ইতিহাস কাহারও জানা থাকিত, তাহা হইলে নিজে অঙ্কে সেই অনুসারে পরিবর্তন করিয়া তিনি হয়তো নূতন সিদ্ধান্তও দিতেন। এই কড়া সিমেণ্টের মধ্যে চামড়া বা সূক্ষ্ম জালের মত ডিজাইনের কি করিয়া সম্ভব হইল, আর তাহার মধ্য দিয়া জলের ফোয়ারা কেমন করিয়া বাহির হইল, ইহাও হয়তো বলিয়া দিতেন। সত্যই নক্ষত্রবিজ্ঞানের মতই এই ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞান, অদ্ভুত সুন্দর। মনোবিজ্ঞান অপেক্ষা উহার চর্চা কম কঠিন নয়। এই তিনটি বিদ্যাই মানুষের বুদ্ধিবলের অদ্ভুত রম্য বিলাস।

ঐ গুহা হইতে আমরা দূরে চলিয়া গেলাম। এক জায়গায় উঁচুতে উঠিতেও হইল। পাশেই জলের এক ক্ষুদ্র প্রপাত। একটু অগ্রসর হইলেই পাথর ও চুণে বাঁধা দুইটি দেওয়াল দেখিয়া চেষ্টা করিয়াও হাসি সামলাইতে পারিলাম না। মানুষ ভাবিয়াছিল, যে জল পাহাড়ের হৃদয় ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়, তাহা আমরা দুইটি দেওয়াল দিয়া বন্ধ করিতে পারিব! আমার মনোভাব বুঝিয়াই যেন বিজয়ী প্রপাত আমাকে বলিতে লাগিল, 'আমিও সেই কথা ভাবিয়াই হাসিতেছি।' পাহাড়ের বিদীর্ণ হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেলেও সুন্দর

দেখাইতেছিল, কিন্তু মানুষের ভাঙ্গা দেওয়াল তাহার মনোরথের মত তিরস্কার ও হাস্যের ভাব সৃষ্টি করিতেছিল। কোনও উদ্দাম লোককে চড় চাপড় মারিলে তাহার মুখ যেমন থমথমে দেখায়, সেইরূপ এই দেওয়াল বেশিক্ষণ ধরিয়া দেখিবার ইচ্ছাও হইতেছিল না। আমরাই বা কি করিয়া বেশিক্ষণ ধরিয়া কোনও গণ্ডগোল বা হাঙ্গামার সাক্ষী থাকিতে পারি?

ভিতরে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবরের শোভা বাড়িয়াই চলিল। ইতিমধ্যে দেখা গেল, দুই দেওয়ালের মধ্যে একটা বড় পাথর পড়িতে পড়িতে আটকাইয়া গিয়াছে। হয়তো উপর হইতে লাফাইয়া পড়িতেছিল। দুই পাশের দেওয়াল স্নেহভরে তাহাকে বলিয়া থাকিবে, 'ওরে ভাই, থামিয়া যা, জলের খেলায় বাধা সৃষ্টি করিস না।' বেচারি কি করে, সেখানেই দাঁড়াইয়া ঝুলিতেছে। তাহার কপালে ছিল, হেটমুণ্ড হইয়া জলের খেলা তাহাকে দেখিতেই হইবে। উহাতে ভয় পাইয়া যদি বা আমরা আর একটু অগ্রসর হইলাম, তখন দেখিলাম যে আর একটা পাথরও ঠিক ঐভাবেই ঝুলিতেছে। পিঠে নিজের থেকে তিনগুণ ভারি বোঝা লইয়া যেন আটকাইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইল। আমরা উহার নীচে হইতেও বাহির হইলাম। যদি পাশের দেওয়াল একটু ধ্বসিয়া চওড়া হইয়া যাইত, তবে আমাদের হাড়গুলি গুঁড়াগুঁড়া হইয়া যাইত, জলের রং দুই চার মুহূর্তের জন্য একেবারে লাল হইয়া যাইত। তথাপি প্রকৃতি বলে, আমি কিছু জানি না। দুই চারি জন লোক হয়তো এখানে আসিয়াছিল, এবং তাহাদের অর্থহীন জিজ্ঞাসার দাম চুকাইয়া দিয়াছে। সে কথা কে আর মনে রাখে! তাহাদের মত অন্য লোকেরা যখন ভবিষ্যতে কখনও এখানে আসিয়া পৌঁছিবে, তখন পাথরচাপা কিছু দেহাবশেষ তাহারা হয়তো পাইবে, আর সত্য-মিথ্যা কল্পনা আশ্রয় করিয়া এক আধটা প্রকরণ খাড়া করিবে। বাস, আর কি!

পথ চলিতে চলিতে আমরা তো ক্লান্তি বোধ করি নাই, কিন্তু ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ধারালো পাথরের উপর নগ্ন পায়ে চলিতে চলিতে পা ব্যথা করিতে লাগিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই গুহা প্রবেশের অদ্ভুত ব্যাপার অনুভব করিতে করিতে আমরা অর্ধেক গেলাম। ভিতরে অগ্রসর হইতে হইতে আর কতটা এগোনো যায়? অবশেষে অগ্রগতির সাহস মন্থর হইয়া গেল। তবু মন বলিল, হারিয়া ফিরিব কেমন করিয়া? এ পর্যন্ত যদি আসিয়াছি তখন

ওপারে যাইতেই হইবে। যে মন অন্য দিক না দেখে সে মন মানুষের মনই নয়।

অগ্রসর হইতেই পথ চওড়া হইল আর জলের প্রচণ্ডতা কম হইয়া গেল। তাই বুদ্ধিমান হইয়া আমরা স্বীকার করিয়াই লইলাম যে এখন হইতে সম্মুখের দৃশ্য নীরসই হইবে। আর না গেলেও চলিবে। আমরা ফিরিয়া চলিলাম। আবার সেই দৃশ্য, সেই ভয়! সেই কৌতূহল আর সেই সব চিন্তা!!

গুহা হইতে বাহিরে আসিতে আসিতে পুরা ষোল মিনিট লাগিল!!! আমার অভ্যাসমত এই ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে দুইটি মসৃণ পাথরের টুকরা লইলাম, আর অন্ধকারে জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে বাড়ি ফিরিলাম। মনে একই প্রশ্ন: কাহার শক্তি বেশি? ঐ বজ্রকায় পুরানো পাহাড়ের, না নম্র কিন্তু আগ্রহবান জীবনধর্মী সত্যাগ্রহী জলের?

৫৩

নাগিনী নদী তিস্তা

কয়েক বৎসর পূর্বে আমি যখন দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের দিকে গিয়াছিলাম, তখন আমি প্রথম তিস্তা নদীর দর্শন লাভ করি। প্রথম দর্শনেই তিস্তার প্রতি আমার অসাধারণ প্রেম জাগিয়া ওঠে। যদি তিস্তার বিষয়ে কোনও পৌরাণিক কাহিনী বা মাহাত্ম্য জানিতাম, তাহা হইলে মনে তাহার প্রতি ভক্তির উদয় হইত। কিন্তু এই ঝড়ের মত নদী হিমালয় পর্বতের মধ্য হইতে রাস্তা বাহির করিয়া বড বড পাথরে আঘাত করিয়া, তাহার স্রোতের মধ্যে যে সব ছোট বড় পাথর পডে তাহাদের মন্থন করিয়া, নানা প্রকারের গর্জন করিতে করিতে যখন দৌডাইয়া যাইত, তখন তাহার উৎসাহ, দৃঢ় সংকল্প ও তাহার রোষ দেখিয়া তাহার প্রতি প্রেম ও সমাদরের সঞ্চার হইত, ভক্তির নয়।

তিস্তাকে যখন প্রথম দর্শন করি, তখন মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম যে, এই নদীর পার্বত্য জীবন কিছুটা তো দেখিতেই হইবে। বেগবতী পার্বত্য নদীর উপরে বেতের বা দড়ির সঙ্কীর্ণ পুল বাঁধা হইয়াছে তাহার উপর দাঁড়াইয়া

নদীর দিকে তাকাইলে এক বিচিত্র অনুভূতি হয়। পার হইতে গেলে ভয় হয়—মনে হয়, এই পুল বুঝি নদীর স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়া উপরের দিকে জোরে দৌড়িতেছে। যত বেশিক্ষণ ধরিয়া আমরা মন দিয়া দেখিব, ততক্ষণই এই প্রতীপগামী ভ্রান্তি বাড়িতে থাকিবে।

এক দিন মনে মনে বলিলাম, ইহাকে ভ্রান্তি মনে করিব কেন? ইহা তো এক প্রকারের দীক্ষা। এই অনুভূতির দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে বলিতেছে, 'যতখানি বেপরোয়া ভাব লইয়া এই জল পাহাড় হইতে আসিয়া মাঠের দিকে দৌড়িতেছে, ততখানি বেপরোয়া ভাব ও অদম্য কুতূহল লইয়া এই নদীর তীরে তীরে সব বিপদ বরণ করিয়া উপরের দিকে চলিয়া যাও, এই নদীর উৎপত্তিস্থল খোঁজ গিয়া।'

পাহাড়ের কোনও নদী সরোবর হইতে বাহির হইয়া আসিলে সর-যু বা সরো-জা বলে। যখন সে পর্বতশিখরের কোলে পুঞ্জীভূত হিমরাশি হইতে বাহির হয় তখন তাহাকে হৈমবতী বলা উচিত। এমনিতে তো পাহাড হইতে যে সব নদীর উৎপত্তি তাহাদের অবশ্য সাধারণ নাম পার্বতী। পিতা হিমালয়ের এই সব মেয়ের নাম একত্র করিলে তাহাদের সংখ্যা কয়েক সহস্র হইবে।

তিস্তার আসল নাম ত্রিস্রোতা। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় নীল নদীর দুই পৃথক পৃথক উৎপত্তিস্থান আছে; দুইটি স্রোত দূর-দূরান্তরের দুই হ্রদ হইতেই বাহির হইয়াছে, শ্বেতবর্ণের নীলনদ আর নীলবর্ণের নীলনদ। উভয়ের সঙ্গমে মিশর দেশের মাতা বড নীল গঠিত হইয়াছে। সেইরূপ তিস্তাও তিনটি নদীর সঙ্গমে উৎপন্ন হইয়াছে। একটির নাম 'লাচুঙ্গ চু' (চু অর্থ নদী)। এই নদী 'কান্‌-চেন্‌—ঝোঙ্গা' শিখরের দক্ষিণ হইতে বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয় নদীর নাম 'লাচেন্‌ চু'। এই নদী পাও হুন্‌ রী শিখরের উত্তর হইতে বাহির হইয়া চো হ্লামো ও গোরভামা দুই হ্রদের জল লইয়া পথ বাহির করিতে প্রথমে পশ্চিম দিকে বহিয়া যায়; পুনরায় ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে ফেরে। এই উভয়ের সঙ্গমস্থলে চুঙ্গ থাঙ্গের বৌদ্ধমন্দির অবস্থিত। লাচুন চু ও লাচেন চু এই দুই নদীর সঙ্গম হইতে যে নদীর সৃষ্টি, তাহার সঙ্গে মেশে পঞ্চহিমাকর (কান্‌ চেন্‌ ঝোঙ্গা), সীম ব্যো, ও সিনো লো চু এই তিন আকাশভেদী শৃঙ্গের কোলের হিমরাশি হইতে উৎপন্ন তালুঙ্গ চু। তিনটি স্রোত মিলিয়া তিস্তা হয়। পুনরায় উহা সোজা দক্ষিণ দিকে বহিতে থাকে। কিছু আগে গিয়া

উহার সঙ্গে ডান ও বাঁ দিক হইতে ছোট বড় অনেক নদী আসিয়া মেশে। ইহাদের মধ্যে বড় হইল দিক্ চু, রো রো চু, রোঙ্গনী চু, রঙ্গপো চু, আর বড়, রঙ্গীত চু।

যেখানেই দুই নদী একত্র হইয়াছে সেখানেই এক একটি বৌদ্ধ মন্দির পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা তাহাকে বলে 'গোম্‌্যা।'

যখন আমি তিস্তার আকর্ষণে সর্বপ্রথম এই পাহাড়ে প্রবেশ করি, তখন আমি রঙ্গীত নদীর সঙ্গম ও রঙ্গপো নদীর সঙ্গম দেখিয়াছিলাম। সঙ্গমে উভয় নদীর রং এখানে পৃথক পৃথক হয়। এবার এই নদীর সঙ্গমই তো নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। কিন্তু সিকিমের রাজধানী গঙ্গতোকের পূর্বদিকে রোরো চু ও রোঙ্গনী নদীর সঙ্গমও সিংটমে দেখিলাম। সঙ্গম অর্থে জীবন্ত কাব্য।

দেশবিজয়ের জন্য অনেক রাজার সেনা যেমন একত্র হয় ও তাহাদের সংকল্প দৃঢ় হয়, তেমনই এই সকল নদীর জলভার লইয়া তিস্তা নদী জলবতী, বেগবতী ও সংকল্পশালিনী হয়, পাহাড়গুলির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সমতল ভূমিতে আসিয়া পৌঁছে। তখন সে শিলিগুড়ি পর্যন্ত না গিয়া জলপাইগুড়ির পথে পাকিস্তানে প্রবেশ করে আর রঙ্গপুর দর্শন করিতে করিতে শেষে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মেশে।

আমাদের পূর্বজেরা নদীগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। অনেক নদীর জলে পুষ্ট হইলে সে নদীকে যুক্তবেণী বলিতেন। শুভ্র গঙ্গা শ্যাম যমুনা ও 'মধ্যে গুপ্তা' সরস্বতী মিলিয়া প্রয়াগরাজের নিকট ত্রিবেণী। পঞ্জাবে সিন্ধু সাত নদীর জল পাইয়া যুক্তবেণী। পরে গিয়া সেই নদী যখন নিজে অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয় ও অনেক মুখে সমুদ্রে গিয়া মেশে, তখন তাহাকে বলে মুক্তবেণী। নদীর জীবনকে আমরা অন্য ভাবেও দুই ভাগ করিতে পারি। পাহাড়গুলিব বদ্ধ জীবন আর খোলা সমতলভূমির মুক্ত জীবন। গঙ্গা নদীর পার্বত্য জীবন হরিদ্বারের নিকটেই শেষ। কিন্তু যে পর্যন্ত জমি শক্ত, সে পর্যন্ত এক ধারাতেই নদীর গতি। বাংলার মত যে অঞ্চলে মাটিতে পাথর থাকে না ও যাহা সমতল, সেখানে তাহার গতি অনেক ধারায়। আমরা বলিতে পারি যে নদীর পার্বত্য জীবন কুমারীর জীবনের মত নিষ্পাপ হয়। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড়গুলি হইতে বাহির হইবার পর তিস্তাকে শুধু দুই একটি বন্ধন সহ্য করিতে হয়, তাহা হইল

আসামের অভিমুখে যাওয়ার পথে রেলওয়ে পুলের বন্ধন। একটি হইল ভারতবর্ষের নবনির্মিত আসাম লিংকের পুল, অন্যটি হইল আমাদেরই প্রস্তুত কিন্তু পাকিস্তানের হস্তগত রঙ্গপুরের নিকটবর্তী পুল।

তিস্তা নদীর সমতল ক্ষেত্রের জীবন খানিকটা বিচিত্র প্রকারের। তিব্বতের বহুপতি প্রথা হয়তো তাহার স্মরণ আছে। এমন এক সময় ছিল যখন তিস্তা গঙ্গা নদীর সহিত মিশিয়াছিল। এই দুই এক শত বৎসরের মধ্যে সে অনেক বিক্রম দেখাইয়াছে, স্থানীয় লোকের নিকট 'পাগলা' নামও পাইয়াছে। আজও তাহার একটি প্রবাহ ছোট তিস্তা নামে পরিচিত, একটি বুড়ি তিস্তা, আর তৃতীয়টির নাম মরা তিস্তা। তাহারা নিজের জলভার করতোয়া নদীকে দিয়া দেখিল, ঘঘোতকেও দিল। সমতল ভূমিতে সে যুক্তবেণীও হয়, মুক্তবেণীও হয়। তিস্তার চঞ্চল স্বভাবকে চিনিতে পারা ও তাহাকে অনুনয় করা মানুষের পক্ষে সহজ নয়। সে এতই স্থান পরিবর্তন করে যে তাহার অনেক প্রবাহের স্থায়ী নাম দেওয়া ও তাহা মনে করিয়া রাখাও কঠিন। শোনা যায়, কালিকাপুরাণে তিস্তার উল্লেখ আছে। সেখানে গল্প আছে যে দেবী পার্বতী কোনও এক অসুরের সঙ্গে লড়াই করিতেছিলেন। উন্মত্ত অসুর বলিতেছিল, আমি শিবকে পূজা করিব, পার্বতীকে নয়। পার্বতী আর সেই অসুরে ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে অসুর খুব পিপাসার্ত হইল। সে শিবের নিকট প্রার্থনা করিল, প্রভু, আমার পিপাসা মিটাও। অমনি কি আশ্চর্য! প্রার্থনা শিবের নিকট পৌঁছামাত্র পার্বতীর স্তন হইতে স্তন্যধারা বহিতে লাগিল। উহাই আমাদের তিস্তা বলা হয়, অসুরেশ্বরের তৃষ্ণা মিটাইবার কাজ এই নদী করিয়াছিল, তাই ইহার নাম হইল তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রাকৃত রূপ তিস্তা। নদীকে কেহ তৃষ্ণা কি করিয়া বলে তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। তৃষ্ণার স্থানে 'তণ্হা'ই তো হইতে পারে। ণ কারের লোপ হইয়া যাওয়া ঠিক মনে হয় না।

যাহা হউক, তিস্তার জীবনধারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও স্মরণীয়। পাহাড়ে যেখানে এই সব নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে খুব গরম হয়। এই জন্য ম্যালেরিয়ার বাহন মশাও অনেক। হয়তো এই জন্যই তিস্তার নাম কোনও লোকগীতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এখন তো আমরা বিজ্ঞানযুগে প্রবেশ করিয়াছি। ম্যালেরিয়াবাহন মশার প্রতিকার হইতে পারে। যেখানে নদী বেগে বহে, সেখানে উহাতে

যন্ত্র লাগাইয়া তাহা দিয়া প্রচুর কাজ হইতে পারে। তিস্তার উৎপত্তি হয়তো পাঁচ সাত হাজার ফুট উঁচুতে। যখন সে পাহাড়ি মুলুক ছাড়িয়া আসে, তখন তাহার উচ্চতা সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে একেবারে সাত শত ফুট। দেখিতে দেখিতে যে নদী ছয় হাজার ফুট হইতে লাফাইয়া পড়ে, তাহাকে দিয়া যেমন ইচ্ছা কাজ করাইয়া লওয়া যায়। করাত দিয়া কাঠ চেরাই করা আর গম পিষিয়া আটা করার কাজ তো এই সব নদী করিয়াই থাকে। এখন ইহাদের দিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড কাজ করানো হইবে। তখন তো সমস্ত সিকিম রাজ্যের রূপই বদলাইয়া যাইবে।

আমাদের ধর্মপ্রাণ পূর্বপুরুষদের যন্ত্রবুদ্ধিও ধর্মকার্যেই প্রয়োগ করা হইত। এক জায়গায় আমরা দেখিলাম, পার্বত্য স্রোতের সামনে একটি চাকা রাখিয়া তাহার সাহায্যে 'ওম্ মণিপদ্মে হুম্' জপের কাষ্ঠচক্র ঘোরানো হয়। আর এই ভাবে যে যন্ত্রে জপ হয়, যন্ত্রের মালিক তাহার পুণ্য লাভ করে।

এরূপ পুণ্যের বড় অংশ নদীরই প্রাপ্য।

৭-১০-৫৬

৫৪

পরশুরাম কুণ্ড

ভারতবর্ষের প্রায় উত্তরপূর্ব সীমান্তে লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রের তীরে ব্রহ্মকুণ্ড বা পরশুরাম কুণ্ড নামে এক তীর্থস্থান আছে। তিব্বত, চীন ও ব্রহ্মদেশের সীমার নিকটে, বন্য জাতিদের মধ্যে, ভারতীয় সংস্কৃতির ইহা ছিল প্রাচীন শিবির। পশ্চিম সমুদ্রের তীরে সহ্যাদ্রির তরাইয়ে যিনি ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ভার্গব পরশুরাম সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ করিতে করিতে উত্তরপূর্ব সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট শান্তি লাভ করেন। ইহাই হইল এ স্থানের মাহাত্ম্য।

যখন হইতে আমি আসাম প্রদেশে যাইতে আরম্ভ করি, তখন হইতে ইচ্ছা ছিল, পরশুরাম কুণ্ডে গিয়া স্নান-পান-দানের সুখ লাভ করিব। রাজনৈতিক,

ভৌগোলিক, সাময়িক অসুবিধার জন্য আজ পর্যন্ত সেখানে যাইতে পারি নাই। কিন্তু যখন শুনিলাম যে মহাত্মাজীর চিতাভস্ম বিসর্জন অন্যান্য তীর্থের মত পরশুরাম কুণ্ডেও করা হইয়াছে, তখন সেখানে যাইবার আগ্রহ বাড়িল। এ বৎসর শুনিলাম যে, আসাম প্রদেশের কয়েকজন লোকসেবক ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সর্বোদয় মেলার জন্য সেখানে যাইবে, তখন মনে স্থির করিয়াই ফেলিলাম যে এই সুযোগ ছাড়া হইবে না। পলাশবাড়ির নিকটে কয়েক বৎসর ধরিয়া চালু মোমান আশ্রমের শ্রীভুবনচন্দ্র দাসের আমাকে ডাকিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

বারবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া ভূগোলবিদ্যা বাড়াইয়াছেন এমন যে সব ভূগোলবেত্তার নাম আমাদের পুরাণে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে নারদ, ব্যাস, দত্তাত্রেয়, পরশুরাম ও বলরামের নাম সকলে জানেন। ইঁহাদের মধ্যেও ব্যাস ও বলরাম নিজের নিজের বিভূতির বৈশিষ্ট্যের জন্য চিরজীবী হইয়া আছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি সংগঠন ও প্রচারের কাজ মহর্ষি ব্যাস যেমন করিয়াছেন আর কেহই তেমন করেন নাই। এই জন্য তাঁহার বেদ-ব্যাস উপাধি। তাঁহার আসল নাম তো ছিল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।

আর পরশুরাম ছিলেন অগস্ত্য ঋষির মত সংস্কৃতি বিস্তারক (pioneer of culture)। প্রাচীনকালে মনুষ্যজাতিকে বাঁচিবার জন্য দারুণ যুদ্ধ করিতে হইত—জঙ্গলের সঙ্গে এবং জঙ্গলের পশুদের সঙ্গেও। জঙ্গলগুলি মানবসংস্কৃতিকে আক্রমণ করিয়া কতবার জীর্ণ বা হজম করিয়াছে। তাহার প্রমাণ আজও কাম্বোডিয়ায় আংকোর-ভাট ও আংকোর-থামে পাওয়া যায়। উঁচু উঁচু রাজপ্রাসাদ ও বড় বড় মন্দিরের চূড়া পর্যন্ত মাটির ঢিবিতে ঢাকিয়াছে; আর জঙ্গলগুলির বনস্পতিরা তাহার উপর নিজেদের জয়পতাকা স্থাপিত করিয়াছে। আমাদের দেশেও ছোট বড় অসংখ্য মন্দির অশ্বত্থ ও পিপুল বৃক্ষের শিকড়ের জালে ফাঁসিয়া গিয়া বাঁকা হইয়া আছে।

এমন যুগে পরশু বা কুঠার হাতে লইয়া মানবসংস্কৃতিকে রক্ষা ও প্রসারিত করিবার ভার লইয়াছিলেন ভগবান পরশুরাম। পুরাণে বলে, জন্মের সময় হইতেই পরশুরামের হাতে পরশু ছিল। ধনী বাপ-মায়ের ঘরে জন্ম হইলে ইংরেজীতে বলে, He is born with a silver spoon in his mouth—রূপার চামচ মুখে লইয়াই তাহার জন্ম। পরশুরামের সম্বন্ধেও ঐ কথা।

পরশুরাম জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার সমস্ত সংস্কার ছিল ক্ষত্রিয়ের। বনজঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য কুঠার চালাইতে তিনি সম্রাট সহস্রার্জুনের সহস্র ভুজের উপরও কুঠার চালাইয়াছিলেন। আর ক্ষত্রিয়দের বৃদ্ধিজনিত আতঙ্ক দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি একুশ বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ক্ষাত্র পদ্ধতি অনুসারে এই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ একুশ বার ক্ষত্রিয় বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগামী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় গৌতম বুদ্ধ সে অভিজ্ঞতা একটি গাথায় রচনা করিয়াছিলেন :

ন হি বেরেন বেরানি সংমংতীধ কুদাচনং।

এই পরশুরামের ক্রোধপরায়ণ পিতা তাঁহার অন্য পুত্রদের আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, তোমাদের মাতা কুলটা, তাহাকে মারিয়া ফেল। তাহারা এ কাজ করিতে অস্বীকার করে। জমদগ্নির ক্রোধাগ্নি আরও বাড়িয়া গেল। তিনি পরশুরামের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, বৎস, তুমি আমার আদেশ পালন কর। এই রেণুকাকে মারিয়া ফেল। কুঠার চালাইতে অভ্যস্ত আজ্ঞাবহ পুত্রকে ভাবিতে হইল না। সে অবিলম্বে মাতার শির ছেদন করিল। পিতা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, যত ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার প্রিয় কর্ম করিয়াছ। পুত্রের এখন সুযোগ। পিতার সমস্ত তপস্যার ফল সে নিঃশেষে চারিটি বরে গ্রহণ করিল। 'আমার মাতা আবার জীবন লাভ করুন। আমার ভাইদের আপনি শাপ দিয়া জড় পাষাণ করিয়াছেন, তাহারাও জীবিত হউক, আপনার হত্যা ও শাস্তির কথা ভুলিয়া যাক। আমি মাতৃহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হই, চিরজীবন লাভ করি।' পিতা বলিলেন, 'আর সকলই দিব, কিন্তু মাতৃহত্যার পাপ ধুইয়া ফেলার শক্তি আমার তপস্যারও নাই।' উদাস হইয়া পরশুরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাহার পর পরশুধর রামকে ধনুর্ধর রাম পরাস্ত করিলেন, কারণ যুদ্ধশাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল। পরশু অপেক্ষা ধনুর্বাণের শক্তি ছিল বেশি; তাহার গতি ছিল আরও দূর পর্যন্ত। পরশুরাম ভারত ভ্রমণে সারা জীবন ব্যয় করিলেন, অনেক তীর্থ অনেক সাধুসন্ত দর্শন করিলেন। চিত্তবৃত্তিতে উপশমের আবির্ভাব হইল এবং লোহিত ব্রহ্মপুত্রের তীরে ব্রহ্মকুণ্ডে তাঁহার হাতের কুঠার খসিয়া গেল। সেই শস্ত্র-সংন্যাস এই তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য। পরশুরামের জীবনকথায় পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরপূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত ভারতের কোনও এক যুগের সমস্ত ইতিহাস আসিয়া পড়ে। পরশুরাম

কুণ্ডে যাত্রা করিয়া সাধুসন্তেরা এখানকার বন্যজাতিদের ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্কার দিয়াছেন। এই প্রদেশের লোকমানস বলে যে, রুক্মিণী আমাদের এখানকারই রাজকন্যা ছিলেন, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে আমাদের জামাতা হন।

প্রাচীন কালের সাংস্কৃতিক অগ্রদূত যেভাবে এখানে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে 'অবের' হইবার উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধ ভগবানের শিষ্যও এখানে আসিয়া থাকিবেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু হিমালয় পার হইয়া তিব্বতেও গিয়াছিলেন, এবং জাহাজে চড়িয়া চীনদেশেও গিয়াছিলেন। তাহার পরে আসাম প্রদেশে অহিংসা ধর্মের নূতন বন্যা আসিল শ্রীশংকরদেবের যুগে। শ্রীশংকরদেব আসলে ছিলেন শাক্ত। ঐ পথের অনাচার হইতে উর্ধ্বে উঠিয়া তিনি বৈষ্ণব হইলেন, আর সমগ্র আসাম প্রদেশে ধর্মোপদেশ, নাটক, সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজশুদ্ধি ও সংস্কৃতি বিস্তারের কাজ দীর্ঘকাল পর্যন্ত করিয়াছিলেন। এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্মের প্রচার মণিপুরের দিকে হইয়াছিল। শংকরদেবের প্রভাব আসাম প্রদেশের পার্বত্য লোকের মধ্যে প্রচারের এখনও বাকি আছে।

ইহাদের মধ্যে সদিয়া এমন এক স্থান যাহার আশপাশে অনেক নদী ও উপনদী আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে মেশে। নোয়াডিহিং, টেঙ্গাপানি, লোহিত, ডিগারু, দেওপাণি, কুণ্ডিল, ডিবং, সেসেরী, ডিহং, লালী প্রভৃতি অনেক নদী তাহাদের জল জোগাইয়া ব্রহ্মপুত্রকে পুষ্ট করে। সদিয়া হইতে অনেক পথ অনেক দিকে গিয়া অনেক বন্য জাতিকে সেবা করে। খোদ সদিয়ার চারিদিকে যে চুলেকাটা মিশমীরা বাস করে, তাহারা স্বভাবত সৌম্য, তাই হয়তো তাহাদের ভিতর সভ্য সমাজের বহু দোষ ও রোগ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মূল ব্রহ্মপুত্রের উত্তর দিকের নাম ডিহং। তাহারও উপরে যখন সে মানস সরোবর হইতে বাহির হইয়া হিমালয়ের সমানান্তর হইয়া পূর্বদিকে বহিয়া আসে, তখন তাহার নাম 'সানপো'।

এই সকল নদীর ধারে ধারে আমাদের যে সব পাহাড়িয়া ভাই বাস করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন আমাদের পরম কর্তব্য। একাজ সরকারের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে হওয়া সম্ভব নহে। এজন্য পরশুরাম ও বুদ্ধের মত সংস্কৃতিপ্রবীণ মহাপুরুষদের আবশ্যক, অর্থাৎ তাঁহাদের নূতন দৃষ্টি, নূতন আদর্শ থাকা চাই।

এসব কাজ কে করিবে? ভারতের যুবকযুবতীদেরই একাজ করিতে হইবে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা তাঁহাদের বুদ্ধিমত ভালমন্দ অনেক কিছু করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সর্বদা নির্মল ছিল, একথাও আমরা বলিতে পারি না। এ অবস্থায় দেশনেতাদের উচিত, দূরদৃষ্টির সঙ্গে এসকল স্থান নিরীক্ষণ করা, আর যুবকদের মানবতার নামে শুদ্ধ সংস্কৃতির প্রেরণা দিবার জন্য এই প্রদেশে প্রেরণ করা।

ওয়ার্ধা
২১. ৩. ৫০

৫৫

মাদ্রাজের দুই ভগ্নী

এই দুই ভগ্নীর প্রতি আমার অসীম সহানুভূতি। মাদ্রাজ শহর ইঁহাদের মূল্য যেমন বাড়াইয়াছে, তেমনই উপেক্ষাও করিয়াছে।

এমনিতেই তো মাদ্রাজ শহরের গুরুত্ব কৃত্রিম। উহার নিকটে না আছে কোনও সুন্দর পর্বত, না আছে কোনও মহানদীর খাড়ি বা মোহনা। আর্থিক সম্পদ বা সামরিক দৃষ্টিতে মাদ্রাজের কোনও মৌলিক বিশেষত্ব নাই। কিন্তু ইতিহাসের ফেরে ইংরেজদের এই স্থান পছন্দ করিতে হইল। এ অঞ্চলের লোকদের এই শহরের প্রতি কম ভালবাসা ছিল, এমন কথা তো কেহ বলিতে পারে না। যে সকল ভারতীয়েরা অর্থাৎ ধীবর আদিবাসীরা এই শহরের চন্নপট্টনম্ বা স্বর্ণপুরী নামকরণ করিয়াছিল, তাহারা কি প্রথম হইতেই এই শহরের ভাগ্যের কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিল?

যাহাই হউক, যেদিন ইংরেজেরা এখানে নিজেদের কুঠি বানাইল, তখন হইতে এই শহরের ভাগ্য ও বৈভব বাড়িয়াই চলিল, আর এইরূপে শহরের সেবিকা এই দুই ভগ্নীরও ভাগ্য পরিবর্তিত হইয়া চলিল। একটির নাম 'কূবম্', অন্যটির নাম 'অড়িয়ার'। এই দুই নদী পূর্বগামী হইয়া বঙ্গোপসাগর বা পূর্ব সমুদ্রে গিয়া মিলিয়াছে।

মাদ্রাজ ও তাহার চারিদিকের জমি একেবারেই সমতল। এখানে ছোট-বড় অনেক পুষ্করিণী বা সরোবর আছে। কিন্তু এখন আর তাহাদের কোনও শোভা থাকিল না।

যুক্তি বলে, জমি যদি সমতল হয়, আর তাহার মধ্যে পাথর না থাকে, তাহা হইলে নদী যখন তাহার পথ কাটিয়া সোজা বহিতে থাকে, তখন কোনও বাধা পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু কোনও নদীই তেমন যায় না। কিছু দূর পর্যন্ত নদী এক দিকে ঝোঁকে, সেখান থেকে ক্লান্ত হইয়া মোড় ফেরে, আর অন্যদিকে যায়। আবার অগ্রসর হইলে দিক বদল হয়। এইভাবে সর্পের মত 'নাগমোড়ি' বা বক্রগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে।

পাহাড়িয়া নদীর তো কোনও উপায়ই নাই। পর্বত ও বড বড পাহাড়ের টুকরার মধ্যে যেখানে যেখানে পথ পাওয়া যায়, সেই পথেই তাহাকে যাইতে হয়। তিস্তা বলিবে, 'আমি প্রকৃত নাগিনী নই। বক্রগতি আমার স্বভাব নয়, ইহা আমার ভাগ্য।' কাশ্মীরে প্রবাহিত বিতস্তা বা ঝিলম নদী এইভাবে নিজেকে বাঁচাইতে পারে না। কখনও কখনও চক্রাকারে ঘুরিয়া যাওয়া, আর একটুও অগ্রসর হইবার উৎসাহ না থাকা, ইহাই হইল কাশ্মীর-তল-বাহিনী বিতস্তার স্বভাব। বিহারে প্রবাহিত অসংখ্য নদীর বিষয়েও ইহা বলা যাইতে পারে। এক সময়ে আমাকে বিহার প্রদেশে অনেক জায়গায় হাওয়াই জাহাজে ঘোরাঘুরি করিতে হইত। বিহারের আকাশ আমি অনেক দিক হইতে কতবার যে ভেদ করিয়াছিলাম তাহার হিসাব নাই। হাওয়াই জাহাজে দূর হইতে দূরান্তরে দীর্ঘ পরিভ্রমণেও আমি অনেক উঁচু হইতে বাংলা ও বিহারের নদী দেখিয়াছি, আর তাহাদের বক্রপথে বহিবার নৈপুণ্য দেখিয়া তাহাদের সমাদর করিয়াছি।

ভারতভূমির এক বড মানচিত্র প্রস্তুত করাইয়া তাহার উপর যদি শুধু নদীপথের রেখা টানা যায়, তাহা হইলে সেই বক্ররেখার মহোৎসব খুবই চিত্তাকর্ষক হইবে। নদী ডাইনে বাঁয়ে মোড না ফিরিয়া সন্তুষ্টই হয় না। একদিকে উঁচু পাডের গা ঘেঁষিয়া যাওয়া, অন্যদিকে নীচু পাডকে প্রতি বৎসর ডুবাইয়া কিছু কালের জন্য সেখানে জলপ্রলয়ের দৃশ্য উপস্থিত করা, এ তো নদীর বার্ষিক ক্রীড়া।

কিন্তু নদীগুলি যখন বড় বড় শহরের বস্তিতে আটকাইয়া যায়, অথবা দয়ালু হইয়া দুই পাড়ে মানুষকে বাস করিতে দেয়, তখন তাহাদের সেই স্বচ্ছন্দ বিহার চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। আর তখন হইতে তাহাদের জীবন টাঙ্গার ঘোড়ার মত হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় নদীগুলি যদি তাহাদের গতির দিক এক প্রকারই অর্থাৎ সরল রাখে, তাহা হইলেও তাহাদের শোভা সৌন্দর্য তো নষ্টই হয়।

লণ্ডনে টেম্‌স্ নদী, প্যারিসে সীন নদী, লিস্‌বনে টেগাস নদী, এই তিনটির বন্ধন দুর্দশা দেখিয়া আমার হৃদয় কতবার কাঁদিয়া উঠিয়াছে। আর যখন মানিনী ও স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী নীলনদী নিরুপায় হইয়া আল্-কাহেরো (কাইরো) শহরের মধ্য দিয়া যায়, তখন মনে দুঃখের সহিত ক্রোধও জাগ্রত হয়। আর যাহারা নদীর অপমান করে, তাহাদের কি করিয়া শাসন করা যায়, এই চিন্তা মনে ওঠে।

অড়িয়ার ও কূবম্ এই উভয়ের মধ্যে কূবমের বেশি দুঃখ সহ্য করিতে হয়। কারণ উহা শহরের মধ্য দিয়া ঘোরে। অড়িয়ার শহরের দক্ষিণ প্রান্তে চলিয়া কিছু সুযোগ সুবিধা পায়।

কিন্তু—এখানেও কিন্তু আসিয়া গিয়াছে—মনুষ্য যেখানে অপমান করে নাই, সেখানে সরিৎপতি এই সরিতের অপমান করিয়াছে। বেচারি উৎসাহের সঙ্গে সমুদ্রে মিলিত হইতে যায়। আর সমুদ্র তাহা গ্রাহ্য না করিয়া উঁচু উঁচু ঢেউয়ের সঙ্গে বালু আনিয়া তাহার সামনে এক খুব বড় বাঁধ বা সেতু খাড়া করিয়া দেয়।

দেবী বাসন্তীর ব্রহ্মবিদ্যা আশ্রম যখন সর্বপ্রথম দেখিতে যাই, তখন সাগর-সরিৎ সঙ্গমের সৌন্দর্য দেখিবার জন্য নদীর মুখ পর্যন্ত গিয়াছিলাম। আর কি দেখিলাম—খণ্ডিতা অড়িয়ার তাহার জল লইয়া বারবার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। আর সমুদ্র যে বাঁধ নিজে দাঁড় করাইয়াছে তাহার অন্য পাড়ে ঢেউগুলি বিকট হাস্য করিতেছে। সমুদ্রের প্রতি মনে মনে তো ক্রোধ হইলই। তাহার মধ্যে কি সামান্য দাক্ষিণ্যও নাই? সামান্য একটু পথ দিলে হইত। কিন্তু নদী ও সমুদ্রের মধ্যে প্রসারিত সেতুর উপর দিয়া চলিতে চলিতে মনে এই চিন্তা জাগিল যে, অড়িয়ারের অপমানে আমিও যোগ দিয়াছি। অন্য পথে যাইবার পর সেতুর উপর দিয়া ফিরিয়া তো আসিতেই হইবে।

তাহার পর আজ পর্যন্ত বহুবার মাদ্রাজ গিয়াই, ভগবতী অডিয়ারকে দর্শনও করিয়াছি। কিন্তু ঐ বাঁধের উপর দিয়া যাইতে প্রাণ সরে নাই।

কূবমের জল অপেক্ষা অডিয়ারের জল অনেক স্বচ্ছ বলিয়া মনে হইল। ওখানকার হাওয়া স্বচ্ছ বলিয়া জলে একটা জ্যোতিও যেন দেখা যায়। এই নদীর মধ্যে ভিতরের দিকে লক্ষীর এক বরপুত্রের শ্বেত প্রাসাদ আছে। তাহা নদীর শোভাকে নষ্ট করে না। নদীর জন্য তাহার আরও উন্নতিই হইয়াছে।

আমি যখন যখন অডিয়ার গিয়াছি সর্বদাই তাহার তীরে নারিকেলের মিঠা জল পান করিয়াছি, আর তাহাই লোকমাতার প্রসাদ বলিয়া মনে করিয়াছি। অডিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে কূবমের দর্শনও তো হইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য আজ পর্যন্ত মনে দয়া হিসাবে দয়ারই উৎপত্তি হইয়াছে, যদিও মাদ্রাজের সেণ্ট জর্জ কোর্টের কারণে তাহার শোভা সাধারণ শ্রেণীর নয়।

ইংরেজরা অডিয়ার হইতে কূবম্ পর্যন্ত এক ছোট খাল খনন করিয়াছে, তাহার নাম দিয়াছে বাকিংহাম কেনাল। এই কেনাল হইতে যে কি লাভ হইয়াছে তাহা তো জানি না। কিন্তু যতবারই এই নাম শুনিয়াছি ততবারই আমার খারাপ লাগিয়াছে।

এই নদীগুলি যদি মাদ্রাজ শহরের মধ্যে না হইত, তাহা হইলে হয়তো আমি ইহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলিও দিতে পারিতাম না। কিন্তু ইহাদের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য বাড়াইবার কাজ মাদ্রাজের হাত হইতে সম্ভব হইল না। মাদ্রাজ ইহাদের সেবা লইয়াছে কিন্তু ইহাদের সেবা করে নাই, মাদ্রাজের বেলায় এই দুঃখ মনে থাকিয়াই যায়।

২ জুন, ১৯৫৭

প্রথম সমুদ্র-দর্শন

পিতা তাঁহার কর্মস্থল সাতারা হইতে কারোয়ারে বদলি হইয়া গেলে আমাদের সাতারা হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইল। বাড়িতে নরশা নামে এক বলদ ছিল। তাহাকে আমরা মামার বাড়িতে বেলগুন্দীতে পাঠাইয়া দিলাম। মহাদুকে ছুটি দিতেই হইল। বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ লাল করিয়া ফেলিল। বাড়ির ঝি মথুরাকে ছাড়িবার সময় মা তাহাকে তাঁহার এক পুরাণো কিন্তু ভাল শাড়ি দিয়া দিলেন, আর সে আমাদের সকলকে খুব আশীর্বাদ করিল। বাড়ির ভাল ভাল আসবাবপত্র অন্যত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আমরা প্রথমে শাহপুর গেলাম, সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া পেনিনসুলার রেলওয়েতে মুরগাঁও গেলাম। পথে গুঞ্জী ষ্টেশনে জলের ফোয়ারা ছুটিতেছিল, তাহা দেখিয়া আমাদের বড মজা লাগিল। লোনড়ে স্টেশনে গাড়ি বদল করিয়া আমরা 'ডবলিউ আই পি রেলওয়ের কামরায় বসিয়া পড়িলাম।

গোয়া ও ভারতের সীমায় ক্যাসল রক স্টেশন। সেখানে কাস্টমের লোকেরা আমাদের সকলের খানাতলাসি করিল। আমাদের নিকট খাজনা আদায়ের মত আর কি জিনিস থাকিতে পারে? কিন্তু আমরা ভ্রমণ কালে ছেলেদের খাওয়ার জন্য বাক্স ভরিয়া ভরিয়া ছোট বড় লাড্ডু নিয়াছিলাম। দেখিয়া কাস্টমের সিপাইয়ের জিভে জল আসিল। সে বিনা সঙ্কোচে আমাদের নিকট লাড্ডু চাহিয়া বসিল। বলিল, 'আপনাদের লাড্ডু আমাদের খাইতে দিন।' আমি ভাবিলাম আমাদের লাড্ডু তবে এইখানেই শেষ হইয়া যাইবে। মায়ের মন গলিয়া গেল, তিনি বলিলেন, 'নেও বাবা, এতে আর কি আছে।' কিন্তু বাবা মাঝখানে পড়িয়া বলিলেন, 'অন্য কাহাকেও দিয়া দেও, কিন্তু এই সিপাহীদের দেওয়া মানে তো ঘুস দেওয়া।'

সিপাহী বলিল, 'আমরা কি আর লোককে বলিতে যাইতেছি? আপনাদের

নিকটে খাজনা দেওয়ার মত জিনিস পাওয়া গেলে, আর আমরা আপনাদের নিকট তাহার জন্য কিছু আদায় না করিলে, আপনার লাড্ডু দেওয়া ঘুস দেওয়ার মত হইত।'

. বাবার কথা না শুনিয়া মা ঐ তিন জনকে এক একটি করিয়া বড় লাড্ডু দিয়া দিলেন। ঘিয়ে ভাজা আর চিনির রসে পাক করা লাড্ডু ঐ বেচারিরা হয়তো ইহার পূর্বে কখনও খায় নাই। তাহারা লাড্ডুর টুকরা মুখে দিয়া নিজের নিজের গালকেই লাড্ডুর মত করিয়া তুলিল।

বাবার দিকে ফিরিয়া মা বলিলেন, 'আমি কি বাড়িতে চাপরাশিদের খাইতে দিতাম না? ইহারা তো আমার ছেলের মত। ইহাদের খাইতে দিতে লজ্জা কিসের? আজ পর্যন্ত কখনও এমন হয় নাই যে কেহ আমার কাছে কিছু চাহিয়াছে আর আমি দিব না বলিয়াছি। আজই তোমার ঘুসের কথা আসিল কোথা হইতে?'

ক্যাসল রক হইতে আরম্ভ করিয়া তিনটি ঘাট পর্যন্ত সৌন্দর্য দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত হইল। একথা বলা কঠিন যে ইহাতে দেখিবার আনন্দই বেশি ছিল, না দেখাইবার আনন্দ। আমরা ডান দিকের খিড়কি হইতে বাঁ দিকের খিড়কি পর্যন্ত, আর বাঁ দিকের জানলা হইতে ডান দিকের জানলা পর্যন্ত নাচিয়া ও লাফাইয়া কামরাতে যে সব যাত্রী ছিল তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিলাম।

তাহার পর আসিল দুধসাগরের প্রপাত। উহাতো আমাদের চেয়েও হৈ চৈ করিয়া লাফাইতেছিল। ইহার পূর্বে আমরা কোনও জলপ্রপাত দেখি নাই। এতখানি দুধের প্রবাহ দেখিয়া আমাদের খুব মজা লাগিল। আমাদের রেলগাড়িও ছিল খুব রসিক। প্রপাতের একেবারে সামনে যে পুল তাহার উপর আসিয়া উহা ছাড়াইয়া গেল, আর জলের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কণা জানলার মধ্য দিয়া আমাদের কামরাতে আসিয়া আমাদিগকে চঞ্চল করিতে লাগিল। সেদিন আমরা শুইবার সময় পর্যন্ত জলপ্রপাতেরই কথা বলিতেছিলাম।

আমরা মুরগাঁও পৌছিলাম। আজকাল মুরগাঁওকে লোকেরা বলে মার্মাগোয়া। আমরা স্টেশনে নামিয়া রেলের অনেক সব কাঠের লাইন পার হইয়া এক হোটেলে গেলাম। সেখানে খাওয়া দাওয়ার পর আমি যে সব ঝিনুক এদিক ওদিক পড়িয়া ছিল তাহা লইয়া খেলিতে লাগিলাম। ততক্ষণে

কেশু দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমার কাছে আসিল। তাহার বড় বড় চোখ দেখিয়া ও তাহাকে হাঁপাইতে দেখিয়া আমার মনে হইল বুঝি উহার পিছনে কোনও গোরু তাড়া করিয়াছে।

সে চিৎকার করিয়া বলিল, 'দত্তু, দত্তু, শিগ্‌গির আয়। শিগ্‌গির আয়। দেখ এখানে কত জল। ফেলে দে তোর ঝিনুকগুলো। সমুদ্র রে সমুদ্র! চল, আমি তোকে দেখাইয়া দিই!' ছেলেবেলায় একের আনন্দ অন্যকে দিতে কারণ জানার প্রয়োজন হয় না। আমারও মন কেশু আনন্দে ভরিয়া দিল, আমরা দুইজনে দৌড়িতে লাগিলাম। দূর হইতে আমাদের দৌড়িতে দেখিয়া গেন্দুও দৌড়াইতে লাগিল। আমরা তিন জন পাগলের মত জোরে ছুটিলাম।

কী দেখিলাম! সামনে এতখানি জল লাফাইতেছে যে আমরা আজ পর্যন্ত এমন কোথাও দেখি নাই। বিস্ময়ে আমার চোখ বড় বড় হইয়া গেল, বলিয়া ফেলিলাম, 'অব্‌ব্‌বব্‌......কতখানি জল!' আর দুই হাতে এতখানি প্রসারিত করিলাম যে বুক টান ধরিয়া গেল। কেশু আর গেন্দুও নিজের নিজের হাত মেলিয়া ধরিল। বাবা যদি আমাদের সেই অবস্থায় দেখিতেন তাহা হইলে ক্যামেরা আনিয়া আমাদের ছবি তুলিয়া লইতেন। 'কত জল! এত সব জল কোথা হইতে আসিল? দেখতো, রৌদ্রে কেমন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে!' আমরা পরস্পরকে বলিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম, কিন্তু প্রাণ ভরিল না। এখন এই জল লইয়া কি হইবে? একেবারে দিগ্‌বলয় পর্যন্ত জলে জলময়, আর সে বিশাল জলরাশি শান্ত হইয়াও থাকিতে পারিতেছিল না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নাচিতে লাগিলাম, জোর গলায় চিৎকার করিতে লাগিলাম, 'সমুদ্‌দ্রে! সমুদ্‌দ্রে!! সমুদ্‌দ্রে!!!' প্রত্যেকবার 'সমুদ্র' শব্দের 'মুদ্র' বেশি রকম জোরে ফুলাইয়া উচ্চারণ করিতাম। সমুদ্রের বিশালতা, ঢেউয়ের খেলা, আর দিগন্তের দৃশ্য এই প্রথম-বার দেখিতে পাইলাম। আমাদের ইহাতে যে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের নিকট অন্য কোনও উপায়ই ছিল না। সমুদ্রের ঢেউ যেমন উঠিয়া, ফুলিয়া, ফাটিয়া যায় আমরাও তেমনই সমুদ্রের গর্জন অনুসারে তালে তালে নাচিতে লাগিলাম, কিন্তু আমরা তো আর ঢেউ নই, তাই শেষে ক্লান্ত হইয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলাম। একদিকে দেখিলাম, এক একটা ঘরের মত বড় ইটের স্তূপ বাহিরে রাখিয়াছে। তাহাদের কোনটা

বা বেঁকা কোনটা বা সোজা। তখন দোকানে সাবানের ঢেলা ও দিয়াসলাইয়ের বাক্সের উপমার কথা আমার মনে পড়িল। প্রকৃত পক্ষে ঐগুলি ছিল বড় বড় ইঁট দিয়া তৈরী মুরগাঁওয়ের ঘাট। শিবের ষাঁড়ের মত সমুদ্রের ঢেউগুলি বার বার আসিয়া ঐ ঘাটে জোরে আঘাত করিত।

বাড়ি ফিরিয়া আমরা সমুদ্র দেখিতে কেমন সেবিষয়ে বাড়ির সকলকে বলিতে লাগিলাম। সমুদ্রের নহবৎখানায় বেচারি দুধসাগরের পাখির ডাক এখন কে শোনে ?

সূর্য সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। চারিদিকে অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িল। ঘাটে জাহাজ লাগিয়া ছিল, খাওয়া দাওয়া সারিয়া তাহাতে আসিয়া উঠিয়া পড়িলাম। জাহাজে আমি ও গেন্দু লোহার তার দিয়া যে রেলিং হয়, তাহার পাশের বেঞ্চে বসিয়া দেখিতে লাগিলাম যে উটের মত ঘাড়ওয়ালা ভারি বোঝা উঠাইবার যন্ত্রে (ক্রেন) বড় বড় বস্তা রসি দিয়া বাঁধিয়া কি করিয়া উপরে উঠাইয়া একপাশে রাখা হয়। আমাদের সামনেই ক্রেন এক বড় স্তূপ হইতে বস্তা বাহির করিয়া আমাদের জাহাজের পেটে ভরিয়া দিল। যন্ত্রের ঘর্ঘর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মাল্লাদের জোর চিৎকার 'আবেস! আবেস!—আর‍্যা! আর‍্যা!' 'আবেস' বলিলে ক্রেনের শিকল টানিয়া দেয়, আর 'আর‍্যা' বলিলে তাহা ঢিলা করিয়া দেওয়া হয়। লোকে বলে যে এ শব্দ দুইটি আরবি।

আমরা আত্মহারা হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম, এমন সময়ে আমাদের পিছনে যেন কানের কাছেই 'ভোঁ ওঁ ওঁ……' করিয়া বড় জোরে এক আওয়াজ হইল, আমরা দুইজনে ভয়ের চোটে বেঞ্চ হইতে চট করিয়া লাফাইয়া পড়িলাম, আর পাগলের মত এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলাম। আমাদের কানের পরদা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এত নিকটে এত জোর শব্দ সহ্যই বা হয় কি করিয়া? কোথায় দূর হইতে শোনা যায় রেলের 'কু—উ—উ—' বাঁশির ধ্বনি, আর কোথায় এই মহিষের মত কর্কশ কণ্ঠে 'ভোঁ—ওঁ—' শব্দ! অবশেষে সে শব্দ বন্ধ হইয়া গেল; কাঠের পুল সরাইয়া লওয়া হইল, আসা যাওয়ার রাস্তার উপর হইতে যে কাঁটার সিঁড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা আবার উঠাইয়া লওয়া হইল, আর 'ধস' 'ধস' করিতে করিতে আমাদের জাহাজ পাড় ছাড়িয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে দূরত্ব বাড়িয়া চলিল। কেহ কেহ হাওয়ায় রুমাল উড়াইয়া আর কেহ কেহ বা শুধু হাত নাড়িয়া পরস্পরের নিকট

বিদায় লইল। এই সুযোগে বহু লোকের কিছু না কিছু ভুলে যাওয়া কথা নিশ্চয় মনে পড়িয়া যায়। তাহারা জোরে চিৎকার করিয়া পরস্পরকে তাহা মনে করাইয়া দেয়, অন্যেরা তাহার সান্ত্বনার জন্য 'হাঁ, হাঁ' বলিতে থাকে, যদিও তাহাদের মাথায় আসল কথা কিছুই ঢোকে না।

মাটির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ দূর হইল। আমরা সমুদ্রের পৃষ্ঠে জাহাজে করিয়া অগ্রসর হইতেছি। এই সব মজা দেখিয়া আমরা নিজের নিজের জায়গায় বসিয়া রহিলাম। জাহাজে সর্বত্র বিদ্যুতের আলো। রেলে অন্য ধরণের আলো ছিল, সেখানে 'খোপরা' ও কেরোসিন তেলের বাতি কাঁচের হাঁড়িতে ঝুলিতেছিল। এখানে দেওয়ালের ছোট ছোট কাঁচের গোলাকার আধারের ভিতর বিদ্যুতের তার জ্বলিয়া মৃদু আলোক দিতেছিল।

সমুদ্র ও সমুদ্রযাত্রার এই হইল আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা।

৫৭

ছাপ্পান্ন বৎসরের ক্ষুধা

১৮৯৩ সনের কাছাকাছি আমি একবার কারোয়ারে গিয়াছিলাম। মার্মাগোয়া বন্দর হইতে যখন আমি প্রথম সমুদ্র ঝক্‌মক্ করিতেছে দেখিলাম, তখন অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। রাত্রি নয়টায় আমরা স্টীমারে উঠিলাম। স্টীমার তীর ছাড়িয়া সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমার মনও তাহার চিরপরিচিত তীর ছাড়িয়া কল্পনা সমুদ্রে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। ভোর হইতেই আমরা কারোয়ারে পৌঁছিলাম। স্টীমার হইতে নৌকায় নামা বড় সহজ ছিল না। প্রত্যেক নৌকার সঙ্গে দড়াদড়ি (outriggers) বাঁধা ছিল। আমার মনে প্রশ্ন উঠিল, জানিয়া শুনিয়া এরূপ অসুবিধার সৃষ্টি কেন করা হইয়াছে ? পরে ইহাদের উপযোগিতা বুঝিতে পারিলাম।

ভ্রমণের ক্লান্তি কমিয়া গেলেই আমরা সমুদ্রের তীরে বেড়াইতে লাগিলাম। তীর হইতে সমুদ্রের মধ্যে তিনটি পাহাড় দেখা যাইতেছিল। একটি ছিল দেওগড়ের, একটি মধুলিঙ্গ গড়ের, তৃতীয়টি কূর্মাগড়ের। দেওগড়ের পাহাড়ের

উপর আলোকস্তম্ভ ছিল। ইহাই ছিল তাহার বৈশিষ্ট্য। এই আলোকস্তম্ভের নিকটে এক সরু ধ্বজদণ্ড ঈষৎ দেখা যাইত। সমুদ্রতটে খেলিতে খেলিতে ক্লান্ত হইয়া আলোকস্তম্ভের প্রজ্বলিত দীপ কে সর্বপ্রথমে দেখিবে, তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে গোলমাল হইত। কখনও কখনও মনে হইত, এই বিশাল জলরাশি পার হইয়া আমরা যখন কারোয়ারে আসিলাম, তখন রাত্রের স্টীমারে দেওগড় দেখিতে পাইলাম না কেন?

কোনও স্টীমার আসিবার সময়ে দেওগড়ের ধ্বজদণ্ডের উপরও পতাকা উড়ানো হইত। এখানকার লোকেরা দূরবীণ লইয়া দেওগড়ের দিকে তাকাইয়া থাকিত। ওখানে পতাকা উড়িতে দেখিলে এখানেও তাহারা পতাকা উড়াইত। কখনও কখনও আমি সুদূর দেওগড়ের পতাকা উড়িতে দেখিয়া ভাই গোন্দুকে অবাক করিয়া দিতাম।

একবার বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দেওগড়ের উপরে আলো কে জ্বালায়? পতাকাই বা কে উড়ায়?' তিনি উত্তর করিলেন, 'ওখানে এজন্য একজন লোকই রাখা হইয়াছে। সন্ধ্যা হইতে হইতেই সে আলো জ্বালায়। দূর হইতে বোট আসিতেছে দেখিলেই সে পতাকা উড়ায়। দেওগড়ের আলো দেখিয়া নাবিকেরা বুঝিতে পারে যে কারোয়ার বন্দর আসিয়া গিয়াছে। তাহারা জানে যে আলোর নীচে এক ছোট পাহাড় আছে। তাই তাহারা আলোর কাছে যায় না।'

'আলোকস্তম্ভ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে যাহারা আছে, তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা? তাহারা মিঠা জল আনে কোথা হইতে?'

'খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত জিনিসপত্র ইহারা নৌকা করিয়া কারোয়ার হইতে লইয়া যায়। দেওগড়ে কুয়া বা পুষ্করিণী অবশ্য থাকিবে, তাহাতে বৃষ্টির জল জমা করিয়া রাখে।'

'আমরা কি সেখানে যাইতে পারি না? চলুন, আমরাও একবার ওখানে যাই, ওখানে সর্বদা থাকিতে কি আনন্দ! সন্ধ্যা হইতেই আলো জ্বালা, স্টীমারের বাঁশি বজিতেই পতাকা ওড়ানো! বাস, এই তো কাজ? বাকি সমস্ত সময় নিজের! যে ভাবে চাই কাটাইতে পারিব। কেহ আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে না, আমরাও কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যাইব না। চলুন, আমরা একবার ওখানে যাই।'

পিতা আমাদের বাড়িওয়ালা রামজী শেঠ তেলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহার জাহাজের কাপ্তানের সঙ্গে কথা বলিলেন। পরের দিনই দেওগড যাওয়া স্থির হইল। আমরা সকলে গাড়ি করিয়া বন্দরে গেলাম। বড নৌকায় বসিতে বেশ লাগিল। পাল খুলিয়া দুলিতে দুলিতে আমরা সকলে চলিলাম। নৌকা বেশ দুলিতে লাগিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইবার নাম নাই। অনেকটা সময় লাগিল, তাই পিতা রামজী শেঠকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কাপ্তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কাপ্তান বলিলেন, 'পবন অনুকূল নয়, বাঁকা দিকে পবনের গতি হিসাব করিয়া পাল লাগানো হইয়াছে। নৌকা চলিতেছে ঠিকই ; তবে দেওগড পৌছিতে সন্ধ্যা লাগিবে।' আমার তো কোনও আপত্তি ছিল না। সমস্ত দিন দুলিতে দুলিতে থাকিব, তাহার আনন্দ ; আর সন্ধ্যাবেলায় দীপস্তম্ভের আলো নিকট হইতে দেখিব। কিন্তু এত সুখ পিতার মনে ধরিল না। তিনি বলিলেন, 'ইহা তো ঠিক নয়।' কাপ্তান বলিলেন, 'পবন প্রতিকূল। ইহার সামনে করিব কি ? অল্প দূর গিয়া যদি বুঝি বাতাসের বেগ বাডিতেছে, তাহা হইলে তখন এতটা ফিরিয়া পার হওয়াও কঠিন।' রামজী শেঠ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কি করা যায় ?' পিতা বলিলেন, 'আর তো কোনও উপায় নাই। ফিরিয়াই যাইব।'

হুকুম হইল, 'ফিরিয়া চল।' পালের ব্যবস্থা বদল করা হইল। কি ভাবে বদল করা হইল, তাহা দেখিতেই আমি মত্ত ছিলাম। ততক্ষণে আমাদের জাহাজ ধক্কা পর্যন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। এতটা দূর যাইতে এক ঘণ্টা লাগিয়াছিল। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পাঁচ মিনিটও লাগিল না। বাড়ি ফিরিবার সময় শুধু টাঙ্গার ঘোড়াই তাড়াতাডি করে না।

আমরা যেমন গিয়াছিলাম, তেমনই খালি হাতে ফিরিলাম। শুষ্ক মুখে বাড়ি আসিলাম, যেন কি একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া আসিয়াছি। সহপাঠীদের জানিতেই দিলাম না যে আমরা দেওগড যাইবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম।

ইহার পর প্রায় পাঁচ বৎসর আমি কারোয়ারে ছিলাম। কিন্তু আর কখনও দেওগড়ে যাওয়ার চেষ্টা করি নাই। সূর্যাস্তের সময় দেওগডের আলো দেখিয়া আমি মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতাম, ঐ পরীর দেশে কি আছে ? চল্লিশ বৎসর পরে, অর্থাৎ আজ হইতে দশ বৎসর পূর্বে, পুনরায় একবার কারোয়ারে গিয়াছিলাম ; তখনও দেওগড় যাওয়া হয় নাই।

এবার স্থির করিয়াই গিয়াছিলাম যে দেওগড় না দেখিয়া ফিরিব না। সেখানকার বন্ধুদের বলিয়া দিয়াছিলাম যে দেওগড়ের জন্য একটা দিন যেন অবশ্য রাখেন।

দেওগড়ে দেখিবার মত তো এমন কিছু নাই। কিন্তু ছাপ্পান্ন বৎসরের শৈশবের সংকল্প দেওগড়ের সঙ্গে আবদ্ধ ছিল। সেই পাশমোচনের প্রয়োজন ছিল।

দেওগড় কারোয়ারের তীর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে; সমুদ্র হইতে উত্থিত এই দ্বীপ। কারোয়ার বন্দরের ইহা সব চেয়ে বড় শোভা। সমুদ্রের স্রোত হইতে পাহাড় ২১০ ফুট উঁচু, আর তাহার দীপস্তম্ভ ৭২ ফুট উঁচু।

মদ্যপান নিষেধের জন্য কাস্টম্‌সের লোকদের সমুদ্র পাহারা দিতে হয়। সেজন্য তাহাদের কাছে একটা স্টীমলঞ্চ থাকে। তাহাতে করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমাদের এই ভ্রমণ ব্যাপার যাহাতে অন্যান্য কর্তব্যের প্রতিবন্ধক না হয়, সেজন্য আমরা ভোরে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বন্দরে আসিলাম। ভোরের প্রার্থনা ও জলযোগ ঘরে সারিয়া আসিব, এমন বেরসিক আমরা ছিলাম না। খালাসীরা একটু দেরি করিয়া আসিল, তাই ঘোড়ার মত আমাদের স্টীমলঞ্চ চলিতেছিল, তাহার তালে তালে চলিতেছিল আমাদের প্রার্থনা, সে প্রার্থনা শুনিবার জন্য কারোয়ারের পাহাড়ের পিছন হইতে সূর্যনারায়ণও আসিয়া পৌঁছিলেন। সূর্যনারায়ণকে জন্ম দিয়া কৃতার্থ প্রাচী কতখানি উৎফুল্ল হইয়াছিল! প্রাচীর প্রসন্নতায় সমুদ্রের জলও আলোকিত হইয়া ঢেউগুলির সঙ্গে আসিয়াছিল। আমি মাটির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম; ডান দিকে কারোয়ারের বন্দর ছোট-বড় নৌকাগুলিকে জাগাইয়া দিয়া খেলিতেছিল। তাহার নিকটের পাড়ে নারিকেল গাছ পবনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। শনিবারের তোপ, যাহা আজকাল আর দাগা হয় না, ধ্বজদণ্ডের উপর হইতে মুখ হাঁ করিয়া বৃথা ভয় দেখাইত। তাহার পরে পুষ্করিণীর ধারের গাছ কারোয়ারের বিস্তার মাপিতে মাপিতে কালী নদী পর্যন্ত ছড়াইয়া ছিল। মহাভারতের যুদ্ধে রাজারা যেমন বিশ্বরূপের মুখে ছুটিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনই তিন চারিটি জাহাজ কালী নদীর মুখে ঢুকিতেছিল। আর সদাশিবগড়ের পাহাড় সহজভাবে ভ্রুকুটি করিয়া সমস্ত অঞ্চল রক্ষা করিতেছিল।

প্রার্থনা শেষ হইলে আমাদের স্টীমলঞ্চ সমুদ্রের উপরে যে রাস্তা আঁকিয়াছিল আর তাহার উপর যে ডিজাইন দ্রুত অদৃশ্য হইতেছিল, তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। সেই ডিজাইনে মুক্তবেণীর প্রত্যেক উল্লাস সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

'তোমাকে দেওগড় না দেখাইয়া ছাড়িব না,' এরূপ সংকল্প করিয়া, খুঁটিনাটি ব্যবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ভাই পদ্মনাথ কামাত আমাকে দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের নীচে প্রসারিত চন্দ্রভাগার তীর দেখাইল। এক সময়ে ইউরোপীয় মেয়েরা সেখানে স্নান করিত। তাই উহার নাম হইয়া গিয়াছিল Ladies Beach, বা মেয়েদের ঘাট।

গোয়ার সংস্কৃতিতে ওতপ্রোত কবি বোরকরও আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। আমাদের আনন্দবর্ধনের জন্য কামাত ভাই চিত্রশিল্পী শ্রীরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। রমানন্দের পিতাও বড় বড় অতিথিদের নিকট সমুচিত নম্রতা অবলম্বন করিয়া প্রকৃত আত্মবিলোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্র মধ্যে আসিয়াই পাহাড়, মেঘ, সূর্য, পক্ষী, জাহাজের পাল, সমুদ্রের ঢেউ—ইহাদের প্রভাবে তাঁহার শিল্পী আত্মা আমাদের স্থূলভাব ভুলিয়া গিয়া বহুদিনের ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকের মত চারিদিকের কাব্যসুধা অনিমেষ দৃষ্টিতে পান করিতে লাগিল। আমরা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাঁহার দিকে অন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। কিন্তু তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল না। শুধু শিশু কুন্দের চঞ্চল দৃষ্টি সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আমাদের কবি তো শাস্ত্রীয় ভক্তির বশে আমাদের প্রার্থনা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রার্থনা শেষ হওয়া মাত্র তিনি সাগরের লহরী সম্বন্ধে নাবিকদের এক গান আরম্ভ করিলেন। গানের ঢং নাবিকদের মত হউক, তাঁহার অন্তরের ভাব কিন্তু নাবিকদের মত ছিল না। ঐ গীত দিয়া ভালোমানুষ খালাসী তাহার মনের কথা বলিত না। কিন্তু কাব্যের উন্মাদে কবি তাঁহার অভিজাত ভাবনার ফোয়ারা খুলিয়া দিলেন। একথা সত্য যে সেদিন আমাদের দলে কেহই প্রকৃতিস্থ ছিল না। হিন্দু স্কুলের আচার্য শ্রীযুক্ত কুলকর্ণীও আনন্দে মগ্ন ছিলেন। কল্যাণীয়া সরোজ তো তাহার আসন ছাড়িয়া বয়লারের আগে গিয়া দাঁড়ানোই পছন্দ করিল। তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়া সে অগ্রগামিত্ব বা নেতৃত্ব স্বীকার করিল দেখিয়া আমার আনন্দ

হইল। আমি তাহাকে মঞ্চুর সরোবরে কাব্যপানরত নারায়ণ মালকানির কথা মনে করাইয়া দিলাম। এতদূর তুলনার ইঙ্গিত করিয়াই আমরা দুইজন প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করিতে পারিলাম।

সমুদ্রের জলের উপর দিয়া যাওয়া-আসার অনেক প্রকার আছে। প্রত্যেক প্রকারে পৃথক পৃথক রস। ঢেউয়ের আঘাত খাইতে খাইতে বাহুবলে সাঁতার দিতে দিতে ভিতরে অনেকখানি চলিয়া যাওয়ার মধ্যে এক প্রকারের আনন্দ আছে। বুকের নীচে ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে, তাহার উপরে চড়িবার আনন্দ যে একবার উপভোগ করিয়াছে, সে তাহা কখনও ভুলিতে পারে না। নদীর জলের মত সমুদ্রের জল আমাদের ডুবাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে না। সমুদ্রের জল যদি কাহাকেও গ্রহণ করে তবে তাহা নিরুপায় হইয়াই করে। না হইলে তাহার চেষ্টা সর্বদাই থাকে সন্তরণকারীকে সন্তরণ করিতে দেওয়ার জন্য।

সরু ও লম্বা নৌকায় বসিয়া একই সঙ্গে প্রত্যেক ঢেউয়ের সামনে ওঠা-নামায় এক পৃথক আনন্দ আছে। দুইটি ঢেউয়ের মাঝে নৌকা বেঁকা হইয়া গেলেই বিপদ। যদি এইটুকু সামলাইয়া লওয়া যায়, তবে সমুদ্রের আনন্দের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় পাওয়া কঠিন।

বড় নৌকায় দুই দুইজন একত্র বসিয়া দাঁড় ফেলার আনন্দ হইল এই আনন্দের তৃতীয় প্রকার। মৌন অবলম্বন করিয়া এ আনন্দ আমরা ভোগ করিতে পারি না। তালের নেশা এতই পাইয়া বসে যে হঠাৎ গান বাহির হইয়া পড়ে।

স্টীমলঞ্চে বসিবার আনন্দ এই তিনের অপেক্ষা কিছু কম। কারণ উহা চালাইতে মানুষের বাহুবল একেবারেই ব্যয় হয় না। নিয়ন্ত্রণ চক্র হাতে ধরিয়া থাকিতে হয়, হাতেরই পরিশ্রম। স্টীমলঞ্চে পৌরুষের অবকাশ ঐটুকুই। কিন্তু স্টীমলঞ্চে জলরাশি বিদীর্ণ করিয়া যাওয়ার আনন্দ সমস্ত শরীরে অনুভব করা যায়। স্টীমলঞ্চ যখন সোজা ছোটে, তখন তাহার গতি আমাদের শিরায় শিরায় অনুভব করি। মোটর চালাইবার আনন্দ হইতে স্টীমলঞ্চ চালাইবার আনন্দ অনেক গুণ বেশি।

এই আনন্দ ভোগ করিতে করিতে ও সমুদ্রের জল এখানে কত গভীর এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা দেওগড় যাত্রা করিলাম। আমার একটা কথা

মনে হইল, যে জলভাগ সবচেয়ে নীচে তাহা কি উপরের জলের ভারে দলিত হয় না? উপরের জলের চেয়ে নীচের জল বেশি গভীর ও ঘন হওয়ার কথা। অনেক মাছ সেই গভীর জল ভেদ করিয়া হয়তো নীচে নামিতেই পারে না। ওপারে সরোবরে যদি আমরা পড়িয়া যাই, তাহা হইলে তো কাঠের টুকরার মত উহার উপরেই সাঁতরাইতে থাকিব। কোনও কোনোও মাছেরও নীচের গভীর জলে এই অবস্থাই হইতে থাকিবে।

যতই দেওগড়ের দ্বীপের নিকটে আসিতে থাকিলাম, ততই আশপাশের ছোট ছোট দ্বীপ ও পাথর স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। আকাশ ও সমুদ্র যেখানে মিশিয়াছে, সেই দিগ্‌বলয় রেখাও আজ স্পষ্ট ছিল। কেহ যেন সূচ দিয়া দেখাইতেছিল যে এখানে পৃথিবী শেষ হইয়াছে ও স্বর্গ শুরু হইয়াছে।

দুইটি নৌকা পালে বাতাস ভরিয়া পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। পালের মধ্যে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌গত সূর্যের কিরণ প্রবেশ করিয়াছিল। মনে হইতেছিল, ইহার ভারে পাল বুঝি ফাটিয়া যাইবে। পাল এতই ঝকমক করিতেছিল যে উহা রেশমের না হাতির দাঁতের, তাহা স্থির করা কঠিন ছিল। বাতাস যখন পালে প্রবেশ করিত, তখন কলাপাতার ডিজাইন উহাতে বেশ মানাইত।

এতক্ষণে আমরা একেবারে দেওগড়ের নিকটে আসিয়া গিয়াছি। সমস্ত পাহাড়ের চূড়া ছোট বড় গাছে ঢাকা ছিল। উপরের আলোকস্তম্ভ তাহার দরজা সামলাইয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছিল। স্টীমলঞ্চের পক্ষে এখন আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যে সামান্য এবং সংকটময় দূরত্ব অবশিষ্ট ছিল, তাহা পার হইবার জন্য আমাদের স্টীমলঞ্চের সঙ্গে এক ছোট ডিঙ্গী নৌকা বাঁধা ছিল। সেই ছোট নৌকা করিয়া আমরা নামিলাম ও দ্বীপের ধারে গিয়া পৌছিলাম। নামিতেই লাল পাকা ফল আমাদের অভ্যর্থনা করিল। আমরা উপরে উঠিবার সময় বড় বড় বৃক্ষের শাখা ও বটগাছের মূল দেখিতে দেখিতে দীপস্তম্ভের তলদেশ পর্যন্ত গিয়া পৌছিলাম। দীপস্তম্ভের দীপ জ্বালাইবার ভার ছিল একজন মুসলমান ভদ্রলোকের উপর। তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আলোকস্তম্ভ আছে বলিয়া দ্বীপে কিছু কিছু লোক বাস করিত। তাহাদের জন্য কিছু কিছু ছাগল ও মুরগিও থাকিত। (সময় সময় তাহাদের অশাস্ত্রীয় ভাবেও মৃত্যু হইত।) সমুদ্রের তীর হইতে উড়িতে উড়িতে

আসিয়া যাহারা এখানকার গাছে বিশ্রাম করে এবং প্রকৃতির কাব্যের নির্ঝর উৎসারিত করে, এমন সব পক্ষী তো মুনিঋষির মতই পবিত্র বলিয়া মনে করা উচিত।

স্টীমলঞ্চে বসিয়া আমরা সকলে পরমাত্মার উপাসনা করিলাম, তাহার পর এখানে এক প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া সকলে উদরের উপাসনা করিলাম। চারিদিকের শোভা ভাল করিয়া দেখিবার পর দীপস্তম্ভের উদরস্থ হইয়া উপরে গেলাম।

দীপগুলির মধ্য হইতে 'বিশ্বতো' বহির্গত কিরণগুলির সৌন্দর্য হইতে ফিরিয়া জলের উপর সমান্তরালে তাহার বড় প্রবাহ চালাইবার জন্য নানা প্রকারের বেলোয়ারি কাঁচে তৈরী দুই ঢাল সর্বপ্রথম দেখিলাম। প্যারাবোলা ও হাইপারবোলার অঙ্ক উহাতে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো হইয়াছে। শংকুচ্ছেদ বা 'কনিক সেক্‌শনের' রহস্য যিনি জানেন, তিনি এ রহস্যও বুঝিতে পারিবেন। তাহার পর এই আলোর পরদার একদিক ঘেঁসিয়া আমরা সুদূর পর্যন্ত সমুদ্রের শোভা দেখিলাম, এবং তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া আলোর আশপাশের গ্যালারিতে গিয়া দশ দিক দেখিতে লাগিলাম।

ছাপ্পান্ন বৎসর ধরিয়া যে দৃশ্য দেখিবার ইচ্ছা আমি মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম, আজ তাহা দেখিলাম। চোখ ভরিয়া দেখিলাম, তৃপ্তি হইল। মনে হইতেছিল, সারা দ্বীপটা যেন একটা বড় জাহাজ। আলোকস্তম্ভ তাহার মাস্তুল, আমরা তাহার উপর চড়িয়া চার দিক পাহারা দেওয়ার খালাসি। সত্য বটে যে জাহাজের মাস্তুলের মতো এই আলোকস্তম্ভ হেলে দোলে না। তথাপি সদ্য সদ্য স্টীমলঞ্চে চড়িয়া বেড়াইতে আসিয়াছি, আমাদের কৃতজ্ঞ মন এই ত্রুটি দূর করিয়া ফেলিয়াছিল।

এতখানি উঁচু হইতে চার দিকে তাকাইলে এক অনুপম আনন্দ বোধ হয়। কুতব মিনারের উপর হইতে ভারতবর্ষের অনেক রাজধানীর শ্মশান দেখিলে মনে যে বিষাদের সৃষ্টি হয়, তাহা এখানে হয় না। এখান হইতে যে সমুদ্র দেখা যায়, তাহাতে প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত অনেক জাহাজ ডুবিয়া গিয়া থাকিবে, কিন্তু এখানকার বাতাবরণে তাহার কোনও চিহ্নই দেখা যায় না। সমুদ্রের মধ্যে ভূত ও ভবিষ্যতের স্থানই নাই। সেখানে বর্তমানকাল ও সনাতন অনন্তকাল, এই দুইয়েরই সাম্রাজ্য। যখন ঝড় ওঠে, তখন মনে

হয়, ইহাই বুঝি সমুদ্রের স্থায়ী ও সত্য রূপ। আর যখন আজকার মত সর্বত্র শান্তি বিরাজ করে, তখন মনে হয়, ঝড় বুঝি মায়া। সত্যই সমুদ্রের মুখ ভগবান বুদ্ধের শান্তি ও তাঁহার উপশম প্রকাশ করিবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে।

এত বড় সমুদ্রকে আশীর্বাদ দিবার শক্তি পিতামহ আকাশের মধ্যেই থাকিতে পারে। আকাশ প্রশান্তচিত্তে চারদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল আর সমুদ্রের উপরিভাগ রক্ষা করিবার জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল। ঢাকনার উপর কোনও ডিজাইন ছিল না; পাখিরা তাহা সহ্য করিতেই পারিত না। তাই তাহারা উহার উপর নানা প্রকার রেখা টানিবার সাময়িক চেষ্টা করিত। শিশু যেমন কোনও গম্ভীর ব্যক্তিকে হাসাইবার জন্য তাহার সম্মুখে ভয়ে ভয়ে অল্প কিছু হাসাইবার চেষ্টা করিয়া দেখে, সমুদ্রের নীল রংও তেমনি আকাশের নীলিমাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

ভগবানের এইরূপ বিরাট্ দর্শন হইলেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায় মনে পড়া চাই, কিন্তু এত প্রাচীনকালে যাওয়ার পূর্বে উত্তেজিত চিত্ত বিনোদনের জন্য নিকটেরই এক প্রসঙ্গের উল্লেখ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিলাম। কুড়ি বৎসর পূর্বে লঙ্কার দক্ষিণ প্রান্তে দেবেন্দ্রেরও আগে মাতারায় গিয়াছিলাম, তখন সেখানকার আলোকস্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ঠিক এমনই, বরং ইহার অপেক্ষা অনেকগুণ, বিশাল দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। সেখানে দৃষ্টিরেখাকে ধনুক করিয়া মানুষ যতটা চায় ততটা বড় বর্তুল বা গোলক টানিতে পারে। সেই বর্তুলের দক্ষিণার্ধ ভারত মহাসাগরে, আর উত্তরার্ধ নারিকেল পাতার ঢেউয়ে প্লাবিত ও দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে আলোকিত বনসাগরকে অর্পণ করা হইয়াছিল। এখানে দেওগড়ের উপর হইতে পূর্বদিকে সূর্যনারায়ণের পাদপীঠের মত বিরাজমান পর্বত দেখা যাইতেছিল। তাহার নীচে প্রসারিত কারোয়ারের সমুদ্র শান্তিতে উদ্ভাসিত ছিল। তাহার উপরের নৌকার ডিজাইন একেবারেই হালকা ধরণের ছিল। পশ্চিমদিকে তো ছিল এক অখণ্ড মহাসাগর, তাহা আরবদেশের কথা মনে করাইয়া দিত। দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

'নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্বঃ'—এই কয়টি শব্দমাত্র মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

* * *

ইহারই মধ্যে আমাদের লাজুক চিত্রকর এক কোণে বসিয়া নিকটের এক বড় প্রস্তরখণ্ড ও আশপাশের সমুদ্রের এক ছবি আঁকিয়াছেন। বাড়ী আসিতেই তিনি আমাকে উহা উপহার দিলেন। আজ আমার ছাপ্পান্ন বৎসরের ক্ষুধা তৃপ্ত হইল, ইহার স্মারক হিসাবে আমি উহা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিলাম।

অবশেষে আলোকস্তম্ভের কাব্য পূর্ণাঙ্গ হইল।

মে ১৯৫৭

৫৮

মরুস্থল, না সরোবর ?

কোনও ঘটনা নিয়ত হয় বলিয়াই কি তাহার অদ্ভুতভাব দূর হইয়া যায় ?

ছয় ঘণ্টা পূর্বে এক ফোঁটা জল কোথাও নজরে আসে নাই। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সোজাসুজি সমুদ্রতীর প্রসারিত হইয়া আছে। পশ্চিম দিকে যেখানে আকাশ নত হইয়া পৃথিবীকে ছুঁইয়াছে সেই পর্যন্ত—দিগ্‌বলয় পর্যন্ত —জলের চিহ্নটুকু নাই, একটা ঢেউও দেখা যায় না। প্রথমবার দেখিলে মনে হইবে, উহা বুঝি একটা মরুভূমি, বর্ষায় একটু ভিজিয়া গিয়াছে। অথবা মনে হইবে, উহা বুঝি একটা জলা, শুধু উপরে ঘাস জন্মায় নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর সোজা সমতল ভূমি দেখিয়া কত আনন্দ বোধ হয়। এরূপ সমতল ভূমি প্রস্তুত করিবার কাজ কোনও ইঞ্জিনীয়রকে দিলে তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। কিন্তু ইহা যে প্রকৃতির কারিগরি। উঁচু পাহাড়ের সৌন্দর্য সমবিস্তৃত* প্রদেশের বিশালতা বা বিস্তারের উপর নির্ভর করে। এই বিশাল সৌন্দর্যসুধা পানে মগ্ন ছিলাম, এমন সময়ে দূরে দিগ্‌বলয়ে জাহাজের মত একটা কিছু দেখা গেল। মাটিতে জাহাজ? সে কী! ততক্ষণে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত প্রসারিত এক ধূসর রেখা গম্ভীর হইতে লাগিল।

* সম-তত=সমানভাবে প্রসারিত; যেমন গঙ্গার মোহানার কাছে সুন্দরবন অঞ্চলকে সমতত বলা হয়।

মাঝে মাঝে তাহার উপর সাদা সাদা ঢেউ দেখা দিতে লাগিল। জলের ব্যূহ হইল। সেনাপতির আদেশমত 'এক সারিতে' ঢেউগুলি অগ্রসর হইতে লাগিল। আসিল, আসিল, জল আগে আসিতেছে! আধ ঘণ্টার মধ্যে সে জল সর্বত্র ছড়াইয়া গেল! সূর্য আকাশে উঠিতেছে, রোদ চড়িতেছে, ঢেউয়ের পাগলামিও বাড়িতেছে। ঢেউগুলি কি ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া কোনও অসাধারণ কার্য করিবার জন্য চলিয়া আসিতেছে? ইহাদের দেখিয়া যমদূত বলিয়া মনে হইতেছে না, দেবদূত বলিয়াই মনে হইতেছে। জঙ্গলে যেমন ভেড়ার পাল লাফাইতে লাফাইতে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া যায়, ঢেউয়ের দল তেমনই অগ্রসর হইতেছিল। যেখানে ছিল নীরব আর্দ্র মরুভূমি, সেখানে প্রসারিত হইল উচ্ছল গর্জনশীল ঢেউয়ের সাগর। জোয়ার আসিয়াছে পূর্ণ-মাত্রায়। ঢেউগুলি আসিয়া কিনারে আঘাত করিতেছে। একটু লক্ষ্য করিয়া তাহাদের দিকে এক আধ ঘণ্টা দেখিতে থাকুন, অবিলম্বে মনে হইবে, ঢেউগুলি জড় নয়, সচেতন। তাহাদেরও স্বভাবধর্ম আছে। চার দিকে দেখা যাইতেছে জল আর জল। বাঁ দিকে তাল গাছ জলে দুলিতেছে—মনে হইতেছিল, বুঝি এখনই ডুবিয়া যাইবে। দীর্ঘকাল পরে বোনপো দেখা করিতে আসিতেছে দেখিয়া সমুদ্রের মাসী বেলাভূমি স্নেহে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। ঢেউগুলির মত্ততার তো হ্রাসই হয় না। তাহারা হাতির মত ছুটিতেছে, তীরে আসিয়া বপ্রক্রীড়ায় আনন্দ করিতেছে। কী আশ্চর্য দৃশ্য! জমি ঢালু হইলে, নীচু হইলে, আর জল নদীর মত বহিতে থাকিলে কিছুই আশ্চর্য বলিয়া মনে হইত না। জলের নিম্নগামী হওয়া তো স্বভাব। কিন্তু সমতল ভূমিতে, যেখানে জল ছিল না সেখানে বর্ষা বা বন্যা না হইলেও জল ছুটিতে ছুটিতে আসে আর মাটির উপর ছড়াইয়া পড়ে, এ কত আশ্চর্য ব্যাপার! যেখানে আমরা এইমাত্র দৌড়াইতে বা বেড়াইতে ছিলাম, সেখানে পা ফেলিতে পারা যাইবে না, এমন জলময় অবস্থা কি করিয়া হইল? এত অল্প সময়ে এত বিপর্যয়! যেখানে আমরা হাওয়ায় হাত নাড়িতে নাড়িতে বেড়াইতে ছিলাম, সেখানে এখন উচ্ছল তরঙ্গে হাত দিয়া জল কাটিতে কাটিতে সাঁতার দিবার আনন্দ লাভ করিতেছি—মনে হয় যেন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। এই জোয়ারের সময় যদি কেহ আসিয়া দেখেন তবে তাঁহার মনে হইবে যেন লবণজলের এই উত্তাল সরোবর হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া

এইভাবেই এখানে পড়িয়া আছে। কিন্তু অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া কষ্টটুকু স্বীকার করিলে মনে হইবে যে একটা বড় মহাযুদ্ধের মত এই আক্রমণেরও শেষ আছে। ঢেউগুলি এতক্ষণ তাহাদের লীলা বিলাস দেখাইল, এখন তাহা সংযত করিবার সময় হইল, ঈশ্বরের কাজ বুঝি শেষ হইয়া আসিল। তিনি তাঁহার প্রাণশক্তি বুঝি সংবরণ করিলেন। এখন এক একটা ঢেউ তীরের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, আবার পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে জল পিছনে হটিয়া যাইতেছে।

আরম্ভ হইয়া গেল ; জল পিছনে হটিয়া চলিতেছে। সমুদ্রের পরপারে কি বড় গর্ত আছে, যাহা ভরিয়া ফেলিবার জন্য এই সমস্ত জল ছুটিয়া চলিয়াছে? সম্মুখের ঢেউগুলিকে ফিরিতে দেখিয়া পরের ঢেউগুলি মধ্যপথেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে, আর ছুটিতে ছুটিতেই হাসিয়া ওঠে। সমুদ্রের জলের পরিমাণ কে জানে, কে অনুমান করিতে পারে? কি করিয়া তাহার পরিমাপ করে? এত জল আসেই বা কেন, চলিয়াই বা যায় কেন? উহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কি কেহ নাই? অথবা জিজ্ঞাসা করিবার কেহ আছে বলিয়াই উহা এত নিয়মিত ভাবে আসে আর যায়? যতই ভাবি ততই এই ঘটনার অদ্ভুত রূপ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। জোয়ার আর ভাটা কি বস্তু? সমুদ্রের শ্বাস-প্রশ্বাস? তাহাদের উপযোগিতাই বা কি? জোয়ার ভাটা না থাকিলে সমুদ্রের অবস্থা কিরূপ হইত? সমুদ্রচর প্রাণীদের জীবনে কি কি পরিবর্তন হইত? চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণ ও পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে সাগরকে পৃথক করা ইত্যাদি উল্লেখ করা তো যায়; কিন্তু ইহাদের পিছনে উদ্দেশ্য কি, তাহা জানিবার জন্য মন বেশি উদ্‌গ্রীব। এই কৌতূহল আজও তৃপ্ত হয় নাই।

যতবার জোয়ার-ভাটা দেখি ততবারই উহা সমান অদ্ভুত লাগে। আর একথায় দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে ভগবানের সৃষ্টিতে চারদিকে সেই জ্ঞানময় প্রভু সনাতন রূপে বিরাজ করিতেছেন।

'সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ' বলিয়া হৃদয় তাঁহাকে প্রণাম করে। সৃষ্টি যদি মহান হয় তবে তাহার স্রষ্টা বিভু কিরূপ হইবেন? তাঁহাকে চিনিবে কে? কে তাঁহাকে চিনিল, সে কথা কি তিনি গ্রাহ্য করিবেন?

বোরডী, ১ মে, ১৯২৭

৫৯

চাঁদিপুর

আমার ভয় ছিল যে সেবার চাঁদিপুরে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহা এবার আর দেখিতে পাইব না। তাই, বিশেষ আশা করিব না বলিয়া মনকে বুঝাইয়া চাঁদিপুর যাত্রা করিলাম। তবে চাঁদিপুর তো চাঁদিপুরই—তাহার সামান্য শোভাও অসামান্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে কটক যাইবার পথে বালেশ্বর নামে এক শহর আছে। চাঁদিপুর সেখান হইতে আট মাইল পূর্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। সরকারের সৈন্যবিভাগ জায়গাটিকে কিছুটা কাজে লাগাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ইহার মহত্ত্ব বাড়ে নাই। এখান হইতে তিন মাইল দূরে, যেখানে বুড়া-বালং নদী সমুদ্রে আসিয়া মেশে সেখানে একটা সুন্দর বন্দর নির্মাণ করিতে পারা যায়। হাওয়া খাওয়ার সুন্দর স্থলও সেখানে হইতে পারে। কিন্তু এ পর্যন্ত এমন কিছু হইতে পারে নাই। আজ চাঁদিপুরের মহত্ত্ব তাহার চিরন্তন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই। তাই আমি উহাকে নাম দিয়াছি পূর্বাঞ্চলের 'বোরডী'।

বোম্বাইয়ের উত্তরে ঘোলবড় স্টেশন হইতে দেড মাইল দূরে বোরডী নামে এক স্থান আছে। সমুদ্র সেখানে যখন ভাটার সময় পিছনে সরিয়া যায়, তখন দেড় মাইল কি দুই মাইল ব্যাপিয়া তটভাগ খোলা রাখিয়া চলিয়া যায়, আর তাহার জল প্রায় ভূবলয়ের নিকটে গিয়া পৌঁছায়। সমস্ত সমুদ্রতট যেন দেবদানবের ভিজা টেনিসকোর্ট, স্থানটি এতই সমতল বলিয়া মনে হয়। কোথাও বাঁকাচোরা কিছু নাই। আর যখন জোয়ারের সময় জল বাড়িতে থাকে, তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত তট জলে ভরিয়া যায়, সরোবরের মত ছল ছল করিতে থাকে। এই মুহূর্তে সিক্ত মরুভূমি, পরমুহূর্তে চঞ্চল সরোবর। প্রকৃতির এই লীলা দেখিয়া আমার বিস্ময় লাগিতেছিল। আমি যখন তাহার বর্ণনা লিখিতেছিলাম তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে প্রকৃতি ঠিক এই প্রকারের আর একটি স্থান পূর্বাঞ্চলেও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

রাষ্ট্রভাষা প্রচারকের রূপে আমি যখন ইতিপূর্বে কলিকাতা হইতে উৎকল আসি, তখন বালেশ্বরের কাজ শেষ করিয়া বিশেষ করিয়া চাঁদিপুর দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছিলাম। পথে স্থানে স্থানে জলাশয়ে উদ্ভিন্ন নীলকমল দেখিয়া আমার আনন্দ আর ধরে না। কমল হইল প্রসন্নতার প্রতীক। সৌন্দর্য, কোমলতা, নবীনতা ও পবিত্রতা একত্র হইলে তবে তাহা কমলের রূপ ধারণ করে। কমল শ্বেতবর্ণ হইলে তাহা তপস্বিনী মহাশ্বেতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রক্তবর্ণ হইলে গন্ধর্ব নগরীর রাজসিংহাসনে আসীনা কাদম্বরীর শোভা প্রদর্শন করে। কিন্তু নীলকমল তো সাক্ষাৎ কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণেরই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত আমাদের দেশে নীলকমল বেশি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া আমার ঐরূপ মনে হয়। কিন্তু এই পথে নীলকমল দেখিয়া আমার মনে আনন্দের আর সীমা রহিল না, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বালেশ্বর হইতে চাঁদিপুরের পথ প্রায় সরল রেখা ধরিয়া চলিয়াছে। তটদেশের নিকটে ডাকবাংলোর দরজা পর্যন্ত পৌঁছিলেও সমুদ্র দর্শন হয় না। কিন্তু যখন হয়, তখন তাহার বিশালতা মনোহরণ করে। গতবার যখন যাই তখন জোয়ার ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল, আর ছোট ছোট ঢেউগুলি ভূ-বলয়ের সঙ্গে সমান্তর রেখায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। ভূবলয় হইতে তীরে আসিবার সময় ছোট ছোট ঢেউগুলি এত সোজা ও সমান্তর ভাবে আসিতেছিল যে মনে হইতেছিল, কেহ বুঝি লম্বা টানা দড়ি টানিয়া আগে লইয়া চলিয়াছে। আমার সঙ্গে যদি কোনও ছাত্র থাকিত তাহা হইলে আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিতাম যে নোটবুকে যে সব রেখা টানা হয় সেগুলি এরূপ সুন্দর ও সমান্তর করিয়া টানিতে হয়। মাটি সকল প্রকারে সমতল হইলে ইংরেজ লেখক তাহাকে টেনিসকোর্টের সহিত তুলনা করে। কিন্তু কোথায় টেনিসকোর্ট, আর কোথায় মাইলের পর মাইল জুড়িয়া লম্বা চওড়া সিকতাভূমি!

সারা দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম। মন তৃপ্ত হইলেও দেখিলাম। সামনে হইতে দেখিলাম, পাশ হইতেও দেখিলাম। আমরা কত পুণ্যবান্, এই কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখিলাম। তখন মনে হইল, এখন ইহাকে কি করিতে হইবে? ইহার বিষয়ে তো লিখিতে হইবেই। রাজা যখন রত্নলাভ করেন তখন তিনি তো উহা নিজের খাজনাখানায় পৌঁছিয়া দেনই। রমণীর হাতে

যখন ফুল আসে তখন কেশপাশে সে ফুল না দেওয়া পর্যন্ত তাহার মন সন্তুষ্ট হয় না। প্রকৃতির উপাসক লেখকের যখন কোনও দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিবার সুযোগ হয় তখন সে তাহা লেখায় বা কবিতায় রূপায়িত না করা পর্যন্ত শান্ত হয় না। কিন্তু তাহা তো বাড়ি ফিরিয়া যাওয়ার পরই সম্ভব। এখন এখানে কি করিতে হইবে? প্রকৃতির বিস্তার প্রশস্তই হউক আর উঁচাই হউক, তাহার আস্বাদ শুধু চোখে করা যায় না, পা দুটিকেও তাহার ভাগ দিতে হয়।

ডাকবাংলোর উঁচু জায়গা হইতে বালু পায়ের নীচে সরিয়া যাইতেছিল ও হাসিতেছিল, তাহার উপর দিয়া আমরা দৌড়াইতে দৌড়াইতে নীচে নামিলাম। এতক্ষণে এদিকে ওদিকে দৌড়াইতেছে ও পৃথিবীর ভিতরে লুপ্ত হইতেছে এমন বড় বড় 'মাণিক' দেখিলাম। তাহাদের লাল জমকালো তরল বর্ণ কী সুন্দর ছিল! মখমলে যেমন ফিকা ও গভীর লাল রং হয়, দীপ্তির জন্য মাণিকের মধ্যেও তেমনই দেখায়। এই সকল ধাবমান রত্নের মধ্যেও আমরা এইরূপ লাবণ্য দেখিতে পাইলাম। এই সব কাঁকড়া যেমন মনোহর তেমনই ভীষণ। ভয় হইতেছিল, বুঝি আসিয়া কোথাও কামড়াইবে, আর উহাদের মতই লাল রক্ত পা হইতে বাহির হইতে থাকিবে। কিন্তু তাহারা যতই ভয় জাগাইত, নিজেরাও ততই ভীরু ছিল। মানুষ দেখিলে অমনই নিজের নিজের গর্তে গিয়া লুকাইত। আমরা উহাদের পিছনে পিছনে দৌড়াইলাম ও উহাদের ছুটাছুটি দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমরা ছোট বড় বাটির মত ছোট বড় শামুক দেখিলাম। উহাদের উপরের আকার দেখিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিল যে উহাদের দেখিয়াই এখানকার মন্দিরের কলস তৈয়ার করা হইয়া থাকিবে। সুপারি অপেক্ষা এই আকার কলার দৃষ্টিতে অনেক বেশি সুন্দর।

কল্যাণীয়া মদালসা এমন কয়েকটা শামুক বাছিয়া লইল। তাহাদের চারদিক শক্ত হওয়ায় তাহা দিয়া মালা তৈরী করিবার কল্পনা সহজে মাথায় আসিতেছিল।

সমুদ্রতট, সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউগুলি, লাল কাঁকড়া আর এই সব শামুক, ইহাদের কথা বলিতে বলিতে আমরা ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু নীলকমলও লইয়া আসিলাম, ভারত ভ্রমণে আরও যেন এক মূল্যবান সম্পত্তি লাভ হইয়াছে এরূপ সন্তোষের সঙ্গে বাড়ি ফিরিলাম।

এবার যখন পুনরায় বালেশ্বরে আসিলাম, তখন এই সমস্ত দৃশ্য প্রত্যক্ষ স্মরণ পথে আসিল, আর তাহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্য পুনরায় চাঁদিপুর আসিবার কার্যক্রম স্থির করিলাম।

আকাশের চারিদিকে মেঘ। তথাপি আশা ছিল, চাঁদিপুর পৌছিয়া জল হইতে উদীয়মান সূর্য দর্শন করিব। সুতরাং রাত সাড়ে তিনটায় উঠিয়া নিত্যকর্ম শেষ করিলাম; চারটায় ডাঃ ভুবনচন্দ্রের মোটরগাড়ি চাহিয়া পাঠাইলাম, এবং আট মাইল মোটরগাড়িতে চলিয়া আসিলাম। পথে না ছিল গর্ত, না ছিল শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর সঙ্গে উপমার যোগ্য নীলকমল। আমার প্রায় এই বিশ্বাস ছিল যে ঐ ছোট ছোট ঢেউগুলিও আমরা দেখিতে পাইব না। অষ্টমীর চাঁদ আকাশে ম্লান দেখাইতেছিল। তাই আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে এখানে শুধু শান্ত তরঙ্গিত সমুদ্র দেখিতে পাইব। আমাদের পরিচিত ডাকবাংলোর আঙ্গিনায় আসিয়া দেখিলাম, জল তো কখন সরিয়া গিয়াছে। দূরে বিলীয়মান জল বালুকাস্তূপ বলিয়া মনে হইতেছিল। শুধু বালুকাময় তটদেশ ক্রমেই উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। যদি কয়েক মিনিট পূর্বে পৌছাইতাম, তবে দেখিতাম যে সূর্য জলের উপর পা রাখিয়াছেন। আকাশে মেঘ ছিল, কিন্তু সূর্যের নিকটে দিগ্‌বলয় নির্মল ও সুন্দর দেখাইতেছিল। মেঘের স্তর সূর্যের শোভা বাড়াইতেছিল। সূর্যকে দেখিয়া নিত্যশ্লোক বলিবার কথাও মনে থাকিল না। আমি শুধু বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অর্ঘ্য অর্পণ করিলাম, আর দূরে সমুদ্র হইতে উত্থিত সূর্যনারায়ণকে প্রণাম করিলাম। মনে পড়িল মনুর শ্লোক—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং জাতম্‌ ইতি নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

ততক্ষণে শ্রীমান্‌ অমৃতলাল গান ধরিয়াছেন—

'প্রথম প্রভাত উদিত তব গগনে।'

নীচে বালুকার উপরে পৌছিতে আমাদের দেরি হইল না। লজ্জাশীল কাঁকড়াগুলি নিজের নিজের গর্তে ঢুকিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিল।

সমুদ্রে ফিরিয়া যাইতে যাইতে জলরাশি দূর হইতেই আমাদের ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এখানে আসিতেছ তো?' জলের নিমন্ত্রণ কি করিয়া অগ্রাহ্য করা যায়?

আমরা অগ্রসর হইলাম। মাঝে মাঝে দুই চার আঙুল গভীর জল দেখিয়া পা ভিজাইতে ভিজাইতে চলিতে থাকিলাম। কখনও সূর্য দেখিবার ইচ্ছা হইল, তখন পিছন ফিরিয়া তীরের দিকে দেখিতে প্রাণ চায়। দুই একটি সর গাছ, দুই একটি কুটির, জলবিভাগের পতাকা লাগাইবার জন্য উঁচু স্তম্ভ—আকর্ষণ করিবার ইহার বেশি কিছু সেখানে ছিল না। ইহার চেয়ে তো পায়ের তলায় জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত মেঘের শোভাই বেশি আনন্দ দিতেছিল। জল পিছনে সরিয়া যাইতেছে, তাহার মোহিনী মূর্তির পিছনে পিছনে আমরা অনেক দূরই চলিয়া যাইতাম। কিন্তু আমরা একথা ভুলি নাই যে আমাদের সম্মুখে অন্য কার্যক্রমও আছে, আর সময়ের বাজেটের বাহিরে এখানে বেশিক্ষণ স্ফূর্তি করা যায় না। তীর হইতে কত দূর আসিলাম তাহা হিসাব করিবার জন্য পা গুনিতে গুনিতে আমরা ফিরিয়া আসিলাম। এক পা ফেলিতে দুই দুই ফুট, আমরা এক হাজার পা গুণিলাম, আর দৌড়িতে দৌড়িতে মাণিকের রত্নভূমিতে পৌঁছিলাম। উপরে গিয়া দেখি, দুষ্ট জলও ধীরে ধীরে আমাদের পিছনে আসিতেছে, আর জল আসিতেছে দেখিয়া কোনও কোনও জেলে বালুর উপর বাঁশের সাহায্যে তাহাদের জাল ছড়াইয়া দিল।

পুরাণো গল্প শেষ হয় 'খাও, পিও, রাজত্ব কর' এই কথা দিয়া। আমাদের বর্ণনা বেশির ভাগ এই বলিয়া শেষ হয়—'প্রার্থনা করিলাম, পরে জলযোগ করিলাম।' সঙ্গীদের একজন বলিলেন, আজকাল এখানে যখন সৈন্যেরা তোপ দাগে, তখন ভূমিকম্পের মত সমস্ত বস্তী কাঁপিয়া ওঠে। যে প্রাণঘাতী বস্তু তৈয়ারি হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া উৎরাইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য ইহাই উপযুক্ত স্থান। শব্দ যতই প্রচণ্ড হউক, ক্রান্তি বা বিপ্লবের পর যেমন শান্তির প্রতিষ্ঠা হয় শব্দ সেই রূপে আকাশে বিলীন হইয়া যায়, আর শেষে থাকে শুধু নীরবতা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মে, ১৯৪১

সার্বভৌম জোয়ার-ভাটা

প্রতিটি ঢেউ সমুদ্রতট পর্যন্ত আসে আর ফিরিয়া যায়। ইহাও একপ্রকার জোয়ার-ভাটা। তবে ইহার প্রাণ ক্ষণিকের জন্য। বড় বড় জোয়ার-ভাটা প্রতি বারো ঘণ্টা পর পর হয়। তাহাও একপ্রকারের বড় বড় ঢেউ বলিতে হইবে। বারো ঘণ্টা জোয়ার-ভাটা যাহার ঢেউ, তাহা কি রূপ! অক্ষয়-তৃতীয়ার জোয়ার যদি বৎসরের সব চেয়ে বড় জোয়ার হয়, তাহা হইলে সব চেয়ে ছোট জোয়ার কখন আসে?

আমরা যে নিঃশ্বাস লইয়া ছাড়িয়া দিই, তাহাও একপ্রকারের জোয়ার-ভাটাই বলিতে হইবে। হৃদয়ে আলোড়ন হয়, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল করে, তাহাও একপ্রকারের জোয়ার-ভাটা বলিতে হইবে। বাল্যকাল, যৌবন ও বার্ধক্যও বড় বড় জোয়ার-ভাটা। রাষ্ট্রেরও জোয়ার-ভাটা হয়। সংস্কৃতির জোয়ার-ভাটা হয়। ধর্মভাবেরও জোয়ার-ভাটা হয়। প্রত্যেক ভাটার পর জোয়ারের প্রেরণা তো দেন রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের মত অবতারী পুরুষ। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার প্রেরণা চন্দ্র দেন বলিয়া কি রাম ও কৃষ্ণের চন্দ্রের সঙ্গে উপমা দেওয়া হইয়াছে? কবি বলেন, উভয়ের রূপলাবণ্য আনন্দদায়ক ছিল বলিয়া চন্দ্রের সঙ্গে ইহাদের উপমা দেওয়া হইয়াছে। আর কবি যাহা বলেন তাহা তো ঠিকই বলেন। কিন্তু এমন কেন বলা যাইবে না যে ধর্মের ভাটা বন্ধ করিবার ও নূতন জোয়ারের গতি দিবার এই দুইজন ধর্মবীর ছিলেন, তাই তাঁহাদের চন্দ্রের সঙ্গে উপমা দেওয়া হইয়াছে? এইজন্য এ পর্যন্ত ভাল করিয়া না বলিলেও আজ ইহা তো আমরা স্বীকার করিবই যে ধর্মসাগরের চন্দ্রের সম্পর্কেই তাঁহাদের নাম রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র রাখা হইয়াছিল।

যিনি জলের স্থানে স্থল ও স্থলের স্থানে জল করিতে পারেন, তাঁহাকেই তো 'অঘটনঘটনপটীয়সী' ঈশ্বরের মায়া বলে। এই মায়া আমরা এখানে নিত্য

দর্শন করি। তথাপি কেন ভক্তিনম্র হই না? অদ্ভুত বস্তু প্রত্যহ ঘটে বলিয়া কি তাহা নিঃসার হইয়া গিয়াছে? আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব পড়িয়াছে তিনটি বস্তুর—গাম্ভীর্যে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পর্বত, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির রত্নখচিত গভীর আকাশ, আর বিশ্বাত্মার অখণ্ড স্তোত্র গান করিতেছে ঐ যে অনন্ত সমুদ্র। তিন হাজার কি দুই হাজার বৎসর পূর্বে (হাজারের এখানে লেখা-জোখা নাই) ভগবান্ বুদ্ধের ভিক্ষুগণ তথাগতের বাণী দেশে বিদেশে পৌঁছাইয়া এই সমুদ্রতটে আসিয়া থাকিবেন। সোপারা হইতে কাম্বেরী, সেখান হইতে ধারাপুরী পর্যন্ত, থানা বা পুণা জেলার সীমায় অবস্থিত নানাঘাট, লেণ্যাদ্রি, জুন্নর প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত, কার্লা ও ভাজার প্রাচীন পাহাড় পর্যন্ত আর এদিকে নাসিকের পাণ্ডবগুহা পর্যন্ত শান্তি-সাগরের মত বৌদ্ধ ভিক্ষু যখন বিহার গড়িতে ছিলেন, তখনকার ভারতসমাজ আজ হইতে ভিন্ন ছিল। তখনকার সমস্যা এখন হইতে অন্য প্রকারের ছিল। তখনকার কার্যপ্রণালী আজ হইতে পৃথক ছিল। কিন্তু এই সাগর তো তখনও ছিল। সেদিনও সাগর হয়তো ঠিক আজিকার মতই গর্জন করিয়া থাকিবে। আর গর্জন করিয়া থাকিবে বলি কেন, অবশ্যই গর্জন করিয়াছিল। সেদিনও মহাসাগর আজিকার মতই বাণী দিতেছিলেন—'দৃশ্যমাত্রই নশ্বর, কর্মই একমাত্র সত্য; যাহার সংযোগ হইয়াছে তাহার বিয়োগ নিশ্চিত; যে সংযোগবিয়োগের পারে চলিয়া যায়, সেই ব্যক্তিই শাশ্বত নির্বাণসুখের অধিকারী।' আজ আর সে যুগ নাই। মহাসাগরের নাম পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার বাণীর পরিবর্তন হয় নাই। যিনি জোয়ার-ভাটার পারে গিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যে অবশ্য আছে শাশ্বত শান্তি। তিনিই বুদ্ধ। তিনিই সু-গত। তিনি চিরকালের জন্য গত হইয়াছেন। আবার জোয়ার আসিবে, আবার ভাটাও আসিবে। কিন্তু তিনি আর ফিরিবেন না। তথাগত সত্যই সু-গত।

বোরডী, ৭ মে, ১৯২৭

৬১

অর্ণবের আমন্ত্রণ

সমুদ্র বা সাগরের মত পরিচিত শব্দ ছাড়িয়া অর্ণব শব্দ 'আমন্ত্রণে'র সঙ্গে অনুপ্রাসের লোভেই পছন্দ করি নাই। অর্ণব শব্দের পিছনে উঁচু উঁচু ঢেউয়ের অখণ্ড তাণ্ডবের সূচনা আছে। তুফান, অবস্থা, অস্বাস্থ্য, বেগ, প্রবাহ ও সকল প্রকার বন্ধনের প্রতি ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত ভাব অর্ণব শব্দের মধ্যে আসিয়া যায়। অর্ণব শব্দের তাৎপর্য ও উচ্চারণ, দুই-ই এই সকল ভাবের সহায়ক। তাই বেদের মধ্যে বহুবার অর্ণব শব্দের প্রয়োগ সমুদ্রের বিশেষণ রূপেই করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া বেদের অঘমর্ষণ সূক্তে যে অর্ণব-সমুদ্রের প্রসঙ্গ আছে, তাহা উহার গাম্ভীর্য প্রকাশ করে।

এইরূপ অর্ণবের সংবাদ আজ আমাদের জগতে দেওয়ার শক্তি পাইয়াছি, সেজন্য বৈদিক দেবতা সাগর-সম্রাট বরুণকে বন্দনা করি।

যেখানে পথ নাই সেখানে পথ করিয়া দেওয়ার দেবতা তো বরুণ। প্রভঞ্জনের তাণ্ডব হইতে যখন মরুভূমিতে বালুর ঢেউ উথলিয়া ওঠে, তখন সেখানেও যাত্রীদের দিক্‌দর্শন করাইতে সেই বরুণই আছেন। আর অনন্ত আকাশতলে পক্ষদ্বয়ের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য ত্রিভুবনের যাত্রী পক্ষীরা যখন ব্যোমপথে বিচরণ করে, তখনও সেই বরুণ দেবতা। বৈদিক যুগের ভুজ্যু হইতে আরম্ভ করিয়া কালই যে তরুণ নাবিকের ওষ্ঠের উপরে কৃষ্ণরোমরেখার উদ্‌গম হইয়াছে, সকলের সমুদ্রপথের দিশারী যেমন বরুণ, তেমনই নব নব অজ্ঞাত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া নব নব পথ নির্মাণকারী যযরাজ বা অগস্তিকে সাহস ও প্রেরণা দেওয়ার দীক্ষাগুরুও সেই বরুণ।

বরুণ যেমন যাত্রীদের পথপ্রদর্শক, তেমনি তিনি মনুষ্যজাতির ন্যায় ও শৃঙ্খলার দেবতা। তিনি 'ঋতম্' ও 'সত্যম্'-এর পূর্ণ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। তাই তিনি প্রত্যেক আত্মাকে সত্যপথে যাইবার প্রেরণা দেন। ন্যায়পথে চলার মধ্যে যে সৌন্দর্য, যে সমাধান ও যে চরম সফলতা আছে

তাহা বরুণের নিকট হইতে শিক্ষা করুন। আর যদি কোনও লোভী, অদূর-দৃষ্টি ব্যক্তি বরুণের এই ন্যায়নিষ্ঠার আদর না করে, তাহা হইলে বরুণ তাহাকে উদরী রোগ দিয়া শাস্তি দেন, যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে যে লোভের ফল কখনও ভাল হয় না।

নিজের মূল্য না কমিয়া যায় এজন্য যেমন পরমমঙ্গল, কল্যাণকারী, সদাশিব রুদ্ররূপ ধারণ করেন, সেইরূপ রত্নাকর সমুদ্রও ভীত মনুষ্যকে অট্টহাস্যে মুখরিত তরঙ্গ হইতে দূরে রাখেন। কোমল বনস্পতি ও গৃহলোভী মনুষ্য সমুদ্রতীরে আসিয়া যাহাতে স্থির হইয়া না থাকে, সেজন্য জোয়ার-ভাটা চালাইয়া তিনি এই সব লোককে বুঝাইয়া দেন যে আমার নিকট হইতে তোমাদের এতখানি দূরত্ব রক্ষা করিয়াই থাকা উচিত।

সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া যখন ঢেউগুলির যাওয়া আসা দেখি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় জোয়ারের আসা যাওয়া দেখি, আর বুদ্ধি কোনও উত্তর দিতে পারে না, তখন মন বলিয়া ওঠে, 'এইটুকুও কি বুঝিতে পার না? তোমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য তোমার বুক যেমন ফুলিয়া ওঠে ও নামিয়া যায়, সেই প্রকার বিরাট সাগরের শ্বাস প্রশ্বাসের ইহা হইল কম্পন; ইহাই হইল উহার আবেগ। ভূতলবাসী মনুষ্য যে পাপ করিয়াছে এবং যে উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ক্ষমা করিবার শক্তি পাইবার জন্যই মহাসাগরকে হৃদয়ের এতখানি ব্যায়াম করিতে হয়।'

যে ঢেউ দুর্বল ব্যক্তিদের ভয় দেখাইয়া দূরে রাখে, তাহাই আবার রসিকদের সস্নেহ ফেনিল নিমন্ত্রণ করে, বলে, 'চলিয়া আসুন, এইভাবে স্থির বিক্রম-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছেন কেন? এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে তো আপনার মরিচা ধরিবে। নিন একটা নৌকা, উঠুন তাহার উপর, খুলিয়া দিন পাল, আর চলুন যেখানে পবনের প্রাণ আপনাকে লইয়া যায়। আমরা সকলেই তো সাগরের সন্তান, কিন্তু আমাদের শিক্ষাগুরু হইল পবন। সে আমাদের যেমন নাচায় আমরা তেমনি নাচি। আপনিও এই ব্রত গ্রহণ করুন, চলুন আমাদের সঙ্গে।' যাহার মনে উল্লাস আছে, সে এই নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারে না। ছেলেবেলায় সিন্ধবাদের কাহিনী কি আপনি পড়েন নাই? তাহার ছিল বিপুল অর্থ, ভূসম্পত্তি আদি সব কিছু। প্রেম দিয়া ভালবাসা দিয়া তাহার জীবন ভরিয়া দিবার আত্মীয়স্বজনও তাহার

চারিদিকে অনেক ছিল। তথাপি সমুদ্রের গর্জন শুনিলে সে আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিত না। ঢেউয়ের দোলা ছাড়িয়া যে পালঙ্কে শুইয়া থাকে সে মূর্খ। মন বলিল, 'চল!' 'চল!' আর সিন্ধবাদ সমুদ্রযাত্রার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতে যথেষ্ট কষ্ট হইল। তাহার মধুর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা কটু অভিজ্ঞতাই বেশি হইল। তাই সুস্থ স্বচ্ছন্দভাবে ফিরিয়া আসিলে সে শপথ করিল যে এখন আর সমুদ্রযাত্রার নাম পর্যন্ত করিবে না।

কিন্তু শেষে ইহা তো মানুষেরই সংকল্প, এই সংকল্প তো সম্রাট বরুণের আশী-র্বাদ লাভ করিল না! কয়েক দিন কাটিল। গার্হস্থ্য জীবন তাহার নিকট নীরস মনে হইল। রাত্রিবেলায় বিছানায় শুইয়া পড়িত, কিন্তু তাহার চক্ষে ঘুম আসিত না। ঢেউ তাহার সঙ্গে অবিরাম কথা বলিয়া চলিত। শেষরাত্রে যদি একটু চোখ লাগিয়া আসিত, তাহা হইলে স্বপ্নেও ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠিত, আঙ্গুল নাড়িয়া তাহাকে ডাকিত। বেচারী জেদ করিয়া কতক্ষণ থাকিবে? অন্যমনস্ক হইয়া যেই একটু বেড়াইতে গিয়াছে, অমনি তাহার পা তাহাকে বাগানের পথ হইতে দূরে যেখানে সমুদ্রের সাদা বালু ঝিকঝিক করিতেছে, সেই দিকেই লইয়া চলিয়াছে। শেষে সে ভাল ভাল জাহাজ কিনিল, দৃঢ়হৃদয় খালাসীদের কর্মে নিয়োগ করিল, নানা রকমের মাল সঙ্গে লইল এবং 'জয় দরিয়া পীর' বলিয়া সমস্ত জাহাজ সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল।

ইহা তো হইল কাল্পনিক সিন্ধবাদের কাহিনী। কিন্তু আমাদের দেশের সিংহপুত্র বিজয় তো ছিলেন ঐতিহাসিক পুরুষ। পিতা তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিতেন না। তিনি অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, কিছুতেই ফল হইল না। শেষে অস্থির হইয়া তিনি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। প্রজারা ভীতত্রস্ত হইয়া রাজার নিকট গিয়া বলিতে লাগিল: 'রাজন্, হয় আপনার পুত্রকে দেশ হইতে নির্বাসিত করুন, নয় তো আমরা আপনার দেশ ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছি।' পিতা বড় বড় জাহাজ আনিলেন। তাহাদের মধ্যে পুত্রকে ও তাঁহার অত্যাচারের সঙ্গীদের বসাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এখন যেখানে যাইতে হয় যাও। এখানে আর মুখ দেখাইও না।' তাহারা চলিয়া গেল। তাহারা সৌরাষ্ট্রের উপকূল ছাড়িয়া চলিল, ভৃগুকচ্ছ ছাড়িল, সোপারা ছাড়িয়া গেল, দাভোল পার হইল, সোজা মঙ্গলাপুরী পর্যন্ত গেল। সেখানেও তাহারা থাকিতে পারিল না। তাই সাহস করিয়া অগ্রসর হইল, তাম্রদ্বীপে

গিয়া বাস করিল। সেখানকার রাজা হইল। বিজয়ের পিতা পুত্রকে ফিরিয়া আসিতে বারণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার পিছনে পিছনে কেহ যাইবে না, এমন আদেশও বাহির হয় নাই। তাই অনেক সমুদ্রবীর বিজয়ের পথে গিয়া নূতন নূতন বিজয় করিতে থাকিলেন। তাঁহারা যব ও বালি দ্বীপ পর্যন্ত গেলেন। সেখানকার সমৃদ্ধি, সেখানকার আবহাওয়া, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিবার পর কাহার আর ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হয়? তাহার উপর শম্বুকের পুত্র সমস্ত পশ্চিমতীর পার হইয়া লংকার কন্যাকে বিবাহ করিবে, একথা প্রায় নিয়মে আসিয়াই দাঁড়াইয়াছিল।

এদিকে বাংলার নদীপুত্র নদী মুখ দিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। যে বন্দর দিয়া বাহির হইয়া তাম্রদ্বীপে যাওয়া যাইতে পারিত, সেই বন্দরের নামই তাহারা রাখিল তাম্রলিপ্তি। এইরূপ তাম্রদ্বীপ লংকায়—অঙ্গবঙ্গের বাঙ্গালী, উড়িষ্যার কলিঙ্গ ও পশ্চিমের গুজরাতী একত্র হইল। মাদ্রাজ অঞ্চলের দ্রাবিড় তো কবেই সেখানে পৌছিয়া গিয়াছিল। এইভাবে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত নিজ নিজ অর্ণবের আমন্ত্রণে লংকায় একত্র হইল।

ভগবান বুদ্ধ নির্বাণের পথ খুঁজিয়া বাহির করিলেন ও শিষ্যদের আদেশ দিলেন, 'দশ দিকে এই অষ্টাঙ্গিক ধর্মতত্ত্বের প্রচার কর।' তিনি নিজে উত্তর-ভারতে চল্লিশ বৎসর কাল পর্যন্ত প্রচার কার্য করিলেন। আসেতুবন্ধ হিমাচল নিজের রাজ্য বিস্তারের জন্য জয়যাত্রায় নিষ্ক্রান্ত সম্রাট্ অশোকের দৃষ্টি পড়িল ধর্মবিজয় করিবার দিকে। ধর্মবিজয়ের উদ্দেশ্য আজকার মত ধর্মের নামে দেশদেশান্তরের প্রজাদের লুটতরাজ করিয়া ক্রীতদাস করিয়া ভ্রষ্ট করা ছিল না। লোককে কল্যাণের পথ দেখাইয়া নিজের নিজের জীবন চরিতার্থ করিবার উপায় যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ তাহা দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য। ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বন্যজাতির মত নির্ভয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার সাহসী শিষ্যেরা অর্ণবের আমন্ত্রণ শুনিয়া দেশবিদেশে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কেহ পূর্বদিকে গেলেন, কেহ বা পশ্চিমদিকে। আজও পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের তীরে তীরে এই সকল ভিক্ষুদের বিহার পাহাড়-পর্বতের মধ্যে পাথর কাটিয়া করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সোপারা, কান্হেরী, ধারাপুরী প্রভৃতি স্থান ভিক্ষু প্রচারকদের বিদেশযাত্রার পরিচয় দেয়। উড়িষ্যার খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুহাগুলিও এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

এই সকল বৌদ্ধ প্রচারকদের নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়া প্রাচীন কালের খ্রীষ্টানেরাও সমুদ্র পথে গিয়া অনেক দেশে ভগবদ্‌ভক্ত ব্রহ্মচারী যীশুর বাণী প্রচার করিয়াছে।

যে ব্যক্তি স্বার্থের জন্য সমুদ্রযাত্রা করে, তাহাকেও অর্ণব সাহায্য করে। কিন্তু বরুণ বলেন, 'স্বার্থপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার বারণ আছে, নিষেধ আছে। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধ ধর্মপ্রচারের জন্য বাহির হইবেন, তাঁহারা তো আমার আশীর্বাদই পাইবেন, তা তাঁহারা মহেন্দ্র বা সংঘমিত্রা বা বিবেকানন্দই হউন, আর সেণ্টফ্রান্সিস জেভিয়ার বা তাঁহার গুরু ইগ্‌নেশিয়াস লয়লাই হউন।'

এখন অর্ণবের সাহায্যের জন্য স্বার্থপরায়ণ লোকদের অবস্থা দেখুন। মকরাণীরা বেলুচিস্থানের দক্ষিণে থাকিয়া পশ্চিম সাগরের তটে যাত্রা করিত। তাই ভারতবর্ষের অর্থকোষ তাহাদেরই হাতে ছিল। আগ্রহের সহিত তাহারা উহা নিজেদেরই হাতে রাখিতে চাহিত। সুতরাং জনৈক বরুণপুত্রের মনে হইল, সমুদ্রের অন্য একটা পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বরুণ তাহাকে বলিল, অমুক মাসে আরব হইতে তোমাদের জাহাজ ভরা সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলে সোজা কালিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। দুই এক মাস তোমরা ভারতে বাণিজ্য করিয়া ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইও; ইতিমধ্যে আমি পবনকে বিপরীত মুখে বহাইয়া যে রাস্তা দিয়া তোমরা আসিয়াছিলে সেই রাস্তা দিয়াই তোমাদিগকে ফিরাইয়া দেশে পৌঁছাইয়া দিব।—ইহা খ্রীঃ পূঃ ৫০ বৎসরের কথা।

প্রাচীনকালে সুদূর পশ্চিমে ভাইকিং নামে জলদস্যু থাকিত। ইহারা ছিল বরুণের প্রিয়পাত্র। গ্রীনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, ব্রিটেন ও স্কাণ্ডিনাভিয়ার মধ্যবর্তী শীতল ও আর্তিকর সমুদ্রে তাহারা যাত্রা করিত। আজকার ইংরাজেরা তাহাদের বংশধর। সমুদ্রতীরে অবস্থিত নরওয়ে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন ও পোর্টুগাল দেশ হইতে একের পর একে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। এ সকলেরই ভারতবর্ষে আসিবার ছিল। মধ্যপথে পূর্বদিকে মুসলমানদের রাজ্য ছিল। সেসব পার হইয়া বা আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের পথ খুঁজিতে হইত। সকলে বরুণের উপাসনা আরম্ভ করিল, আর অর্ণবের পথ ধরিয়া চলিল। কেহ গেল উত্তর ধ্রুবের দিকে, কেহ গেল আমেরিকার দিকে। কেহ আফ্রিকা বিপরীত ভাবে প্রদক্ষিণ করিল। শেষে সকলে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিল। সমুদ্র তো

লক্ষ্মীর পিতা। যে তাহার মধ্যে যাত্রা করে, সে অবশ্যই লক্ষ্মীর কৃপাপাত্র হয়। ইহারা নূতন নূতন দেশ জয় করিল, ধনদৌলত সংগ্রহ করিল, কিন্তু বরুণদেবের ন্যায়াসনের কথা ভুলিয়া গেল। বরুণদেব হইলেন ন্যায়ের দেবতা। তাঁহার ধৈর্যও আছে, পুণ্যের দাহিকাশক্তিও আছে। যখন তিনি দেখিলেন যে তিনি ইহাদের সমুদ্রের রাজত্ব দান করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা রাজার কর্তব্য ন্যায়ধর্ম পালন করে নাই, তখন তিনি তাঁহার আশীর্বাদ ফিরাইয়া লইলেন, ইহাদের সাজা দিলেন, দিলেন 'জলোদর' বা উদরী রোগ। এখন এই সব দেশের লোকের ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা হইতে যে সকল সম্পত্তি আনিয়াছিল, তাহা ব্যয় করিতে লাগিল আত্মকলহে, আর নিজেদের প্রাণ ও সেই সকল সম্পত্তি জলের উদরে পৌঁছাইয়া দিতেছে। সমুদ্রযানই হউক, আর আকাশযানই হউক, পরিণামে তাহাকে সমুদ্রজলের উদরে পৌঁছাইতেই হইত। এখন বরুণরাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। এখন তাঁহার বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে যে সমুদ্রের সেবা যাহারা গ্রহণ করিতে চায়, তাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিকতা না থাকিলে তাহারা সংসারে অনর্থেরই সৃষ্টি করে। এতদিন তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রী ও জ্যোতির্বেত্তাদের, বিদ্যার্থী ও লোকসেবকদের সমুদ্রযাত্রার প্রেরণা জোগাইতেছিলেন। এখন তিনি ভারতবর্ষকে নূতন ধরণের প্রেরণা দিতে চাহিতেছেন, ভারতবর্ষের সম্মুখে এক নূতন 'মিশন' রাখিতে চাহিতেছেন। আমরা কি উহা শুনিবার জন্য প্রস্তুত আছি?

আমরা পশ্চিমসমুদ্রতীরের অধিবাসী। রাতদিন পশ্চিম সাগরের* নিমন্ত্রণ শুনি। এ পর্যন্ত আমরা ছিলাম বধির। এই বাণী অবশ্যই আমাদের কানে আসিয়াছিল; কিন্তু ভিতরে পৌঁছিতে পারে নাই। এ অবস্থা এখন আর নাই। ইউরোপের প্রবল জাতিগুলি আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমাদিগকে মোহিনী মায়ায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। সে মায়া এখন দূর হইয়াছে। এখন আমাদের কান খুলিয়াছে। সংসারের মানচিত্র আমরা নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখন আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি যে

* আমাদের এই প্রতিবেশীকে আমরা 'আরব সাগর' নামে জানি, এ বড় বিচিত্র কথা! বিদেশ হইতে আগত শ্বেতাঙ্গেরা উহাকে যতই 'আরব সাগর' বলুন, আমাদের নিকট তো উহা বোম্বাই সাগর বা 'পশ্চিম সাগর'। এই নাম আমাদের চালানো উচিত।

মহাসাগর ভূমণ্ডলকে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করে না, সংযুক্ত করে। আফ্রিকার সমগ্র পূর্ব উপকূল ও কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সিঙ্গাপুর আল্‌বানী (অস্ট্রেলিয়া) পর্যন্ত পূর্বদিকের পশ্চিম উপকূল আমাদের নিমন্ত্রণ জানাইতেছে, 'ঈশ্বর তোমাদিগকে যে জ্ঞান, চরিত্রবল ও ঐশ্বর্য দিয়াছেন। তাহার অংশ এখানকার লোকদেরও দাও।' একদিকে আফ্রিকা, অন্যদিকে জাভা আছে, বলি আছে, অস্ট্রেলিয়া আছে, টাসমানিয়া আছে, আর আছে প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ। ইহারা সকলে অর্ণবের বাণী দিয়া আমাদিগকে ডাকিতেছে। এই সকল স্থানে সমুদ্রের নিকট হইতে প্রেরণা লইয়া অনেক মিশনরী গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের সঙ্গে সর্বত্র লইয়া গিয়াছিলেন বংশে বংশে যে উচ্চনীচ ভাব আছে সেই ভাব। ঈশা মেসিয়াকে ভুলিয়া শুধু তাঁহার বাইবেল লইয়া গিয়াছিলেন। আর এই বাইবেলের সঙ্গে তাঁহারা নিজের নিজের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইলেন। অর্ণব তাঁহাদিগকে লইয়া গেল অবশ্য। কিন্তু বরুণ তাঁহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা ভারতবাসীরা প্রাচীন কালে চীনে গেলাম, যবনদের দেশে গ্রীস পর্যন্ত গেলাম, জাভা ও বলী অভিমুখে গেলাম। আমরা 'সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ' এই নীতির প্রচার করিলাম। কিন্তু আমরা সেই সকল স্থানে নিজেদের সাম্রাজ্য নির্মাণ করিবার দুর্বুদ্ধি করি নাই। অন্যান্যদের তুলনায় আমাদের হাত আছে নিষ্কলুষ। তাই বরুণ আমাদের নির্দেশ দিয়াছেন যে—অর্ণব আমাদের নিমন্ত্রণ দিয়া রাখিয়াছে আর বলিতেছে, 'অন্যে জয়পাতাকা লইয়া গিয়াছে, তোমরা অহিংসা ধর্মের ত্রিবর্ণ অভয় পতাকা লইয়া যাও, আর যেখানে যাইবে সেখানে সেবার সৌরভ বিকীরণ করিতে থাক। শোষণের জন্য নহে, কিন্তু অনগ্রসর জাতির পোষণ ও শিক্ষণের জন্য যাও। আফ্রিকা হইতে শালগ্রাম বর্ণ বিশিষ্ট তোমার ভাই তোমাকে ডাকিতেছে, পূর্বদিক হইতে কেতকী স্বর্ণ বর্ণ বিশিষ্ট তোমার ভাই তোমার পথের দিকে তাকাইয়া আছে। ইহাদের সকলের সেবা করিতে যাও এবং সকলকে বল যে অহিংসাই পরমধর্ম। উচ্চনীচভাব, অভিমান, অহংকার ইত্যাদি হীন বৃত্তিগুলির স্থান এ ধর্মে হইতে পারে না। ভোগ ও ঐশ্বর্য, দুই-ই জীবনের কলংক, জীবনকে দূষিত করে। সংযম ও সেবা, ত্যাগ ও বলিদান, ইহাই হইল জীবনের কৃতার্থতা। যাহারা এই ধর্মের তত্ত্ব বুঝিয়াছ, তাহারা বাহির হইয়া এস। পূর্ব সাগর ও পশ্চিম সাগর,

ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ পথগামী হাজার হাজার মাইল ধরিয়া উপকূল গঠন করিয়া ভারতবর্ষকে ভারত মহাসাগরে যে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহা সমুদ্র-বিমুখ হওয়ার জন্য কখনও নয়। উহা তো অহিংসার বিশ্বধর্মের পরিচয় সমস্ত বিশ্বকে দেওয়ার জন্য।'

ইউরোপের মহাযুদ্ধের শেষে দুনিয়ার রূপ যেমন বদলাইবার তেমনই বদলাইবে। কিন্তু অসংখ্য ভারতীয় প্রবাসী বীর অর্ণবের আমন্ত্রণ শুনিয়া, বরুণের নিকট দীক্ষা লইয়া, ধীরে ধীরে দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সাগরপৃষ্ঠে আমাদের অনেকানেক জাহাজ দুলিতে দেখিতেছি। তাহাদের অভয় পতাকা আকাশে দুলিতে দেখিতেছি, আর আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। অর্ণবের আমন্ত্রণ আমি নিজে এখন হয়তো স্বীকার বা গ্রহণ করিতে পারি না, তথাপি যুবকদের মনের মধ্যে উহা পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছি ইহাই আমার সৌভাগ্য। বরুণরাজাকে আমার নমস্কার! জয়, বরুণরাজার জয়!!

অক্টোবর, ১৯৪০

৬২

দক্ষিণসমুদ্রতীরে

ধনুষ্কোটিতে আমি সর্বপ্রথম প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে আসিয়াছিলাম। যতদূর মনে আছে, তখন রাজাজী আমার সঙ্গে শ্রীবরদাচারীকে পাঠাইয়া ছিলেন। বরদাচারী ছিলেন রামায়ণের ভক্ত। সমস্ত পথই রামায়ণের সরস আলোচনায় কাটিল। ধনুষ্কোটিতে পৌঁছিয়া বরদাচারীর সনাতনী আত্মা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। একজন উপযুক্ত ব্রাহ্মণের সন্ধান করিয়া সে এই সকল কর্মে বিভোর হইল, আমরা সম্মুখে গর্জনকারী রত্নাকর ও মহোদধির অপরূপ সৌন্দর্য দেখিবার জন্য পৃথক হইয়া গেলাম।

দুই নদীর সঙ্গম অথবা প্রয়াগ অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সংগমের কাব্য আর্যদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে অবিলম্বে

তাঁহারা সে সকল স্থানে যাগযজ্ঞ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যাগযজ্ঞের জন্য এমন প্রকৃষ্ট বা প্রশস্ত স্থানকে তাঁহারা প্রয়াগ বলিতেন।

দুই নদীতে যখন আসিয়া মেলে তখন অনেকটা ইংরাজি Y-এর মত আকারের হয়। মহারাষ্ট্রে কহ্লাড়ের নিকটে দুইটি নদী সামনা-সামনি আসিয়া মেশে, তাহার পর সমকোণে একদিকে বহিয়া যায়। ইংরেজী T-এর মত পাঁচটি তীরের আকৃতি হয়। নদী দুইটি সামনা সামনি আসিয়া একে অন্যের গলা জড়াইয়া ধরে, তাই ইহাদের বলা হয় প্রীতির সঙ্গম।

গঙ্গার সহিত যেখানে যমুনা আসিয়া মেলে সেখানেও প্রায় T-এর মত চেহারা হয়। শুধু তাহাতে গঙ্গা সরল রেখায় চলিয়া যায়, যমুনা কোনও চেষ্টা না করিয়া কিছু ঘুরিয়া খানিকটা সম্ভ্রমের সঙ্গে গঙ্গায় আসিয়া মেশে।

যমুনা প্রথমে তো 'আত্মনি অপ্রত্যয়' এর ভাব দেখাইত। কিন্তু গঙ্গার সহিত মিশিবার পরই দুই ভগ্নীর উল্লাসের উন্মাদনা আসিত, আর এই ভয়ে যে পরস্পরে হঠাৎ ওতপ্রোত হইলে মিলনের আনন্দ দূরে যাইবে, অনেক দূর পর্যন্ত উভয়ে খুব কমই মিলিত হইত। ধর্মকাব্য-রচয়িতা এই স্থানকে 'প্রয়াগ-রাজ'-এর মত গৌরবভরা নাম শুধু শুধুই দেন নাই।

কিন্তু কোনও নদী যখন সাগরের সহিত মেশে তখন এই সাগর সরিৎ-সঙ্গমের উন্মাদনা হরপার্বতী মিলনের মত অদ্ভুত-রম্য হয়। ইহার বর্ণনা ভক্তের বৃত্তি অনুসারে অথবা সন্তানের ভাষায় হইতেই পারে না। মানুষ যে মানুষ তাহা ভুলিয়া গিয়া তাহার শক্তি অপেক্ষা অধিক উঁচায় উঠিয়া সাগর-সরিতের এই অসমান সংগম বর্ণনা করিতে হইবে।

কিন্তু ধনুষ্কোটিতে তো বিষ্ণু ও মহাদেবের মিলনের সমান ছিল দুই সমুদ্রের সঙ্গম। রত্নাকর আসিতেছে মানারের (Manar) দিক হইতে, মহোদধি পাল্ক (Palk) হইতেছে সামুদ্রধুনীর প্রতিনিধি। উভয়কে কি করিয়া সহসা মিলিতে দেওয়া যায়? পৃথিবী যেন রামধনুতে তীর সংযোজন করিয়া এক ক্রোশ জুড়িয়া ইহাদের মিলিত হইতে দেয় নাই। একদিকে রত্নাকর উত্তাল হইয়া উঠিতেছে, অন্যদিকে মহোদধি গর্জন করিতেছে, আর পবনদেবের নির্দেশ মত তাহারা নিজেদের প্রবাহ ছুটাইতেছে।

আর এই উভয়ের আলাপ-আলোচনা কী অতুলনীয়! মহোদধি যদি হরিদ্বর্ণ ধারণ করে তাহা হইলে রত্নাকর একেবারে নীলবর্ণ হইয়া যায়; আর যখন

রত্নাকর হরিদ্বর্ণ ধারণ করে তখন মহোদধি আকাশকেও শিখাইতে পারে এরূপ গাঢ় নীল রঙ বহাইতে আরম্ভ করে।

যতক্ষণ তাহাদের মনে হইতেছে যে মিলনের ইচ্ছা থাকিলেও মিলিতে পারা যাইবে না, ততক্ষণ উভয়ে ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করে। মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন ক্রোধ আসিয়া দেখা দেয়। আর একবার মিলনের সুযোগ পাইলে এমন একটা স্বাভাবিক শান্তির ভাব লইয়া উভয়ে মিলিত হয় যে মনে হয় মিলিত হইবার জন্য কেহই উৎসুকই ছিল না। মিলিবার ছিল তাই মিলন হইল! ব্যাকুলতার ভাব যেন দূর হইতেই বর্জন করিয়া চলিয়াছে। যেখানে উভয়ের প্রত্যক্ষ মিলন হয়, সেখানে তো সরোবরের শান্তিই ছড়াইয়া প্রসারিত হইয়া থাকে। আর ইহাতে আশ্চর্যেরই বা কি আছে! অদ্বৈতে আনন্দের পরিসীমাই থাকিতে পারে, উন্মাদনার স্থান তো নাই।

ধনুষ্কোটির কূলে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিয়া লওয়া চাই। যেখান হইতে হাঁটিয়া আসিতেছি ততখানি মাটির জিহ্বা ছাড়িয়া দিলে সকল দিকে মহাসাগরের বিশাল জলরাশি ক্ষিতিবলয়ের সঙ্গে নির্মিত বলয় চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

রেঙ্গুন বা করাচী যাইবার পথে মাঝখানে সমুদ্রের মধ্যে চারিদিকে সমুদ্র বলয় ও দিগ্‌বলয় মিলিয়া এক হইয়া যায়, তাহার উন্মাদনা বড় কম নয়। মনের মধ্যে এ কল্পনা না আসিয়া পারে না যে জলের এই দিগ্‌বলয় ব্যাপী বিস্তারের উপর আকাশের অত বড় কিন্তু অনন্তগুণ উঁচু ঢাকনা রাখা হইয়াছে, আর এই সুবৃহৎ পেটিকায় এক ছোট জাহাজের উপর বসিয়া তুচ্ছ আমরা মক্তির মত সংগৃহীত হইয়াছি। এ অবস্থা যতই বেশি চিন্তা করি ততই মনে নিজের তুচ্ছতা আরও বেশি করিয়া উপলব্ধি করি।

ধনুষ্কোটির কথা ইহা হইতে পৃথক। পৃথিবীর সঙ্গে আমরা অনুবদ্ধ, পায়ের নীচে শক্ত মাটি, আর এই মাটি ধীরে ধীরে ছড়াইয়া এক বিশাল দেশ ও ভূখণ্ডের দিকে লইয়া যাইতে পারে—এই ভাবনা আমাদিগকে শুধু আশ্বস্ত করে না, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের অধিকারী করিয়াও তোলে। ধনুষ্কোটির কূলে আমি যতবার গিয়াছি ততবারই আমি মনুষ্যের আত্মগৌরবের ধারণা ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। তাই সেখানে নিজের 'ভূমিকায়' স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া সাগরের উপাসনা করিতে পারিয়াছি।

যতবার আমি মণ্ডপ ছাড়িয়া পুলের উপর দিয়া পামবন গিয়াছি ততবার কালিদাস রঘুবংশে এই প্রদেশের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কথা মনে পড়িয়াছে। কালিদাসের বর্ণনা শক্তি আমার মধ্যে না-ই থাকিল, কিন্তু একথায় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে আমি তাঁহার সমানধর্মা। আমি মোটেই কবিযশঃপ্রার্থী নই, যে কালিদাসের সঙ্গে আমার নিজের নাম দিতে সঙ্কোচ করিব? আমাকে যে সব টীকাকার উপহাস করিবেন তাঁহাদিগকে আমি এক টীকাকার কবিরই কথা মনে করাইয়া দিব—'পর্বতে পরমাণৌ চ পদার্থত্বং প্রতিষ্ঠিতম্।'

কিন্তু আমি যখন ধনুষ্কোটির নিকট আসি, তখন কালিদাসের কথা ভুলিয়া যাই এবং কেমন করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করি এই সমস্যায় পতিত হনুমানের দৃষ্টিতে দক্ষিণদিকে দেখিতে আরম্ভ করি। আর এই ভাবের কল্পনাকে ছুটিতে দিয়া যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ি, তখন চারি ধামের তীর্থযাত্রা শেষ করিয়া যাহারা রামেশ্বরে আসিয়াছে সেই সব বৃদ্ধদের হৃদয় অনুভব করিয়া কল্পনা করি: 'একটা পূর্ণ জীবন প্রায় শেষ করিয়া আমি ভারতবর্ষের যত বিশাল "জীবন-প্রদেশ" আছে সব ভ্রমণ করিয়াছি। এখন ফিরিয়া গিয়া কি করিব? ইহলোকের কাজ যেমন তেমন করিয়া সারিয়াছি। সফল জীবনই হউক আর ব্যর্থ জীবনই হউক, সে জীবন আর ফিরিয়া যাপন করিতে হইবে না। এখন তো সমস্ত জীবন পিছনে ফেলিয়া আসাই ভাল। ফিরিয়া সেদিকে দেখিয়া স্মরণের আনন্দ লাভ করিব, তাহাও এখন আর হইবে না। এখন তো সাম্পরায়ের কথা, পরলোকের কথা পরমার্থের দৃষ্টিতে চিন্তা করার মধ্যেই শ্রেয়ঃ।' মনে যখন এইরূপ চিন্তাপরম্পরা জাগে তখন আমি যেন একরূপ অচৈতন্য হইয়া উঠি, অন্যদিকে পরম শান্তি অনুভব করি।

এবার আমি যখন ধনুষ্কোটিতে আসি তখন পরম্পরা অনুসারে মহোদধিতে স্নান করিলাম। মহাসমুদ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করিলাম। মনে কিন্তু একই চিন্তা—এখানে আর ফিরিয়া আসা হইবে না। সিংহল হয়তো কখনও যাইতে হইবে, কিন্তু ধনুষ্কোটি যে দর্শন করিলাম, ইহাই শেষ দর্শন। এ চিন্তা মনে কেন আসিল, সে কথা বলা কঠিন। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এবার মনে তৃপ্তির চিন্তা জাগিল।

২

রামেশ্বর-ধনুষ্কোটির পর কন্যাকুমারী। একটি স্থান যদি সুন্দর হয়, তবে অন্যটি আরও সুন্দর। এখানে দুই নয়, তিন সাগরের সঙ্গম হইয়াছে। সঙ্গমের এই বায়ুমণ্ডল অভেদভক্তি-জনিত আনন্দের সমান। 'এখানে ভারত মহাসাগর শেষ হইয়াছে,' 'এখানে বোম্বাই অর্থাৎ পশ্চিম মহাসমুদ্র আরম্ভ হইয়াছে,' আর 'এখানে বঙ্গদেশের পুর্বসীমুদ্রের আরম্ভ'—এসব কথা এখানে বলিতেও পারা যায় না, মানিতেও পারা যায় না। ইহাই ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত, তিনটি সাগর উহার তিন দিক হইতে জড়াজড়ি করিয়া পড়িয়া আছে। আমরা তো বলি সঙ্গম। সাগরদের এখানে সঙ্গমের মত কিছুই নাই। সঙ্গমের কল্পনা আমাদের। সাগরদের যদি জিজ্ঞাসা কর তবে তাহারা বলিবে, যে ভেদের অস্তিত্বই নাই, তাহা দূর হইবার কথা ওঠে কি করিয়া! সঙ্গমের কল্পনাই একেবারে ভুল—বলিতে হইলে 'সংভবন' বল। যেখানে পূর্ণ একতা আছে সেখানে যে কোনও অংশের নাম ইচ্ছামত দিতে পার। নাম ও রূপের দ্বৈতভাব এখানে ফিকা হইয়া যায়, ধুইয়া যায়, শুদ্ধ অদ্বৈত ভাবই তাহার অখণ্ড উন্মাদনায় গর্জন করিতে থাকে।

কন্যাকুমারীতে আমি যে মহত্ত্ব অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আমি হিমালয় ও গান্ধীজীর জীবন ছাড়া আর কোথাও অনুভব করি নাই।

কন্যাকুমারীর মহত্ত্ব আমি সর্বপ্রথম গান্ধীজীর মুখ হইতেই শুনিয়াছিলাম। তিনি কদাচিৎ কোন দৃশ্যের বর্ণনা করিতেন, কিন্তু কন্যাকুমারী হইতে আশ্রমে ফিরিবার পর তিনি উৎসাহভরে আমার সম্মুখে উহার বর্ণনা করিয়াছিলেন।

১৯২৭ খ্রীঃ আমি যখন তাঁহার সম্মুখে দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করি, তখন নাগর-কোবিল পৌঁছিতেই তিনি গৃহস্বামীর নিকট বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে 'কাকাকে কন্যাকুমারী যাইতে হইবে, মোটরের বন্দোবস্ত করিয়া দিন।' কাকার কন্যাকুমারী যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য তিনি সেদিন দুইবার জিজ্ঞাসাদি করিলেন।

পূজনীয়া কস্তুরবাকে লোভ দেখানো আমার পক্ষে বিশেষ কঠিন হইল না। দুইজন ভাইও আমাদের সঙ্গী হইলেন।

বাপুজীর মুখে যে দৃশ্যের প্রশংসা শুনিয়াছিলাম তাহা দেখিবার জন্য

আমার উৎকণ্ঠা খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। এখানে পৌঁছিবার পর তো তাহার নেশাই লাগিয়াছিল। তাহার পর যতবার এখানে আসিয়াছি ততবারই আমার সেই নেশা লাগিয়াছে।

আশ্চর্য এই যে, এই নেশার সঙ্গে সঙ্গেই মনে ব্রহ্মচর্যের বিষয়েও গভীর চিন্তা না উঠিয়া পারে নাই। ইহা দেবী কন্যাকুমারীর স্থান বলিয়া যে মনে এই চিন্তা উঠিত, এরূপ কোনও কথা নয়। আমি তো কখনও সে কথা স্বীকার করি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ এই স্থানে সেই নেশা অনুভব করিয়াছিলেন, একথা জানার জন্যই এখানে আসিলেই মনে ব্রহ্মচারীর ভাব জাগিত না। গান্ধীজীর সংস্কৃতির সুন্দর সাধনার সঙ্গেও এই চিন্তার সম্পর্ক নাই। এই চিন্তা স্বতঃই স্বয়ম্ভুরূপেই মনে ওঠে।

আমার এখানে এই (৫।১।১৯৪৭ তারিখে) তৃতীয়বার আসা হইল। আসিবামাত্র সর্বপ্রথমে সমুদ্রের ঢেউ, আকাশের মেঘ, পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বলয় আর পিছনের পর্বতশ্রেণী—আমার প্রতি যাহাদের স্নেহ আছে—সকলকে দেখিয়া লইলাম।

আজ পৌষ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী। চন্দ্র আজ রোহিণীতে বা মৃগনক্ষত্রে থাকিবার কথা। আমরা মন্দির হইতে মন্দিরে মোটরযোগে যখন কন্যাকুমারীর দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি, তখন হইতে চন্দ্র আকাশে উঁচুতে উঠিয়া তাকাইয়া দেখিতেছিল, কখন সূর্যাস্ত হইবে, কখন আকাশে অধিকার স্থাপন করিব। সন্ধ্যাকে তাহার বর্ণবিন্যাস ছড়াইবার জন্য বেশি সময় দিল না, তবু যেটুকু সময় পাইল সন্ধ্যা তাহারই ভিতরে অনেক সুন্দর রঙীন দৃশ্য দেখাইয়া দিল।

সূর্যাস্ত দেখিবার জন্য আমাদের বড়ই আগ্রহ ছিল। কিন্তু পশ্চিমের মেঘ কিছু পরিষ্কার হইতে হইতে বলিল, 'কাহারও অস্ত দেখিবার জন্য কি উৎকণ্ঠা থাকিতে পারে? আসলে তো সূর্যের অস্ত হয়ই না। তোমাদের দৃষ্টিতেই আলোর অবসান হয়। তাই সূর্যকে না দেখিয়া তাহার পরিবর্তে উদয় বা অস্তের সময়ে তাহার বর্ণের যে একরূপতা তাহাই দেখিয়া নাও না কেন?'

উদয়ে সবিতা রক্তো রক্তশ্চাস্তমনে তথা।
সংপত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতাম্ একরূপতা॥

এই শ্লোক মেঘেরাও ছেলেবেলায় হয়তো কণ্ঠস্থ করিয়াছিল।

সূর্য যখন দিগ্‌বলয়ের নীচে গেলেন, তখন মেঘের গবাক্ষের ভিতর দিয়া সূর্যের আলোর লাল কিরণ উপর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। আর উপরে ছড়াইলে উহা হইতেও বেশি দক্ষিণ ও উত্তর দিকে ছড়াইয়া গেল। গবাক্ষ বেশি ছিল না, কিন্তু যাহা ছিল তাহা বেশ বড় বড়। তাই কিরণমালা দেখিয়া লাল রংয়ের পট্টবস্ত্র শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছিল। আকাশ তাহার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হইতেছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম এ শোভা আরও অনেকক্ষণ থাকিবে, তাই উহা দেখিবার অভিলাষ পোষণ করিয়া মন কিছুটা তৃপ্ত হইল।

কুমারীর যে বিবাহ হয় নাই তাহার খই যেখানে ছড়ানো আছে, সেই দিকের শিলার উপর আমরা লহরীর তাণ্ডব দেখিতে গিয়া বসিলাম। দেখিতে না দেখিতে সন্ধ্যা পশ্চিমে বিলীন হইয়া গেল, চন্দ্রের রাজ্য আরম্ভ হইল। মেঘ আকাশ ঘিরিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য এখনও পূর্ণ করে নাই। ইতিমধ্যে দক্ষিণ দিকে মেঘের মধ্য হইতে এক বড় তারকা চিকমিক করিতে লাগিল। এ তারকা আর কে হইবে? স্বয়ং অগস্তি মহারাজ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরূঢ় হইয়াছেন। সৌভাগ্যের কথা, যমুনা ও যামমৎস্যও বক্ররেখায় আকাশে দেখা দিল। দক্ষিণে তাকাইবার ফল পাওয়া গেল। তৃপ্ত নয়নে আমরা উত্তরে তাকাইলাম। সেখানে আকাশে দেবযানীর (ক্যাসিওপিয়া) 'M' আকৃতি উপর পর্যন্ত উঠিয়াছে। তাহার নীচে দিগ্‌বলয়ের নিকটে এক তালবৃক্ষ পরিমাণ উচ্চে সেই তালপত্রের আসন করিয়া ধ্রুবকুমার তাহার সুদর্শন মূর্তি লইয়া দেখা দিল। দেবযানী ও ধ্রুবকে দেখিতে দেখিতে দৃষ্টি পশ্চিমে ফিরিল; সেখানে হংস বলিয়া দিল, শ্রবণ তো কোন কালে অস্ত গিয়াছে। তাই পূর্ব-দিকে তাকাইলাম। ব্রহ্মহৃদয় বলিয়া দিল, ব্রহ্মমণ্ডলের বিস্তার ইহার মধ্যেই কোথাও নিশ্চয় হইবে।

পুনরায় দক্ষিণদিকে মুখ ফিরাইলাম। অগস্তি এত উঁচুতে আসে নাই যে আমরা তাহার কুটির কল্পনা করিতে পারি। কিন্তু ব্যাধ তো দেখিতেই হইবে। ব্যাধ যতই তেজস্বী হউক, মেঘের পুরু স্তর সে কি প্রকারে ভেদ করিতে পারিবে? আবার আমরা নিজেদের দৃষ্টি দিয়া মেঘের স্তর ভেদ করিতে চেষ্টা করিলাম। সন্দেহ হইল, মেঘের যে অংশ একটু বেশি উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইতেছে উহার পিছনে ব্যাধ অবশ্যই আছে। মেঘের ওপারে

ব্যাধের আলো আর এপারে আমাদের দৃষ্টি—উভয়ের আক্রমণে মেঘ পাতলা হইয়া গেল ; পাতলা পরদার পিছন হইতে নাটকের পাত্রদের যেমন দেখা যায়, ব্যাধকেও তেমনই দেখা যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ব্যাধ তাহার পূর্ণরূপ লইয়া সম্মুখে আসিল, আর তাহার পর ব্যাধ, অগস্তি, যমুনা ও যাম্যমৎস্যের শোভা তেলুগু অক্ষরের শিরোরেখার মত দেখা যাইতে লাগিল।

এখনই মৃগ দেখা দিবে, রোহিণী ঝিকমিক করিবে, প্রশ্বন লাফাইবে, এই আশায় আমরা আকাশের দিকে তাকাইয়াছিলাম। ততক্ষণে রজনীনাথ চারিদিকে তাঁহার কুণ্ডল ছড়াইলেন আর এই স্বর্ণবলয়ের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘও বাড়িল। আকাশ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া আছে, তাহাতে কি? রাত্রের মেঘ আমাদের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করিতে পারিতেছিল না। তাই আমরা অতিশয় কালো সমুদ্রের গভীর জলের উপর নৃত্যশীল শ্বেতফেনের ঝিকিমিকি রেখার পংক্তি দেখিয়াই চক্ষু তৃপ্ত করিলাম।

সমুদ্রের জলে ও আকাশের মেঘে বিবিধ বর্ণের নৃত্য প্রাণ ভরিয়া দেখিবার পর এই গম্ভীরতা এতই তৃপ্তিকর মনে হইতেছিল যে এই তৃপ্তির সঙ্গে স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ গাহিতে ও সন্ধ্যা উপাসনা করিতে অবর্ণনীয় আনন্দ হইল। এই সাগর পূর্ণ। উপরে প্রসারিত আকাশও পূর্ণ। উভয়ের দর্শনে জীবনের সন্ধ্যার সময়ে হৃদয়ে উদ্ভূত আমাদের শান্তিপ্রধান আনন্দও পূর্ণ। এই ত্রিবিধ পূর্ণতার মধ্য হইতে কিছু বাদ দিন কি উহার সঙ্গে কিছু যোগ করুন, পূর্ণতার ইতর বিশেষ হইবে না। যে পূর্ণতা পাওয়া গিয়াছে তাহা কম হইতে পারে, কারণ তাহা সত্যকার পূর্ণতা নয়; যে পূর্ণতার সাধনা করা হইয়াছে তাহা স্থায়ী, কারণ উহা আমাদের সহজাত। ঐ পর্যন্ত পৌঁছাইতে দেরি হইয়াছে, ইহাই আমাদের দোষ। যে পূর্ণতার সাধনা করা হইয়াছে, তাহা আত্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, এখন সেখান হইতে চড়াই-উৎরাইয়ের প্রশ্নই নাই।

যাহা বিরাট, যাহা অনন্ত, যাহা বৃহত্তম, তাহার সঙ্গে একাত্ম হইবার পর যে জীবন স্বাভাবিকরূপে যাপন করা যায়, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য। বাসনা দমন করিবার পরেও তাহা কখনও উদ্বেল হইতে পারে। বাসনার মৃত্যু হইলেও তাহা ভূতের মত ক্লান্ত করিতে পারে। বাসনার তৃপ্তিসাধনের উপায় গ্রহণ করিলে উহা ব্যসনের মত চিরকালের জন্য লাগিয়া থাকে, ও

বাড়িতে থাকে। বাসনাকে যদি ডাকিয়া আনা যায়, তাহা হইলে মনের মধ্যে তাহা গজরাইতে থাকে। বাসনার বিরোধিতা করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তুমি কে? মিত্ররূপে শত্রুতা করিতে আসিয়াছ, না জীবনকে সমৃদ্ধ করার সাধনারূপে আসিয়াছ? বাসনা যতক্ষণ খোলাখুলি ও স্পষ্ট না হয়, ততক্ষণই তাহার মোহ। মোহ আসে অস্পষ্টতা হইতে, আংশিক দর্শন হইতে। বাসনার বশ হইলে প্রধান লাভ হয় অন্ধতা। বাসনার অন্ধ বিরোধও তাহাকে তীব্র করিয়া তোলে। দুই চক্ষে দেখিয়া আমরা বাসনাকে চিনিতে পারি না। মহাদেবের মত ত্রিনয়নে তাহাকে দেখিতে হয়। তবে তাহার শত্রুতা আপনা আপনি শেষ হইয়া যায়।

বাসনার প্রতিরোধ শুধু তপস্যায় হয় না, সত্য কথা বলিতে কি, প্রজ্ঞা স্থির হইলে তবে বাসনার বিরোধই করিতে হয় না।

জীবনে যতক্ষণ আমাদের অপূর্ণতার জ্ঞান আছে, ততক্ষণ ব্রহ্মচর্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিতে পারি না। অপূর্ণতাই ব্রহ্মচর্যের বাধা নয়। বালকের মধ্যে অপূর্ণতা কম নয়। সে নির্মলভাবে জীবনযাপন করে, তাহার অপূর্ণতা স্বাভাবিক ক্রমে কমিতে থাকে। অপূর্ণতার জ্ঞান হইলে মানুষ দ্রুত মূর্খ হইয়া যায়। সাগরের মত পূর্ণ হইলে লহরীর পর লহরী যতই উচ্ছল হউক, যতই লাফাইতে থাকুক, জলরাশি দলে দলে যত ইচ্ছা ছুটিয়া আসুক, সাগরের প্রবাহিত হইবার আবশ্যকতা আর থাকে না। সে 'আত্মনি তৃপ্তঃ', তাই নিজের মর্যাদা লঙ্ঘনের প্রয়োজন আর হয় না। নিজের মর্যাদা জ্ঞানই তাহার নাই; তাই অনায়াসে, অভাবিতরূপে মর্যাদা পালন তাহার দ্বারা হইতে থাকে। ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য।

প্রার্থনা শেষ হইলে, গত চার দিনের স্মৃতিকথা লিখিবার ইচ্ছার তরঙ্গ জাগিল। কিছু লিখিবার পরেই নিদ্রা আসিল।

পরের দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে ভূতের মত আমি যে সমুদ্রতীরে গিয়া বসিতাম, বর্ষা আসিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিল। প্রার্থনার সময়ে সমুদ্রতটে যাইতে যাইতে আবার আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। দক্ষিণ দিক এতখানি পরিষ্কার ও সুন্দর হইয়া গিয়াছিল এবং এতখানি দূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল যে পূর্বদিকে ঘনীভূত মেঘের প্রতি মনে মনে ক্রোধ হইতেছিল। পূর্বদিক যদি দক্ষিণের অনুকরণ করিত, তাহা হইলে উহার কি ক্ষতি হইত?

দক্ষিণ দিকে ত্রিশংকু বরাবর দাঁড়াইয়াছিল। জয় বিজয় তাহার দ্বারপালের কাজ করিতেছিল। 'কৈরীণা' বা মিথ্যা ক্রশ একধারে গিয়া পড়িয়াছিল। উভয়ের মধ্যে এমন কয়েকটি সুন্দর তারা চিকমিক করিতেছিল যে ওয়ার্ধা বা বোম্বাইয়ের লোকদের জীবনে তাহা কখনও দেখিতে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

উত্তর দিকে সপ্তর্ষি পূর্ণ নম্রতার সহিত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রির মত ধ্রুব কখনও কখনও মাটি স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল। স্বাতী ও চিত্রা মাথার উপর চিকমিক করিতেছিল। হস্তা একটু বেঁকা হইয়া গিয়াছিল। পশ্চিম দিকে চন্দ্র অস্ত গিয়াছিল বটে, কিন্তু চন্দ্রিকা তখনও তাহার অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতেছিল। পুনর্বসুর নৌকা হইতে শুধু প্রশ্বনই মেঘ ভেদ করিয়া লাফাইতেছিল। একটি তারা একাকী নিজের স্বভাবের অনুযায়ী প্রশ্বন ও মঘা হইতে বিবাদ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মঘার 'হঁসিয়া' ফাল্গুনীর চতুষ্কোণকে সামলাইতেছিল। পূর্বদিকের বিশাখার নীচে গুরু ও শুক্র শোভা পাইতেছিল। আর এই দুইটি অনেক উঁচুতে চড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া কৃশা অনুরাধা, বক্র জ্যেষ্ঠা ও সুন্দরমূর্তি মূল তাহাদের সাহায্য করিতেছিল। গুরু ও শুক্র যখন পারিজাতের নিকটে আসে তখন এই তিনটির মিলন সুন্দর হয়। মঙ্গল তাহাদের নিকটে নাই বলিয়া দুঃখ হইত না।

ভারতবর্ষের এক জ্যোতির্ময়ী ব্যাখ্যা দেখিতে পাইলাম। কন্যাকুমারীর দক্ষিণে গেলে ধ্রুব দেখা দেয় না; কাশ্মীরের উত্তর দিকে গেলে দক্ষিণে অগস্তি দেখা দেয় না। তাই আমি এই ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছি যে, যে প্রদেশে ধ্রুব ও অগস্তি দুই-ই দেখা যায় তাহাই আমাদের ভারতবর্ষ।

প্রার্থনার পর সকল প্রাণীর উদরপূরণ নামে যে যজ্ঞকর্ম করিতে হয় তাহা আমরাও পূর্ণ করিলাম, এবং স্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়া কুণ্ডে নামিলাম। নূতন ধরণে নির্মিত এই কুণ্ডে সমুদ্রের জল নিরন্তর আসিতেছে। কুণ্ডের অর্ধেক ৪ ফুট গভীর, বাকি অংশ ৮ ফুট গভীর। কাপড় ছাড়িবার জন্য দুইটি কামরাও করা হইয়াছে। এইরূপ সুব্যবস্থা করিলে পুণ্য কম হয়, একথা মনে করা উচিত নয়। স্নানের পর আমরা কন্যাকুমারী দর্শন করিতে গেলাম। মন্দির হিন্দুরাজ্য ত্রিবাঙ্কুরে অবস্থিত বলিয়া হরিজনদের জন্য অনেক কাল হইতে উন্মুক্ত করা হইয়াছে। মন্দিরের দ্বারদেশে সরকারী ঘোষণাপত্র টাঙানো আছে—জন্মের বা ধর্মের দিক দিয়া যে হিন্দু, সে-ই এ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে।

মন্দিরের স্থাপত্য সাদাসিধা, কিন্তু প্রশস্ত। প্রস্তরস্তম্ভের উপর ছত্রের আকারে প্রস্তর আড় করিয়া রাখার জন্য ভিতর হইতে সমস্ত মন্দির গর্ভগৃহের মত মনে হয়। দেবীর মূর্তি পূর্বমুখী, কিন্তু সে দিকের বাহিরের দরজা বন্ধ থাকায় দেবীর সমুদ্রদর্শন হয় না, সমুদ্রেরও দেবীদর্শন হয় না! বেচারি বঙ্গসাগর কখনও নিশ্চয় এরূপ দাবি করে নাই যে সে জন্মের দিক দিয়া বা ধর্মের দিক দিয়া হিন্দু! আর সমুদ্র বলিয়া মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াও সে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না!!

কন্যাকুমারীর আখ্যান বড করুণ। এখানকার তীরে ছড়ানো খইয়ের মত সাদা মোটা মোটা বালু, মাণিক চূর্ণের মত লাল বালুর আবির, আর শোষ-কাগজের মত কাজে লাগে এমন কালো বালু—এ সব প্রাকৃতিক বস্তু সেই করুণ কাহিনীকে আরও করুণ করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। সংসারের সকল মহাকাব্য যদি করুণান্ত হয় তাহা হইলে ভারত মহাসাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কন্যাকুমারীর কথাও করুণান্ত হইবে, ইহা তো যুক্তিযুক্ত। করুণরসে যে গভীরতা আছে, তাহার দ্বারা জীবনের প্রতীতি হইতে পারে।

দুঃখং সত্যং সুখং মায়া, দুঃখং জন্তোঃ পরং ধনম্।
……………………দুঃখং জীবন-হৃদ্‌গতম্॥

চঞ্চল জীবন মনে করে যে সুখই জীবনের অনুভূতি, জীবনের সারসর্বস্ব। এই ভ্রম দূর করিবার ভার দুঃখকে সঁপিয়া দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের নিকটে হার না মানিয়া যে ব্যক্তি দুঃখকে জীবনের সাধনা হিসাবে গ্রহণ করে, সে-ই সুখদুঃখের পারে গিয়া জীবনসমৃদ্ধির আনন্দ ভোগ করিতে পারে। এই আনন্দ সুখদুঃখের অতীত বলিয়া সাগরের মত গভীর ও আকাশের মত অনন্ত।

এই আনন্দের ভাগ্যে কাহারও সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হওয়া লেখা নাই!

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

৬৩

করাচীর পথে

[এক পত্র হইতে]

বোম্বাইতে জাগিবার ঋণ শোধ করিবার জন্য আমি শীঘ্রই শুইয়া পড়িয়াছিলাম। ভোর চারটায় উঠিলাম। স্টীমার দুলিতে দুলিতে অগ্রসর হইতেছিল। এখানে কোথাও মাটি দেখা যাইতেছিল না। উপরে আকাশ আর নীচে জল। জলের উপর মানুষের কতখানি নির্ভর। মাটির দিক হইতে দেখিলে ভাসিতেছে বলিয়া মনে হইলেও দিনরাত ধরিয়া সে সমুদ্র যাত্রা করিতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় জলের নাম জীবন। পিপাসার সময় যাহা পেটে আসে তাহা জীবন; আর ঝড়ের সময় যাহার পেটে আমাদের যাইতে হয় তাহা মরণ।' এই জলের জন্য আমাদের পূরুষেরা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ কল্পনা করেন নাই।

প্রার্থনার জন্য সঙ্গীদের জাগাইব কি না, কিছুক্ষণ ধরিয়া মনে মনে সেই কথা আলোচনা করিলাম। শেষে মনের সঙ্গে এই বোঝাপড়া করিলাম, যে সব শিশু শুইয়া আছে তাহাদের না জাগাইয়া সকলের পক্ষ হইতে একাই চাপা কণ্ঠে প্রার্থনা করিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহার নাম সামূদায়িক প্রার্থনা করিলে চলে কি করিয়া? মনে হইল, যাই, নিকটে যে ক্যানভাসের মোটা পরদা আছে, তাহা সরাইয়া দেখিয়া লই যে প্রার্থনাতে সঙ্গী হইবার জন্য আকাশে কোনও তারা জাগিয়া আছে কি না। অনুরাধা বলিল, 'আমরা এইমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছি। কৃষ্ণচন্দ্রের আসিবার জন্য আয়োজন চাই।'

ইত্যবসরে চন্দ্র তাহার দুই শিং উঁচা করিয়া বলিল, 'তৈয়ারি হইবার জন্য কোনও শিং উঠিতে বাকি নাই। আমি আসিয়াই গিয়াছি।' তাহার বাঁ হাতে পারিজাত, তাহাতে তাহাকে ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে অভিজিত দিগ্‌বলয় হইতে মাথা উঁচু করিল, পরে স্বাতী, অভিজিত

ও পারিজাতের ত্রিকোণ মিলিয়া পূর্বদিগ্‌বলয়ে এক বড় পিরামিড দাঁড়াইয়া গেল। ইহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া আমি আমার প্রার্থনা শেষ করিলাম।

এতক্ষণে চন্দ্র কিছুটা উপরে আসিল, আর আমাদের জাহাজ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের পা পর্যন্ত এক সোনালি পটি জলের উপর চমক দিতে লাগিল। মনে হইল, চন্দ্রলোকে যাইবার এ কেমন সহজ ও সরল পথ। যেটুকু দেরি তাহা শুধু জাহাজ হইতে নামিয়া রওনা হওয়ার। কিন্তু পশ্চিম দেশের লোকেরা বলে, চন্দ্রলোকে শুধু পাগলেরাই থাকে। তাই আবার ভাবিলাম, এতখানি পরিশ্রমের পর যদি সেখানে আমার সহধর্মী ও জাতিভাইদেরই সঙ্গে দেখা হয়, তবে এসব কষ্ট কেন সহ্য করা?

* * *

আকাশের মেঘ আমার বড় ভাল লাগে। ছোট হউক বড় হউক, শাদা হউক আর কালো হউক, সম্পূর্ণ হউক আর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হউক, মেঘ আমাকে আনন্দই দেয়। কিন্তু রাত্রিবেলার মেঘ আমার মোটেই ভাল লাগে না। তাহার আকার ও বর্ণ যতই মনে লাগুক, কিন্তু তারাগুলির মধ্যে সে যে ভূতের মত—অথবা হত্যাকারীর মত—লুকাইয়া লুকাইয়া চলে, ইহা আমার ভাল লাগে না।

উষাকালের প্রথমভাগে আকাশ কতখানি সাত্ত্বিক ও রমণীয় মনে হইতেছিল! জ্যোৎস্না সাগরের ঢেউ—ঢেউ বা বলি কেন?—অসহায় বীচিমালা, অথবা সাগরপিতার মুখে লঘু হাস্যের চিহ্নগুলি—ঠিক গোনা যাইতে পারে এতখানি স্পষ্ট ছিল। কিন্তু এই মেঘগুলি বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট, মধ্য পথে আসিয়া সব কিছু গোলমাল করিয়া দিল।

আমরা প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছিলাম। পূর্বদিকে, অর্থাৎ আমাদের দক্ষিণে, মাটি সত্যই দেখা যাইতেছিল, না উহা দৃষ্টিভ্রম, এই ধাঁধায় পড়িতেছিলাম। এতক্ষণে হঠাৎ আলো দেখা গেল। বিশ্বাস হইল যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারিকার নিকটে পৌঁছিয়াছি। একটু পরেই দ্বিতীয় আলোকপুঞ্জ চমক দিতে দেখা গেল। উহাতে এক দীপস্তম্ভের আলো বৃদ্ধের স্মৃতির মত মাঝে মাঝে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তাহার পর একটা কলের চিমনির ধুঁয়ার এক শান্ত নদী, ক্ষিতিবলয়ের সঙ্গে সমান্তর হইয়া বহিতে লাগিল।

আকাশের তারা দেখিয়া তোমার কথা মনে হইল। জানি না, প্রভাতের উষার সঙ্গে তোমার কি বন্ধুত্ব? আমাদের দেখা হওয়ার পূর্বেই বোরডীতে আমি পূর্বদিকের নাম দিয়াছিলাম অনসূয়া। 'জীবননো আনন্দে' 'অনসূয়া প্রাচী'র উপর যে মন্তব্য আছে তাহা অবশ্য দেখিও।

৩০-১২-'৩৭

৬৪

সমুদ্রে পৃষ্ঠে

[কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন যাওয়ার পথে]

বিকাল চারিটা হইবে। আমাদের জাহাজ রওয়ানা হইয়াছে। রোদের প্রকোপ কমিয়াছে। মন্দ মন্দ হাওয়া বহিতেছে। জলের উপর সূর্যের ছবি নাচিতেছে। তাহার আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে। লাল লাল বয়াতে সারি সারি জাহাজ অগ্রসর হইতেছে। দুই পাশেই জাহাজ দেখা যাইতেছে, ছোট ছোট নৌকা দেখা যাইতেছে। ফোর্ট উইলিয়ামের কেল্লা ছাড়িয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। কোনও কোনও বন্দরে ছোট ছোট জাহাজ তৈরি হইতেছিল। দুইদিকের জমি জলের স্রোত হইতে বেশি উঁচু নয়। তাই দুই দিকেই অনেক দূরবর্তী স্থান দেখা দিতেছিল। কিন্তু চিত্তের তৃপ্তিসাধন হয় এমন কোনও দৃশ্য ছিল না। এই ধরণের বড় বড় নদী যেখানে সমুদ্রে মিলিতে যায়, সেই অঞ্চলের তীরদেশে বড় আবর্জনা থাকে। জোয়ার ভাটার জন্য ভিজা বালুর মধ্যে কাঁকড়ারা দৌড়ধাপ করিতেছে, এ ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না।

আমরা যতই অগ্রসর হইতেছিলাম, নদীও ততই প্রশান্ত আকার ধারণ করিতেছিল। যখন দূরে সমুদ্রতীরে সাদা বালুকা দেখিলাম, তখন মনে কিছু শান্তি অনুভব করিলাম। সুন্দরবন অঞ্চল পার হইলাম। রাত্রি হইবার পূর্বেই আমরা ডায়মণ্ডহারবারের নিকটে আসিয়া পৌছিলাম। আমাদের জাহাজ এখন ঢেউয়ের সঙ্গে দুলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দেরি করিয়া জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমরা হিন্দুস্থানের তীর দৃশ্যপথ

হইতে লুপ্ত হইতে দেখিলাম। কিন্তু পরে মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাই আহারাদি শেষ করিয়া আমরা শুইয়া পড়িলাম। শোওয়ার পূর্বে প্রার্থনার শেষে গিরিধারী রবীন্দ্রনাথের আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এই সুন্দর গীতটি গান করিলেন। শুনিবার জন্য অনেক লোক জুটিয়া গেল, আর সেই গানের প্রভাবে আমাদের বিছানা ভাল করিয়া পাতিবার কথায় কাহারও হিংসা হইল না।

ভোরে সকলের পূর্বে জাগিলাম। তখন অরুণদেবেরও উদয় হয় নাই। আকাশে যেমন চাঁদ চলে, জাহাজও তেমনই একা একা জল কাটিতে কাটিতে চলিতেছিল। তখনকার শান্তি ছিল কি বিচিত্র! জাহাজের পেটে যন্ত্ররূপী তাহার হৃদয় যদি তাহার কম্পন না শুনাইত, তবে বাহিরের শান্তি এত সুন্দর মনে হইত না। চারিদিকে সমুদ্র যেন লোহা বা সীসার ঠাণ্ডা রসের মত ছড়াইয়া ছিল। আমি গিয়া জাহাজের উপর দাঁড়াইলাম। জাহাজের দোলার সঙ্গে সঙ্গে জল উপরে উঠিত আর নীচে নামিত। চারি দিকে শুধু ঢেউ আর ঢেউ! ঢেউয়ে ঢেউয়ে যখন পরস্পর ঠোকাঠুকি লাগিত তখন তাহার মধ্য হইতে ফেনা বাহির হইত। অন্ধকারেও এই ফেনা জ্বলিয়া উঠিত, আর আলোর সোজা বাঁকা রেখা দিয়া নানা প্রকারের আকৃতি তৈরি হইত। জাহাজ দুলিয়া উঠিলে তাহার প্রভাব আমাদের মনে কাজ করিত। তাহার মধ্যে যদি আমরা ঢেউয়ের অখণ্ড ও সনাতন নৃত্যের লীলা দেখিতে থাকি তবে তাহার নেশা বাড়িতেই থাকিবে।

আগে গিয়া ঢেউ ওঠা বন্ধ হইয়া গেল। সাগরের হৃদয়, জায়গায় জায়গায় উপরে উঠিত আর নীচে নামিত। সাধারণতঃ ঢেউ উপরে উঠিতেছে আর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখিলে এক ধরণের আনন্দ বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে অতখানি গাম্ভীর্য থাকে না। ধ্বনিকাব্যের রহস্য যেমন শব্দের মধ্যে স্পষ্ট করিতে গিয়া কমিয়া যায়, ঢেউয়ের ভাঙ্গানেও তেমনি। কিন্তু ঢেউ যখন ভিতরে ভিতরে উচ্ছল হইয়া ওঠে, আর তাহার পর মিলাইয়া যায়, তখন তাহার ভঙ্গী নানারূপ, অনন্ত, অস্পষ্ট, বা অব্যক্ত হইয়া যায়। অন্ধকার হইলে ও হাওয়া পরিষ্কার থাকিলে, ব্যোম ও সাগরের মিলনবর্তুল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। ক্ষিতি বলয়ের নিকটে ঢেউয়ের প্রশ্নই থাকে না। সমুদ্রের কালিমার তুলনায় অন্ধকার আকাশও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়।

বৈদিক যুগের ঋষিরা যেমন জীবনরহস্য দেখাইয়া থাকিবেন, রাত্রিকালে ক্ষিতিবলয়ও তেমন ভাবে দেখা দেয়। পার্থিব জীবনের ভবিষ্যৎকাল যখন তাঁহাদের আর্যদৃষ্টির সম্মুখেও সাগরের বারিবাশির সমান অজ্ঞাত ও অব্যক্ত থাকিয়া যায়, তখন ঋষিদের অনন্ত কালের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনন্ত আকাশে দীপ্যমান তারার সমান স্পষ্ট দেখা যায়।

দৃষ্টি ও কল্পনার খেলা এমন ভাবেই চলিতেছিল, ততক্ষণ

'আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।'

এই শোভা কমিয়া আসিতে লাগিল, আর অরুণোদয় পূর্বদিক নিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত করিয়া দিল। এই কাব্য দেখাইবার জন্য জীবতরাম কৃপালানীকে জাগাইলাম। কিন্তু তাহার উঠিবার পূর্বেই গিরিধারী জাগিয়া বলিতে লাগিল, 'আমাকে বলুন, কি হইয়াছে আমাকে বলুন।' আরে, আমি আর তাহাকে কি বুঝাইব? ওখানে তো কোনও পাখি বা জাহাজ ছিল না যে আঙুল দিয়া কিছু দেখাইব বা বুঝাইব? আমি তাহাকে বলিলাম, ঐ যে লাল আকাশ দেখা যাইতেছে, তাহার দিকে তাকাও; অল্পক্ষণ পরেই ওখানে সূর্যোদয় হইবে।

এখন সমুদ্র তাহার রং বদলাইল। পূর্বদিক হইতে যেন লাল রংয়ের প্রপাত বহিয়া আসিতেছিল। আর কি আশ্চর্য, পশ্চিম দিকেও ঐ বর্ণের প্রতিক্রিয়া হইতেছিল। অবশ্য পশ্চিমদিকে সমুদ্র অপেক্ষা আকাশই ঐ রং বেশি গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্বদিকের প্রসন্নতা বাড়িতে লাগিল। লাল রংয়ে চমক লাগিল। কুঙ্কুমের সিন্দুর হইল, সিন্দুর হইতে হইল স্বর্ণ। আমরা যাহারা বোম্বাই অঞ্চলে থাকি তাহারা পশ্চিম পারের সমুদ্রে সূর্যাস্তের শোভা বহুবার দেখিতে পারি, কিন্তু সাগরমন্থনে উদিত লক্ষ্মীর মত উদীয়মান উষার বর্ধমান শোভা দেখিবার আনন্দের কোনও তুলনা নাই। আকাশ যেমন হাসিতে লাগিল, সমুদ্রের মুখের উপর আনন্দ ও লজ্জার রেখা বাড়িতে লাগিল, যেন সমবয়স্ক নবযুবকদের মধ্যে হাস্যকৌতুক চলিতেছে।

একদিকে প্রভাতের এই বিকাশ দেখিবার জন্য মন লালায়িত, অন্যদিকে জাহাজের এই দোলনে মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে হইল, অল্পক্ষণের জন্য যদি ঢেউগুলি বন্ধ হইয়া যায় ও জাহাজ স্থির হয় তবে কতই না ভাল হয়। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ ও মানুষের মনোরথ কখনও কি বন্ধ হয়? আরাম কেদারায়

শুইয়া পড়িব ভাবিতেছি, ততক্ষণে বালসূর্যবিম্ব জলে স্নান করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। উদীয়মান সূর্যের বিম্বের উপর এক বিশেষ তরলতা আছে; সূর্য যেন ঠাণ্ডা জলের মধ্য হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিতেছে। আর জলে যে আলো ছড়াইয়া পড়ে তাহা দেখিয়া মনে হয় উহা বুঝি সূর্যের গাত্রধৌত অঙ্গরাগ। সমগ্র সূর্যবিম্ব বাহিরে আসিলে আমি সূর্যনারায়ণের ধ্যানমন্ত্র গাহিলাম ; ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী ইত্যাদি।

জীবতরামের এ-প্রকার গম্ভীরভাব একটুও সহ্য হয় না। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, থামুন, কোথাকার বানরভাষা বলিতেছেন। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি ভুল করিতেছেন। ইহা আপনার ভাষা নয়, ইহা সংস্কৃত। হাস্যকৌতুকের মধ্যে ভক্তির ভাব নষ্ট হইয়া গেল। প্রার্থনা যেমন তেমন করিয়া শেষ হইল। আর জাহাজে রোজ যেমন ভাবে চলিতে হয় সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিলাম। শৌচের জন্য জাহাজের উপর হইতে নীচে যাইতে হয়। নীচের অংশ পূর্বের মত সর্বদাই ময়লা থাকে।

কিন্তু প্রাতঃকালে উহা যেন নরকের সঙ্গে সমান হইতে যায়। সেখানকার হাওয়া দুর্গন্ধযুক্ত ও লবণাক্ত। লোকে জায়গায় জায়গায় বমি করিয়া দেয়। ইঞ্জিনের ভাপ হইতে এক রকমের দুর্গন্ধ বাহির হয়, আর ঠিক সেই সময় খালাসিদের রান্নাঘর হইতে আসে পেঁয়াজ ও মাছের দুর্গন্ধ—উভয়ের মিশ্রণের মধ্য দিয়া পার হইয়া শৌচকূপে প্রবেশ করার অপেক্ষা সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া আমার নিকটে কম কষ্টের বলিয়া মনে হয়। সাধ্য থাকিলে আমি তিনদিন ধরিয়া শৌচের জন্য যাওয়াই ছাড়িয়া দিতাম। কিন্তু—

হইয়া তো আসিলাম, কিন্তু আমাদের তিনজনের চেহারা এমন হইয়া গেল যে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া দেখিবারও ইচ্ছা রহিল না। কোনও এক দল ঝগড়া করিবার জন্য গিয়া যখন খুব মার খাইয়া ফিরিয়া আসে, তখন যেমন নিজেদের সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করে না, তেমনই আমরা এই ব্যাপারের নাম পর্যন্ত করি নাই।

গিরিধারীকে বলিলাম, চল, খাইতে বসি। সে বলিল, আমার ক্ষুধা নাই। জীবতরামও খাইতে চাহিল না। আমি বলিলাম, মহাশয়, রোদ বাড়িবে, আর মাথা ঘুরিতে থাকিবে। তখন আর খাওয়া সম্ভব হইবে না। এখন ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় পেট ভরিয়া খাইয়া লও। রোদ উঠিবার আগে সব হজম হইয়া

যাইবে। গিরিধারী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ব্যায়াম না করিয়াই সব হজম হইয়া যাইবে ? আমি উত্তর করিলাম, আমাদের সকলের হইয়া এই জাহাজই ব্যায়াম করিতেছে। তাই তুমি আর চেষ্টা করিও না। গিরিধারী আমার কথা বুঝিতে পারিল না। সে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তিনজনে পেট ভরিয়া খাইলাম। তিনজনের মধ্যে জীবতরাম পাকা লোক। সে কেবল রসাল ফলই খাইল। আমি নিজের পছন্দমত খাইয়া উপর হইতে একটা গোটা লেবু চুষিয়া লইলাম। বেচারি গিরিধারী ভাল কলা পাইয়া তাহাতে জমিয়া গেল। সে পেট ভরিয়া কলাই খাইল। কিন্তু দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই সে এতখানি পস্তাইল যে এই যাত্রায় সে আর কলার নাম পর্যন্ত করিল না।

বেলা দ্বিপ্রহর হইল। আমি নিজের দুর্বলতা জানিতাম। আমি আমার বিছানায় হাত পা মেলিয়া শুইয়া পড়িলাম। হাতে আর একটা লেবু লইয়া চোখ বুজিয়া রহিলাম। মাদ্রাজের দিক হইতে হয়তো কোনও জাহাজ কলিকাতায় যাইতেছে। তাহা দূর হইতে দেখিয়া লোকেরা বলিতে লাগিল, 'ওই দেখ জাহাজ, ওই দেখ জাহাজ।' ততক্ষণ দুই জাহাজ 'ভোঁ ওঁ……'করিয়া পরস্পরকে অভিবাদন করিল। কিন্তু আমি তো চোখ বুজিয়া কল্পনার সাহায্যেই এই সমস্ত দৃশ্য দেখিয়া লইলাম। গিরিধারী থাকিতে পারিল না। সে চট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যেমনই দাঁড়াইল, অমনি তাহার কলাগুলি আর পেটে থাকিতে চাহিল না। সে ঘাবড়াইয়া গেল। আমি শুইয়া শুইয়াই তাহাকে জল দিলাম। আদার টুকরা দিলাম। একটু কমিলেই সে আমার বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু পেট একবার বিগড়াইলে তাহা কি আর শীঘ্র শান্ত হইতে পারে ?

আমরা ডেকের উপর শুইয়াছিলাম। সেখানে একদিকে উপরের কেবিনে দুইজন দেশীয় খ্রীষ্টান বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের বমি হইতে থাকিল। তিনি যেমন যেমন বমি করিতেছিলেন, তেমন তেমন তাঁহার বন্ধু ঠাট্টা করিতেছিলেন। বন্ধুর 'বন হিগিন্‌স্‌, বমি করবে,' ইত্যাদি কথা তাহার বমি অপেক্ষাও জোরে বাহির হইতে লাগিল। গিরিধারী ঘণ্টাখানেক হাসিয়া লইল, পরে পস্তাইয়াছিল।

এই সব করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যাবেলায় আমার দেহে

খানিকটা প্রাণ আসিল। আমরা আবার কিছু খাইয়া লইলাম, কিন্তু তাহা কাহারও অনুকূল হইল না। বসিয়া বসিয়াই সন্ধ্যার শোভা দেখিলাম। লোকে বলিতেছিল, এখন আমরা কালাপাণিতে পড়িয়াছি। সত্য সত্যই জলের রং দেখিয়া ভয় লাগিত, জল এমন কালো ছিল। লোকে বলিল, এখন আন্দামান দেখা যাইবে। কেহ বলিল, না, আমাদের জাহাজ উহা হইতে অনেক দূরে আছে, ঐ দ্বীপটি দেখা যাইবে না।

সন্ধ্যার শোভা কিছুটা বিচিত্রই ছিল। প্রাতঃকালের বর্ণ আর সন্ধ্যার বর্ণ সমান হয় না। উদয় আর অস্ত কি সমান হইতে পারে? উদয় বাল্য-কাল, তাহার বৃদ্ধি আছে, আর অস্ত হইল বিজয়ী বীরের নিধনের মত শোকপূর্ণ। উষার মুখে খেলে মুগ্ধ হাস্য আর সন্ধ্যার মুখমুদ্রায় আছে ক্ষণিকের উল্লাস ও বিলাস। সমুদ্রের রং আবার বদলাইতে লাগিল। সূর্য অস্ত গেলেন আর দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে তারার পারিজাত ফুটিতে লাগিল।

জাহাজের উপর বিজলির সুন্দর আলো তো কতক্ষণ হইতেই জলিতেছিল। আমার ছেলেবেলা হইতেই এই আলো পছন্দ। উহা এতই শান্ত যে নিকটের সব বস্তু দেখা যাইতেছিল; কিন্তু তাহাতে চোখ ধাঁধিয়া যাইতেছিল না। অন্ধকার নষ্ট করিয়া নিজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার উচ্চাকাংক্ষা এই সব আলোর ছিল না। অন্ধকারের সঙ্গে মোটামুটি বোঝাপড়া করিয়া 'তুমিও থাক, আমিও থাকি' এই জীবন-নীতিই ছিল ইহাদের প্রিয়। শহরের বিদ্যুতের আলো নবীন অধ্যাপকের মত নিজের সমস্ত জ্যোতি উড়াইয়া দিতে চায়; জাহাজের বাতি হইল যোগীর মত 'আত্মন্যেব সন্তুষ্টঃ', নিজেই নিজেতে সন্তুষ্ট।

বিছানায় শুইয়া শুইয়া আমরা এই সব বাতির কথা বলিতেছিলাম। এমন সময়ে আমাদের জাহাজ ভোঁ-ওঁ করিয়া ডাক ছাড়িল। আমার বুঝিতে দেরি হইল না যে উহা কোথাও অন্য একটা জাহাজ দেখিয়া থাকিবে। দূরে আবার সেই ডাক। আমি উঠিয়া বসিলাম। রাত্রিবেলা সমুদ্রে জাহাজ দেখিতে আমার বড় ভাল লাগে। বিদ্যুতের এক দীর্ঘ সারি আর উঁচু মাস্তলের উপর টাঙানো দুইটি লাল বড় আলো ভূতের মত যখন অন্ধকারের মধ্য দিয়া দৌড়ায়, তখন মনে হয় যেন পরীদের জগতে প্রবেশ করিয়াছি। জাহাজ যেমন যেমন আপনার গতি বদলায় তেমন তেমন নূতন নূতন ধরণে সামনের দৃশ্য ফুটিয়া ওঠে। জাহাজ যখন দূরে চলিয়া যায় ও দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যাইতে

আরম্ভ করে, তখন সে দৃশ্য নিদ্রার জন্য চলমান স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্যকার চোখ বোজার মতই বলিয়া মনে হয়। আকাশের তারার দিকে চাহিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তৃতীয় দিন সকালে বৃষ্টি হইতে লাগিল। জাহাজের এক খ্রীষ্টান কর্মচারী আসিয়া আমাদের সকলকে নীচে যাইতে বলিল। লোকে ইহার কারণ শীঘ্র বুঝিতে পারিল না। সে বলিল, একটা বড় ঘূর্ণি আগ্নেয় কোণ হইতে এদিকে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহার নাম সাইক্লোন,। জাহাজ সাইক্লোনের মধ্যে আসিয়া পড়িলে বড় অনর্থ। অনেক জাহাজ সাইক্লোনের চক্রে আসিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। কর্মচারীটি বলিল, যদি আপনারা ডেকে বসিয়া থাকেন তবে হয়তো এই আঁধি আপনাদের উড়াইয়া লইয়া যাইতেও পারে। লোকে একে একে সবাই ভয়ে ভয়ে নীচে নামিয়া গেল। আমরা পরিষ্কার জানাইলাম, নীচে যাইব না। সে আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিল। আমরা বলিলাম, আঁধি আসিলে এই সব বড় বড় দড়াদড়ি ধরিয়া থাকিব।

'কিন্তু বর্ষায় আপনারা ভিজিয়া যাইবেন।'

'ভিজিলে আবার শুকাইয়া যাইবে।'

আমাদের জেদ দেখিয়া সে চলিয়া গেল। জল আসিল। খুব ভাল জল। তিনচার মাইল জুড়িয়া আঁধির সীমা। সৌভাগ্যবশত উহা আমাদের জাহজ পর্যন্ত আসে নাই। ধূমকেতুর মত উহার চারিদিকে লেজ থাকে, এমন এক লেজের বাড়ি আমাদের জাহাজ পর্যন্ত কিছুটা লাগিল। আমরা খুব ভিজিয়া গেলাম। তাহার পর নীচে না নামিয়া উপরে কেবিনে গিয়া বসিলাম।

অবশেষে রেঙ্গুন আসিল। যাহারা ঘাটে নামিবে এবং তাহাদের লইয়া যাইবার জন্য যে সব বন্ধু ও প্রিয়জন আসিয়াছিল, তাহাদের ভিড়ের শেষ নাই। ডাঃ প্রাণজীবন মেহেতো নিজে আমাদের লইয়া যাইবার জন্য বন্দরে আসিয়াছিলেন। জানিলাম যে রেঙ্গুনে জায়গায় জায়গায় রবারের রাস্তা আছে। তাই গাড়িগুলি দৌড়াইয়া চলে, আর শুধু ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শোনা যায়।

ঐ দিন ঠিক মনে হইতেছিল যেন পায়ের নীচে মাটি দুলিতেছে। একদিন বিশ্রাম করিবার পর হইতে তিন দিনের সমুদ্র নামিয়া যাইতে পারিল।

মার্চ ১৯২৭

৬৫

সরোবিহার

আমাদের রেঙ্গুনের নিকটবর্তী বিখ্যাত সরোবর বা লেক দেখিবার ছিল। ইউরোপখণ্ডের আকৃতির মত এই সরোবরের আকারও টেরা বাঁকা। উহাতে অনেকগুলি খাঁড়ি, অন্তরীপ ও জলডমরুমধ্য আছে। রেঙ্গুন কোংকনেরই অক্ষাংশের উপর অবস্থিত, সমুদ্রের নিকেটেও, এইজন্য সেখানকার বনশ্রীও আমার মনে কোংকণের-ই মত আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল। চারিদিকে বড় বড় গাছ। সৃষ্টি যেন তাহার সৌন্দর্য দেখাইবার জন্য বাহির হইয়া আসিয়াছে। বনশ্রী ও জলদেবতার যেখানে মিলন হয়, সেখানে লক্ষ্মী না ডাকিলেও আসেন। আমরা বেলা তিন প্রহরে সেই সরোবরের নিকটে গিয়া পৌছিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তীরে তীরে ঘুরিলাম। সরোবরের সৌন্দর্য প্রতি কোণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মনে হইতেছিল। কয়েকটি রূপগর্বিত বৃক্ষ সর্বক্ষণ সরোবরের দর্পণে নিজেদের রূপ দর্শন করিতেছিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের ধৈর্য শেষ হইয়া আসিল। সরোবর তো ঈশ্বর নৌকাবিহারের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। হাবসি 'জন'কে ডাকাইয়া আমরা তাহার নৌকায় গিয়া বসিলাম, আর বিনা উদ্দেশ্যে নানা দিকে ঘুরিতে লাগিলাম। মধ্যখানে ছিল একটা দ্বীপ। তাহা না দেখিয়া কি করিয়াই বা ফিরিতে পারা যাইত? দ্বীপের উপর এক সুন্দর আরামগৃহ সজ্জিত ছিল। তাহার সিঁড়ির দুই দেওয়ালের উপর সিমেন্টের তৈয়ারি দুই ভয়ানক অজগর লম্বা হইয়া পড়িয়াছিল। নৌকা চালাইতে চালাইতে মোড় একবার ফিরিতেই সোয়ে ড্যাগন প্যাগোডা তাহার উচ্চ চূড়াসহ দেখা দেয়। আগরার কেল্লা হইতে তাজমহল দেখিতে যে মজা পাওয়া যায়, এখানেও তেমনই মজা হইতেছিল। বস্তুর নিকটে গেলে তাহার পূর্ণ সৌন্দর্য প্রকট হয়, কিন্তু তাহার কাব্য তো দূর হইতেই খোলে। এই আনন্দ জানে বলিয়াই কি চন্দ্র সূর্য ও অগণিত তারা আমাদের নিকট হইতে এত দূরে দূরে বিচরণ করে?

সন্ধ্যা হইয়াছে বলিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল।

সরোবর শকুন্তলার মত আমাদিগকে ফিরিয়া আসিবার নিমন্ত্রণ তো অবশ্যই করিয়াছিল। তাই পরের দিন স্নানের কার্যক্রম স্থির করিয়া আমাদের এক বড় দল সেখানে যাওয়ার জন্য রওনা হইল। সেখানে পৌছিবার পর আমাদের সহরের লোকেরা বুঝাইল, গোরাদের বোটিং ক্লাবের জন্য সরোবরে স্নান করা বারণ। ভোর হইতেই যেমন কুমুদ বন্ধ হইয়া যায়, আমার উৎসাহ তেমনি মিটিয়া গেল। এতখানি পরিশ্রমের পর রসপূর্ণ স্নিগ্ধ সরোবরে স্নান করিবার আনন্দে বঞ্চিত হইতে কাহার ভাল লাগে? কিন্তু আমাদের সঙ্গীরা সত্যাগ্রহী বিশেষ ছিলেন না! খোলাখুলি আইনের বিরোধ না করিয়া চুপচাপ আইন ভঙ্গ করাই তাঁহারা ভালবাসিতেন। তাঁহারা অনেক পূর্ব হইতেই এমন এক নিভৃত স্থান খুঁজিয়া লইলেন যেখানে গোরাদের নৌকা কি তাহাদের দৃষ্টি কিছুই পৌছিতে পারিল না। আমি এখানে আসিতেই দেখিলাম যে এই স্থানের সৌন্দর্য অন্য স্থানের অপেক্ষা কম নয়। গোপনে চুরি করিয়া স্নান করিলে অভূতপূর্ব আনন্দ মনে হয়। গিরিধারী সাঁতার দিতে জানিত না, তাহার হাতে খড়িও এখানেই হইল। জলে সাঁতার দিতে দিতে যে অনুভূতি সর্বপ্রথমে আসে, তাহার যদি কোনও উপমা দিতে হয়, তাহা হইলে ডিম ভাঙ্গিয়া বহিরাগত পক্ষীর আনন্দের উপমাই দেওয়া যাইতে পারে। রৌদ্র প্রচণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু তবু গিরিধারী উঠিয়া আসিবার নাম পর্যন্ত করে না। আরও আধঘণ্টা জলে থাকিবার জন্য সে আমাকে ইংরাজিতে মিনতি করিতে লাগিল। তাহা না মানিলে সে বাংলায় মিনতি করিত, যেন ভাষা বদলাইলে মিনতির অনেক জোর হয়! তাহাকে আমি নারাজ করি কি করিয়া? আমরা ইচ্ছামত জলবিহার করিলাম।

যযাতিরও যখন জীবনের আনন্দ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তখন আমাদের সাঁতার দেওয়ার আনন্দের শেষ হইবে, তাহাতে আশ্চর্যই বা কি? ক্লান্ত কিন্তু লঘু দেহ লইয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। পথে ছিল আনারসের বাগান। মনে হইতেছিল যেন বহু দূর হইতে কণ্টকময় আনারসের ফোয়ারাই মাটির মধ্য হইতে উপরের দিকে ছুটিতেছিল। আনারসের এত বড় বাগান আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই, তাই পেটে ক্ষুধা হইলেও আর এখানকার আনারস প্রাপ্তির কোনও আশা না থাকিলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা উহা দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলাম।

মার্চ ১৯২৭

সুবর্ণদেশের মাতা ঐরাবতী

ঈরাবতী বলিব, না ঐরাবতী? আমি তো বুঝি যে ঈরা নামে ঘাস হইতেই নদীর নামকরণ হইয়াছিল ঈরাবতী। নদীর ধারে ধারে পুষ্টিকর ঘাস খাইয়া মদমত্ত হইয়াছিল যে হাতী, তাহার নাম হইয়াছিল হয়তো ঐরাবত; অথবা ইন্দ্রের ঐরাবতের মত মহাকায় ও গজেন্দ্রগতি এই নদী দেখিয়া কোনও বৌদ্ধ ভিক্ষুর মনে হইয়া থাকিবে, 'চল, ইহাকে আমরা ঐরাবতী বলি।'

কিন্তু ঐতিহাসিক কল্পনা তরঙ্গে ভাসিয়া যাওয়া অলস লোকের কাজ। পথিকদের তাহা পোষায় না।

ঐরাবতী নদী যদি ভারতবর্ষ হইত, তাহা হইলে সংস্কৃত কবিরা তাহার বিষয়ে ঐরাবতীর মতই লম্বা চওড়া কাব্যপ্রবাহ বহাইয়া দিত। ব্রহ্মদেশের কবিরা তাঁহাদের এই মাতার বিষয়ে অনেক কাব্য যদি লিখিয়াও থাকেন তাহা হইলেও আমরা তাহার সন্ধান রাখি না। ব্রহ্মের ভাষা আমাদের জন্মভাষা নয়, শাস্ত্রভাষা নয়, রাজভাষাও নয়। আমাদের প্রতিবেশীদের ভাষা শিখিবার প্রবৃত্তিই বা আমাদের মধ্যে কোথায়? বহু বৎসর ধরিয়া বিদেশে থাকিলে আমরা সেখানকার ভাষা বলিতে পারি, কিন্তু সে ভাষার সাহিত্যের আস্বাদ লইবার জন্য যে পরিশ্রম তাহা আমরা কখনও করি না। কোনও ইংরেজ ব্রহ্মের ভাষা শিখিয়া ব্রহ্মের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া আমাদের দিলে তবে হয়তো আমরা উহা পড়িতে পারি।

যে কোনও দেশ ঐরাবতীর মত নদী লইয়া গর্ব করিতে পারে বা তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হইতে পারে। ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুনের উত্তরদিকে সোজা মান্দালয় পর্যন্ত আমরা রেলওয়ে ট্রেনে গিয়াছিলাম। তাহার নিকটে অমরাপুরায় গিয়া আমরা ঐরাবতীর দর্শন প্রথম পাই। যদি পূর্ব হইতেই জানিতাম যে অমরাপুরার নিকটে প্রচণ্ড বৌদ্ধমূর্তিগুলি আছে, তাহা হইলে আমরা ভগবান বুদ্ধের দর্শন হইতেই ঐরাবতী বিহার আরম্ভ করিতাম।

এখানেও নদীর পাট খুব প্রশস্ত। নদীর প্রবাহ ধীরোদাত্ত গজেন্দ্রগমনে চলিয়াছে। এমন নদীর পিঠে নৌকা বা 'ওয়াফরে' (স্টীমার) বসিয়া ভ্রমণ করা জীবনের এক পরম সৌভাগ্য।

অমরাপুরা হইতে মান্দালয় ফিরিয়া আমরা 'ওয়াফরে' গিয়া বসিলাম। সমুদ্রে ভ্রমণ এক ধরণের, নদীতে ভ্রমণ অন্য ধরণের। নদীতে সমুদ্রের মত ঢেউ নাই। দুই পাশের তীর আমাদের সঙ্গ দিতে দিতে চলিয়াছে। এমন মনে হয় না যে নামে জীবন অথচ প্রাণহন্তা এক মহাভূতের ফাঁদের মধ্যে আমরা ধরা দিয়াছি। পৃথিবীর গোলকে হাওয়ার মধ্যে চলার মত সনাতন ভ্রমণের সমানই নদীবিহার শান্ত ও আনন্দদায়ী। আজও যখন এই ঐরাবতীতে ভ্রমণের কথা মনে পড়ে, তখন একসঙ্গে সকলের কথাই মনে আসে—দ্রৌপদীর মত অভিমানী নর্মদার চাণোদ-কর্ণালী অভিমুখে যাত্রা, সীতার মত তাপ্তীর সাগরসঙ্গমে যাত্রা, কাশীতলবাহিনী ভারতমাতা গঙ্গার যাত্রা, মথুরা-বৃন্দাবনের কৃষ্ণসখী কালিন্দীর যাত্রা, কাশ্মীরের নন্দনবনে পার্বতী বিতস্তার যাত্রা, বনশ্রীর ভাণ্ডারসদৃশ গোমন্তক প্রদেশ ও কেরলের জলযাত্রা। ইহাদের মধ্যেও মনের পক্ষে তৃপ্তিকর দীর্ঘ ভ্রমণ তো হইল বিতস্তা ও ঐরাবতীর মধ্যে ভ্রমণ। ঐরাবতী নদী সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ও নর্মদার সমতুল্য। ঐরাবতীর পাট ও স্রোত দেখিলেই মনে হয় যেন কোনও মহান সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করিবার জন্য ইনি কোনও সম্রাজ্ঞী! আরাকান ও পেগুয়োমা ঐরাবতীকে অবশ্য রক্ষা করিতেছে, কিন্তু ঐরাবতীর মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ইহারা সবিনয়ে দূরেই দাঁড়াইয়া আছে।

আমাদের জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যা হইতেই যেমন কামধেনুর বৎস মায়ের নিকট দৌড়াইয়া আসে, আশেপাশের বিস্তীর্ণ প্রদেশের কৃষি-শ্রমিকেরাও তেমনই দলে দলে ঐরাবতীর তীরে একত্র হয়। আমাদের জাহাজ ছিল যেন একটি চলন্ত বাজার। কোনও ছোটখাট বন্দর আসিলে উহা সেখানকার লোকদের নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বাঁশী বাজায়। বাস, পিপীলিকার মত ভিড় করিয়া লোকেরা দৌড়িতে দৌড়িতে আসে আর নানা-প্রকারের পানাহারের বস্তু, কাপড়, বেতের বাসন, হাতের কাজের ও অন্যান্য বস্তু জাহাজের উপর ছড়াইয়া রাখে। জাহাজেও অনেক ব্যবসায়ী নিজের নিজের জিনিসপত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়াই থাকে। পাখীর কলরবের মত

লেনদেনের হৈ-চৈ ওঠে। আমরা যদি ভাষা বুঝিতাম তবে এই হৈ-চৈতে জমিয়া যাইতাম। কিন্তু এখানে তো লোকে লড়াই-ঝগড়াই করুক আর চীৎকার করুক বা কাঁদুক, আমাদের পক্ষে সবই এক। একটা বড় নাটকের যেন অভিনয় হইতেছে। বিনিময় শেষ হইতেই জাহাজ ছাড়িয়া দিত। সকালের প্রস্তুতির মধ্যেই ঐরূপ মহিষের মত আমাদের জাহাজ দুলিতে দুলিতে চলিত। জাহাজের এক কাপ্তান গোয়ার সঙ্গে আমাদের একটু ঝগড়া হওয়ায় যাত্রার আরম্ভেই সমস্ত আনন্দ বিস্বাদ হইয়া গেল। কিন্তু মন্দ মন্দ পবনে এসমস্ত উড়াইয়া লইল, আর আমরা প্রকৃতির মত প্রসন্ন হইয়া গেলাম।

আবার এক বন্দরে আসা গেল। এখানে বিশেষ কিছু একটা ব্যাপার হয়তো চলিতেছিল। ছোট-বড় অসংখ্য নৌকা নদীর ধারে জঙ্গলে ঢুকিয়াছিল। মহিষের পিঠে যেমন মাছি ভন্ ভন্ করে, তেমনি গ্রামের শিশুরা এই নৌকা-গুলির মধ্যে লাফাইয়া লাফাইয়া খেলিতেছিল। ব্রহ্মের লোকেরা বড় সৌখীন। তাহাদের কেওড়া রং-এর মত চামড়ার উপর লাল ও হলুদ উল্কী বড়ই সুন্দর লাগে। মহারাষ্ট্রের লোকদের বিশ্বাস, এজন্মে দেহের উপর গহনার উল্কী দিলে আগামী জন্মে সোনার গহনা মিলিবে, কপালে টীকা বা চন্দ্রের উল্কী দিলে মেয়েরা অখণ্ড সৌভাগ্যবতী হইবে। এমন কিছু বিশ্বাস এদেশের লোকদের মধ্যে নিশ্চয় আছে, কারণ এখানকার গ্রামের অনেক লোক কোমর হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে নানাপ্রকার আকৃতির লুঙ্গীর উল্কী করিয়া রাখে। তাই যখন তাহারা স্নানের জন্য নদীতে বস্ত্রত্যাগ করিয়া নামে, তখন বস্ত্রহীন হইলেও তাহাদের উলঙ্গ বলিয়া মনে হয় না। জাহাজ কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়াইলে আমরা তীরে নামিয়া আশপাশের গ্রামে ঘুরিয়া আসিতাম। ব্রহ্মদেশের বাড়ীঘর ও পল্লীর সহিত আমাদের চোখ ভালমতই পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। আমরা তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারিতাম না। তথাপি এই সকল সরল গ্রামবাসীদের জীবন আমাদের নিকট একপ্রকার পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ীদের রাগ-দ্বেষ যদি আমরা পৃথক করিয়া দিই, এবং ধার্মিক ও অধার্মিক লোকদের কল্পনা সৃষ্টি এক দিকে রাখিয়া দিই, তাহা হইলে মনুষ্যজাতি সর্বত্র সমান। আমি যেমন বুঝিয়াছি, সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া রূপ ও স্বভাবের দিক হইতে সকল গ্রামই সমান।

নদীর প্রবাহের সঙ্গে তাল দিবার জন্যই যেন স্তূপ ও মন্দিরও মাঝে মাঝে

দেখা যাইতেছিল। উঁচু উঁচু পাহাড় ও শিখর মানুষের সর্বদাই ভাল লাগে। তাহার মধ্যেও নীল নদীর মত ঐরাবতী যখন চারদিকে তাহার কৃপার অত্যাচার ছড়াইয়া দেয়, তখন এই সব উঁচু স্থানই মানুষের আশ্রয় লইবার জায়গা হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ মন্দির গড়িয়া তাহার প্রতি যদি নিজের কৃতজ্ঞতা না দেখায়, তাহা হইলে আর কোন উপায়ে দেখাইবে? প্রকৃতি আমাদের শিখাইয়াছে যে সবুজ পাতার মধ্যে পরিপক্ক ফল তাহার সমস্ত উন্মাদনা দেখাইতে পারে। এই পাঠ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া এখানকার লোকেরা গাছের মধ্যখানে মন্দির গড়িয়া তাহার উপর আকাশের অনন্ত রূপ দর্শন করাইবার জন্য সোনার আঙ্গুল উঁচু করিয়া উঠাইয়া রাখিয়াছে। যাহারা স্বীকার করে যে প্রকৃতির শোভাকে মানুষ বাড়াইতে পারে না, তাহারা একবার যেন এখানে আসিয়া এই সব শিখর দেখিয়া যায়।

বেলা দ্বিপ্রহর। ইংরেজী-জানা ব্রহ্মদেশের এক কলেজের ছেলের সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। ইতিমধ্যে এক শান্তধ্বনি শোনা গেল। চিন্দউইন নদী তাহার করভার লইয়া ঐরাবতীর সঙ্গে মিলিতে আসিয়াছিল। উভয়ের প্রেমসঙ্গম কী চমৎকার! সে দৃশ্য এমনই ছিল, যেন রামদাস আর তুকারাম পরস্পরে মিলিত হইতেছেন, অথবা কালিদাস দাবা খেলিতেছেন আর ভবভূতি তাঁহাকে তাঁহার রচিত 'উত্তররামচরিত' শোনাইতেছেন।

কল্পনার সাহায্যে তো আমি চিন্দউইনের অজ্ঞাত প্রদেশে শানরাজ্যে পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিলাম। সেখানে দেখিলাম নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় বনবাসীদের, তাহারা হাতে তীর ধনুক বা কুড়াল লইয়া ঘুরিতেছে। একটু মাত্র সন্দেহ হইলেই তাহারা প্রাণ লইতে পারে, আবার বিশ্বাস দৃঢ় হইলে প্রাণ উৎসর্গ করিতেও পারে; এইসব প্রকৃতিশিশুদের দেখিলে মঙ্গলস্নানের মত হয়, তাহাতে সভ্যতার আবর্জনা ধুইয়া ফেলিতে পারা যায়। জাহাজের পাখি যতই উড়ুক না কেন, অবশেষে তাহাকে জাহাজেই ফিরিয়া আসিতে হয়। আমার কল্পনাও তেমনই বনজঙ্গল ঘুরিয়া পুনরায় জাহাজেই ফিরিয়া আসিল, কারণ আমরা পকোকু বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পকোকুর নিকটে আবর্জনাময় নদীতে স্নান করিয়া আর ব্রহ্মদেশের আতিথ্য স্বীকার করিয়া আমরা পুনরায় জাহাজে চড়িলাম ও কেরোসিন তৈলের কূপ দেখিবার জন্য ইনাঙ্গাং পর্যন্ত গেলাম। এখানে আমেরিকান

শ্রমিকদের রাজত্ব চলিতেছে বলা যাইতে পারে। বনশ্রী নাই বলিলেও চলে। এখানে এক দিকে এই সব কেরোসিন তেলের কূপের আধুনিক ক্ষেত্র, অন্য দিকে টিলার উপর অবস্থিত ক্ষুদ্রকায় প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরের তীর্থক্ষেত্র, দুইটি দেখিয়া মনে কত চিন্তা উঠিল। মন্দিরের কাজকর্মের মধ্যে হাতির মত মুখ এক পাখি খোদাই করা ছিল। ঐরূপ অনেক মিশ্রণ এখানে দেখিতে পাওয়া গেল। নিকটের মঠে কয়েকজন বৌদ্ধ সাধু আলাপের সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য প্রার্থনা বা ঐরূপ অন্য কোনও নিয়ম পালন করিতেছিলেন। ঐরাবতী যেন পক্ষপাতশূন্য হইয়া কেরোসিন তৈলের পাম্পের শোরগোলও নিজের হৃদয়ে বহন করিতেছিল, আবার 'অনিচ্চা বত সংসারা উপ্পাদব্যয়ধম্মিনো' —এই শ্রান্ত বা চিরন্তন সন্দেশও বহন করিতেছিল। আমেরিকার শক্তি সামর্থ যতই অতুলনীয় হউক, ঐভূখণ্ড তো এখনও শিশু বলা যায় না কি? তাহার জীবনরহস্য এত শীঘ্র কি করিয়া পাওয়া যাইবে? সে তো নদীতীরে তিন তিন হাজার ফুট গভীর কূপ খনন করিয়া কেরোসিন তৈল বাহির করিতেই জানিবে। সংসারের সকল সৃষ্ট পদার্থ জন্মে আর ফুরাইয়া যায়। সকলই নশ্বর ও ব্যর্থ, অসার। সার তো হইল এ সব হইতে বাঁচিয়া নির্বাণ প্রাপ্তির মধ্যে—একথা কোন আমেরিকান মানিয়া লইতে পারে? কিন্তু ঐরাবতী নদী নূতন উৎসাহের জন্য কখনও জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করিবে না, জ্ঞানের ভারে কর্মে উৎসাহও হারাইবে না। তাহাকে তো মহাসাগরে বিলীন হইতেই হইবে, আর এই লয়ের আনন্দ সর্বদা জাগ্রত ও প্রবাহিত রাখিতে হইবে।

ইনাঞ্জাং হইতে আমরা প্রোম পর্যন্ত গিয়াছিলাম, সেখানে ঐরাবতীর নিকট বিদায় লইলাম। এখান হইতে অগ্রসর হইয়া এই মহানদী অনেক মুখে সাগরে প্রবেশ করে। ঐরাবতী সত্যই সুবর্ণদেশের মাতা।

মার্চ, ১৯২৭

৬৭

সমুদ্রের সঙ্গে একত্র বাস

[আফ্রিকার পথে]

বোম্বাই হইতে মার্মাগোয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষের পশ্চিম তীর দেখা যাইতেছিল। মা যতক্ষণ চোখের আড়াল না হন ততক্ষণ শিশুর বিশ্বাস যে সে মায়ের কাছেই আছে; সেইরূপ ভারতবর্ষের তটদেশ যতক্ষণ দেখা যাইতেছিল ততক্ষণ মনে হয় নাই যে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আসিয়াছি। মার্মাগোয়া ছাড়িয়া আমাদের জাহাজ 'কাম্পালা' স্বদেশের সঙ্গে সমকোণ করিয়া সোজা বিশাল সমুদ্রে প্রবেশ করিলাম। দেখিতে দেখিতে ভারতবর্ষের তীর চোখের আড়াল হইয়া গেল, চারিদিকে দেখা গেল শুধু জল আর জল। রাত্রি হইল, আকাশের জনসংখ্যাও বাড়িল। ফলে নিঃসঙ্গভাব বড় অল্পই অনুভব করিতে থাকিলাম। কিন্তু যতই ভূমধ্যরেখার দিকে অগ্রসর হইলাম, ততই হাওয়া ও মেঘের চঞ্চলতা বাড়িতে থাকিল। মৌসুম ভাল হওয়াতে সমুদ্র শান্ত ছিল। ঢেউগুলি অল্প অল্প হাসিয়া শান্ত হইয়া যাইতেছিল। কিছু কিছু ঢেউ কাঁচা ঘাসের মত উঠিতে উঠিতেই মিলাইয়া যাইতেছিল। সমুদ্রের রং কখনও আসমানী কালির মত নীল হইয়া যাইতেছিল, কখনও কালো রং। আর জাহাজ জল কাটিতে কাটিতে যখন অগ্রসর হইতেছিল, তখন দুই দিকে তাহার যে সাদা ফেনা ছড়াইয়া পড়িত, তাহার অনেক বিচিত্র বর্ণ হইত। নীল বর্ণের সঙ্গে তাহা একপ্রকারের সুন্দর বলিয়া মনে হইত, কালো বর্ণের সঙ্গে অন্য প্রকারের। প্রথম প্রথম সমুদ্রের চেহারার উপর ঢেউ ছাড়া চামড়ার উপর পড়া ঝুরির মত স্পষ্ট ছাপ দেখা যাইত। কখনও কখনও এই সব ঝুরি লুপ্ত হইয়া যাইত আর জল ঝকমক করিলে বাসনের মত সুন্দর দেখাইত। জাহাজ চলিতেছিল ধীরে ধীরে দুলিতে দুলিতে। জাহাজের গতিবেগ কম হইলে দোলন বেশি হয়। বড় জাহাজ তাহার ধীর গতি সহজে ছাড়ে না।

যখন সম্মুখের দিক হইতে ঢেউ আসে, তখন জাহাজ দোলা ছাড়া ঘোড়সওয়ারের মত সম্মুখে ও পিছনেও ঝোঁকে, ইহাকে ইংরেজীতে বলে 'পিচিং'। বেশীক্ষণ এই 'পিচিং' চলিতে থাকিলে লোকের ভালও লাগে না, তাহা অনুকূলও নয়। কিন্তু তাহা বন্ধ করা যায় কি করিয়া? দোলনায় ঝুলিতে ঝুলিতে গা বমি বমি করিলে দোলনা বন্ধ করিয়া তাহা হইতে নামা যায়। কিন্তু এ তো একবার জাহাজে বসিলে আট দিন পর্যন্ত তাহার দোলন ও ঝোঁক খাওয়া স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। তা ছাড়া কোনও উপায় নাই। কখনও কখনও সন্দেহ হয়, দুই গতির মিশ্রণে কী মাথা ঘুরিতে থাকিবে না? মনে মনে এই ভয়ও বদ্ধমূল হইয়া যায় যে মাথা ঘোরার কথা যখন মনে হইয়াছে তখন তাহা হইবেই। খাওয়ার সময় মুখে ভাল লাগিতেছে, তাহা হইলেও মনে সন্দেহ জাগিয়াই আছে, যাহা খাইয়াছি তাহা পেটে যাইবে কি না। এই সন্দেহ দূর করা সহজ কথা নয়। যাহা হউক, আমাদের আট দিন তো আমরা খুবই আনন্দে কাটাইলাম। লোকে আমাদের ভয় দেখাইয়াছিল যে শেষের চার দিন খুব কষ্টে কাটিবে; কিন্তু তেমন কিছুই হইল না। তবে ভূমধ্যরেখা যেদিন পার হই, সেদিন কিছুটা সময় খুব জোর হাওয়া বহিতেছিল। তাহাতে আমাদের ধৈর্যহানি কিছু হয় নাই।

চারিদিকে যখন জল আর জল, তখন খানিকক্ষণ খুব আনন্দ হয়। পরে সমস্ত বায়ুমণ্ডল গম্ভীর হইয়া যায়। এই গম্ভীরতা কম হইলে চোখের ব্যাকুলতা অনুভব করি। আমাদের সমস্ত সংসার যেন এক জাহাজেই আঁটিয়া গিয়াছে। বিশাল সমুদ্রের তুলনায় উহা কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ! সমুদ্রের দয়ার উপর জীবন! তাহা ছাড়িয়া জল আর জল চারিদিকে! এই সমস্ত জলরাশির চরম উদ্দেশ্য কি? মাটির উপর যখন থাকি তখন আমরা চাই ঐ বিশাল ভূখণ্ড দেখিব না কেন, মনে কখনও এ চিন্তা আসেনা যে এ সমস্ত মাটি কেন সৃষ্টি হইয়াছে। বিশাল ও অনন্ত আকাশ দেখিয়াও মনে হয় না যে, এত বড় আকাশ কেন নির্মাণ করা হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের জল দেখিয়া এই চিন্তা অবশ্যই মনে জাগে। মাটি দেখিতে অভ্যস্ত দৃষ্টি জলের অখণ্ড বিস্তার দেখিয়া দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া ওঠে, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মেঘ দিগ্‌বলয় ঢাকিয়া রাখিয়াছে দেখিয়া বিশ্রাম পায়। কিন্তু, এ মেঘ তো প্রায়ই আকারহীন ও অর্থহীন হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে তাহার উদাসীনতা অসহ্য হইয়া ওঠে।

জীবনের সকল চিন্তা ভুলিয়া যাইত। নীলবর্ণের পোষাক পরিয়া ইহারাই সারা দিন কলের মত কাজ করে, একথা জানা সত্ত্বেও সত্য বলিয়া মনে হইত না। তাহাদের সামনে আমি অনেকবার বক্তৃতা করিলাম। তাহাদের এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, তাহাদের জীবন একপ্রকার সাধনাই বটে। ইহাও বলিলাম যে মাটির উপরই প্রাচীর খাড়া করা যায়, সমুদ্রের উপর নয়। সুতরাং খালাসীদের সমাজে জাতিভেদের দেওয়াল থাকা উচিত নহে, তাহাদের মন তো সমুদ্রের মত উদার হওয়া চাই।

আমরা এইভাবে ভজনে মগ্ন থাকিতাম, ইতিমধ্যে জাহাজের উপরে অনেক গোয়ানিজ স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া এক রাত্রি নাচের আয়োজন করিল। এজন্য তাহারা যে চাঁদা সংগ্রহ করিল, তাহাতে আমরাও কিছু দিলাম। ইহাতে নাচ দেখিবার আমাদের অধিকার জন্মিল!

গোয়ার খ্রীষ্টানদের মধ্যে ইউরেশিয়ান নাই বলিলেই হয়। ধর্মে খ্রীষ্টান কিন্তু রক্তে বিশুদ্ধ ভারতীয়, ইহারা পশ্চিমের যে সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রভাব দেখিবার মত। কোনও জোড়া সংযত হইয়া নৃত্যকলার আনন্দ উপভোগ করিতেছে, কোনও কোনও জোড়া এমন গম্ভীর, নির্লিপ্ত ও যন্ত্রের ধরণে নৃত্য করিতেছে যেন কোনও সামাজিক চাঁদা আদায় করিতেছে; কোনও যুগল নৃত্যের নিয়ম মানিয়া যতটুকু অবকাশ পাওয়া যায় ততখানি সময় পুরা ছুটি লইয়া নৃত্যেও পরস্পরে লীন হইয়া ছিল। দুই এক জোড়ার বয়স ও উচ্চতা এত অসমান ছিল যে বারবার মনে হইতেছিল, এতখানি বিড়ম্বনা তাহাদের কেন ভুগিতে হইল! সংকীর্ণ স্থানে এত সব লোকের নৃত্য যেমন তেমন করিয়া সমাধা হইল। অবশেষে সারা রাত জাগিয়া কাটাইবার ইচ্ছা না থাকায় এগারোটা বাজিবার পূর্বেই আমরা শুইয়া পড়িলাম।

আমাদের জাহাজ পশ্চিম দিকে এবং পৃথিবীর দৈনন্দিন গতির বিপরীত দিকে চলিতেছিল। তাই প্রায় প্রতিদিন আমাদের ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইতে হইত। জাহাজের দিক হইতে আমাদের নির্দেশ মিলিত যে 'মধ্যরাত্রে আধ ঘণ্টা কম কর' অথবা 'এক ঘণ্টা কম কর।' সৃষ্টির নিয়ম বুঝিয়া এইটুকু ক্ষতি-স্বীকারের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইত। আফ্রিকায় পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা সর্বশুদ্ধ আড়াই ঘণ্টা লোকসান করিয়া ফেলিয়াছিলাম। বেলজিয়ান কংগোতে গিয়া আরও এক ঘণ্টা লোকসান করিতে হইল।

যে সব পাঠক ভূগোলের সংবাদ রাখেন না, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে রেখাংশের প্রতি পনেরো ডিগ্রীতে এক ঘণ্টা বাড়াইতে বা কমাইতে হয়। আর প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ যখন এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে ১৮০ রেখাংশের উপর থাকে, তখন যাইতে আসিতে উহাকে একটা গোটা দিন বাড়াইতে বা কমাইতে হয়। এই রেখাংশকে ইংরেজীতে 'ডেট্ লাইন' বলে। আমাদের এখানে যেমন ভাবে অধিকাংশ মাস আসে, সেইভাবে 'ডেটলাইন'-এর উপর যাইতে আর একটা দিন লাগে, আসিতে এক দিন ক্ষয় হয়।

আট দিনে না পাইলাম কোনও খবরের কাগজ দেখিতে, না কোনও ডাক, না হইল কাহারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, না কোনও শহর বা গ্রাম—এমন কি, দিব্য করিবার জন্য কোনও পাহাড় বা দ্বীপও দেখিতে পাইলাম না। এই অবস্থায় যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন চুপচাপ কাটে, তখন বার ও তারিখেরও ঠিকানা থাকে না। আমাদের জাহাজের উচ্চতার হিসাব করিতে করিতে যখন আমি আমাদের চারিদিকে ভূবলয় পর্যন্ত কতখানি সমুদ্র প্রসারিত আছে তাহা জানিতে চাহিলাম, তখন জাহাজের লোকদের নিকট হইতে জানিলাম যে আমাদের চোখে ২৫০ বর্গমাইল সমুদ্র এক নজরে দেখিতে পাওয়া যায়।

কি সে মহাশান্তি! উহাও দোলা, ঝোলা, প্রবাহিত হওয়া, কিন্তু স্থির শান্তি। আকাশের আশীর্বাদের নীচে সব একত্র হইতেছিল। Swelling and rolling place—abiding and abounding— জানিনা কিভাবে, এই শান্তি উপভোগের সঙ্গে আমার মধ্যে মানবপ্রেম উথলাইয়া উঠিতেছিল, আর সমস্ত মনুষ্যজাতিকে স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি জানাইতেছিল। মানবজাতির ইতিহাস আজও সমস্ত মিলিয়া সুন্দর হইতে পারে নাই। এই সমুদ্র কতই না অন্যায় ও অত্যাচার দেখিয়া থাকিবে। কত ক্রীতদাসের দীর্ঘশ্বাস ইহার হাওয়ায় মিশিয়া আছে। কত না প্রার্থনা সূর্য চন্দ্র তারকা পর্যন্ত পৌঁছিয়াও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এসব সত্ত্বেও যদি মনুষ্যরক্তে সমুদ্র লাল না হইয়া গিয়া থাকে, দুঃখীর দীর্ঘশ্বাসে এখানকার বায়ু কলুষিত না হইয়া থাকে, মানুষের নৈরাশ্যে আকাশের জ্যোতি ম্লান না হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে মনুষ্যজাতির সামান্য ইতিহাস পড়িয়া আমার মানবপ্রেম কেনই বা সংকুচিত বা কম হইবে? যদি আমি নিজে অসংখ্য দোষ

ভুলিয়া নিজেকে ভালবাসিতে পারি, নিজের বিষয়ে অনেকপ্রকারের আশা পোষণ করিতে পারি, তবে আমারই অনন্ত প্রতিবিম্বরূপ মানবজাতির প্রতি আমার প্রেম কেন কম হইবে ?

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার ভূমিতে বিষমভাবে চলিতেছে যে মনুষ্যজাতি তাহার ত্রিখণ্ড সহকার দেখিবার জন্য আমি মোম্বাসা পৌঁছিলাম।

এই আট নয় দিনের মধ্যে খুব লিখিবার পড়িবার যে কল্পনা আমি করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইল না। কিন্তু এই আট দিন, জীবনের দর্শন, চিন্তন ও মননে পরিপূর্ণ ছিল।

নভেম্বর ১৯৫০

৬৮

ভূমধ্যরেখার পারে

ভূমধ্যরেখা পৃথিবীর কটিমেখলা। সিংহলের দক্ষিণে যখন পৌঁছিয়াছিলাম তখন একথা ভাবিয়া মন কতটা কাতর হইয়া গিয়াছিল যে এপর্যন্ত আসিয়াও ভূমধ্যরেখা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিলাম না! সিংহলের দক্ষিণে গল, দেবেন্দ্র, মাতারা পর্যন্ত গিয়াও দক্ষিণে ৬ ডিগ্রীর বেশি যাইতে পারিলাম না! কন্যা-কুমারী গেলে কষ্টে সৃষ্টে আট ডিগ্রী পর্যন্তই পৌঁছিয়াছিলাম। কল্যাণীয় সতীশ যখন সিঙ্গাপুরে ছিল তখন সেখানে একবার যাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য তত নয়, যত ভূমধ্যরেখা পার হইবার লোভে। তবে যখন মানচিত্রে দেখিলাম যে সিঙ্গাপুরও ভূমধ্যরেখার এদিকে, তখন সে উৎসাহ আর থাকিল না।

কিন্তু ভূমধ্যরেখায় আছে বা কি ? মাটির উপর বা জলের উপর সাদা, কালো, হলুদ রং-এর দাগ টানা হয় নাই। তবু ভূমধ্যরেখা প্রদেশ যে কাব্যময় তাহাতে সন্দেহ নাই।

সে প্রদেশের কথা স্মরণ করি আর শান্তাদুর্গা ও অর্ধনারী নটেশ্বরের কথা

মনে পড়ে। শান্তাদুর্গা এক দিকে শুভংকরী শান্তা, অন্যদিকে ভয়ংকরী দুর্গা। মহাদেবও সেইরূপ। তাঁহার দক্ষিণ মুখ সৌম্য শিব, বাম মুখ উগ্র রুদ্র। অর্ধনারী নটেশ্বর একদিকে স্ত্রীমূর্তি অন্যদিকে পুরুষমূর্তি। আমাদের সমন্বয়বাদী পূর্বপুরুষেরা হরিহরেশ্বরের কল্পনা এইভাবেই করিয়াছিলেন। শিব ও বিষ্ণু উভয়ের মিলনে হরিহরেশ্বরের সৃষ্টি।

ভূমধ্যরেখার উপর এইভাবে পরস্পরবিরোধী ঋতুর মিলন হইয়াছে। উত্তরগোলার্ধে যখন গরমের মরসুম তখন দক্ষিণগোলার্ধে শীতের মরসুম। একটিতে যখন বসন্ত অন্যটিতে তখন শরৎ। ভূমধ্যরেখা এমন এক প্রদেশ যেখানে গ্রীষ্ম ও শীতের মরসুম হাতছানি দিয়া ডাকিতে পারে। প্রৌঢ়া শরৎও বালক বসন্তকে খেলা দিতে পারে।

এমন স্থানে যদি অখণ্ড শান্তিই হয় তবে সেখানকার জীবন আলুনী হইয়া যায়। প্রকৃতি ক্রীড়াকুশল, সে ইহা কি করিয়া সহ্য করিতে পারে? গঙ্গাযমুনার ধবল-শ্যামল জলের সঙ্গম তো সর্বদা নৃত্য করে, উত্তর দক্ষিণের মিলনে নৃত্য নাই, ইহা কিরূপ সম্ভব?

আজ ভূমধ্যরেখার উপর আসিয়াছি। এখানে পবনের নৃত্যের বিরাম নাই। চঞ্চলতা যদি কোথাও স্থির হইয়া থাকে তবে তাহা এখানেই। এখানকার প্রকৃতি একহাতে গ্রীষ্মের পিঠে চপেটাঘাত করিতেছে, অন্যহাত শীতের পিঠে বুলাইতেছে।

ভূমধ্যরেখা, অর্থাৎ বাটখারায় ওজন করা পক্ষপাতরহিত ন্যায়; উত্তর-ধ্রুব দেখিতে পাইব, দক্ষিণধ্রুব নয়, এমন এখানে হইতে পারিবে না। এখানে আকাশে মৃগনক্ষত্রের পেটে যে বাণ বিঁধিয়াছে তাহাতে সে এদিক ওদিক ঝুঁকিতে বা ঢলিতে পারিবে না, সোজা পূর্বদিকে ডুবিয়া খস্বস্তিক (Zenith) ছুঁইয়া পশ্চিমে ডুবিবে। এই এক ধন্য প্রদেশ, যেখানে খস্বস্তিক বিষুববৃত্তে বিরাজমান হইতে পারিবে। যেমন ভূমির উপর ভূমধ্যরেখা, তেমনি আকাশে বিষুববৃত্ত। এইটুকু লিখিতেছি এমন সময়ে রঙীন অভিবাদন জানাইবার জন্য এক ইন্দ্রধনু ডানদিক হইতে সম্মুখে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এতক্ষণে তৃপ্তি হইল। কিন্তু মানুষের সকল তৃপ্তির মত উহাও যদি ক্ষণস্থায়ী না হইত, তাহা হইলে পেট ফাটিয়া যাইত। পেট না হইলে চোখ ফাটিয়া যাইত। ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? এখন দক্ষিণ গোলার্ধে কি কি দেখিতে ও জানিতে পারিব, কি কি

অনুভব হইবে, এই ধরণের উৎসুকতা জাগ্রত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভূমধ্য-রেখা প্রথমবার পার হইতে পারিয়াছি, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা সর্বদা জীবনের সঙ্গী হইয়া থাকিবে।

মে, ১৯৫০

৬৯

নীলোত্রী

আফ্রিকা যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, উত্তরপূর্ব আফ্রিকার মাতৃতুল্য উত্তর-বাহিনী নীলনদীর উদ্‌গম স্থান নীলোত্রী দর্শন করিব। গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী যাত্রা করিবার পর এখন বারবার মনে হইতেছিল, নীলোত্রী দর্শন করাও প্রয়োজন। সেদিন এখন নিকটে আসিল। জুলাইয়ের প্রথম দিবসে প্রাতঃ-কালেই আমরা কামপালা ছাড়িয়া জিঙ্গার অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। জরুরি কাজ ছিল বলিয়া আপ্পাসাহেব আজ নাইরোবী ফিরিয়া গেলেন, আর আমরা মোটরগাড়ী করিয়া নিজেদের পথে চলিলাম।

কামপালা হইতে জিঙ্গা পর্যন্ত পথ বড় সুন্দর। অনেক ছোট ছোট ও চওড়া পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই করিতে করিতে আমাদের গাড়ি নীলোত্রীর ও আমা-দের মধ্যেকার ৫২ মাইলের ব্যবধান কমাইতে কমাইতে চলিল। আমাদের উৎকণ্ঠাও বাড়িতে থাকিল। কিন্তু অতি সৌভাগ্যের কথা যে জিঙ্গা পৌছিবার পূর্বেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, আমাদের নীলোত্রীর দর্শন লাভ ঘটিল। ডানদিকে ভিক্‌টোরিয়া বা অমররসের সরোবর দূর হইতে প্রসারিত ছিল। উহার মধ্য হইতে সহজ লীলায় লম্ফ প্রদান করিয়া নীলনদীর সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা নদীর পুল পর্যন্ত পৌছিলাম। নৌকা হইতে নামিলাম এবং ডানদিকে ফিরিয়া রিপন্ ফলস্ নামে প্রসিদ্ধ এক ক্ষুদ্রাকার প্রপাতে আমরা নীলনদীর দর্শন লাভ করিলাম।

প্রপাতের তলদেশ তুষারাচ্ছন্ন। শিরোদেশে মুকুট ঝক্‌মক্ করিতেছিল। পিছনে এক হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ মুকুটের শোভা আরও বাড়াইতেছিল। দেবীর দুই

হাতে ধান্তের মঞ্জরী আর মুখে প্রসন্ন বাৎসল্যের হাসি—কল্পনা দৃষ্টিতে এ মূর্তি দেখিলাম। মূর্তি নীলবর্ণের নয়, বরং শ্যামাভ গৌরী। সমস্ত শরীরে জলধারা বহিতেছিল। ইহাতে দেবীর মুখের হাসি আরও সুন্দর বলিয়া মনে হইতেছিল।

প্রাণ ভরিয়া এই মূর্তি দর্শন করিবার পর বামদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। ডানদিকের জল আমাদের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়া আসিতেছিল। বামদিকের জল আমাদের হইতে দূরে সরিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল। উভয়ের প্রভাব ছিল একেবারেই ভিন্ন। আমাদের মনে হইতেছিল যে ডানদিকে রিপন প্রপাত, বাঁ দিকে একটু দূরে ওয়েন প্রপাত। আমাদের দেশে উহাকে প্রপাত কেহ কখনই বলিবে না। জলের স্রোত কয়েক ফুট অন্তর হইলেই কি তাহাকে প্রপাত বলে? প্রপাত তো তখনই বলা যাইতে পারে যখন জল ধব্ ধব্ করিয়া পড়ে, যতটা পড়ে ততটাই আবার লাফাইয়া ওঠে এবং ফেন ও তুষারের মেঘ এদিকে ওদিকে নাচিতে থাকে।

তীর্থযাত্রার শেষে লোকে শীঘ্র গিয়া মন্দিরে দেবতার যে দর্শন করে, যাত্রীদের ভাষায় তাহার নাম 'ধূলি দর্শন'। যাত্রা পদব্রজে হইবে, সমস্ত শরীর ধূলায় মাখা হইবে, আর উৎকণ্ঠার জন্য ঐ অবস্থায় দৌড়াইয়া ইষ্ট দেবতার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত বা দর্শন করিবে, তাহাকে ধূলিদর্শন বলে। আমরা তো মোটরগাড়িতে চড়িয়া আসিলাম। ভোরবেলা সামান্য একটু বৃষ্টি হইয়াছিল, এজন্য রাস্তার উপরেও ধূলা ছিল না। তাই এই প্রথম দর্শনকে 'ভিজা' দর্শনই বলা যাইতে পারে। ভাবে ভিজা বলিলে আরও অধিক যথার্থ বর্ণনা হইবে। মূর্তি ভিজা, মাটি ভিজা, চোখ ভিজা আর অনেক মিশ্রভাবে ওতপ্রোত হৃদয়ও ভিজা। অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলাঃ ক্রিয়াঃ, যিনি এই চরণটি প্রথমে গাহিয়াছিলেন তিনি আমার মত অসংখ্য যাত্রীর প্রতিনিধিই ছিলেন। নীলমাতার এই প্রথম দর্শন হৃদয়ে সংগ্রহ করিয়া আমরা জিঞ্জায় প্রবেশ করিলাম। গুজরাত বিদ্যাপীঠের কোনও সময়ের বিদ্যার্থী এডভোকেট শ্রীচন্দুভাই প্যাটেলের বাড়িতে আমাদের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। পুরাতন ছাত্রদের এখানে আতিথ্য গ্রহণ করা যতই আনন্দের, ততই কঠোর ও কঠিন। বাড়ির সব চেয়ে ভাল সুবিধা আমাদের দিয়া নিজেরা কষ্ট স্বীকার করায় তাঁহারা আনন্দ বোধ করিয়া থাকিবেন; কিন্তু আমরা কি করিয়া সংকোচ বোধ না করিয়া থাকিতে পারি?

এতক্ষণে আমরা বিধি অনুসারে নীলোত্রী দর্শন করিবার জন্য বাহির হইলাম। আমরা যেখানে পৌছিলাম, সেখানে অমরসরের জল পাথরগুলির ধারের উপর হইতে নীচে নামিতেছে আর নীলনদীর জন্ম হইতেছে। তাড়াতাড়ি জলের পাশে গিয়া সর্বপ্রথমে পা ঠাণ্ডা করিলাম। আচমন করিয়া হৃদয় ঠাণ্ডা করিলাম। মুহূর্তের জন্য ঐ স্থান ধ্যান করিলাম। অভ্যাস অনুসারে ঈশোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, বা অঘমর্ষণ সূক্ত মুখ হইতে বাহির হইতে গিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ এই শ্লোকটি বাহির হইল—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

নীলনদীর তটের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নস্থানে তিনবার নীলমাতার ধ্যান করিলাম, প্রতিবার মুখ হইতে অভ্রান্তরূপে এই শ্লোক বাহির হইল। এখন মিশরদেশের ইতিহাসপুরাণে সন্ধান করিতে হইবে যে নীলনদীর সঙ্গে ভগবান সূর্যদেবের কোনও বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি?

আমি সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখিতে পারিলে এই নদীর জলে যেসব মাছ থাকে, জলের উপর দিয়া উড়িয়া যায় যে সব বাচাল পাখী, ও নদীর তীরে ফিরিয়া আসে যে সব কিবো বা সিন্ধুঘোটক তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক স্তোত্র গাহিতাম। নীলনদীর তীরে যে ওয়াটার-ওয়ার্কস্, তাহা দেখা-শোনা করিবার জন্য নিযুক্ত একজন গুজরাতী ভদ্রলোকের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া তুষ্টিলাভ করিলাম, "আপনি কত সৌভাগ্যবান যে দিনরাত্র নীলোত্রীর দর্শন লাভ করেন, আর যাহাতে এখান হইতে দূরে না যান সেজন্য আপনাকে অর্থও দেওয়া হয়।" ভদ্রলোক নিজেকে এই ধরণের ধন্য বলিয়া মনে করিলেন কিনা তাহা দেখিবার বা প্রশ্ন করিবার জন্য আর থাকিলাম না।

আমার দৃষ্টিতে নদী দুই প্রকারের। এক প্রকারের নদী পাহাড় হইতে বাহির হয়, অন্য প্রকারের নদী বাহির হয় সরোবর হইতে। প্রথম জাতীয় নদীর নাম দিব আমি পার্বতী; অন্য জাতীয়ের নাম সরোজা। আশা করি, সারা সংসারের কমল আমাকে মার্জনা করিবে। শৈলজা নদীর উৎপত্তিস্থান অতি সামান্য, সংকীর্ণ ও প্রায় তুচ্ছ বলিলেই চলে, তাই উহাদিগকে সমাদর-

যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য বড় বড় মাহাত্ম্য লেখা হয়। গঙ্গোত্রীর নিকটে গঙ্গা প্রবাহ কখনও কখনও এত ছোট হইয়া যায় যে, সামান্য মানুষও এক তীরে এক পা আর অন্য তীরে অন্য পা রাখিয়া দাঁড়াইতে পারে। সরোজা নদীর কথা স্বতন্ত্র। বিশাল ও নির্মল বারিরাশির মধ্য হইতে প্রাণ যতটা চায় ততটা জল টানিয়া সে বহিয়া যাইতে থাকে। তাহারই চলন-বলন হইতে জন্মাবধি ধনী ও শ্রীমন্ত হইবার অভিমান হয়।

নীলোত্রী যাইবার আরও এক অদম্য আকর্ষণ ছিল। মহাত্মা গান্ধীর পার্থিব শরীর দিল্লী রাজঘাটে অগ্নিসাৎ করিবার পর তাঁহার অস্থি ও চিতাভস্ম ভারতবর্ষ ও বিশ্বসংসারের বহু পুণ্যস্থানে বিসর্জন করা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি স্থান নীলোত্রী।

আমরা ছিলাম জিঞ্জা নগরীর সর্বসাধারণের অতিথি। তাই স্থানীয় লোকেরা আমাদের উপস্থিতি হইতে লাভবান হইতে চাহিল। যেখানে চিতাভস্ম বিসর্জন করা হইয়াছিল, তাহার নিকটে এক কীর্তিস্তম্ভ দাঁড় করাইবার কথা স্থির হইলে আমারই হাত দিয়া তাহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

২রা জুলাই ১৯৫০ তারিখে আষাঢ় কৃষ্ণ তৃতীয়ার দিন প্রাতঃকালে শত শত লোকের সাক্ষাতে আমি এই কর্তব্য পালন করিলাম। উৎসবের জন্য গান্ধীজির এক বৃহৎ আলেখ্য সম্মুখে রাখা হইয়াছিল। আমার দৃষ্টি তাহার উপর পড়িতেই আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। বৈদিক নিয়ম সম্পন্ন হইলে আমি গান্ধীজির জীবনকথা লইয়া সামান্য বক্তৃতা করিলাম এবং বলিলাম যে আফ্রিকাই তাঁহার তপোভূমি। ফোটো তুলিবার আধুনিক নিয়ম হইতে মুক্ত হইয়াই তীরের এক পাথরের উপর বসিয়া নীলমাতার সুভগ জলপ্রবাহের উপর আমি অঙ্গুলি চালনা করিলাম ও অন্তর্মুখ হইয়া ধ্যান করিলাম, সে সময়ে মনে হইল যে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া এই তিন মহাখণ্ডের এমন কি আমেরিকারও ছোট বড় আবালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ এখানে আসিবে। সর্বোদয়ের ঋষি মহাত্মা গান্ধীর জীবন, কর্মসাধনা ও অন্তিম বলিদানের কথা এখানে লোকে চিন্তা করিবে আর মানুষে মানুষে ভেদ ভুলিয়া বিশ্বকুটুম্বিতা প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিবে। ভবিষ্যতের এই সমস্ত তীর্থযাত্রীদের আমি এখান হইতে আমার প্রণাম পাঠাই।

২

নীলনদীর দুই শাখা—শ্বেত ও নীল। জিঞ্জার নিকট যাহার উৎপত্তি তাহা শ্বেত শাখা। নীল শাখাও সরোজা। ইথিওপিয়া (আমরা যাহাকে হাবসিয়ানা বা এবিসিনিয়া বলি) দেশে তানা নামে এক সরোবর আছে। এই সরোবর হইতে নীল শাখার উৎপত্তি। এই শাখা দুইটি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া বহিতেছে এবং তটনিবাসী পশুপক্ষী ও লোকদিগকে জলদান করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইউরোপীয়েরা যে কথা জানে না তাহার নাম দেয়, অজ্ঞাত। এক দিক দিয়া তাহাদের কথা সত্যও বটে। নদীর তীরে থাকিয়াও যদি অন্য লোকে সন্ধান না করে যে এই নদী আসে কোথা হইতে, কত দূরেই বা যায়, তাহা হইলে বলা যায় না যে তাহারা নদীর সম্বন্ধে সব কিছু জানে। মসলন্, তিব্বতের লোকেরা মানসরোবর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে যে সানংপো বা বিশালপ্রবাহ নদী, তাহাকে জানে। অধিকন্তু তাহারা ইহাও বেশ জানে যে এ নদী পূর্বদিকে বহিতে বহিতে জঙ্গলে লোপ পাইয়া যায়। এদিক হইতে আমাদের লোকেরা ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থল খুঁজিতে খুঁজিতে সেই জঙ্গলের এদিকের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল। ওদিকের কথা তাহারা কিছুই জানিত না। যখন কয়েকজন ইংরেজ বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই সব জঙ্গল পার হইয়া গেল, তখন তাহারা প্রতিপন্ন করিল যে তিব্বতের সানংপো নদীই এই দিকে আসিয়াছে এবং অন্য কয়েকটি ছোটবড় নদীর জল লইয়া ব্রহ্মপুত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নীল নদীর উৎপত্তিস্থান যাঁহারা খুঁজিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মিঃ স্পীক অবশেষে কৃতকার্য হইলেন। তিনি প্রমাণ করিয়া দিলেন যে জিঞ্জার নিকটে সরোবর হইতে যে নদী উঠিয়াছে তাহাই মিশরজননী নীল।

স্পীক সাহেব ভারত সরকারের কর্মচারী ছিলেন। তিনি সন্ধান লইয়াছিলেন যে প্রাচীন হিন্দুরা মিশর অর্থাৎ আধুনিক ইজিপ্টের বিষয় অনেক কিছু জানিতেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন যে সংস্কৃত পুরাণে বলা হইয়াছে, নীল নদীর উৎপত্তি মিঠা জলের অমরসর হইতে হইয়াছে, এই প্রদেশে চন্দ্রগিরি আছে, ঠিক দক্ষিণে মেরু পর্বত আছে, ইত্যাদি। পুরাণগুলি হইতে কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোক তিনি অনুবাদ করাইয়া লইলেন। তাহার সাহায্যে নীলের উৎপত্তিস্থল সন্ধান করিবেন স্থির করিলেন।

সর্বপ্রথমে তিনি গেলেন জাঞ্জিবারে, সেখানে সব কিছু আয়োজন করিয়া ফেলিয়া প্রদেশ পার হইয়া উগাণ্ডায় গেলেন। সেখানে তিনি অমরসরবিশিষ্ট অচ্ছোদ সরোবর দেখিতে পাইলেন। (অচ্ছ সুঅচ্ছ—স্বচ্ছ। উদ—উদক—জল। মিঠা জলের সরোবরকে অচ্ছোদ বলা যায়।) সেখান হইতে বহিয়া বাহির হইতেছে নীল নদী, তাহাও দেখিতে পাইলেন। তিনি ইহাও প্রমাণ করিলেন যে এই নদীই সুদান ও ইজিপ্টের মধ্য দিয়া বহিতেছে। একথার পর এখনও শতবর্ষ পূর্ণ হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকা, সেখানে যাহারা বাস করে এমন অনেক আফ্রিকান জাতির দেশ। ইহার বিষয়ে ইউরোপীয়ানরা পুরাপুরি জানিত না, ইহা আফ্রিকার অধিবাসীদের বিশেষ দোষ নয়। ইউরোপ ও বিশেষতঃ আরব দেশের লোকেরা আফ্রিকার তীরে গিয়া সেখানকার লোকদের ধরিয়া আনিত এবং নিজের নিজের দেশে আনিয়া ক্রীতদাস হিসাবে তাহাদের বিক্রয় করিত। ধৃত বন্দীদের মধ্যে স্ত্রীলোক এবং শিশুও থাকিত। কিন্তু লুণ্ঠনকারীরা তাহাদের মানুষের মধ্যে গণিবে কেন?

কোনও কোনও খ্রীষ্টান মিশনারীর মনে হইল, এইরূপ বন্য লোকদের আত্মার উদ্ধারের জন্য তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্মের আশ্রয় লওয়াইতে হইবে। যে অন্ধকারময় প্রদেশে ব্যবসায়ীরা অর্থলোভেও যাইতে সাহস করিত না, সেখানে এই উৎসাহী ধর্মপ্রচারকেরা পৌঁছিয়া যাইত, আর সেখানকার ভাষা শিখিয়া লোকদের ঈশা মসিহার শুভসংবাদ শোনাইত।

তাহার উপর ইউরোপের রাজারা আফ্রিকা ভূখণ্ড নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। ভাগের নিয়ম থাকিল, যে দেশের মিশনারিরা যতখানি অঞ্চল খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, সেই পরিমাণ অঞ্চল সেই দেশের রাজার অধীন বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইহার মধ্যে একবার এমনই হইল যে, স্ট্যানলি নামে কোনও মিশনারী ইংলণ্ডের রাজার নিকট কংগো নদীর গতির সন্ধান করিবার জন্য সাহায্য চাহিল। ইংলণ্ডেশ্বর অর্থাৎ পার্লামেণ্ট এই সাহায্য দিল না। তখন সে বেলজিয়ামের রাজার নিকটে গেল। রাজা লিওপোল্ড ছিল লোভী ও উৎসাহী। সে তাহাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিল। ফলে যখন আফ্রিকাখণ্ডের ভাগ বাঁটোয়ারা হইল, তখন কঙ্গো নদী যে দেশের মধ্য দিয়া বহিতেছে তাহা বেলজিয়ামের ভাগে পড়িল। বেলজিয়াম কঙ্গোর এই প্রদেশ

আয়তনে প্রায় ভারতবর্ষের মত বড়। সেখান হইতে রবার লইবার জন্য শ্বেতাঙ্গেরা সেখানকার অধিবাসীদের উপর যে অত্যাচার করিত, তাহার বর্ণনা পড়িলে দেহে রোমাঞ্চ হয়, একথা বলিলে অল্পই বলা হইল। চিন্তাশীল ব্যক্তি এই বর্ণনা পড়িলে তাহার দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। অবশ্য শ্বেতাঙ্গেরা তাহাদের ধীরে ধীরে সভ্য করিয়া লইয়াছে। এখন তাহারা কাপড় পরে, চুলে নানা প্রকারের ঢেউ খেলায়, মদও খায়। এইভাবে তাহাদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছে।

আমাদের দেশের লোকেরা ইউগাণ্ডায় গিয়া কাপাস তুলার চাষ বাড়াইয়াছে। রাজ্যকর্তাদের সাহায্য লইয়া সেখানে বড় বড় 'এস্টেট' করিয়াছে, ও কোটি কোটি টাকা রোজগার করিয়াছে। আমরাও এখানকার লোকদের সভ্য করিয়াছি। দরজির কাজ, ছুতারের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, রান্নার কাজ, ইত্যাদি বিষয়ে আমরা উহাদের সাহায্য লইয়াছি, এই জন্য উহারা ধীরে ধীরে এসব ব্যাপারে পটু হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের কাপড় ও বিলাতি মদ ইত্যাদি নানা প্রকারের দোকান খুলিয়া জীবনের আনন্দ ভোগ করিতে শেখানো হইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গ ও গোধূমবর্ণের লোকদের এই চেষ্টার সাক্ষী নীল নদী এখান দিয়া নীরবে বহিয়া যাইতেছে এবং দুই তীরে বহু দূর পর্যন্ত তাহার দান ছড়াইয়া দিতেছে অন্যের উপকারের জন্য।

আমাদের দেশে গঙ্গা নদীর যে মহত্ত্ব, সেই মহত্ত্ব অতি উগ্রভাবে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার নীল নদীর রহিয়াছে। ইজিপ্টের মিশ্র বা মিশর সংস্কৃতির স্থান রহিয়াছে দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা মহত্ত্বপূর্ণ পাঁচ-ছয়টি প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে। তাহার প্রভাব শুধু ইউরোপের ইতিহাসের উপর নহে, তাদের ধর্মের উপরও পড়িয়াছে। আমাদের দেশে যেমন চাতুর্বর্ণ্যকে আশ্রয় করিয়া সংস্কৃতি বিকশিত হইয়া উঠিল, সেইরূপ সংস্কৃতি প্রাচীন মিশর দেশেও দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহার প্রতিবিম্ব গ্রীক দার্শনিক অফলাতুনের সমাজ-ব্যবস্থায় পড়িয়াছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। চাতুর্বর্ণ্য সমাজ সেকালের পক্ষে যতই অনুকূল ও সুন্দর বলিয়া স্বীকৃত হউক, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ইউরোপ তাহা হজম করিতে পারিল না। ইউরোপে যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার, তাহার পালনপোষণ ইজিপ্টে কিছু কম হয় নাই। কিন্তু সেখানকার বৈরাগ্য, তপস্যা ও দেহ-সংযম যথেষ্ট পরীক্ষার পর ইউরোপ

ছাড়িয়া দিল। তথাপি ইউরোপীয় সভ্যতার মূল কোথায় তাহা খুঁজিতে গেলে ইজিপ্টের ইতিহাসে প্রবেশ করিতেই হইবে। এই ইতিহাস গঠনের কিছুদূর পর্যন্ত নীলনদীর ঋণ স্বীকার করিতে হইবে।

নদীর জল যেমন সামনের দিকেই বহে, পিছনের দিকে বহে না, বা যাইতে পারে না, তেমনই নীল নদীর উৎপত্তিস্থলের দিকে উগাণ্ডা প্রদেশে ইজিপ্টের সভ্যতা পৌছিতে পারিল না। একথায় আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। ইজিপ্টের লোকেরা যদি অমরসরের আশেপাশে আসিয়া বাস করিত, তাহা হইলে শুধু আফ্রিকার নয়, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস ভিন্নরূপে লিখিত হইত।

আমাদের দেশে নদীগুলির যে-সব উৎপত্তিস্থল আমরা দেখি, তাহারা সবই জঙ্গলে বা দুর্গম প্রদেশে অবস্থিত। এই উৎপত্তিস্থল ছোটই হইয়া থাকে। নীলনদীর উৎপত্তিস্থল বিশাল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু উৎপত্তিস্থলের কাব্য সৃষ্টিতে সেখানে এক শহর বসিয়াছে এরূপ বলা যায় না। আমাদের দেশে কৃষ্ণা ও তাহার সখিচতুষ্টয় সহ্যাদ্রির যে অঞ্চল হইতে বাহির হইয়াছে তাহা ছিল দুর্গম ও পবিত্র। সন্তরা এখানে মহাবলেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজেরা তাহাতে নিজেদের গ্রীষ্ম-নগর নির্মাণ করিয়া তপোভূমিকে বিহারভূমি বা বিলাসভূমিতে পরিণত করিলেন। জিঞ্জায় আসিয়া একথা স্মরণ না করিয়া পারিলাম না।

আর এখন তো সেখানে ওয়েন ফল্সের সামনে একটা বড় বাঁধ দিয়া বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হইবে। পৃথিবীর মধ্যে ইহা এক অদ্ভুত বাঁধ। তাহার শক্তি ইউগাণ্ডায় শুধু নয়, সুদান ও ইজি পর্যন্ত গিয়া পৌছাইবে। ইহাতে শস্যবৃদ্ধি হইবে। দুর্ভিক্ষ দূর হইবে। অসংখ্য অশ্বত্থামার (হর্স্ পাওয়ার) সমগ্র শক্তি মনুষ্যসেবায় নিয়োজিত হইবে। তথাপি হৃদয় বলে, মানুষকে ইহার পরিবর্তে এমন কিছু হারাইতে হয় বিশাল ধনসম্পত্তি দিয়া যাহা পূরণ করা যায় না।

নীলনদী মাতা ছিলেন, দেবী ছিলেন, এখন তো তিনি বর্তমানের লোক-ধাত্রী ধাত্রীমাতা হইবেন।

নভেম্বর, ১৯৫০

বর্ষাগান

কালিদাসের একটি শ্লোক আমার বড়ই ভাল লাগে। উর্বশী অন্তর্হিত হইলে বিয়োগবিধুর রাজা পুরূরবা বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে আকাশের দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার ভ্রম হইতেছে, বুঝি এক রাক্ষস উর্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। কবি এই ভ্রম বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু ইহা সহজ ভ্রম, এ কথা উপলব্ধি করার পর, ঐ ভ্রমের মূলে প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। পুরূরবা বলিতেছেন—"আকাশে যে ভীমকায় কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি দেখা দিতেছে উহা কোনও উন্মত্ত রাক্ষসের নহে, বর্ষার জলে কানায় কানায় ভরা একটা মেঘই বটে। আর এই যে সামনে দেখা যাইতেছে তাহা ঐ রাক্ষসের ধনুক নহে, প্রকৃতির ইন্দ্রধনুই বটে। এই যে বর্ষা দেখিতেছি ইহা বাণের বৃষ্টি নহে, জলের ধারা, আর মাঝখানে এই যে উজ্জ্বল বস্তু নিজের তেজে দেদীপ্যমান দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ও আমার প্রিয়া উর্বশী নহে—নিকষ প্রস্তরে স্বর্ণরেখার মত বিদ্যুল্লতা।"

কল্পনাভরে আকাশে ওড়া তো কবিদের স্বভাব। কিন্তু পাখি যখন আকাশে স্বচ্ছন্দ বিহার করিবার পর নীচে আসিয়া নিজের নীড়ে তৃপ্তি ও সন্তোষের সহিত বসিয়া পড়ে, তখন তাহার সেই অনুভূতির মধুরিমা অন্য প্রকারেরই হয়। পৃথিবী জুড়িয়া বহু দেশ ঘুরিয়া স্বদেশে ফিরিবার পর মনে যে বিচিত্র সন্তোষ জন্মে, যে স্থৈর্য লাভ হয়, নিশ্চিন্ততার যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা যে চিরপ্রবাসী শুধু সে-ই বলিতে পারে। আমার এই কথাতেও সন্তোষ হয় যে, কল্পনা বিস্তারের পর জলধারার মত নীচে নামিয়া আসার আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য কালিদাস বর্ষা ঋতুই পছন্দ করিয়াছিলেন।

* * *

যখন আজকালের মত যানবাহন ছিল না, প্রকৃতিকে পরাস্ত করিয়া তাহার উপর বিজয় লাভ করিবার আনন্দও যখন মানুষ পাইত না, তখন লোকে

শীতের শেষে দেশভ্রমণে বাহির হইত, এবং দেশ-বিদেশের সংস্কৃতি নিরীক্ষণ করিয়া ও সকল প্রকারের উদ্যোগ করিয়া বর্ষা ঋতুর পুর্বেই ঘরে ফিরিয়া আসিত।

সে যুগে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের 'মিশন' বা জীবনব্রত নিজের জীবনে পালন করিবার পথও ছিল অনেক, আর সে সকল পথ পরস্পরে আসিয়া মিশিত। জীবনপ্রবাহ রুদ্ধ করিবার বাঁধের সংখ্যা খুব অল্পই ছিল, যাহা ছিল, তাহা সেতুই ছিল। ঐসব সেতুর কাজ ছিল, জীবনপ্রবাহ প্রতিহত করিয়া মানুষের জন্য পথ করিয়া দেওয়া। কিন্তু যখন জীবনের এই বন্ধন অসহ্য বলিয়া মনে হইত, তখন সেতুগুলি ভাঙ্গিয়া জলের স্রোতের জন্য পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া ছিল প্রবাহের কাজ। ইহা ছিল পুরাতন ক্রম। এইজন্য নদীনালার অতিরিক্ত জল রাস্তা ও সেতু ভাঙ্গিয়া দিত, তাহার পূর্বেই পথিকেরা নিজের নিজের বাড়ি ফিরিয়া আসিত। তাই বর্ষাঋতুর বর্ষ 'মহিমময়ী ঋতু' বলিয়া গণ্য করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে 'বর্ষ' নামই বর্ষা হইতে আসিয়াছে। 'আমরা অন্তত পঞ্চাশ বর্ষা দেখিয়াছি' প্রাচীনেরা এইকথা বলিয়াই প্রায় নিজেদের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিতেন।

* * *

শৈশব হইতেই বর্ষা ঋতুর প্রতি আমার অসাধারণ আকর্ষণ। গ্রীষ্মকালে শীতলকরা জলবৃষ্টি সকলেরই প্রিয়, কিন্তু পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের হাওয়া যখন বহিতে থাকে, বিদ্যুৎ যখন গর্জিয়া ওঠে, মনে হইতে থাকে যে আকাশ বুঝি এখন ধপ্ করিয়া নীচে পড়িয়া যাইবে, তখনকার বর্ষার অভিযান আমার শৈশব হইতেই অতি আদরের বস্তু। বর্ষার এই আনন্দে হৃদয় আকণ্ঠ ভরিয়া থাকিলেও তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না, ব্যক্ত করিতে গেলেও হয়তো সেদিকে সহানুভূতির সঙ্গে কেহ তাকাইবে না, এই চিন্তায় আমার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত।

* * *

চারদিকের টিলাগুলির উপর হইতে হনুমানের মত আকাশে ধাবমান মেঘ যখন আকাশ ঘিরিয়া ফেলিত, তখন তাহা দেখিয়া আমার বুক যেন বোঝার ভারে অবসন্ন হইত। কিন্তু বুকের এই ভারও সুখের বলিয়া মনে হইত। দেখিতে দেখিতে গাঢ় অন্ধকার সংকুচিত হইয়া গেল, দিক্‌গুলি ছুটিতে ছুটিতে

পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, আশপাশের সৃষ্টি ক্ষুদ্র এক নীড়ের রূপ ধারণ করিল। পক্ষী যেমন কুলায়ে আসিয়া পৌছিলে সন্তোষ লাভ করে এই অনুভূতি হইতে আমি তেমনই সন্তোষ পাইতাম।

কিন্তু আমি যখন কারোয়ারে গেলাম ও প্রথমবার সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া বর্ষা প্রত্যক্ষ করিলাম, তখনকার আনন্দের তুলনা তো নূতন জগতে পৌছিবার আনন্দের সঙ্গেই হইতে পারে।

বর্ষার বর্ষাপ্রহরণ ভূমিতে আঘাত করিতেছে, ইহা তো আমি শৈশব হইতেই দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই বর্ষা যেন বেত্র দিয়া সমুদ্রকে প্রহার করিতেছে দেখিয়া, ও সমুদ্রের উপর তাহার উদ্ধত আঘাত দেখিয়া, এই যে প্রকাণ্ড সমুদ্র তাহার প্রতিও আমার মন দয়া ও সহানুভূতিতে ভরিয়া যাইত। মেঘ ও বর্ষার ধারা যখন ভিড় করিয়া আকাশের হস্তীকে আক্রমণ করিতে যাইতেছিল, তখন আমার তাহাতে এমন কিছু লাগে নাই, কারণ শৈশব হইতেই আমি ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু বর্ষার ধারা ও তাহার সাহায্যকারী মেঘ যখন সমুদ্রকে আঘাত করিত, তখন আমি জ্ঞানহারা হইয়া পড়িতাম। কান্না আসিত না, কিন্তু যাহা কিছু অনুভব করিতাম তাহা প্রকাশ করিবার জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিবার কথাই মনে আসিত। বর্ষা ইচ্ছা করিলে পাহাড়কে আক্রমণ করিতে পারে, খেতকে পুকুর এবং রাস্তাকে নালা করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু সমুদ্রকে তাহার গর্ত ভরিতে বাধ্য করা সীমা ছাড়াইয়া যাওয়ার মত মনে হইতেছিল। এই অবজ্ঞার দৃশ্য দেখাও আমার কেমন যেন অনুচিত বলিয়া বোধ হইত।

* * *

ভূগোল বিজ্ঞান পড়িয়া আমার এই বেদনা দূর করিলাম। আমি বুঝিতে আরম্ভ করিলাম যে সূর্যনারায়ণ সমুদ্র হইতে কর গ্রহণ করেন এবং সেইজন্য তপ্ত হাওয়ায় জলের আর্দ্রতা লুকাইয়া থাকে। এই আর্দ্রতা বাষ্পের আকারে উপরে গিয়া শীতল হইয়া মেঘের আকার ধারণ করে, এবং পরিণামে এই সকল মেঘ হইতে কৃতজ্ঞতার ধারা বহিতে আরম্ভ করে, পুনরায় গিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়।

গীতায় বলা হইয়াছে, এই জীবনচক্র প্রবর্তিত আছে বলিয়া সৃষ্টিও অব্যাহত। গীতা এই জীবনচক্রের নাম দিয়াছে যজ্ঞ। এই যজ্ঞ-চক্র না থাকিলে

সৃষ্টির বোঝা বওয়া ভগবানের পক্ষেও অসহ্য হইত। যজ্ঞ-চক্রের অর্থ হইল, পরস্পরের সাহায্যে স্বাশ্রয়ের সাধনা। পাহাড়ের উপর হইতে নদী বহিবে, নদী দিয়া সমুদ্র ভরিবে, সমুদ্রের দ্বারা হাওয়া আর্দ্র হইবে, শুষ্ক হাওয়া তৃপ্ত হইতেই সে তাহার সমৃদ্ধিকে মেঘের রূপ দিবে, পুনরায় সেই মেঘ দিয়া নিজের জীবনের অবতার-কৃত্য আরম্ভ করাইবে—এই সুন্দর নির্মাণ-কৌশল জানিয়া যে তৃপ্তি হইল, এই বিশাল পৃথিবীর তুলনায় তাহা একটুও কম ছিল না।

তখন হইতে প্রতিবার বর্ষায় আমার জীবনধর্মে নূতন করিয়া দীক্ষা হয়।

* * *

বর্ষা ঋতু যেমন সৃষ্টির রূপ বদলাইয়া দেয়, তেমনই আমার হৃদয়ের উপরও বুলাইয়া দেয় এক নূতন প্রলেপ। বর্ষার পর আমি নূতন লোক হইয়া যাই। অন্য হৃদয়ে বসন্তের যে প্রভাব, আমার উপর বর্ষার সেই প্রভাব হয়। (লিখিতে লিখিতে মনে হইল, যখন সাবরমতী জেলে ছিলাম, তখন বর্ষার শেষে কোকিলার গান শুনিয়া 'বর্ষান্তে বসন্ত' নাম দিয়া গুজরাটিতে এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম।)

* * *

গ্রীষ্ম ঋতু হইল মাতা বসুন্ধরার তপস্যা। মাটি না ফাটা পর্যন্ত পৃথিবী গ্রীষ্মের তপস্যা করেন, আকাশের নিকট জীবন-দানের প্রার্থনা করেন। বৈদিক ঋষিরা আকাশকে পিতা ও পৃথিবীকে মাতা বলিয়াছেন। পৃথিবীর তপশ্চর্যা দেখিয়া আকাশ-পিতার চিত্ত আর্দ্র হয়, তিনি পৃথিবীকে কৃতার্থ করেন। বালতৃণের মধ্য হইতে পৃথিবী শিহরিয়া ওঠেন, লক্ষ লক্ষ জীবের সৃষ্টি হয়, তাহারা চারিদিকে নাচিতে খেলিতে আরম্ভ করে। প্রথম হইতেই সৃষ্টির এই আবির্ভাবের সঙ্গে আমার হৃদয় একাত্ম হইয়া পড়ে। পতঙ্গের পাখা গজায়, পরের দিন সকাল হইবার পূর্বেই সবগুলি মারা যায়। মাটিতে এখানে ওখানে তাহাদের পাখা ছড়াইয়া আছে দেখিয়া আমার কুরুক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে। মখমলের পোকা মাটিতে জন্মিয়া আবার নিজের লাল রং-এর দ্বিগুণ শোভা দেখাইয়া লুপ্ত হয়, ইহা দেখিয়া জীবনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধায় আমার কৌতুকবোধ হয়। ফুলের বৈচিত্র্যকে লজ্জা দিবার জন্য পিপীলিকার আবির্ভাব, তাহাদের সারি দেখিয়া আমি প্রকৃতির নিকট হইতে কলার দীক্ষা গ্রহণ করি। প্রেমিক লতা মাটিতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে, বৃক্ষের উপর আরোহণ

করে, কূপের ভিতরে নামে, আমার মনও তাহাদের মত কোমল ও স্পর্শ-কাতর হইয়া যায়। এজন্য বর্ষাকালে বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে যে ভাবে জীবন সমৃদ্ধি দেখা যায়, হৃদয়-সমৃদ্ধিও তেমনই পাই। আর বর্ষা শেষ হইলে আকাশ স্বচ্ছ হওয়া পর্যন্ত আমার এক প্রকারের হৃদয়সিদ্ধিও লাভ হয়। এই কারণে আমার নিকটে বর্ষা ঋতুই সকল ঋতুর মধ্যে উত্তম। আকাশের দেবতা যদি এই চার মাস ঘুমাইয়াও পড়েন, তথাপি আমার হৃদয় তো সতর্ক হইয়া থাকে, জাগিয়া থাকে, আর এই চার মাসের সঙ্গে আমি তন্ময় হইয়া যাই।

'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ন্যায়ে, অন্তে বসন্ত ঋতুর বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস ঋতুসংহারের আরম্ভ করিয়াছেন গ্রীষ্ম ঋতু দিয়া। আমি যদি "ঋতুভ্যঃ" দীক্ষা লই, আর নিজের জীবন-নিষ্ঠা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে বর্ষা ঋতু দিয়াই এক প্রকার আরম্ভ করিয়া পুনরায় অন্য রীতিতে বর্ষা ঋতুতেই সমাপ্তি করিব।

জুলাই, ১৯৫২

অনুবন্ধ

[সামাজিক জীবনের পক্ষে যে সব শিল্প অত্যন্ত উপযোগী তাহা শিখিতে শিখিতে বা চালাইতে চালাইতে প্রতি পদে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতায় যত প্রয়োজন, ততখানি পূর্ণজ্ঞান তখন তখনি খুঁজিয়া লওয়া ও তাহা আয়ত্ত করা এই জীবন সমৃদ্ধ করিবার স্বাভাবিক উপায়। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহা কিছু করিতে হয়, তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া এদিকে ওদিকে সমস্ত জ্ঞান প্রয়োগ করিলে ভারি আনন্দ হয়। আর সুযোগে অর্জিত অভিজ্ঞতা সহজে আয়ত্ত হয় এবং জীবনে মিশিয়া যায়।

এই সমস্ত দেখিয়া শিক্ষাশাস্ত্রীরা পড়ানোর এই নূতন পদ্ধতি চালাইয়াছেন। যাহাতে জীবন কাটাইতে, ও জীবিকার উপায় শিখিয়া সেই উপায় অবলম্বন করিয়া শিখিতে ও চালাইতে, প্রয়োজনীয় যে জ্ঞান অর্জন করিতে বা দান করিতে হয়, তাহা শিক্ষার মাধ্যম করা হয়। এই পদ্ধতির নাম অনুবন্ধ বা 'কো-রিলেশন'।

সংস্কৃত গ্রন্থের প্রাচীন টীকাকারেরা এই ভঙ্গির সাহায্য লইয়া যে কোনও গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতে করিতে অনেক বিষয়ের জ্ঞান দিতেন। আর মূল লেখক অনেক বিদ্যায় বিশারদ হইলে এবং তাঁহার গ্রন্থে ঐ সকল বিদ্যার তত্ত্ব প্রসঙ্গ-ক্রমে আসিলে, টীকাকার ঐ সকল বিদ্যার আবশ্যকীয় জ্ঞান তাঁহাদের টীকায় ভরিয়া দিতেন।

আজকালকার পড়ানোতে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে "নোট্স" বা টিপ্পনী দেওয়া হয়। বইও ইংরেজিতে লেখা, টিপ্পনীও ইংরেজিতে লেখা। এইভাবে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে পড়াইবার কৃত্রিমতার জন্য বিদ্যার্থীরা 'নোট্' মুখস্থ করে এবং মুখস্থ জ্ঞান পরীক্ষায় লিখিয়া পরীক্ষা পাশ করে। এই অবস্থার জন্য 'নোট' দেওয়ার প্রথার খুবই বদনাম হইয়াছে, আর ভাল ভাল পণ্ডিতেরা দেখা বইয়ের উপর নোট দেওয়া তাঁহাদের জ্ঞানের প্রতিকূল বলিয়া মনে করেন। কখনও কখনও এরূপ নোট নিন্দাভাজনও হয়।

কিন্তু যদি অনুবন্ধের দৃষ্টিতে টিপ্পনী লেখা যায় ও সুযোগ মত তাহার মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় বিবিধ জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে এই পদ্ধতি অবশ্যই সর্বপ্রকারে ইষ্ট ও লাভদায়ক হয়।

আমার বহু অধ্যাপক বন্ধুরা আমার অনেক গ্রন্থ তাঁহাদের টিপ্পনী দিয়া অলংকৃত করিয়াছেন। আমিও ইহাতে তাঁহাদের সহযোগিতা করিয়াছি। যেখানে বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকেরা বড পুস্তকালয়ের সাহায্য পান না, সেখানে তো এই সব টিপ্পনীর সাহায্যেই পুস্তক পড়ানো সন্তোষজনক ভাবে হইতে পারে। পুস্তকের বিষয়ে নিজের ভাষায় লেখা মন্তব্য দিলে অনুবন্ধের অনেক কাজ হইতে পারে। এইজন্য শিক্ষাকলার প্রবীণ অধ্যাপকদের দ্বারা রচিত টিপ্পনী আমি অনুবন্ধের মতই মনে করিয়াছি। আশা আছে, যদি কোনও অধ্যাপক এই গ্রন্থ পড়াইবার সুযোগ পান, তাহা হইলে তিনি এই টিপ্পনীগুলি অনুবন্ধ হিসাবেই ব্যবহার করিবেন। অধ্যাপকের সাহায্য না লইয়া যে যুবক টিপ্পনীর সাহায্যে এই পুস্তক পড়িবেন, তিনি এই টিপ্পনী হইতে অনুবন্ধের একটা ধারণা করিতে পারিবেন।

কা. কা.]

টিপ্পনী

পৃ ২ বিশ্বস্য মাতরঃ ॥ 'এইরূপে যত নদীর কথা স্মরণ হয় তাহাদের নাম করিয়াছি। ইহারা সকলেই বিশ্বের মাতা, সকলেই শক্তিশালী, সকলেই মহাফলদাত্রী।'

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় যখন ভারতবর্ষের বর্ণনা করেন তখন ভারতবর্ষের নদীগুলির নাম শোনাইবার পর উপসংহারে এই কথা বলেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে নবম অধ্যায়ে ৩৭ ও ৩৮ শ্লোকের প্রথম দুই চরণ লইয়া এই শ্লোক রচিত হইয়াছে।

যথাস্মৃতি ॥ ভাবার্থ এই যে নদী তো অনেক আছে, কিন্তু আমার যতখানি স্মরণ আছে তাহাদের নাম শুনাইয়া দিলাম। ৩৭ শ্লোকের শেষের দুই চরণে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে :

তথা নদ্যস্ত্বপ্রকাশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।

এই রূপে যাহাদের কথা জানা নাই এমন শত শত সহস্র সহস্র নদী আছে।

[ইহাতে সঞ্জয়ের (এবং লেখকেরও ?) স্বদেশভক্তি সূচিত হইতেছে। 'সুজলা সুফলা' মাতার বিপুলতা কেহ কম না মনে করেন, এইরূপ অতিস্নেহ হইতে পাপশংকা কি ইহাতে আছে ?]

জীবনলীলা

পৃ ৫ গ্রাম্য ॥ গ্রামবাসী। ঋগ্‌বেদে এই শব্দের এরূপ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

পৃ ৮ ডলয়োঃ সাবর্ণ্যম্ ॥ ড ও ল সমান বর্ণ। 'ডলয়োরভেদঃ' এরূপও বলে।

পৃ ১০ লিম্পতীব ॥ অন্ধকার যেন সারা অঙ্গে লেপন করা হইয়াছে, আকাশ হইতে যেন অঞ্জন বৃষ্টি হইতেছে।

পৃ ১১ দেশের অর্থ॥ অপভ্রংশ ভাষায় রচিত নিম্নলিখিত পদের সঙ্গে তুলনীয়—

সরিহিঁ ন সরেহিঁ ন সরবরেহিঁ নহি উজ্জানবণেহিঁ।
দেশ রবণ্ণা হোন্তি বঢ় নিবসন্তেহিঁ সুজণেহিঁ।

[মূর্খ, দেশ নদীর জন্য রমণীয় হয় না, সরোবরের দ্বারাও নয়, উদ্যান ও বনের দ্বারাও নয়। উহার অধিবাসী সুজনদের দ্বারাই উহা রমণীয় হয়।]

নদী-সংস্কৃতি

পৃ ১৩ ক্ষেমেন্দ্র॥ একাদশ শতাব্দীর এক কাশ্মীরী পণ্ডিত ও কবি। জনশ্রুতি যে ইনি চল্লিশটিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 'ভারতমঞ্জরী', বৃহৎকথামঞ্জরী', 'নৃপাবলি', 'সুবৃত্ততিলক', 'ঔচিত্যবিচারচর্চা', 'কবিকণ্ঠাভরণ' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

পৃ ১৪ মীলনদেবী॥ কর্ণাটকের চন্দ্রাবতী নগরীর রাজকন্যা, কর্ণদেব সোলংকীর পত্নী, সিদ্ধরাজ জয়সিংহের মাতা; ধোলকার বিখ্যাত 'মলাও' পুষ্করিণী ও বীরমগামের 'মুনসর' পুষ্করিণী ইনিই নির্মাণ করিয়াছিলেন। সোমনাথ দর্শনার্থী প্রত্যেক যাত্রীর উপর যে কর ধার্য ছিল তাহা ইনি বন্ধ করিয়া দেন। ইনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাণী ছিলেন।

উর্বশী॥ 'উর্' দেশের উর্বশী।

নদীমুখেনৈব সমুদ্রমাবিশেৎ

পৃ ১৬ কুলমর্যাদা॥ কূল=তীর। তীরের মর্যাদা। 'কূল-মর্যাদা' শব্দ হইতে এই শব্দ গঠিত হইয়াছে।

নামরূপ ত্যাগ করিয়া……যাইতেছে॥ মুণ্ডকোপনিষদের নিম্নলিখিত বচন মনে করুন :

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

[নদীরা যেমন বহিতে বহিতে নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে ডুবিয়া যায়।]

উপস্থান

পৃ ১৭ উপস্থান ॥ বন্দনা, পূজা, উপাসনা। যেমন, সূর্য বা সন্ধ্যার উপস্থান।

আমাদের পূর্বপুরুষদের নদীভক্তি ॥ লেখক সরস্বতী-পুত্র সারস্বত, এ কথা এখানে মনে না করিয়া থাকিতে পারেন না।

ভক্তির এই সকল বাণী শ্রবণ করিয়া ॥ ভক্তি শ্রবণ করিয়া, শ্রবণ-ভক্তি করিয়া। (প্রেমের সঙ্গে সাদরে শ্রবণ করাও ভক্তির এক পুণ্যদায়ী প্রকার।)

সংস্কৃতিপুষ্ট ॥ জগতের অনেক সংস্কৃতির বিকাশ নদীর তীরেই হইয়াছে। যেমন, ইজিপ্টের (মিশর) সংস্কৃতি নীলনদীর তীরে বিকসিত হইয়াছে। খাল্‌ডিয়ার (ইরাক) সংস্কৃতি ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের তীরে; চীনের সংস্কৃতি ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহোর তীরে; মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি অমু ও সরের তীরে; ভারতের সংস্কৃতি পঞ্চসিন্ধু, গঙ্গা-যমুনা, তাপ্তী-নর্মদা ও কৃষ্ণা-গোদাবরীর তীরে বিকসিত হইয়াছে।

পৃ ১৮ ভগবান সূর্যনারায়ণের প্রেমের কথা ॥ তাপ্তী—কথিত আছে সূর্যের কন্যার নাম তপতী। তিনি সংবরণ রাজার পত্নী ও কুরুদের মাতা ছিলেন। গুজরাতী কবি প্রেমানন্দের নামে প্রচলিত 'তপত্যাখ্যানে' ইহার কথা আছে।

পৃ ১৮ 'ইতিহাসের উষাকাল' ॥ সাধারণতঃ উষঃকালের প্রয়োগ হয়। কিন্তু এখানে জানিয়া শুনিয়াই 'উষাকাল' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। স্থানীয় ইতিহাসে আছে যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে তেজপুরের নিকটে বাণাসুর ও উষার নিবাস ছিল।

উষা-অনিরুদ্ধের কথা ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৬২-৬৩ অধ্যায়ে আছে। বলির পুত্র বাণাসুরের কন্যা উষা একবার স্বপ্নে কোনও সুন্দর যুবকের সহিত মিলিত হন। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার বিরহে উষা আর্তরব করিতে লাগিলেন। সখী চিত্রলেখা এই আর্তরব শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উষা স্বপ্নের বিবরণ দিয়া বলিলেন, ইহার সঙ্গে বিবাহ না হইলে আমি বাঁচিব না। চিত্রলেখা পর পর অনেক চিত্র আঁকিয়া দেখাইলেন, শেষে কৃষ্ণের

পৌত্র অনিরুদ্ধের ছবি দেখিয়া উষা বলিলেন, 'এই সেই পুরুষ যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম।'

ইহার পরে চিত্রলেখা যোগবলে দ্বারকা গেলেন। সেখান হইতে নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে পালঙ্ক সুদ্ধ উঠাইয়া লইয়া আসিলেন। উষা-অনিরুদ্ধের গান্ধর্ব বিধিতে বিবাহ হইল। উভয়ে চার মাস একত্র থাকিলেন। উষার পিতা যখন জানিতে পারিলেন যে উষার গৃহে একজন পুরুষ আছে, তখন তিনি ক্রোধভরে সেখানে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। উভয়ে যুদ্ধ হইল। শেষে বাণাসুর অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বাঁধিয়া বন্দী করিলেন।

এদিকে দ্বারকায় অনিরুদ্ধের সন্ধান আরম্ভ হইল। নারদ আসিয়া খবর দিলেন, অনিরুদ্ধকে তো শোণিতপুরে (বর্তমান তেজপুরে) বাণাসুর বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। ক্রুদ্ধ হইয়া যাদবেরা শোণিতপুর আক্রমণ করিল এবং বাণকে হারাইয়া উষা-অনিরুদ্ধকে লইয়া খুব ধূমধামের সঙ্গে দ্বারকায় ফিরিয়া আসিল।

পৃ ১৯ সম্ভূয়-সমুত্থানের নিয়মানুসারে ॥ একত্র হইয়া উন্নতি করিবার সিদ্ধান্ত। Joint Stock-এর সিদ্ধান্ত। স্মৃতিশাস্ত্রে এই শব্দ পাওয়া যায়।

সমুদ্রে যাইবার পথে ॥ দক্ষিণ গুজরাতে বলসাডের নিকটে বাঁকী নদীও তাহার নামের অনুযায়ী বেঁকা-টেড়া হইয়া ঠিক সমুদ্রের নিকটে আসিয়া এতই টেড়া হইয়া যায় যে দুই তিন মাইল উত্তর দিকে বহিয়া ঔরঙ্গার সহিত মেশে ও তাহারই সঙ্গে সমুদ্রে গিয়া পড়ে।

১

সখী মার্কণ্ডী

পৃ ১ মার্কণ্ডী ॥ বেলগাঁও হইতে ৯ মাইল দূরে লেখকের গ্রাম বেলগুঁদী, তাহার নিকটে এক ছোট নদী।

বৈজনাথ ॥ সং বৈদ্যনাথ—বেলগাঁওয়ের এক পাহাড়। বৈদ্যদের মতে এই পাহাড়ের উপর মূল্যবান বনস্পতি অনেক আছে।

আমাদের অঞ্চলের ॥ কর্ণাটকের বেলগাঁও তালুকের।

পৃ ২ মার্কণ্ডেয়॥ মৃকণ্ডু মুনির পুত্র, মার্কণ্ড।

সাধু সুন্দর॥ মধ্যযুগের এক কবির রচিত মার্কণ্ডেয় উপাখ্যানে এই পংক্তিগুলি পাওয়া যায়, মারাঠী মেয়েদের মধ্যে অনেকের কণ্ঠস্থ।

মৃত্যুঞ্জয়॥ মহাদেবের নাম। অলুক্ সমাস, বিভক্তি প্রত্যয়ের লোপ হয় না। ধনঞ্জয়, সমিতিঞ্জয়, গণঞ্জয় (dictator) তুলনীয়।

তাহার আয়ু॥ উপাখ্যানে আছে যে তাহার আয়ু হইয়াছিল সাত বা চৌদ্দ কল্প। ইহার পরে কাহাকেও দীর্ঘজীবী বলিয়া আশীর্বাদ করিতে গেলে 'মার্কণ্ডায়ুর্ভব' বলা হয়। কিন্তু এই রচনায় ইহার অর্থ হইল নদীরূপ আয়ুর ধারা। ইহা লেখকের কল্পনা।

পৃ ৩ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া॥ কার্তিকী দ্বিতীয়া। এই দিনে যমুনা তাহার ভাই যমকে বাড়িতে ডাকিয়া তাহার পূজা করিয়াছিল ও ভোজন করাইয়াছিল। এই কারণে এই দিনের নাম যম-দ্বিতীয়াও বটে। এই দিন ভগিনীরা তাহাদের ভাইয়ের পূজা করে ও খাওয়াইবার সময় নীচের মন্ত্র বলিয়া তাহাকে আচমন করায় :

ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুংক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥

ভাই, আমি আপনার অনুজা। এই আহার্য গ্রহণ করুন, ইহাতে আপনার শুভ হইবে, যমরাজ, বিশেষ করিয়া তাঁহার ভগ্নী যমুনা, প্রসন্ন হইবেন। বড় ভগ্নী হইলে 'ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং' বলা হয়।

মৃগনক্ষত্র॥ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় শীতকাল। তখন সমস্ত রাত্র আকাশে মৃগনক্ষত্র দেখা যায়। তাই 'মৃগনীতা রাত্রয়ঃ।'

লাবণ্য॥ (সং লবণ+য) মিষ্টতা, দীপ্তি, যৌবনের কান্তি।

তাহার লক্ষণ :

মুক্তাফলেষু ছায়ায়াঃ তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥

২

কৃষ্ণার স্মৃতি

সাতারা॥ কৃষ্ণার তীরবর্তী শহর, লেখকের জন্মস্থান। ইহা শাহু প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের রাজাদের রাজধানী ছিল।

শাহু মহারাজ॥ শিবাজীর পৌত্র। সম্ভাজীর পুত্র। পূর্বে নাম ছিল শিবাজী। ঔরঙ্গজেব ইহার নাম রাখিয়াছিলেন শাহু। ছেলেবেলায় ইহাকে দিল্লী দরবারে বন্দী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। সেখানকার ভোগ-বিলাসের জন্য তিনি রাজ্য পরিচালনার ভার তাহার মন্ত্রী পেশোয়ার উপর সমর্পণ করিয়া নিজে সাতারায় থাকিতেন।

পৃ ৪ আমরা শিশুরা॥ লেখক ও তাঁহার ভাই।

'বাসুদেব'॥ ময়ুরপংখের টুপি পরিয়া ভজন গাহিতে গাহিতে ভিক্ষা করে এমন এক সম্প্রদায়ের লোক।

বেণ্যা॥ সাতারার এক ছোট নদী।

'নরসোবাচী বাড়ী'॥ কৃষ্ণার তারে কুরুন্দবাডের নিকটে। ইহা দত্তাত্রেয়ের তীর্থস্থান।

অমৃত-খেত॥ যে খেতে অমৃতের মত মিষ্ট ফল দেয়।

যে এক আধবার খাইতে চাহিবে॥ শিখদের গুরু নানকের সম্বন্ধে এক কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি স্বর্গে গিয়াও উদাস হইয়া থাকিতেন। ভগবান কারণ জানিতে চাহিলে উত্তর পাইলেন, 'স্বর্গে সব কিছু আছে, কিন্তু মকাইয়ের ভুট্টা নাই, সরিষার শাক নাই, তাহা খাইবার জন্য পৃথিবীতে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইতেছে।'

লোকচিত্তই এইরূপ কাহিনী রচনা করিতে পারে।

পৃ ৫ সাঙ্গলী॥ কৃষ্ণার তটবর্তী শহর। স্বাধীনতার পূর্বে ইহা এক দেশীয় রাজ্য ছিল।

শ্রীসমর্থ॥ স্বামী রামদাস। শিবাজী মহারাজের গুরু। ইনি ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং অনেক মঠের প্রতিষ্ঠা ও ধর্মপ্রচার করিয়াছেন। 'দাসবোধ', 'মনোবোধ' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা।

ঘোরপড়ে॥ সন্তাজী। শিবাজীর এক সেনাপতি। রাজারামের সময়ে

ধনাজী ও সন্তাজী ঘোরপড়ে এই দুই সেনাপতির মধ্যে অতি প্রচণ্ড বিরোধ ছিল। ঘোরপড়ে মুরার রাও (১৭২৪—১৭৭৭) শাহুর প্রধান সরদারদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বাহুবলে সমগ্র কর্ণাটক জয় করিয়া গুত্তীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে 'গুত্তীকর ঘোরপড়ে'ও বলা হইত। চন্দা সাহেবের সঙ্গে পেশোয়াদের ত্রিচিনপল্লীতে যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি পেশোয়াদের হইয়া জয়লাভ করেন। তাই শাহু তাঁহাকে কর্ণাটকের 'সরদেশমুখী' ও ত্রিচিনপল্লী দুর্গের সুবেদারী দিয়াছিলেন। পরিণামে হাইদর তাঁহাকে বন্দী করিয়া রূপার হাতকড়ি-বেড়ি পরাইয়া কপালদুর্গে রাখিয়াছিলেন। সেখানেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

পটবর্ধন॥ পরশুরাম ভাউ (১৭৩৯-৯৯) সওয়াজী মাধবরাও পেশোয়ার সমকালীন বড় সেনাপতি। ইনি প্রচণ্ড বীর ও সাহসী ছিলেন। হাইদরের সঙ্গে যুদ্ধে ইহার এক একটি করিয়া তিনটি ঘোড়া মারা পড়ে, কিন্তু তিনি ভীত হন নাই। ১৭৮১ খ্রীঃ তিনি ইংরেজ সেনাপতি গডার্ডকে পরাস্ত করেন। ১৭৯৬ খ্রীঃ নানা ফডনবীশের সঙ্গে ইহার মনোমালিন্য হয়। তাই ফডনবীশ ইহাকে বন্দী করেন। ১৭৯৮ খ্রীঃ তিনি মুক্তি পান। কিন্তু তখনই পট্টনকুড়ির যুদ্ধে যোগ দেন, আর সেখানে যুদ্ধ করিতে করিতে মারা যান।

নানা ফড়নবীশ (১৭৪২-১৮০০)॥ মারাঠা প্রভুত্বের অবসান কালের এক সুচতুর রাজনীতিবিদ।

রামশাস্ত্রী প্রভু ১৭২০-৮৯॥ পেশোয়াদের যুগের এক প্রসিদ্ধ বিচারক। বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইনি নিরক্ষরই ছিলেন। যে সওদাগরের নিকটে চাকুরী করিতেন, সে ইহাকে মর্মান্তিক গালি দেয়। তখন তিনি বিদ্যা শিখিবার জন্য কাশী চলিয়া গেলেন, এবং খুব বড় পণ্ডিত ও ধর্মশাস্ত্রী হইলেন। ১৭৫১ সালে ইনি পেশোয়াদের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিলেন এবং ১৭৫৯ সালে প্রধান বিচারক হন। নারায়ণ রাওয়ের হত্যার জন্য ইনি রাঘোবার মৃত্যুদণ্ড বিধান করেন, কোনও সংকোচ করেন নাই।

পৃ ৬ দেহু॥ ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরবর্তী গ্রাম। পুনার নিকটে। মহারাষ্ট্রের সন্ত তুকারামের গ্রাম বলিয়া ইহা পবিত্র বিবেচনা করা হয়।

আড়ন্দী ঃ ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরবর্তী এক গ্রামের নাম। পুনা হইতে বেশী দূর নয়। এখানে জ্ঞানেশ্বর জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন। দেহু-আলন্দীর

নদী ইন্দ্রায়ণী ভীমা নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। এই ভীমা পণ্টরপুরের নিকটে বক্রগতিতে গিয়াছে, তাই সেখানে তাহার নাম চন্দ্রভাগা। ইহার পরেই সে স্ফীত হইয়া কৃষ্ণায় পড়িয়াছে।

তুঙ্গভদ্রা ॥ তুঙ্গা ও ভদ্রা, দুই নদী মিলিয়া তুঙ্গভদ্রা হইয়াছে। যেমন 'মুলা-মুঠার সংগমী (পৃঃ ৮)। তুঙ্গভদ্রার তীরে হাম্পীর নিকটে কর্ণাটক সাম্রাজ্যের রাজধানী বিজয়নগর নির্মিত হইয়াছিল।

তেলিঙ্গানা ॥ ত্রিলিঙ্গ প্রদেশ। যাঁহার পেটে কৃষ্ণার এক বিন্দুও পৌঁছিয়াছে, সে নিজের মহারাষ্ট্রীয়তা কখনও ভুলিতে পারে না, আর 'কৃষ্ণাতে প্রাদেশিকতার পক্ষপাত নাই'—এই দুই বাক্যের মধ্যে বিরোধ আছে কি? লেখক বলিতে চান যে মহারাষ্ট্রের সদ্‌গুণের জন্য সমাদর তো মনে থাকিবেই; কিন্তু তিনটি প্রদেশের প্রতি আত্মীয়তা জাগ্রত হইলে মনে সংকীর্ণতা আসিতেই পারে না।

পাহাড়ের অস্থি ॥ পাথর।

জীবনের লীলা ॥ জীবন অর্থে জল, এবং বাঁচা। এখানে শব্দটির উভয় অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে।

পৃ ৭ অনন্তবুয়া মরডেকর ॥ কাকাসাহেবের প্রিয়সুহৃদ, যাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে কাকাসাহেব তাঁহার 'হিমালয় কী যাত্রা' উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সমর্থ রামদাস স্বামী এবং তাঁহার শিষ্যেরা যে সকল মঠ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মরডে মঠ অন্যতম। এই মঠের গৃহস্থ মঠপতিদের বংশে অনন্তবুয়ার জন্ম হইয়াছিল। ইঁহার পিতা পুরাণে পণ্ডিত ও কীর্তনকার ছিলেন। অনন্তবুয়া প্রথমে মারাঠী ট্রেনিং কলেজে শিক্ষক ছিলেন, পরে ইনি কাকাসাহেবের পূর্বে বরোদার গঙ্গানাথ বিদ্যালয়ে যোগ দেন। এই বিদ্যালয়ের সাহায্যে চাঁদা সংগ্রহের জন্য ইনি বরোদার সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ইঁহার মাসিক খরচ কখনও দশ টাকার বেশি হয় নাই। সংস্থার নিয়মানুসারে ইনি খাওয়া খরচ ব্যতীত পকেট খরচের জন্য পাঁচ টাকা বেশী লইতে বাধ্য ছিলেন। এই পাঁচ টাকা ইনি ছাত্রদের জন্য অথবা হিসাবে ভুল হইলে তাহা মিলাইবার জন্য ব্যয় করিতেন। চালচলনে গুজরাটের প্রসিদ্ধ গঠনমূলক কর্মী রবিশংকর মহারাজের সহিত ইঁহার তুলনা করা যাইতে পারে। ইঁহার পবিত্র জীবন দেখিয়া বহুলোক ইঁহার নিকটে দীক্ষা লইতে চাহিত। কিন্তু ইনি কখনও কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই, বলিতেন, আমার সে যোগ্যতা নাই।

হৃদয়ের অনুভূতি ॥ আদর ভাব। লেখকের প্রতি তিনি অসাধারণ প্রীতি পোষণ করিতেন বলিয়া।

জ্যেষ্ঠ ॥ রাজনৈতিক শিক্ষার কার্যে তিনি লেখকের পূর্বে অগ্রসর হইয়াছিলেন ও লেখকের দৃষ্টিতে অধিক ত্যাগী ছিলেন বলিয়া।

গঙ্গোত্রী ॥ হিমালয়ের এক তীর্থস্থান। গঙ্গা এখান হইতে বাহির হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে গঙ্গার উদ্ভব হয় 'গোমুখ' হইতে, ইহা গঙ্গোত্রী হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে।

অমরনাথ ॥ কাশ্মীরের তীর্থস্থান। এখানে এক গুহায় বরফের স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

অমর হইলেন ॥ স্বর্গে গেলেন।

শিরস্নান ॥ বর্ষাকালে বাঈয়ের অনেক মন্দিরের নদীর জলে কলশ পর্যন্ত ডুবিয়া যায়।

স্বরাজের ঋষি ॥ স্বরাজ যাঁহারা 'ধ্যান' করেন, স্বরাজের জন্য যাঁহারা 'তপস্যা' করেন, আর স্বরাজের জন্য যাঁহারা মন্ত্র দেন। 'স্বরাজ আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার', লোকমান্যের এই বচন সুবিদিত।

পটবর্ধন ॥ পট=বস্ত্র ; বর্ধন=যাহা বৃদ্ধি করে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কথা স্মরণ করুন।

চরকাও অনরূপ সংখ্যা ॥ বিশ লাখ চরখা চালাইবার কথা স্থির হইয়াছিল।

বেজোয়াড়া ॥ অন্ধ্র প্রদেশের এক প্রধান শহর। ইহাও কৃষ্ণার তীরে অবস্থিত।

আব্বাস সাহেব ॥ (১৮৫৪-১৯৩৩) চিরযুবা দেশভক্ত আব্বাস তৈয়বজী। কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনের সম্পাদক বদরুদ্দীন তৈয়বজীর ভ্রাতুষ্পুত্র, পরে তাঁহার জামাতা। প্রথম জীবনে তিনি বরোদা রাজ্যের প্রধান বিচারালয়ের প্রধান বিচারক ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁহার উপর গান্ধীজীর প্রভাব পড়িয়াছিল। তখন গুজরাটের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাঁহার মহত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ব্যাপারে, অসহযোগ আন্দোলনে, তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহে, সরকারী বিদ্যালয় ও বিদেশী বস্ত্রবিপণি বহিষ্কারে, খাদি ফেরি করায়, হিন্দু-

মুসলমান ঐক্যের চেষ্টায়, বন্যাসংকট নিবারণে, লোকদের সাহায্য দানে, বারডোলির আন্দোলনে এবং লবণ সত্যাগ্রহের সময় ধরাসনার সম্মুখে সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব ব্যাপারে তিনি নানা প্রকারে দেশ সেবা করিয়াছিলেন ইহা আমরা দেখিয়াছি।

পুন্তাম্বেকর॥ ইনি সে সময়ে বোম্বাই রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন। পরে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকরূপে ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে কাজ করিয়াছিলেন।

গিদোয়ানী॥ গুজরাট বিদ্যাপীঠের প্রথম উপাচার্য ও গুজরাত মহাবিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য। সম্পূর্ণ নাম: অস্লুদমল টেকচাঁদ গিদোয়ানী। গুজরাটে আসিবার অনেক পূর্বে তিনি দিল্লীর রামযশ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন।

পৃ ৮ কৃষ্ণাম্বিকা॥ কৃষ্ণা মাতা।

রামশাস্ত্রী॥ রামশাস্ত্রী প্রভু, বাঈয়ের নিকটে কৃষ্ণার তীরে ছিলেন বলিয়া।

নানা ফড়নবীশ॥ বাঈয়ের নিকটে মেণবলীতে থাকিতেন বলিয়া।

'রাষ্ট্রীয় হিন্দী'॥ শুদ্ধ হিন্দী তো প্রাদেশিক হিন্দী। অনেক ভাষার প্রভাবে যে হিন্দী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার নাম রাষ্ট্রীয় হিন্দী।

৩

মুলা-মুঠার সংগম

পৃ ৮ অপবাদ বা ব্যতিক্রম…চলে না॥ **Exception proves the rule.** উৎসর্গাঃ সাপবাদাঃ।

পৃ ৮-৯ মিসিসিপি-মিসৌরী॥ ইহার দৈর্ঘ্য ৫৪৩১ মাইল। যেখানে এই দুইটি নদী আসিয়া মিলিয়াছে সেখানে ইহার প্রস্থ ৫০০০ ফুট।

দ্বন্দ্ব সমাস॥ দুই পদ সমশ্রেণীর, এই কথায় উপর এখানে জোর দেওয়া হইয়াছে।

সীতাহরণ হইতে আরম্ভ করিয়া··ইতিহাস॥ কথিত আছে যে রাবণ যখন সীতাকে উঠাইয়া লইয়া গেল, তখন সীতার শাড়ীর পাড় হাম্পীর নিকটে একটা বড় শিলায় লাগিয়া গিয়াছিল, সেই শিলার উপর এখনও তাহার দাগ লাগিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কাজকর্মও তুঙ্গভদ্রার তীরেই চলিত। এই সাম্রাজ্যের স্থাপনা হইয়াছিল ১৩৪৬ সালে। ইহার বিস্তার ছিল কৃষ্ণা হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাকুমারী পর্যন্ত। সওয়া দুই শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানেরা আমাদের আক্রমণ করায় ১৫৬৫ সালে এই সাম্রাজ্যের শেষ হয়। ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাস A Forgotten Empire নামে ইংরেজি পুস্তকে এবং 'বিজয়নগরকে সাম্রাজ্যকা ইতিহাস' নামক হিন্দী পুস্তকে পাওয়া যায়।

খড়ক-ওয়াসলা॥ পুণা হইতে সিংহগড় যাওয়ার পথে। এখানে পুণার জলাগার (water-works) আছে। স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষা বিদ্যালয়ের জন্যও এই জায়গাটি নির্বাচিত হইয়াছে। পৃঃ ১০ দ্রষ্টব্য।

ন্যাড়া পাহাড়॥ সন্ন্যাসীর মত ন্যাড়া মাথা; যাহার মাথায় একটিও গাছ নাই।

চিন্তাকুল প্রতিবিম্ব॥ মানুষ যখন চিন্তামগ্ন থাকে, তখন তাহার চক্ষু বার বার খোলে ও বন্ধ হয়। তারাগুলিও সমস্ত রাত্র এইভাবে খোলে ও বন্ধ হয়। এখানে কথাটার অর্থ এই যে, জল নড়িলে তাহার প্রতিবিম্ব হইবে।

বাংগ॥ ইহা ফারসি শব্দ। মসজিদে নমাজের পূর্বে 'নমাজের সময় হইয়াছে, নমাজ পড়িতে আসুন' এই কথা বলিবার জন্য খুব জোরে যে শব্দ করা হয় তাহার নাম বাংগ। আরবি ভাষায় ইহাকে আজান বলে। এখানে বাংগ কথার সাধারণ অর্থ—ডাক।

লকড়িপুল॥ হয়তো প্রথমে এই পুল লকড়ীর ছিল, ইহার নিকটে কাঠ বিক্রয় হইত। আমেদাবাদের লৌহনির্মিত এলিস ব্রিজকেও 'লকড়িয়া পুল' বলে।

ওঙ্কারেশ্বর॥ এখানে একটি শ্মশান আছে। দ্বিতীয় শ্মশান আছে লকড়ী-পুলের নিকটে।

ক্যাপ্টেন মলেট॥ পেশোয়াদের অধিকার নষ্ট করিবার যন্ত্র ষড়যন্ত্র-কারী ইংরেজ।

ভাণ্ডারকর ॥ ডাঃ স্তর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর। সংস্কৃত ও প্রাচ্য বিদ্যায় পারঙ্গম ও প্রার্থনা সমাজের নেতা।

পৃ ১০ গুজরাটের লক্ষ্মীর এক বরপুত্র ॥ কার্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যাঁহার নাম যুক্ত আছে—স্তর বিট্‌ঠলদাস দামোদরদাস ঠ্যাকারসি।

উত্তুঙ্গশির ॥ উচ্চ মাথা যাহার।

নম্রনামধেয় ॥ নম্র নাম যাহার। বাড়ি তো বড় রাজভবনের মত, কিন্তু তাহার নাম হইল 'পর্ণকুটী'। এই বাড়িতে গান্ধীজী দুইবার অনশন করিয়াছিলেন।

যারবেদা জেল ॥ ছোট বড অসংখ্য দেশবীরের, বিশেষতঃ গান্ধীজীর, কারাবাসের জন্য ও হরিজনদের ভোটাধিকার বিষয়ে চুক্তির জন্য এই জেলখানা দেশে-বিদেশে প্রসিদ্ধ। গান্ধীজী ইহার নাম দিয়াছিলেন 'যারবেদা মন্দির'।

ভিক্ষাজীবী ॥ ভিক্ষার উপর যাহার নির্ভর। লক্ষপতির সঙ্গে মিলাইতে গিয়া এই শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা ভবন ॥ ১৯৪৪ সালে জেল হইতে মুক্ত হইবার পর গান্ধীজী নিসর্গোপচার বা প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি কিছুকাল এই নিসর্গোপচার গৃহে ছিলেন। উরুলী কাঞ্চনেও তিনি এক নূতন প্রাকৃতিক চিকিৎসাকেন্দ্র খুলিয়াছিলেন, তাহা আজও চলিতেছে।

সিংহগড় ॥ লেখকের ক্ষয়রোগ হইয়াছিল। তখন তিনি বহুদিন ধরিয়া সিংহগড়ে বাস করিতেন। এখানে ঐ কথার আলোচনা আছে।

৪

সাগর-সরিতের সংগম

পৃ ১২ শরবন ॥ লেখকের 'স্মরণ-যাত্রা'য় 'সয়ো পার্ক' প্রকরণ দ্রষ্টব্য। 'স্মরণ-যাত্রা'য় কাকাসাহেবের ছয় বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবনের কথা বর্ণিত আছে।

সমুদ্র নিজের মর্যাদা · · সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ চন্দ্রের টানে যখন সমুদ্রে ভাটা আসে তখন জল সরিয়া গিয়া রাস্তা করিয়া দেয়; জোয়ারের সময় বাড়িয়া যখন নদীতে প্রবেশ করে তখন সামনে আসে।

পৃ ১৪ উৎসের দিকে ॥ "আমার ধারণা যে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদার, বদরী, অমরনাথ, খোজরনাথ, মানসরোবর, রাকসতাল, পরশুরাম কুণ্ড, অমরকণ্টক, মহাবলেশ্বর, ত্র্যম্বক প্রভৃতি সকল তীর্থস্থান নদীর উৎসের জন্য স্বাভাবিক জিজ্ঞাসারই পরিণাম। উত্তর ধ্রুবের নিকটে থাকিয়া আর্যেরা যে ভাবে সন্ধান লইবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন যে আমাদিগকে তাপ দিতেছেন যে সূর্য তিনি কোথা হইতে উদিত হন, কোথায় অস্ত যান, এবং যেভাবে চার মহাদ্বীপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, হিন্দুস্থানের সন্তানেরাও তেমনি নিজের নিজের গো-মহিষাদি লইয়া, অথবা একাকী, নদীর উৎস খুঁজিতে যদি নানাস্থানে ঘুরিয়া থাকেন তো তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।"—'হিমালয়কী যাত্রা', প্রকরণ ২১, পৃঃ ১০৯। অজন্তা গুহার নিকটেও এক ছোট নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

যমুনা ॥ যমুনোত্রীর কথা বলা হইয়াছে। হিমালয়ে উত্তরা-খণ্ডের এক তীর্থস্থান। এখান হইতেই যমুনা বাহির হইয়াছে।

মহাবলেশ্বর ॥ কৃষ্ণার উৎপত্তি স্থান। ইহা সাতারায় অবস্থিত।

ত্র্যম্বক ॥ নাসিকের নিকটে; গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান।

শংকররাও গুলবাড়ী ॥ কারোয়ার অঞ্চলে প্রসিদ্ধ সর্বোদয়কর্মী।

কবি বোরকর ॥ গোয়ার কোঙ্কনী ও মারাঠী ভাষার প্রসিদ্ধ কবি।

৫

গঙ্গামাতা

দেবব্রত ভীষ্ম ॥ শান্তনু ও গঙ্গার অষ্টম পুত্র দেবব্রত। শান্তনু সত্যবতী নামে ধীবর-রাজকন্যাকে যাহাতে বিবাহ করিতে পারেন, সেজন্য দেবব্রত আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিবেন এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ও তাহা পালন করিয়াছিলেন। তাই আজও কেহ কোনও ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলে আমরা তাহাকে বলি 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।' ভীষ্ম অর্থে ভীষণ, ভয়ংকর।

পৃ ১৫ আর্যদের বড় বড় সাম্রাজ্য ॥ যেমন হর্ষের সাম্রাজ্য, মৌর্য সাম্রাজ্য।

কুরু-পাঞ্চাল ॥ দিল্লীর আশপাশের প্রদেশ কুরু; গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ পাঞ্চাল।

অঙ্গবঙ্গাদি। গঙ্গার দক্ষিণতীরে যে প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল তাহার নাম ছিল অঙ্গ। চম্পা ছিল তাহার রাজধানী। বর্তমান ভাগলপুরের স্থানে অথবা উহার চারদিকে কোথাও ইহা অবস্থিত ছিল। এখনকার পূর্ববঙ্গের নাম ছিল বঙ্গ। তাই সমুদ্রতটের সঙ্গে বঙ্গের যোগ ছিল। উত্তরবঙ্গের নাম ছিল গৌড় বা পুণ্ড্র।

যখন আমরা গঙ্গাদর্শন করি…। গঙ্গাতীরে শুধু কৃষিবাণিজ্যেরই বিকাশ হয় নাই, কাব্য ধর্ম শৌর্য ভক্তি—সংক্ষেপে, সম্পূর্ণ সংস্কৃতিরই বিকাশ হইয়াছিল।

জওহরলাল নেহরু তাঁহার Discovery of India নামক পুস্তকে ভারতবর্ষের নদীর বিষয়ে লিখিতে গিয়া গঙ্গার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

" · and the Ganga, above all *the* river of India, which has held India's heart captive and has drawn uncounted millions to her banks since the dawn of history. The Story of the Ganga, from her source to the sea, from old times to new, is the Story of India's civilization and culture, of the rise and fall of empires, of great and proud cities, of the adventure of man and the quest of the mind which has so occupied India's thinkers, of the richness and fulfilment of life as well as its denial and renunciation, of ups and downs, and growth and decay, of life and death."—p. 43

"…আর গঙ্গা তো বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষেরই নদী। ইতিহাসের উষাকাল হইতে উহা ভারতের হৃদয়ের উপর তাহার প্রভাব অঙ্কিত করিয়াছে এবং অসংখ্য লোককে তাহার তীরে আকৃষ্ট করিয়া আসিয়াছে। গঙ্গার উৎপত্তিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরসঙ্গম পর্যন্ত ও প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত তাহার কাহিনী ভারতেরই সংস্কৃতি ও সভ্যতার কাহিনী—সাম্রাজ্যের উত্থানপতন, বিশাল ও গৌরবশালী নগর, মানুষের সাহস ও ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ব্যস্ত রাখিবার তত্ত্বানুসন্ধানের কাহিনী, জীবনের সমৃদ্ধি ও সফলতা এবং নিবৃত্তি ও সন্ন্যাসের কাহিনী, পতন-অভ্যুদয়ের, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের, আরোহ-অবরোহের, জীবন ও মরণের কাহিনী।"

উত্তরকাশী। গঙ্গোত্রী হইতে বাহির হইবার পর গঙ্গা যেখানে সর্বপ্রথম উত্তরবাহিনী হন সেই স্থান। 'হিমালয়কী যাত্রা' দ্রষ্টব্য।

দেবপ্রয়াগ ॥ ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থান। 'হিমালয়কী যাত্রা' দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মণঝোলা ॥ হৃষীকেশের নিকটে গঙ্গার উপরে; ইহা পূর্বে দড়ি দিয়া শিকার পুল ছিল। এখন উহা লোহার শিকল ও শিকের ঝুলানো পুল। এখানে লক্ষ্মণের মন্দির আছে। 'হিমালয়কী যাত্রা' দ্রষ্টব্য।

করাল দংষ্ট্রা ॥ বিকট দন্ত। তুলনীয়: গীতা 'বহূদরং বহুদংষ্ট্রা-করালম্', 'দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি'।

ত্রিবেণী-সংগম ॥ গঙ্গা-যমুনা ও (গুপ্ত) সরস্বতীর সংগম। প্রয়োগ তিনটি নদীর প্রবাহ একত্র হয়। তাই সেখানে উহাদের যুক্তবেণী বলে। বাংলাদেশে একটি স্রোত হইতে অনেক স্রোত হয়, তাই সেখানে ইহার নাম মুক্তবেণী।

শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী ॥ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর সঙ্গে দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার বন্ধুত্ব ছিল। একদিন উভয়ে জলক্রীড়ার জন্য বাহির হইয়াছে। স্নানান্তে দেবযানী প্রথমে উঠিয়া আসিল ও ভুলক্রমে শর্মিষ্ঠার কাপড় পরিল। ইহা লইয়া উভয়ে কলহ আরম্ভ হয়। শর্মিষ্ঠা দেব-যানীকে ধাক্কা দিয়া এক কূপে নিক্ষেপ করিল। অল্পক্ষণ পরে মৃগয়ায় বহির্গত রাজা যযাতি জলের সন্ধানে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। দেবযানী ঘরে ফিরিয়া সমস্ত সমাচার পিতাকে শুনাইলেন। শুক্রাচার্য রাগ করিয়া বৃষপর্বার রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শেষে রাজা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীর মত রাখিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন শুক্রাচার্য শান্ত হইলেন। ইহার পর দেবযানীর সহিত রাজা যযাতির বিবাহ হইল ও তাহাকে দাসী লইয়া দেবযানী স্বামীগৃহে গেলেন। শর্মিষ্ঠার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া যযাতি তাঁহাকে গোপনে বিবাহ করিলেন। পরিণামে তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন।

তাই দেবযানীর কথা শুনিবার সময় এখানে বড় কষ্টে মিলিত গঙ্গা-যমুনার স্রোতের কথা মনে পড়ে।

পৃ ১৬ 'প্রয়াগরাজ' ॥ [প্র(ভাল করিয়া)+যজ্ (পূজা করা)+অ (অধিকরণ)=যেখানে উত্তমরূপে পূজা হয় এরূপ স্থান।] যাগ=যজ্ঞ। যজ্ঞের জন্য পবিত্রতম স্থান; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থান; এলাহাবাদ।

সরযূ॥ কৈলাসপর্বতে অবস্থিত মানস সরোবরে এই নদীর উৎপত্তি। 'সর' অর্থাৎ সরোবর। সরোবর হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া 'সরযূ' নাম। ইহার তটে অযোধ্যা। ইহার অপর নাম ঘাঘরা।

পাটলীপুত্র॥ বর্তমান পাটনা শহর, বিহার রাজ্যে অবস্থিত। ইহা কুসুমপুর নামেও পরিচিত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক প্রভৃতি সম্রাটদের রাজধানী। গুরু গোবিন্দসিংহের জন্মস্থানের গুরুদ্বার এখানেই আছে।

মগধসাম্রাজ্য॥ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে এই সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল সিন্ধু হইতে কাবেরী পর্যন্ত।

পৃ ১৭ সগরপুত্র॥ সূর্যবংশীয় রাজা বাহু শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হইয়া রাজ্যপাট ছাড়িয়া হিমালয়ের অরণ্যে পলাইলেন। সেখানেই তাঁহার দেহাবসান হয়। সেই সময়ে তাঁহার এক রাণী যাদবী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহার সপত্নী গর্ভনাশ করিবার জন্য যাদবীর আহার্যের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া দেয়। কিন্তু গর্ভনাশ হইল না, পুত্র হইল। 'গর' নামক বিষের সঙ্গে জন্ম হইয়াছে বলিয়া নাম হইয়াছিল 'সগর'। সগর বড় হইয়া শত্রুদের হাত হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিল। শৈল্যা নামে তাহার এক রাণী ছিল। তাহার গর্ভে অসমঞ্জস নামে এক পুত্র ও কন্যার জন্ম হয়। তাহার দ্বিতীয়া রাণীর নাম ছিল বৈদর্ভী। তাহার গর্ভে এক মাংসপিণ্ডের জন্ম হয়, তাহা হইতে ষাট হাজার পুত্র সৃষ্টি হয়। সগর ৯৯ বার যজ্ঞ করিবার পর যখন শততম যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া যজ্ঞের অশ্ব ছাড়িয়া দেয়, তখন ইন্দ্র তাহা চুরি করিয়া পাতালে লইয়া গেল এবং কপিল মুনির আশ্রমে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিল। এদিকে সগরের ষাট হাজার পুত্র ঘোড়ার সন্ধান আরম্ভ করিল। তাহারা সারা পৃথিবী খুঁড়িয়া ফেলিল। জল আসিয়া সমস্ত ভূভাগ ভরিয়া ফেলিল। এইজন্য এই জলমগ্ন স্থানের নাম ইহার পর হইতে 'সাগর' হইল। অনেক চেষ্টার পর তাহারা পাতালে আসিয়া পৌছিল। সেখানে তাহারা কপিলমুনির আশ্রমে ঘোড়া দেখিতে পাইল। মুনিকেই চোর ভাবিয়া তাহারা মুনিকে অপমান ও লাঞ্ছনা করিল। মুনি কুপিত হইয়া শাপ দিলেন। সকলে ভস্ম হইয়া গেল। পরে অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান মুনিকে প্রসন্ন করিয়া ঘোড়া লইয়া আসিল। এইভাবে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। মুনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে তাহার ষাট হাজার পূর্বপুরুষের উদ্ধারের পথও বলিয়া দিলেন, বলিলেন, যদি কেহ স্বর্গের গঙ্গাকে পৃথিবীতে

নামাইয়া আনিতে পারে আর তাহার জল স্পর্শ করাইতে পারে, তাহা হইলে উহাদের উদ্ধার হইবে। এইজন্য অংশুমান তাহার শেষ জীবন তপস্যায় কাটাইল। অংশুমানের পুত্র দিলীপও এই তপস্যা চালাইয়া গেল, এবং পরিণামে তাহার পুত্র ভগীরথ কঠোর তপশ্চর্যার ফলে গঙ্গাকে পৃথিবীতে নামাইয়া আনিল ও গঙ্গার স্রোত নিজের ষাট হাজার পূর্বপুরুষদের ভস্মের উপর প্রবাহিত করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করিল। এই কথারই এখানে উল্লেখ আছে। ভগীরথ গঙ্গাকে আনিল, তাই গঙ্গার নাম ভাগীরথী।

[এই প্রকারে ভগীরথকে খাল কাটায় নিপুণ মনে করিয়া Irrigation-এর জন্য লেখক এক সুন্দর পারিভাষিক শব্দ প্রচলিত করিয়াছেন—ভাগীরথ বিদ্যা।]

৬

যমুনারাণী

পৃ ১৮ উর্জস্বিতা ॥ ভব্যতা।

গগনচুম্বী ও গগনভেদা ॥ এই দুই শব্দের মধ্যে প্রভেদ স্মরণীয়।

অসিত ঋষি ॥ ব্যাসের এক শিষ্য। অসিত কৃষ্ণ। 'হিমালয়কী যাত্রা' দ্রষ্টব্য।

দেবদেব ॥ মহাদেব। স্বর্গ হইতে অবতরণকালে মহাদেব গঙ্গাকে জটাজালে ধারণ করিয়াছিলেন।

পৃ ১৯ এক কবিপ্রাণ ঋষি ॥ লেখক তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন 'যামুন ঋষি।' 'হিমালয়কী যাত্রা' দ্রষ্টব্য।

অন্তর্বেদী ॥ প্রাচীনকালে গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশকে অন্তর্বেদী (দো-আব) বলিত।

শ্রীনগর ॥ কাশ্মীরের শ্রীনগর নয়। ইহা কেদার যাওয়ার পথে। লোকে ইহাকে সিদ্ধপীঠ বলে। এখানকার সাধনা ব্যর্থ হয় না, অচিরে ফলদায়ী হয়। লেখকের 'হিমালয়কী যাত্রা' ও 'জীবনকা কাব্য' নামক পুস্তক দুইখানিতে শঙ্করাচার্যের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মাবর্ত ॥ কুরুক্ষেত্রের নিকটে দৃষদ্বতী ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী প্রদেশ। বর্তমান নাম 'বিঠুর'।

নরহত্যাক্লিষ্ট ভূমিভাগ ॥ এখানে অনেক ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল।

পৃ ২০ রোমাঞ্চকর ॥ 'সংবাদমিদমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্'। গীতা ১৮।৭৪

যমরাজার ভগ্নীর ভ্রাতৃত্ব ॥ যম, যমুনা অথবা যমী, অশ্বিনীকুমার— ইহারা সকলে সূর্য ও তাঁহার পত্নী সংজ্ঞার সন্তান। একবার সংজ্ঞার ইচ্ছা হইল, পিতা বিশ্বকর্মার গৃহে যাইবেন, কিন্তু সূর্য অনুমতি দিলেন না। তাই তিনি আপন মায়াবলে ছায়া নামে এক স্ত্রীমূর্তি সৃষ্টি করিয়া তাহা সূর্যের কাছে রাখিয়া পিতৃগৃহে গেলেন। ছায়া ও সংজ্ঞার এত সাদৃশ্য ছিল যে সূর্য জানিতেই পারেন নাই যে সংজ্ঞা নাই। ছায়াই যমকে দেখিত শুনিত। কিন্তু পরে সৎমায়ের চিন্তা জাগিয়া উঠিল, সে যমকে অবহেলা করিতে লাগিল। যম রাগিয়া তাহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে ছায়া তাহাকে শাপ দিল, যমের দুই পায়ে ঘা হইয়া গেল, তাহাতে পোকা কিলবিল করিতে লাগিল। যম সমস্ত কথা সূর্যকে বলিয়া দিল। সূর্য যমকে এক কুকুর দিল, কুকুর তাহার ঘা হইতে পোকা চাটিয়া লইতে লাগিল।

যম দক্ষপ্রজাপতির তেরটি কন্যাকে বিবাহ করে। শ্রদ্ধা হইতে সত্য, মৈত্রী হইতে প্রসাদ, দয়া হইতে অভয়, শান্তি হইতে শম, তুষ্টি হইতে হর্ষ, পুষ্টি হইতে গর্ব, ক্রিয়া হইতে যোগ, উন্নতি হইতে দর্প, বুদ্ধি হইতে অর্থ, মেধা হইতে স্মৃতি, তিতিক্ষা হইতে মঙ্গল, লজ্জা হইতে বিনয়, ও মূর্তি হইতে নর ও নারায়ণ নামক পুত্রের জন্ম হয়।

যম জীবের পাপপুণ্যের বিচারক। চিত্রগুপ্ত নামে তাহার এক মন্ত্রী পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখিয়া তাহার সাহায্য করে। দণ্ড তাহার অস্ত্র, মহিষ তাহার বাহন।

এমন যে ভাই সমস্ত সংসার শাসন করে তাহার ভগ্নীরও তেমনই প্রতাপ হইবে। তাই তাহার ভাই হইবার জন্য মানুষের অসাধারণ যোগ্যতা চাই। সাধারণ লোক এই স্থান গ্রহণ করিতে পারে না।

পারিজাত সুকুমার ॥ সুন্দর ও সুকোমল।

তাজবিবি ॥ মুমতাজমহল প্রকাণ্ড নাম বলিয়া এই সাধারণ নাম লওয়া হইয়াছে। আগ্রার লোকেরা 'তাজবিবিকা রোজা' নামেই সমাধিমন্দিরকে জানে।

জমাট অশ্রু ॥ শুভ্রমূর্তি তাজমহল। লেখক তাঁহার তাজমহল বর্ণনায় লিখিয়াছেন—'ইহা সমাধিস্থান নহে, এমন স্থান যেখানে এক ভাবুক সম্রাটের দুঃখ জমাট হইয়া বরফের মত শাদা হইয়া গিয়াছে।' কবিবর রবীন্দ্রনাথ ইহাকে কালের কপোলে অশ্রুবিন্দু বলিয়াছেন :

এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান।
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তরবেদনা,
চিরন্তন হয়ে থাক, সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন
সন্ধ্যা-রক্তরাগ-সম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বাসিত হয়ে সকরুণ করুক আশ্বাস
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল॥

জল যেমন জমিয়া সাদা বরফ হইয়া যায়, অথবা ঘি জমিয়া সাদা হইয়া যায়, তেমনই সম্রাটের অশ্রুবিন্দু জমিয়া শ্বেতমর্মরের রূপ গ্রহণ করিয়াছে এই অর্থ।

চর্মণ্বতী ॥ পরে দ্রষ্টব্য।

সিন্ধু ॥ মালবের মধ্য দিয়া এই ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত।

বেণীভূত-প্রতনু-সলিলা সাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভি র্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ॥

মেঘদূত, ২৯ শ্লোক।

মহাকবি ভবভূতির মালতীমাধবের চতুর্থ অঙ্কের শেষ অংশে মকরন্দ মাধবকে বলিতেছে: ওঠো, পারা ও সিন্ধুনদীর সঙ্গমে স্নান করিয়া নগরেই প্রবেশ করি—তদুত্তিষ্ঠ পারাসিন্ধুসংভেদমবগাহ্য নগরীমেব প্রবিশাবঃ।

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের ৫ম অঙ্কে ১৪শ ও ১৫শ শ্লোকের নীচে এক পত্র আছে, তাহাতে এই নদীর উল্লেখ আছে—"যোঽসৌ রাজসূয়-যজ্ঞদীক্ষিতেন ময়া রাজপুত্রশতপরিবৃতং বসুমিত্রং গোপ্তারমাদিশ্য সংবৎসরো-পাবর্তনীয়ো নিরর্গলস্তুরগো বিসৃষ্টঃ সঃ সিন্ধো র্দক্ষিণরোধসি চরন্নশ্বানীকেন যবনানাং প্রার্থিতঃ।"

রাজসূয়যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আমি শতরাজপুত্রপরিবেষ্টিত বসুমিত্রকে রক্ষা করিবার আদেশ দিয়া বৎসরান্তে ফিরাইয়া আনিবার কথা বলিয়া যে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, তাহা সিন্ধুর দক্ষিণতীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেখানে যবনদের অশ্বদল তাহাকে আটক করিল।

সেখানকার মিশ্রীতে মুখ মিষ্টি করিয়া॥ কালপিতে মিছরির কারখানার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

অক্ষয় বট॥ প্রয়াগ, ভুবনেশ্বর, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে রোপিত বটবৃক্ষ। লোকে বলে, এই বট পূজা করিলে, ইহাতে জল দিলে, অক্ষয়পুণ্য লাভ হয়। তাই ইহাকে অক্ষয় বট বলে। 'হিমালয়কী যাত্রা' দ্রষ্টব্য।

বুড়া আকবর॥ আকবর এখানে দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন সেই কথা বলা হইয়াছে। 'হিমালয়কী যাত্রা' দ্রষ্টব্য।

অশোকের শিলাস্তম্ভ॥ এখানে অশোকের ধর্মবিষয়ে শিলালেখ খোদাই করা আছে। 'হিমালয়কী যাত্রা' দ্রষ্টব্য।

সরস্বতী॥ বাণী। গুপ্তস্রোতা সরস্বতীকেও বুঝাইতেছে।

পৃ ২১॥ কাদম্ব॥ কলহংস।

ইন্দীবরশ্যামা॥ নীলপদ্মের মত শ্যামবর্ণ। ইন্দীবর অর্থে নীলকমল।

সংস্কৃত কবিদের এক পুরাতন কল্পনা, ইন্দীবর-শ্যাম ও গৌরবর্ণের সঙ্গমে পরস্পরের শোভার জন্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। যেমন—

ইন্দীবর-শ্যামতনু র্নৃপোঽসৌ ত্বং রোচনা-গৌর-শরীরযষ্টিঃ
অন্যোন্যশোভা পরিবৃদ্ধয়েবাং যোগস্তড়িত্তোয়দয়োরিবাস্তু॥ রঘু ৬।৬৫

জাহ্নবী॥ গঙ্গা। সগরপুত্রদের উদ্ধারের জন্য ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া

যাইতেছিলেন। পথে জহ্নু নামে এক রাজর্ষির যজ্ঞসামগ্রী উহাতে ভাসিয়া গেল। ঋষি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তপোবলে গঙ্গা পান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে অনেক স্তব করিলেন, তাহাতে তিনি কানের ভিতর দিয়া (অনেকের মতে জঙ্ঘার মধ্য হইতে) গঙ্গাকে বাহির করিয়া দিলেন। ইহার পর হইতে গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী হইয়াছিল।

৭

মূল ত্রিবেণী

পৃ ২২ ব্রহ্মকপাল ॥ হিমালয়ে বদরীনারায়ণ তীর্থে এই নামের এক শিলা আছে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, এই শিলার উপরে বসিয়া শ্রাদ্ধ করিলে লোকের সমস্ত পূর্বপুরুষের একত্র মোক্ষলাভ হয় আর সে পিতৃ-ঋণ হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়। 'হিমালয়কী যাত্রা' দেখুন, প্রকরণ ৪২।

হরির চরণ ॥ হরির 'পৈড়ীর' সূচনা।

৮

জীবনতীর্থ হরিদ্বার

পৃ ২৩ ত্রিপথগা ॥ তিন পথে যাহা বহিতেছে—স্বর্গগামিনী মন্দাকিনী, মর্ত্যবাহিনী গঙ্গা, পাতালগামিনী ভোগবতী।

পৃ ২৫ 'মহোল্লা' ॥ শিখগুরুদের ভজনের শেষে নানকেই নাম পাওয়া যায়। ইহাতে কোন্ ভজন কোন্ গুরুর দ্বারা লেখা হইল তাহা নাম দেখিয়া বোঝা যায় না। গ্রন্থসাহেবের সংগ্রহ যখন হইল তখন এ সমস্ত ভজন গুরুর ক্রম অনুসারে পৃথক করা হইল এবং প্রত্যেক গুরুর ভজনের 'মহোল্লা' পৃথক করিয়া গৃহীত হইল। এখন হইতে কোন ভজন কোন গুরুর রচনা তাহা বোঝা যায়।

আসা-দি-বার ॥ আসাবরী রাগ।

মুক্তিফৌজ ॥ 'স্যাল্‌ভেশন আর্মি' নামে সামরিক ধরণে সংগঠিত খ্রীষ্টানদের এক প্রতিষ্ঠান, ইহার সদস্যেরা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে।

. পৃ ২৬ বাজিনীবতী উষা ॥ ঋগ্‌বেদের উষা সম্বন্ধে সূক্তে উষাকে বাজিনীবতী বলা হইয়াছে। সেখানে উহার অর্থ বলবতী বা সমৃদ্ধিশালী।

উষস্ তৎ চিত্রতমা ভর অস্মভ্যং বাজিনীবতী।

যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥

[হে বলবতী ও সমৃদ্ধিশালিনী উষা, আমাদিগকে সুন্দর (বল বা সম্পত্তি) দান করুন, যাহাতে আমরা পুত্র প্রপৌত্র ধারণ করিতে পারি।]

মণ্ডল ১, সূক্ত ৯২।১৩

'বাজ' শব্দের অর্থ হইল বল, বীর্য, বেগ। ইহা হইতে 'বাজিন্' অর্থাৎ বলবান, বীর্যবান, বেগবান। পুনরায়, ইহার অর্থ হইল—যাহার মধ্যে এই সব গুণ আছে,যেমন যুদ্ধে রথের ঘোড়া। ইহার স্ত্রীলিঙ্গে 'বাজিনী' বা ঘোটকী। ইহার পরে বেগবান অশ্বের চালক বা প্রভুকে 'বাজিনীবৎ' বলে। তাহার স্ত্রীলিঙ্গে রূপ হইল 'বাজিনীবতী'। সিন্ধু বা সরস্বতীতে এই শব্দ প্রযুক্ত হইলে অর্থ হয়—বলবান, বেগবান অশ্বে সমৃদ্ধ।

বল ও বীর্য সমৃদ্ধির মূল। ইহা হইতে সমৃদ্ধির অর্থও আসে। ধান্যও তো এক প্রকারের সমৃদ্ধি। ইহা হইতে এই শব্দে এ অর্থও আসিয়াছে। কখনও কখনও 'বাজিনীবতী' কথার অর্থ 'অন্নশালিনী'ও হয়।

স্বশ্বা সিন্ধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্ময়ী সুকৃতা বাজিনীবতী।

ঊর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধি বস্তে সুভগা মধুবৃধম্ ॥

মঃ ১০, সূঃ ৮২—৮

[উত্তম অশ্ব, উত্তম রথ, সুন্দর বস্ত্র, হিরণ্য, এই সকলের অধিকারী সুগঠিত-দেহ, অন্নবতী, ঊর্ণাযুক্ত, যুবতী ও সুভগা সিন্ধু মধুবৃধ (মধুবর্ধক বৃক্ষ) ধারণ করে।]

কঠোপনিষদে 'বাজশ্রবসে'র উল্লেখ আছে। সেখানে 'বাজ' কথাটির অর্থ অন্ন। অন্ন দান প্রভৃতির জন্য যাহার শ্রবস্ বা যশ লাভ হইয়াছে তাহাই 'বাজশ্রবস্।'

'বাজীকর' ওষধি বা শক্তিবর্ধক ঔষধ। 'বাজীকরণ' প্রয়োগ অর্থাৎ শক্তি বাড়াইবার প্রয়োগ। এই শব্দও সঙ্গে সংবদ্ধ।

৯

দক্ষিণগঙ্গা গোদাবরী

পৃ ২৭ উঠোনিয়াঁ। ॥ 'প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখে চন্দ্রমৌলি শিবের নাম লও। শ্রীবিন্দুমাধবের নিকটে গঙ্গায় স্নান কর, গোদাবরীতে স্নান কর···। কৃষ্ণা, বেণ্যা, তুঙ্গভদ্রা, সরযূ, কালিন্দী, নর্মদা, ভীমা, ভামা, গোদা—এই সকল নদীর মধ্যে গোদাবরী প্রধান, এই গঙ্গায় স্নান কর।'

শ্রীরামচন্দ্রের অত্যন্ত সুখের দিন ॥ সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে অতিবাহিত বনবাসের দিন।

জীবনের দারুণ আঘাত ॥ সীতাহরণের জন্য।

পৃ ২৮ বাল্মীকির এক কারুণ্যময়ী অনুভূতি ॥ ক্রৌঞ্চবধের মত ক্ষুদ্র প্রসঙ্গের মধ্য হইতে করুণার ভাবনা জাগ্রত হইয়া যেমন করিয়া রামায়ণের মত মহাকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে তেমন করিয়া।

পৃ ২৯ সহিষ্ণুবীর রামচন্দ্র ও বেদনার প্রতিমূর্তি সীতামা ॥ এই বিশেষণগুলির উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি করুন। তুলনীয়: 'দুঃখ-সংবেদনায়ৈব রামে চৈতন্যমাহিতম্।'—উত্তররামচরিত।

কষায় ॥ কটু।

কল্পান্ত ॥ কল্প = ব্রহ্মার এক দিন = ১০০০ যুগ = ৪৩২০ লক্ষ (মানুষের) বৎসর। ইহাই সৃষ্টির আয়ু বলিয়া ধরা হয়। সৃষ্টির অন্ত পর্যন্ত যাহা ভুগিতে হয় তাহাই কল্পান্তিক দুঃখ। (কল্প + অন্ত + ইক)

জনস্থান ॥ দণ্ডকারণ্যের এক অংশ, এখানে গোদাবরীর তীরে শ্রীরামচন্দ্র বাস করিতেন। রাক্ষসদের উপদ্রব এখানে কম ছিল বলিয়া লোকে এখানে বাস করিতে পারিত। মানুষের বাসযোগ্য স্থান বলিয়া এ জায়গাটির নাম ছিল জনস্থান।

জটায়ু ॥ অরুণের পুত্র, সম্পাতির ছোট ভাই, রাজা দশরথের পরম বন্ধু। রাবণ যখন সীতাকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন সীতার মুখ হইতে 'রাম' 'রাম' ডাক শুনিয়া জটায়ু সীতাকে ছাড়াইয়া লইবার খুব চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহা বৃথা হইল। তাহাকে আসন্ন মৃত্যুর অবস্থায় আনিয়া রাবণ সীতাকে লইয়া চলিয়া গেল। এদিকে রাম যখন সীতার অন্বেষণে সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন

তখন জটায়ুই তাঁহাকে সংবাদ দিল যে রাবণ সীতাকে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার পর জটায়ুর মৃত্যু হইল।

সীতামায়ের কাতর তনুযষ্টি॥ তুলনীয়—

অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভব স্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূৎ গোদাবরী সৈকতে
আয়ান্ত্যা পরিদুর্মনায়িতামিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্যাদরবিন্দ কুট্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামোঽঞ্জলিঃ॥

—উত্তররামচরিত, ৩।৩৭

পৃ ৩০ যিনি বেদপাঠ করাইয়াছিলেন॥ মহারাষ্ট্রের সন্তকবি জ্ঞানেশ্বরের পিতা বিট্‌ঠলপন্থ জন্ম হইতেই বৈরাগ্যপরায়ণ ছিলেন। যৌবনে তীর্থযাত্রা করিতে করিতে তিনি একবার আলন্দী গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানকার এক ব্রাহ্মণ তাঁহার যোগ্যতা দেখিয়া নিজের কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের ফলে বিট্‌ঠল পন্থের বৈরাগ্যবৃত্তি কমিল না। 'গঙ্গাস্নানে যাইতেছি' বলিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিলেন এবং কাশীতে গিয়া 'আমার স্ত্রীপুত্র নাই' বলিয়া রামানন্দ স্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে রামানন্দ স্বামী রামেশ্বর তীর্থে যাওয়ার পথে আলন্দীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিট্‌ঠলপন্তের পত্নী সেখানে পতির সন্ন্যাসগ্রহণ সংবাদ শুনিবার পর হইতে ব্রতোপাসনায় দিন কাটাইতেছিলেন। গ্রামে রামানন্দ স্বামীর আগমন সংবাদ শুনিয়া তিনি তাঁহার চরণ বন্দনা করিবার জন্য আসিলেন। সন্ন্যাসী যখন তাঁহাকে 'পুত্রবতী ভব' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন তখন তিনি হাসিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহার জীবনকথা শুনাইলেন। রামানন্দ আলন্দী হইতেই সোজা কাশীতে ফিরিয়া গেলেন। বিট্‌ঠলপন্তকে ভৎ‍র্সনা করিয়া তিনি পুনরায় গৃহীর জীবন যাপন করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইঁহার চার সন্তান হইল: নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানদেব, সোপানদেব ও মুক্তাবাঈ।

কিন্তু শাস্ত্রে সন্ন্যাসীদের আবার সংসারী হইবার বিধান নাই। এজন্য সমাজ এই পরিবারকে শাস্তি দিতে লাগিল। ইঁহাদের সন্তানদের উপবীত দিবার কোনও আয়োজন হইল না। অবশেষে বিট্‌ঠলপন্ত পৈঠন গেলেন এবং সেখানকার ব্রাহ্মণদের পদানত হইয়া বলিলেন, "আমার জন্য যে কোনও

প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। কিন্তু আমাকে শুদ্ধ করিয়া নিন এবং আমার সন্তানদের উপবীত সংস্কারের অনুমতি দিন।” ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রে কোনও উপায় পাওয়া গেল না। তাঁহারা বলিলেন, “তোমার পাপ এত অধিক যে তোমার পক্ষে দেহত্যাগই একমাত্র উপায়। তোমাদের সন্তানদের তো উপবীত দেওয়াই যাইতে পারে না।” বিট্‌ঠলপন্ত ও তাঁহার পত্নী প্রয়াগে গিয়া গঙ্গায় জল-সমাধি গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর শিশু চারজন আলন্দীর ব্রাহ্মণসমাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন, “আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান; আমাদের উপবীত সংস্কার হওয়া প্রয়োজন।” ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন, পৈঠনের ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে শুদ্ধিপত্র আনিলে উপবীত দেওয়া যাইতে পারিবে।

শিশুরা পৈঠনে গেলেন। সেখানকার ব্রাহ্মণদের সামনে তাঁহারা নিজেদের সমাজে গৃহীত হইবার দাবি পেশ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, ‘সন্ন্যাসীর সন্তানদের উপবীতে অধিকার কোনও শাস্ত্রেই নাই, এজন্য কোনও প্রায়শ্চিত্তও নাই। সুতরাং তোমরা সর্বত্র ঈশ্বরভাব রাখিয়া জিতেন্দ্রিয় হও, বিবাহ করিও না, সর্বদা হরিভজনে মগ্ন থাক।’

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সভা শেষ হইয়া যাইতেছিল এমন সময় এই চারিটি শিশুকে কেহ তাহাদের নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করিল। নিবৃত্তিনাথ বলিলেন, ‘আমার নাম নিবৃত্তি। আমি কোনও প্রবৃত্তির মধ্যে পড়িব না।’ জ্ঞানদেব বলিলেন, ‘আমি জ্ঞানদেব। সকল আগমশাস্ত্র জানিব।’ সোপানদেব বলিলেন, ‘আমি ভক্তদের ঈশ্বর ভজন শিখাইয়া বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত করাইবার সোপান।’ মুক্তাবাঈ বলিলেন, ‘আমি বিশ্বের লীলা দেখাইবার জন্য প্রকট হইয়াছি, আমি ঈশ্বরের লীলারূপী মুক্তি।’

এই উত্তর শুনিয়া সেই লোকটি বলিল, ‘নাম তো যেমন ইচ্ছা রাখিতে পার। ঐ যে মহিষশাবক যাইতেছে উহার নামও জ্ঞানদেব।’

জ্ঞানদেব অমনই বলিয়া উঠিলেন, ‘নিশ্চয়! ঐ মহিষশাবক ও আমার মধ্যে কোনও ভেদ নাই। উহাতেও আমারই আত্মা।’

এমন সময় কেহ ঐ মহিষশাবকের উপর তিন ঘা চাবুক লাগাইল, আর তৎক্ষণাৎ এদিকে জ্ঞানেশ্বরের পিঠের উপর চাবুকের দাগ পড়িয়া গেল।

শিশুচতুষ্টয় ব্রাহ্মণদের নমস্কার করিয়া নিজের গ্রামে ফিরিবার জন্য বাহির

হইলেন। পথে গোদাবরীর তীরে তাঁহারা বসিয়াছিলেন। সেখানে কয়েকজন যুবক একত্র হইয়াছিল। তাহারা মজা দেখিবার জন্য জ্ঞানদেবকে বলিল, 'তুমি যদি শুদ্ধিপত্র চাও, তবে এই মহিষশাবকের মুখ দিয়া বেদ পাঠ করাও।' জ্ঞানেশ্বর অবিলম্বে মহিষশাবকের নিকটে গিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া ঐ ব্রাহ্মণদের বলিতে লাগিলেন, 'আপনারা তো ভূদেব। আপনাদের বচন কখনও বৃথা হইতে পারে না। দেখুন, এ এখন বেদ পাঠ করিবে।'

আর সত্যই সেই মহিষশাবক বেদের ঋক্ আদি পাঠ করিতে লাগিল !!

গীতার উপর জ্ঞানেশ্বর 'ভাবার্থদীপিকা' লিখিয়াছেন, তাহার নাম 'জ্ঞানেশ্বরী।' ইহা ছাড়া তাঁহার এক স্বতন্ত্র রচনাও আছে, তাহার নাম 'অমৃতানুভব।' এই দুইটি ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য রত্ন।

দশগ্রন্থী ॥ ঋক্, যজুর্, সাম ও অথর্ব, এবং শিক্ষা (স্বরের উচ্চারণ বিষয়ে), ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্বন্ধে), জ্যোতিষ ও কল্প (সূত্র), এই ছয় বেদাঙ্গ—যিনি এই দশ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন।

শংকরাচার্যের উপর অত্যাচার ॥ শংকরাচার্যের মাতা তাঁহাকে সন্ন্যাস লইবার অনুমতি দিতেছিলেন না। একবার শংকরাচার্য স্নানের জন্য নদীতে নামিলেন। সেখানে কুমীর আসিয়া তাঁহার পা ধরিল। শংকরাচার্য মাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এখন আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দাও।' মা অনুমতি দেওয়া মাত্র শংকরাচার্য কুমীরের আক্রমণ হইতে মুক্ত হইলেন। তিনি পুরাপুরি মাতৃভক্ত ছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসধর্মের নিয়ম অনুসারে তিনি মাতার সঙ্গে থাকিতে পারিতেন না, মাতার দর্শন পর্যন্ত করিতে পারিতেন না। তথাপি তিনি বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার সময়ে মাকে বলিয়াছিলেন, 'সংকটের সময় ডাকিলেই আমি আসিয়া পড়িব।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিছু কাল পরে মা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পুত্রকে দেখিবার তাঁহার ইচ্ছা হইল। কথা অনুসারে শংকরাচার্য আসিলেন এবং মায়ের দেহান্ত পর্যন্ত তাঁহার সেবা করিলেন। মাতা সুখে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু এখন গোলযোগ আরম্ভ হইল। শ্মশানে শব লইয়া যাইবার জন্য গ্রামের ব্রাহ্মণেরা প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের শ্মশানে ঐ শব দাহ করিবার অনুমতি দিতেছিল না। কেহ কাঠও দিল না। ব্রাহ্মণেরা স্থির করিল যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর যিনি তাঁহার পূর্বাশ্রমের মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে

আসিয়াছিলেন তিনি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মই করিয়াছিলেন ; তাঁহাকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই উচিত। শংকরাচার্য তাঁহার মায়ের মৃতদেহ চার টুকরা করিলেন, কলাগাছ কাটিয়া লইয়া আসিলেন, তাহার উপর এই টুকরা গুলি রাখিয়া তিনি তাঁহার মায়ের ঘরের আঙিনাতেই যোগাগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, আর নিজের তপস্যার তেজে তাঁহার সৎকার করিলেন।

শংকরাচার্যের গ্রাম যে রাজ্যে ছিল, সেখানকার রাজা ছিলেন তাঁহার শিষ্য। গুরুর উপর এই অত্যাচারের খবর পাইয়াই তিনি তাঁহার রাজ্যের নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের সাজা দিলেন যে, তাহারা পরিবারের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে শব শ্মশানে লইয়া যাইতে পারিবে না, ঘরের আঙিনাতেই তাহা চার খণ্ড করিয়া দাহ করিতে হইবে। রাজা এই দণ্ড কঠোরতার সহিত প্রয়োগ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ব্রাহ্মণেরা ভয় পাইয়া ক্ষমা চাহিলেন। তখন রাজা শব চার খণ্ড করার পরিবর্তে শবের উপর চারটি রেখা টানিবার ও তাহার পরে শ্মশানে লইয়া যাইবার অনুমতি দিলেন।

অষ্টবক্র ॥ যাহার আটটি অঙ্গই বক্র—খুবই আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে।

পৃ ৩১ জীবন বিতরণ ॥ জীবন=জল ; বিতরণ=ভাগ করা।

ইউনান ॥ গোদাবরীর মুখের নিকটে অবস্থিত। ফরাসী কোম্পানি ১৭৫০ খ্রীঃ ইহা দখল করে আর দুই বৎসর পরে ইহা ফরাসী সরকারকে উপহার দেয়। এখন ইহা স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পৃ ৩২ চঞ্চল কমলদল ॥ দৃশ্যের শোভা বাড়াইবার জন্য।

ভবভূতির কথা ॥ ভবভূতি তাঁহার 'উত্তর রামচরিতে' গোদাবরীর বিবিধ সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া। যথা—

এতানি তানি গিরি-নির্ঝরিণী-তটেষু
বৈখানসাশ্রিত-তরূণি তপোবনানি।
যেম্বাতিথেয়পরমা শমিনো ভজন্তে
নীবার-মুষ্টি-পচনা গৃহিণো গৃহাণি ॥ উত্তর রামচরিত ১।২৫
স্নিগ্ধ-শ্যামাঃ ক্বচিদপরতো ভীষণা ভোগরূক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাংকৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্-গর্তকান্তারমিশ্রাঃ
সংদৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥ উ. রা. ২।১৪

ইহ সমদশকুন্তাক্রান্তবানীরমুক্ত-
প্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বুনিকুঞ্জ-
স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ॥ উ. রা. ২।২০
এতে ত এব গিরয়ো বিরুবন্ময়ূরাস্—
তান্যেব মত্তহরিণানি বনস্থলাণি।
আমঞ্জুবঞ্জুললতানি চ তান্যমূনি
নীরন্ধ্রনীপনিচুলানি সরিত্তটানি॥ উ. রা. ২।২৩
মেঘমালেব যশ্চায়মারাদিব বিভাব্যতে।
গিরিঃ প্রস্রবণঃ সোঽয়ং যত্র গোদাবরী নদী॥ উ. রা. ২।২৪
তস্যৈবাসীন্মহতি শিখরে গৃধ্ররাজস্য বাসস্
তস্যাধস্তাদ্বয়মপি রতা স্তেষু পর্ণোটজেষু।
গোদাবর্যাঃ পয়সি বিততশ্যামলানোকহশ্রীর্
অন্তঃকূজন্মুখরশকুনো যত্র রম্যো বনান্তঃ॥ উ. রা. ২।২৫
গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক-
স্তম্বাডম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈর্
উদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ॥ উ. রা. ২।১৯
এতে তে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালম্বিতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দাক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসংকুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈর্
উত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসংগমাঃ॥ উ. রা. ২।৩০
যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে
যানি প্রিয়াসহচরশ্চিরমধ্যবাৎসম্।
এতানি তানি বহুকন্দরনির্ঝরাণি
গোদাবরীপরিসরস্য গিরেস্তটানি॥ উ. রা, ৩।৮

বৈদিক প্রভাত॥ বৈদিক যুগে আর্যেরা যেখানে থাকিতেন সেখানকার প্রভাত কুয়াসার জন্য ধূসর হইত বলিয়া, ইতিহাসে বৈদিকযুগ উষাকালের মত

ধেঁায়াটে বলিয়া মনে হইত বলিয়া এবং বৈদিকযুগেই ধর্মজ্ঞানের উষাকাল হইয়াছিল, সেইজন্যও বটে।

পৃ ৩৩ কবিপ্রতিভার মত'॥ প্রতিভার অর্থ হইল: 'প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা।'—নূতন নূতন স্ফুরণ যে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি হইতে বাহির হয় তাহাকে প্রতিভা বলা হয়।

চরিত্র॥ [চর্ (চলা)+ইত্র (সাধন)=চলিবার সাধন=পা] চাল; আচরণ। বেদে 'চরিত্র' শব্দ পা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। (পায়ের চিহ্ন—চরিত্র—দেখিয়া যাহারা চলে তাহারা এই নির্দেশ পায় যে বক কোন দিকে গিয়াছে। অন্য অর্থে, চালবাজিতে ভরা আচরণ যাহাদের সেই বকধার্মিকদের বকই দিক্ নির্ণয় করে।)

১০

বেদধাত্রী তুঙ্গভদ্রা

পৃ ৩৭ 'দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ'॥ সমাসগুলির মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব। গীতা ১০।৩৩।

১১

নেল্লুরের পিনাকিনী

পৃ ৩৮ নেল্লুর॥ (নেল্ল=ধান+ঊরু=গ্রাম) ধানের গ্রাম। এই গ্রাম মাদ্রাজের উত্তরদিগ্‌বর্তী।

১২

জোগ প্রপাত

পৃ ৪০ হোন্নাওয়ার॥ উত্তর কর্ণাটকে পশ্চিমসমুদ্রতটে অবস্থিত এক শহর।

পৃ ৪১ কারিকল॥ দক্ষিণ কর্ণাটকে মাঙ্গালোর ও উড়পীর মধ্যবর্তী এক শহর। এখানে হায়দর আলির প্রতিষ্ঠিত এক হনুমানের মন্দির আছে। নিকটে টিলার উপর বাহুবলীর এক সুন্দর মূর্তি দাঁড়াইয়া।

মনসা ॥ মনে ভাবি এক আর দৈব করায় অন্যপ্রকার।

চিরপোষিত ॥ রবীন্দ্রনাথের এই চরণটি স্মরণীয়—

বহুদিন বঞ্চিত অন্তরে সঞ্চিত কি আশা।

শিমোগা সাগর ॥ গ্রামের নাম।

গুজরাটে যখন বন্যা হইল ॥ ১৯২৭ সালে গুজরাটে অতিবৃষ্টির ফলে হাজার হাজার বাড়ি ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। লোকের অন্ন বস্ত্র আশ্রয় কিছুই ছিল না। তখন সরদার বল্লভভাই পেটেল তাঁহার বিচক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা আর ধনীদের অর্থ সাহায্যের বলে লোকদের স্বস্তি দিবার পথ দেখাইবার কাজে সফল হইয়াছিলেন।

শ্রীগঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে ॥ কর্ণাটকের এক প্রসিদ্ধ নেতা।

পৃ ৪২ স্থিতধীঃ ॥ স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপ বলেন কিরূপে বসেন এবং কিরূপে চলেন। গীতা ২।৫৪

কুলশিখরিণঃ ॥ পুরা শ্লোকটি নিম্নলিখিতরূপ—

বিরম বিরমায়াসাদ স্মাদ্দুরধ্যবসায়তো
বিপদি মহতাং ধৈর্য ধ্বংসং যদীক্ষিতুমীহসে।
অয়ি জড়মতে! কল্পাপায়ে ব্যপেতনিজক্রমা
কুলশিখরিণঃ ক্ষুদ্রা নৈতে ন বা জলরাশয়ঃ ॥

[সমুদ্র কখনও নিজের সীমা অতিক্রম করেন না। কুলপর্বত নিজের স্থানে সর্বদা স্থির হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রলয়কালে ইঁহারাও বিচলিত হন। মহাত্মাদের মধ্যে কিন্তু এ প্রকার ক্ষুদ্রতা হয় না। সংকট যতই অধিক হয়, তাঁহারা ততই দৃঢ় হন। এইভাবে বুঝাইতে গিয়া কবি বলিতেছেন—

হে জড়মতি! বিপদকালে মহাত্মাদের ধর্মনাশ যদি দেখিতে চাও তো তাহা তোমার মিথ্যা চেষ্টা। তাহা ত্যাগ কর। এ মহাত্মা তোমার ক্ষুদ্র কুলপর্বত নহেন, পামর সাগর নহেন যে প্রলয়কাল আসিবামাত্র নিজের কর্মের নিয়মও ভঙ্গ করিয়া ফেলিবেন।]

পৃথিবীর উপর যতই উৎপাত হউক তথাপি পৃথিবীর ভারসাম্য রাখিবার দায়িত্ব যাহার সেই কুলপর্বত নিজের স্থান হইতে সরিয়া যায় না। এইজন্য কাহারও ধৈর্যের তুলনা দিবার সময় বলা হয়, ইহার ধৈর্য তো কুলপর্বতের ধৈর্যের সমান।

এইরূপে নদীতে যতই বন্যা আসুক, তাহা হইলেও সেই জলে সমুদ্র বা মহাসাগর উপচাইয়া পড়ে না। মহাসাগর তাহার সীমা লঙ্ঘন করে না। তাই মহাসাগরও কবিদের রচনায় ধৈর্য ও মর্যাদার আদর্শ উপমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উপস্থিত শ্লোকে মহাত্মাদের অচল স্থৈর্য বর্ণনা করিবার সময় কবি বলিতেছেন, তাঁহাদের নিকট কুলপর্বতও ক্ষুদ্র, জলরাশি মহাসাগরও তুচ্ছ। কারণ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া নিজের সীমা উল্লংঘন না করার এই শক্তি প্রলয়কালে নিজের স্বধর্ম ত্যাগ করে। মহাত্মারা সেরূপ করেন না।

আদর্শ উপমানকে তুচ্ছ মনে করিয়া উপমেয় বস্তু উপমান হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহা দেখাইবার পদ্ধতিকে সংস্কৃতে প্রতীপ অলংকার বলে। ইহাতে অত্যুক্তি অবশ্যই থাকিবে।

পৃ ৪৩ খাণ্ডালা ঘাট ॥ পুণা ও বোম্বাইয়ের মধ্যবর্তী পার্বত্য প্রদেশ।

পৃ ৪৬ নমঃ পুরস্তাৎ ॥ হে সর্ব! তোমাকে অগ্রভাগে, পশ্চাতে, সমস্ত দিক হইতে নমস্কার। তোমার বীর্য অনন্ত। তোমার শক্তি অপার। সব কিছু তুমি ধারণ করিয়া আছ, তাই তুমি সর্ব। গীতা ১১।৪০

সুদুর্দর্শমিদং ॥ আমার যে রূপ তুমি দেখিয়াছ, উহার দর্শন বড় দুর্লভ। দেবতারাও এই রূপের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন। গীতা ১১।৫২

তাহা কি স্বপ্ন ॥ তুলনীয়—স্বপ্নোনু মায়ানু মতিভ্রমোনু—শকুন্তলা ৬।১০

ব্যপেতভীঃ ॥ ভয় ত্যাগ করিয়া শান্তচিত্ত হইয়া যাও, আর এই আমার পরিচিত রূপ পুনরায় দেখিয়া লও।—গীতা ১১।৪৯

পৃ ৪৭ দেবদাস ॥ দেবদাস গান্ধী।

মণিবেন ॥ সরদার পেটেলের কন্যা।

লক্ষ্মী ॥ রাজাজীর কন্যা, পরবর্তীকালে দেবদাস গান্ধীর পত্নী।

পত্রং নৈব যদা ॥ বসন্ত ঋতুতে যখন সমস্ত বনস্পতির নূতন নূতন পাতা জন্মে, তখন যদি শুধু করীরের পত্র না ওঠে তবে তাহাতে বসন্তের কি দোষ, বল? পেঁচা যদি দিনের বেলা নাই দেখে, তাহাতে সূর্যের কি দোষ?

ভর্তৃহরির এই শ্লোকের শেষ দুই চরণ নিম্নরূপ :

> ধারা নৈব পতন্তি চাতকমুখে মেঘস্য কিং দূষণম্?
> যৎ পূর্বং বিধিনা ললাটলিখিতং তন্ মার্জিতুং কঃ ক্ষমঃ?

[চাতকের মুখে যদি জলের ধারা না পড়ে তবে তাহাতে মেঘের কি দোষ ? বিধি ললাটে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কে মুছিতে পারে ?]

পৃ ৪৮ উচ্ছিষ্ট ॥ [উৎ+শিষ্ট] এঁঠো নয়, চাষীর ফসল কাটা হইয়া গেলে যাহা বাঁচে।

রবীন্দ্রনাথ অথর্ববেদের এক মন্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া বলিতেছেন যে সকল কলা এবং মনুষ্যের সমস্ত উন্নত প্রবৃত্তির মূল উচ্ছিষ্ট। নীচে তাঁহার বচন দেওয়া হইল :

ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ।
ভূতং ভবিষ্যৎ উচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মী বলং বলে ॥

"Righteousness, truth, great endeavours, empire, religion, enterprize, heroism and prosperity, the past and the future dwell in the surpassing strength of the surplus."

The meaning of it is that man expresses himself through his super-abundance which largely overleaps his absolute need.

The renowned Vedic commentator Sayanacharya says :

"The food offering which is left over after the completion of sacrificial rites is praised because it is symbolical of Brahma, the original source of the universal."

According to this explanation, Brahma is boundless in his superfluity which inevitably finds expression in the eternal world process. Here we have the doctrine of the origin of the arts. Of all living creatures in the world man has his vital and mental energy vastly in excess of his need which urges him to work in various lines of creation for its own sake. Like Brahma himself, he takes joy in productions that are unnecessary to him, and therefore represent his extravagance and not his hand-to-mouth penury. The voice that is just enough can speak and cry to the extent needed for everyday use, but that which is abundant sings ; and in it we find onr joy. Art reveals man's wealth of life, which seeks its freedom in forms of perfection which are ends in themselves.

ভাবার্থ:

'ঋত, সত্য, তপ, রাষ্ট্র, শ্রম, ধর্ম, কর্ম, ভূত ও ভবিষ্যৎ, ধর্ম ও লক্ষ্মী, উচ্ছিষ্টের শক্তিতে বাস করে।'

ইহার অর্থ এই যে নিজের প্রয়োজন সাধনের পর মানুষের নিকটে যে অধিক শক্তি থাকে তাহার দ্বারা সে নিজেকে প্রকাশ করে।

বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়নাচার্য বলেন:

'যজ্ঞবিধির পর, অবশিষ্ট (উচ্ছিষ্ট) অন্নবলিকে এইজন্য পবিত্র বলা হইয়াছে যে উহা সমগ্র বিশ্বের মূল কারণ স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতীক।'

এই ধারণা অনুসারে ব্রহ্মের উচ্ছিষ্ট শক্তির সীমা নাই, উহা সনাতন বিশ্বপ্রক্রিয়ার রূপে প্রকট হইতেছে। এখানে আমরা কলার উৎপত্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই। সংসারে অন্য সকল জীবের তুলনায় মানুষের মধ্যে প্রাণ ও মনের শক্তি তাহার প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক বেশি দেওয়া হইয়াছে, আর উহা তাহাকে নানাবিধ অহেতুক সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত করিতেছে। স্বয়ং ব্রহ্মের মত, উহাও যে সৃষ্টি উহার পক্ষে অনাবশ্যক, আর যাহা তাহার অকিঞ্চনত্বের নয় বরং তাহার প্রাচুর্যের দ্যোতক, তাহাতেই আনন্দ পায়। যে স্বর শুধু প্রয়োজনের পরিমাণে তাহা নিত্য কাজকর্মে কথা বলিতে ও কাঁদিতে পারে, কিন্তু যে স্বর অধিক তাহা গাহিতে থাকে—আর ইহাতে আমরা আনন্দ পাই। কলা মানবজীবনের সমৃদ্ধি সূচিত করে। এই সমৃদ্ধি অহেতুক সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণরূপে মুক্তির আনন্দ গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে।

পরিগ্রহো ভয়ায়ৈব॥ পরিগ্রহে ভয় থাকেই। লেখকের স্বরচিত সূত্র।

'নিস্' শ্রেণীর॥ gneiss স্তরের পাথর, যাহাতে অভ্র, চকমকি প্রভৃতি মিশানো থাকে।

পৃ ৪৯ ভগিনী নিবেদিতার বিখ্যাত তুলনা॥ মূল নিয়ে দেওয়া হইল:

Beauty of place translates itself to the Indian consciousness as God's cry to the soul. Had Niagara been situated on the Ganges, it is odd to think how different would have been its valuation by humanity. Instead of fashionable picnics and railway pleasure trips, the yearly or monthly incursion of

worshipping crowds ; instead of hotels, temples ; instead of ostentatious excess, austerity ; instead of the desire to harness its mighty forces to the chariot of human utility, the unrestrainable longing to throw away the body and realize at once the ecstatic madness of Supreme Union. Could contrast be greater ?

—*The Web of Indian Life, p. 241*

পৃ ৫০ ভৈরব মন্ত্র জপ ॥ "পাহাড়ের উপর যেখানে সর্বোচ্চ শিখর আছে, আর তাহার পাশেই নীচে একেবারে সোজা বা খাড়া দেওয়াল, ঐ স্থানের নাম ভৈরব ঘাট। প্রাচীনকালে এবং আজও ভৈরব সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায়ই এইরূপ স্থানে ভৈরবমন্ত্র জপ করিতে করিতে উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িত ও পড়ে। এ কথা মনে করা হয় যে এরূপ আত্মহত্যায় পাপ নাই, বরং পুণ্য আছে। আজকার আইন অনুযায়ী এইরূপ মনে করা ভুল হউক, কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইহার মূলতত্ত্ব সহজেই বুঝিতে পারেন। পৃথিবীতে সর্বপ্রকারে নিরাশ হইয়া ভীরুতার বশে আত্মহত্যা করা, আর প্রকৃতির বিশাল, উচ্চ, উদাত্ত এবং রমণীয় সৌন্দর্য দেখিয়া তল্লীন হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে একরূপ হইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিলে কোনওরূপে প্রকৃতি হইতে বিয়োগের দুঃখ সহ্য করিতে না পারা এবং এইভাবে কোনও মনুষ্যের এই ক্ষুদ্র দেহবন্ধন ভুলিয়া সাম্যে উপনীত হইবার জন্য অনন্তে লাফাইয়া পড়া— এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। উভয়ের পরিণাম যতই কেন এক হউক না, প্রত্যেক বিনাশ আমরা মৃত্যুই বলি, কিন্তু জিনিসটি এক নয়। অনেক সময় মরণ হয় জীবনরূপী নাটকের বিষ্কম্ভক। আর কখনও কখনও উহা হয় এই নাটকের ভরতবাক্য—জীবনের সার্থকতা।"

—হিমালয়কী যাত্রা, প্রকরণ ১৬, পৃঃ ৯১-৯২

বিভব-তৃষ্ণা ॥ ১৩৮ পৃঃ 'ঢেউয়ের তাণ্ডব' দেখুন।

নাভিনন্দেত ॥ মৃত্যুকেও স্বাগত অভ্যর্থনা করিবে না, জীবনকেও না।

—মনুস্মৃতি।

হর্স পাওয়ার ॥ ইহার জন্য লেখক 'অশ্বথামা' পারিভাষিক শব্দ হিসাবে নির্দেশ করিয়াছেন। [অশ্ব=ঘোড়া+স্থামন্=শক্তি।] সমাসে 'স্থামন্'-এর স্ লুপ্ত হয়।

উপবন ॥ 'নিউ ফরেস্ট' নামক প্রদেশ।

পৃ ৫১ নিরো ॥ রোমের সম্রাট (৫৪-৬৮ খ্রীঃ)। মাকে ভয় দেখাইবার জন্য পিতাকে হত্যা করিবার পর রোমের সিংহাসনের অধিকারী ব্রিটোনিকসকে সরাইয়া নিজে সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত ভালভাবে রাজ্য চালাইয়া ইনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া গেলেন। ব্রিটোনিকসকে, নিজের মাকে ও স্ত্রীকে হত্যা করিলেন। রোম অগ্নিদ্বারা পোড়াইবার মিথ্যা অভিযোগে ইনি খ্রীষ্টানদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করিলেন। নিজের গুরু ও মন্ত্রী সেনেকা ও নিজের অন্য পত্নীকেও হত্যা করিলেন। ইহার পরে রোমে বিদ্রোহ হইল, ফলে ইনি পলাইয়া গিয়া আত্মহত্যা করিলেন। জনশ্রুতি যে তিনি রোমে আগুন লাগাইয়া রোম যখন পুড়িতেছিল তখন নিজে বেহালা বাজাইতেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। ইনি যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আর্তিনাশ ॥ তুলনীয়—

> ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং না পুনর্ভবম্।
> কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনা মার্তিনাশনম্॥

[নিজের জন্য আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না। দুঃখতপ্ত প্রাণীদের পীড়া দূর হউক, ইহাই চাই।]

পৃ ৫২ বীরভদ্র ॥ দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞসংহারকারী শিবভক্ত।

ইংরেজদেরই চিনিতে পারিয়াছি ॥ ইংরেজও ভারতের রক্ত শোষণ করে কিন্তু বুঝিতেই পারা যায় না যে তাহারা শোষণ করিতেছে। তাহাদের এই স্বরূপ যদি আমরা চিনিতে পারিয়াছি—

কাকদৃষ্টি ॥ কাকের মত তৃষিত দৃষ্টি। ['কাকা'র দৃষ্টি, এই ব্যঞ্জনা আছে।]

পৃ ৫৩ প্রায়ঃ কন্দুক ॥ আর্য যাঁহারা তাঁহাদের পতন হইলেও সর্বদা 'বলের' মত পড়েন, অর্থাৎ পড়িবার পর আবার উঁচুতে লাফাইয়া ওঠেন।

ভর্তৃহরির পুরা শ্লোক নিম্নরূপ :

> প্রায়ঃ কন্দুকপাতেন পতত্যার্যঃ পতন্নপি।
> তথা ত্বনার্যঃ পততি মৃৎপিণ্ডপতনং যথা॥

ন হি কল্যাণকৃৎ ॥ কল্যাণকর্মী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। গীতা ৬।৪০

পৃ ৫৫ মহাদেব ধ্বংসের তাণ্ডবনৃত্য ॥ শিবতাণ্ডব স্তোত্র স্মরণ করা হইতেছে। নীচে দুইটি শ্লোক দেওয়া যাইতেছে :

জটা-কটাহ-সংভ্রম-ভ্রমন্নিলিম্প-নির্ঝরী—
বিলোল-বীচি বল্লরী-বিরাজমান মূর্ধনি।
ধগদ্-ধগদ্-ধগজ্জ্বলল্-ললাট-পট্ট-পাবকং
কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥ ১ ॥

[যাঁহার শির জটারূপী কটাহে তীব্রগতিতে বহমান সুরসরিৎ (গঙ্গা)-এর চঞ্চল তরঙ্গ লতায় সুশোভিত হইতেছে, ললাটাগ্নি ধক্ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, মাথায় বালচন্দ্র বিরাজমান, সেই শিবের প্রতি আমার অনুরাগ প্রতিক্ষণ থাকুক।]

জয়ত্বদভ্র-বিভ্রম-ভ্রমৎভুজঙ্গম-শ্বসদ্
বিনির্গতক্রম-স্ফুরৎ করাল-ভাল-হব্যরাট্।
ধিমিদ্ ধিমিদ্ ধিমিদ্ ধ্বনন্-মৃদঙ্গ-তুঙ্গ-মঙ্গল—
ধ্বনি-ক্রম-প্রবর্তিত-প্রচণ্ড-তাণ্ডবঃ শিবঃ ॥ ১০ ॥

[সর্বদা দোদুল্যমান ভুজঙ্গমের নিঃশ্বাসে যাঁহার ললাটের করাল অগ্নি উত্তরোত্তর অধিক স্ফুরিত হইতে থাকে আর ধিমিদ্ ধিমিদ্ ধিমিদ্ মৃদঙ্গের এই উচ্চ মঙ্গল ধ্বনির মত যাঁহার প্রচণ্ড তাণ্ডবনৃত্য চলিতে থাকে, সেই বিশ্ব-ভগবানের জয় হউক।]

পৃ ৫৬ দেবেন্দ্র ॥ লঙ্কার দক্ষিণ সীমা। Dundra Head.

নারায়ণের সরোবর ॥ সিন্ধু ও কচ্ছের মধ্যবর্তী হ্রদ।

পৃ ৫৮ পুনরাগমনায় চ ॥ ধর্মপ্রসঙ্গে পূজার শেষে দেবতা বিসর্জনের সময় এই কথার প্রয়োগ হয়। ইহার অর্থ—'আবার আসিবেন বলিয়া'। ভাবার্থ এই যে বিদায় চিরকালের জন্য নহে, পুনরায় মিলনের জন্য।

লেখকের এই ইচ্ছা বা সংকল্পের পূরণ বহু বৎসর পরে কি ভাবে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা পরবর্তী প্রকরণে দেখিতে পাইবেন।

জোগ প্রপাতের পুনর্দর্শন

পৃ ৫৯ এতাবানস্য মহিমা ॥ এই পর্যন্ত তো উহার মহিমা ; পুরুষ তো ইহা হইতেও বড়। এই বাক্যটি ঋগবেদের পুরুষসূক্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পৃ ৬১ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ ॥ 'সর্ববেদস্', সেই যজ্ঞ যাহাতে জীবনের সকল উপার্জন দান করিতে হয়। তুলনীয় :

স্থানে ভবানেকনরাধিপঃ সন্
অকিঞ্চনত্বং মখজং ব্যনক্তি।
পর্যায়পীতস্য সুরৈর্হিমাংশোঃ
কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরো হি বৃদ্ধেঃ ॥ রঘুবংশ ৫।১৬

[আপনি চক্রবর্তী রাজা হইয়া বিশ্বজিৎযজ্ঞের জন্য অকিঞ্চনত্ব দেখাইতেছেন, ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। দেবতারা বার বার পান করিয়াছেন বলিয়া চন্দ্রকলার যে ক্ষয় তাহা বৃদ্ধি অপেক্ষা শ্লাঘ্য।]

পৃ ৬২ প্রতি-ধনু ॥ আকাশে ইন্দ্রধনুর কিছু উপরে ম্লানজ্যোতি অন্য ধনুক প্রায়ই দেখা যায়, উহাকে প্রতি-ধনু বলে। উহার বর্ণ বিন্যাসের ক্রম, মূল ধনুকের ঠিক বিপরীত।

সুরধনু ॥ দেবতাদের ধনুক, 'ইন্দ্রধনু।'

সুরধুনী ॥ স্বর্গের নদী। এখানে শুধু নদী। যে কোনও নদীকে গঙ্গা বলা হয় এই কারণে।

প্রতি মুহূর্ত আমাদের পুণ্য ॥ স্মরণীয়—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।' গীতা ৯।২১

পৃ ৬৫ রমাঁ রোলাঁ ॥ (১৮৬৬-১৯৪৪) ফ্রান্সের বিশ্ববিখ্যাত মানবতাবাদী সাহিত্যকার ও কলা-সমালোচক। তাঁহার উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তফ' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহার জন্য তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'নোবেল পুরস্কার' পাইয়াছিলেন। তিনি গান্ধীজী, রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লিখিয়া ভারতের চিন্তাধারা পশ্চিম জগতে সমানভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ

দিবার জন্য বিলাত যান, তখন ফিরিবার সময়ে বিশেষ করিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁহার ভারতের সম্বন্ধে ডায়েরী ফরাসি ভাষায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উহাতেও গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির বিষয়ে অনেক কথা আছে। তিনি যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন এবং একথা মানিতেন যে কলা সকলের বোধগম্য হওয়া উচিত।

মানুষের হাতে গড়া সৃষ্টি ॥ সৃষ্টিতে যে সৌন্দর্য আছে তাহাকে কলা বলে না। কলা তো মানুষেরই হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য কলার উৎপত্তির প্রেরণা অবশ্য জোগায়।

পৃ ৬৬ 'অল্পস্য হেতোঃ' ॥ অল্প কারণের জন্য বৃহৎ বস্তুর নাশ করিতে যাহারা চায়। কবি কালিদাসের রঘুবংশ হইতে গৃহীত। দিলীপ যখন ধেনুর পরিবর্তে নিজের শরীর সিংহকে অর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন তখন সিংহ তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য বলিতেছিলেন :

একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ।
অল্পস্য হেতো র্বহু হাতুমিচ্ছন্ বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্ ॥

রঘুবংশ ২।৪৭

[সংসারের একচ্ছত্র রাজ্য, নবীন যৌবন, এই সুন্দর শরীর, সামান্য ব্যাপারে এত বড ত্যাগ করিতে যাইতেছ! তোমাকে বিচারমূঢ বলিয়া আমার মনে হইতেছে।]

১৪

জোগের শুষ্ক প্রপাত

পৃ ৬৬ ভীষণ দুর্গতি ॥ স্মরণীয় :

বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং
ক্ষীণা নরা নিষ্করুণা ভবন্তি।

পৃ ৬৭ রাবণের মত ॥ রাবণের যখন জন্ম হয় তখন সে মহারব করিতে করিতেই ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার পর হইতে তাহার পিতা তাহার নাম রাবণ রাখিলেন।

তপস্বিনী ॥ গ্রীষ্মের তাপ সহ্য করিতেছিলেন বলিয়া।

পৃ ৬৮ শম্ভাজীর চক্ষু ॥ ১৬৮৯ খ্রীঃ শম্ভাজীকে বন্দী করিবার পর ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু শম্ভাজী ইসলাম গ্রহণ না করিয়া বরং বাদশাহকে অপমান করেন। এজন্য ঔরঙ্গজেব তাঁহার জিহ্বা ছেদন করেন, চোখ উৎপাটন করেন, তাঁহাকে হত্যা করেন।

নদীমুখেনৈব সমুদ্রমাবিশেৎ ॥ নদীর মুখ দিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করা। মহাকবি কালিদাস 'রঘুবংশে' রঘুর বিদ্যাভ্যাস বর্ণনা করিবার সময় লিখিয়াছেন :

লিপের্যথাবদ্ গ্রহণেন বাঙ্‌ময়ং
নদী-মুখেনৈব সমুদ্রমাবিশৎ ॥ রঘু ৩।২৮

[নদীর মুখ দিয়া যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে সেই প্রকারে লিপি যথাবিধি গ্রহণের দ্বারা তিনি সাহিত্যে প্রবেশ করিলেন।]

ইহার পরে গুজরাত বিদ্যাপীঠের পরিচালনায় গুজরাত মহাবিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সাবরমতী'-র জন্য যখন ধ্যানমন্ত্রের বা প্রকৃষ্ট বচনের প্রয়োজন হইল, তখন কাকাসাহেব 'নদীমুখেনৈব সমুদ্রমাবিশেৎ' এই বাক্যটি দিয়াছিলেন। তখন হইতে হয়তো তাঁহার মনে ধারণা দৃঢ় হইয়া থাকিবে যে ইহাই কালিদাসের মূল বচন। মূলে আছে 'আবিশৎ'=প্রবেশ করিলেন। ইহা হইতে কাকা সাহেব তৈরী করিলেন : আবিশেৎ=প্রবেশ করা চাই।

পৃ ৬৯ কালপুরুষ ॥ 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ' ইহার বক্তা গীতার বিরাট্ পুরুষ।

পৃ ৭০ 'তত্র কা পরিদেবনা' ॥ তাহাতে শোক কি? স্মরণীয় :

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত-নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ গীতা ২।২৮

পৃ ৭২ উষ্মপা ॥ যিনি গরম গরম পান করেন, পিতৃপুরুষ। অন্ন ভোজন করিয়া নয়, শুধু উষ্ণতা পান করিয়াই বাঁচিয়া থাকেন পিতৃপুরুষ ও দেবতারা। গীতায় এই শব্দের প্রয়োগ আছে। ১১-১২

গুর্জরমাতা সাবরমতী

পৃ ৭৩ বনস্পতি-উপাসক শ্রীমান শিবশঙ্কর ॥ প্রসিদ্ধ গুজরাতী লেখক ও অনুবাদক স্বর্গত শ্রীচন্দ্রশেখর শুক্লের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি বনস্পতি সম্বন্ধে প্রচুর অধ্যয়ন করিয়াছেন। হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে ইঁহার উৎসাহ ও পরিশ্রমে বনস্পতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। ইনি 'গুজরাতনী লোকমাতাও' নামে গুজরাতী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

পৃ ৭৪ ব্রাহ্মণেরা তপস্যা করিয়াছে ॥ কথিত আছে যে শৌনক, বশিষ্ঠ, বামদেব, গৌতম, গালব, গাঙ্গেয়, ভরদ্বাজ, উদ্দালক, জমদগ্নি, কশ্যপ, জড়ভরত, ভৃগু, জাবালি প্রভৃতি ৮৮ সহস্র ঋষি সাবরমতীর তীরে তপস্যা করিয়াছিলেন।

পৃ ৭৫ 'বৌঠা'র মেলা ॥ প্রতিবৎসর কার্তিকী পূর্ণিমায় গুজরাতে ধোলকা গ্রামের নিকটে বৌঠাতে এই মেলা বসে। একলাখ দেড়লাখ লোকের সমাবেশ হয়। এখানে মেশোয়া, মাঝম, বাত্রক ও শেঢ়ী হইতে নির্মিত বাত্রক নদীর খারী, হাতমতী ও সাবর হইতে নির্মিত সাবরমতীর সঙ্গে সঙ্গম হইয়াছে।

সাবরমতীর পুরানো নাম ॥ ভিন্ন ভিন্ন যুগে সাবরমতীর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে—সত্যযুগে কৃতবতী, ত্রেতায় মণিকর্ণিকা ও দ্বাপরে বিধুবতী বা চন্দনা বা চন্দনাবতী নাম প্রচলিত ছিল। কলিযুগে সাভ্রমতী নামে পরিচয়।

কশ্যপগঙ্গা ॥ নিম্নলিখিত কাহিনী এখানে উল্লেখযোগ্য—

একবার ক্রমাগত সাত বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে ঋষিরা কশ্যপের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন এবং তিনি শংকরের আরাধনা করিলেন। শংকর সাভ্রমতি গঙ্গাকে লইয়া অর্বুদারণ্যে গেলেন, সেখান হইতে তাহার ধারা অরণ্য হইয়া গুজরাটের দিকে বহিতে লাগিল। তখন সমুদ্র আবির্ভূত হইয়া কশ্যপের নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'ভগবন্ যা হয় একটা উপায় করিয়া এই নদীর জল আমার জলের সঙ্গে মিশাইয়া দিন। অগস্ত্য ঋষি আমার সমস্ত জল পান

করিয়া মূত্র ত্যাগের রূপে ঐ জল আমাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, তাই উহা অপবিত্র হইয়া গিয়াছে। এই নদীর স্পর্শে তাহা পবিত্র হইবে।'

সাবরমতী অন্য নদীর সঙ্গে সমুদ্রে গিয়া মিশিল, সমুদ্র পবিত্র হইল।

অন্য একটি কাহিনীতে আছে, পার্বতীর ভয়ে গঙ্গা এদিকে ওদিকে পালাইতেছিলেন—'সা ভ্রমতি।' কশ্যপ তাঁহাকে জটায় করিয়া অর্বুদারণ্যে লইয়া আসিলেন। সেখানে তিনি জটা ঝাড়িলেন, তাই ঐ গঙ্গা হইতে সাতটি প্রবাহ বহিতে লাগিল। প্রধান প্রবাহের নাম হইল সাবরমতী। অন্য ছয়টি প্রবাহ হইতে ছয়টি নদী গিয়া বৌঠার নিকটে একত্র হইয়াছে।

কশ্যপ লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া নদীর নাম কশ্যপগঙ্গা।

পৃ ৭৬ দধীচি ॥ যজ্ঞকুণ্ডের মধ্য হইতে বৃত্রাসুরের জন্ম হইল এবং জন্মের পর হইতে প্রতি মুহূর্তে সে এত বাড়িতে লাগিল যে দেখিতে দেখিতে সে ত্রিভুবন ঢাকিয়া ফেলিল। ভীত হইয়া দেবতারা তাঁহাদের যত দিব্য অস্ত্র ছিল সব দিয়া তাহাকে আঘাত করিলেন, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। তখন ইন্দ্রকে লইয়া সকল দেবতা আদিপুরুষ অন্তর্যামীর শরণাপন্ন হইলেন। অন্তর্যামী বলিলেন, 'তোমরা মহর্ষি দধীচির নিকট যাও ; বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যায় শক্তিসম্পন্ন তাঁহার শরীর চাহিয়া লও। তিনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না। পুনরায় সেই শরীরের হাড় দিয়া বিশ্বকর্মা তোমাদের এক উত্তম আয়ুধ গড়িয়া দিবেন। তাহাতে এই বৃত্রাসুরের বিনাশ হইতে পারিবে।'

সাবরমতী ও চন্দ্রভাগার সঙ্গমস্থলের নিকটে দধীচি ঋষি তপস্যা করিতেছিলেন। দেবতারা সেখানে গিয়া তাঁহার দেহ প্রার্থনা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন :

"হে দেবগণ, যে পুরুষ নশ্বর এই শরীর দিয়া প্রাণীদের উপর দয়া করিয়া ধর্ম ও যশ পাইতে চায় না, সে স্থাবর প্রাণীদেরও শোচনীয়। অন্য প্রাণীর দুঃখে দুঃখী হওয়া এবং অন্যের আনন্দে আনন্দিত হওয়া, এই ধর্মই তো অবিনাশী। এই কারণে আমি আমার ক্ষণভঙ্গুর, কাক ও কুকুরের ভক্ষ্য এই শরীর ত্যাগ করিতেছি। আপনারা ইহা গ্রহণ করুন।"

এই সংকল্প গ্রহণ করিয়া ঋষি পরব্রহ্মের সঙ্গে নিজের আত্মার যোগসাধন করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

তখন দেবতারা কামধেনুকে ডাকিলেন। কামধেনু ঋষির শরীর লেহন

করিতে লাগিলেন। লেহন করিতে করিতে শুধু অস্থি রহিয়া গেল। এই অস্থি দিয়া বজ্র নির্মাণ করিয়া বিশ্বকর্মা ইন্দ্রকে দিলেন, তাহা দিয়া ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিলেন।

দধীচি যেখানে দেহ সমর্পণ করেন সেখানে কামধেনুর দুধ পড়িয়াছিল। তাই সেখানে দুধেশ্বর মহাদেব স্থাপনা করা হইল।

খাদির কাজ ॥ গান্ধীজী স্বদেশী ও খাদির প্রচার শুরু করিলেন। এইজন্য আশ্রমে খাদি উৎপাদনের কাজও শুরু হইল। আজও সেখানে এই কর্মপ্রচেষ্টা চলিতেছে।

চাষবাস ও গোশালা ॥ খেতী ও গো-সেবার উন্নতির কাজ আশ্রমে আরম্ভ হইয়াছিল। গোশালা ও চাষের কাজ নানাপ্রকার পরীক্ষার দৃষ্টিতে এখনও সেখানে চলিতেছে।

রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় ॥ আশ্রমের বিদ্যালয়। ইহাতে কাকাসাহেব, নরহরি পারেখ, কিশোরলাল মশরুওয়ালা, বিনোবা প্রভৃতি শিক্ষা লইয়া গবেষণা করিতেন। এই সব গবেষণার বুনিয়াদের উপরই পরবর্তীকালে গুজরাট বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

আজ 'বুনিয়াদি তালিম' নামে পরিচিত গান্ধীজীর শিক্ষাপদ্ধতির মূলেও এই চেষ্টা ছিল, বলিতে পারা যায়।

রাষ্ট্রীয় উৎসব ॥ 'নবজীবন' হইতে প্রকাশিত কাকাসাহেবের 'জীবন কা কাব্য' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

লোকসংগীত ও শাস্ত্রীয় সংগীত ॥ আশ্রমবাসী পণ্ডিত নারায়ণ মোরেশ্বর খরে সঙ্গীতশাস্ত্রী ছিলেন। তিনি গুজরাটের কিছু কিছু লোকগীতির স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া 'লোকসংগীত' নামে পুস্তক লিখিয়াছিলেন—শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রচারের জন্য তিনি 'রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত মণ্ডল'-ও স্থাপন করিয়াছিলেন। আমেদাবাদ কংগ্রেসের সময় 'অখিল ভারত সঙ্গীত পরিষদে'র অধিবেশনও সেখানেই হইয়াছিল। উহাতে গান্ধীজীর প্রেরণা ও পণ্ডিত খরের উদ্যম প্রধান উপাদান ছিল।

'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ॥ ইংরেজী ১৯১৯ সালে গান্ধীজী যখন রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান তখন তাঁহার চিন্তাধারা প্রচারের জন্য সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। ইন্দুলাল

বাঙ্কিক ও তাঁহার বন্ধু গুজরাটিতে 'নবজীবন অনে সত্য' নামে মাসিকপত্র চালাইতেছিলেন, তাহার মাধ্যমে তাঁহারা 'হোমরুল' প্রচার করিতেছিলেন। গান্ধীজী এই পত্র নিজের হাতে লইলেন এবং উহাকে সাপ্তাহিকে পরিবর্তিত করিয়া 'নবজীবন' নাম দিয়া চালাইলেন। ইহা গুজরাটিতে প্রকাশিত হইত। পুনরায় সমস্ত দেশে প্রচার করিবার জন্য এক ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রয়োজন বোধ হইতে লাগিল। শংকরলাল ব্যাংকার, যমুনাদাস দ্বারকাদাস প্রভৃতি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামে এক সংবাদপত্র চালাইতেছিলেন। গান্ধীজী এই পত্রিকাও নিজের হাতে লইলেন।

দুইটি সাপ্তাহিকই ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত চলিল। তাহার পর হরিজনকার্য চালাইবার জন্য গান্ধীজী জেল হইতে পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন: হরিজন (ইংরেজী), হরিজন বন্ধু (গুজরাটি), হরিজন সেবক (হিন্দুস্থানী)। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময় বাদ দিলে বলা যায় যে এই সকল পত্রিকা গান্ধীজীর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার চিন্তাধারার বাহন ছিল।

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর এই সব সাপ্তাহিক স্বর্গীয় কিশোরলাল মশরুওয়ালা চালাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে শ্রীমগনভাই দেশাই ছিলেন এইগুলির সম্পাদক। ১৯৫৬ এর মার্চ মাস হইতে এগুলি স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

সত্যাগ্রহ ॥ চম্পারণ, খেডা, নাগপুর, বোরসদ, বারডোলি প্রভৃতি।

কলের মালিকদের সঙ্গে মজুরদের ঝগড়া ॥ এই ঝগডা ১৯১৮ সালে আমেদাবাদের মিলওয়ালাদের সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে হইয়াছিল। শ্রমিকদের পক্ষ ন্যায়ের পক্ষ বলিয়া গান্ধীজী তাহা গ্রহণ করিলেন। এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানিতে হইলে নবজীবন হইতে প্রকাশিত মহাদেব দেশাইয়ের হিন্দী পুস্তক 'এক ধর্মযুদ্ধ' দেখুন।

দাণ্ডি অভিযান ॥ লাহোর কংগ্রেসে 'পূর্ণ স্বরাজের' প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহা কার্যকরী করিবার জন্য গান্ধীজী লবণ আইন অমান্য করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ইহা এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

অভিযানে ৭৯ জন সঙ্গী লইয়া গান্ধীজী যখন সাবরমতী সত্যাগ্রহাশ্রম হইতে বাহির হইলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতদিন স্বরাজ

না পাই ততদিন আশ্রমে ফিরিব না। এই অভিযান সমগ্র দেশে বিদ্যুৎবেগে নবজীবন ও নবশক্তি সঞ্চারিত করিল।

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর এই সব সাপ্তাহিক স্বর্গীয় কিশোরলাল মশরুওয়ালা চালাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে শ্রীমগনভাই দেশাই ছিলেন এই গুলির সম্পাদক। ১৯৫৬-এর মার্চ মাস হইতে এগুলি স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

সত্যাগ্রহ ॥ চম্পারন, খেড়া, নাগপুর, বোরসদ, বারডোলি প্রভৃতি।

মালিকদের সঙ্গে মজুরদের ঝগড়া ॥ এই ঝগড়া ১৯১৮ সালে আমেদাবাদের মিলওয়ালাদের সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে হইয়াছিল। শ্রমিকদের পক্ষ ন্যায়ের পক্ষ বলিয়া গান্ধীজী তাহা গ্রহণ করিলেন। এবিষয়ে বিশেষভাবে জানিতে হইলে নবজীবন হইতে প্রকাশিত মহাদেব দেশাইয়ের হিন্দী পুস্তক 'এক ধর্মযুদ্ধ' দেখুন।

দাণ্ডি অভিযান ॥ লাহোর কংগ্রেসে 'পূর্ণ স্বরাজের' প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহা কার্যকরী করিবার জন্য গান্ধীজী লবণ আইন অমান্য করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ইহা এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

অভিযানে ৭৯ জন সঙ্গী লইয়া গান্ধীজী যখন সাবরমতী সত্যাগ্রহাশ্রম হইতে বাহির হইলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে 'যতদিন স্বরাজ না পাই ততদিন আশ্রমে ফিরিব না।' এই অভিযান সমস্ত দেশে বিদ্যুৎগতিতে নবজীবন ও নবশক্তি সঞ্চার করিল। গান্ধীজীর ওয়ার্ধা ও সেবাগ্রাম যাওয়ার ইহাও এক কারণ ছিল।

পৃ ৭৬ জালিয়ানওয়ালা বাগ ॥ গান্ধীজী যখন রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি ১৯১৯-এর ৬ই এপ্রিল দেশব্যাপী হরতাল ও উপবাসের অদেশ দিলেন। সমগ্র দেশ অপূর্ব উৎসাহের সহিত তাহা পালনও করিল। কিন্তু তিন দিন পরে, ১৯১৯-এর ১০ এপ্রিল তারিখে অমৃতসরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সেখানকার কংগ্রেসী নেতা ডাঃ কিচলু ও সত্যপালকে গ্রেপ্তার করিয়া কোনও অজ্ঞাত স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে শহরে তোলপাড় হইল, শহর সামরিক বিভাগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পাঞ্জাবে অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ ঘটনা হইল এবং মানুষের প্রাণ ও

সম্পত্তির খুবই ক্ষতি হইল। তা ছাড়া গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিবার ফলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও গোলমাল হইল, কিন্তু সে সকল স্থানে পরে শান্তি হইল। ১৩ই এপ্রিল ছিল হিন্দুদের নববর্ষের দিন। সেদিন অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে এক সাধারণ সভা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। স্থানটি এমন ছিল যে চারদিকে শুধু বাড়ি আর বাড়ি, ভিতরে আসিবার শুধু একটিই সরু পথ। সন্ধ্যার সময়ে সেখানে বিশ হাজার স্ত্রী পুরুষ ও শিশু একত্র হইয়াছিল। এমন সময় জেনারেল ডায়ার একশত দেশী ও পঞ্চাশ জন বিদেশী সৈন্য লইয়া আসিল ও দুই তিন মিনিটের মধ্যেই গুলি চালাইবার আদেশ দিল। স্বয়ং ডায়ারের কথামত জানিতে পারা যায় ষোল-শতবার গুলি চালানো হইয়াছিল, গুলি ফুরাইয়া গেলে তবে তাহা চালানো বন্ধ করা হইল। প্রায় চারিশত লোক মারা গিয়াছিল, দুই হাজার আহত হইয়াছিল।

গুজরাট বিদ্যাপীঠ ॥ ১৯২০ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ তখন গান্ধীজী দেশের ছাত্রদের সরকারি স্কুল-কলেজ ছাড়িতে বলেন। এই নির্দেশ পালন করিয়া যে সকল বিদ্যার্থী সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করিয়াছিল তাহাদের অনেকে গঠনকর্মে লাগিয়া গেল। অবশিষ্ট যাহারা রহিল তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা দরকার হইয়া দাঁড়াইল। এজন্য দেশব্যাপী জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল—যেমন বিহারে বিহার বিদ্যাপীঠ, কাশীতে কাশী বিদ্যাপীঠ, পুণায় তিলক বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি। গুজরাটে গুজরাট বিদ্যাপীঠও এইরূপেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৯২০ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার শিক্ষক ও ছাত্রেরা গুজরাটের জাতীয় জীবনে এবং সাহিত্য ও সংস্কারের কার্যে খুব উন্নতির কাজে যোগ দিয়াছিল। আজও এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষার ও সাহিত্য-প্রকাশের কাজ করিতেছে।

১৬

উভয়ান্বয়ী নর্মদা

পৃ ৭৭ উভয়ান্বয়ী ॥ ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগকে যুক্ত করেন।

পৃ ৭৮ অমরকণ্টক ॥ বিলাসপুরের নিকটে মেখল, মেকল বা মাইকাল পর্বতের এক অংশ অমরকণ্টক নামে সুপরিচিত। উহার তলদেশে

যে পুষ্করিণী আছে তাহারও নাম অমরকণ্টক। এখানেই নর্মদা ও শোণের উৎপত্তি। ইহার পর হইতে নর্মদাকে মেকলকন্যা নামেও অভিহিত করা হয়। শ্রাদ্ধের পক্ষে অমরকণ্টক উত্তম স্থান বলিয়া মনে করা হয়।

বিন্ধ্য॥ প্রসিদ্ধ পর্বতশ্রেণী। অগস্ত্য ঋষি এই পর্বতশ্রেণী পার হইয়া দক্ষিণে গিয়া বাস করিতেছিলেন। ইহার উপরে বিন্দুবাসিনীর বিখ্যাত মন্দির আছে। তাহার একটু আগে অষ্টভুজা যোগমায়ার মন্দির আছে, তাহা শক্তির পীঠস্থান বলিয়া লোকে মনে করে।

সাতপুরা॥ নর্মদা ও তাপ্তির মধ্যে সাতপুরা বা সাত ভাঁজে পর্বতশ্রেণী। এখান হইতে তাপ্তি বাহির হইয়াছে।

ভৃগুকচ্ছ॥ বর্তমানে ভরোচ। কচ্ছ = নদী বা সমুদ্রের তীর।

পৃ ৭৯ আদিবাসী॥ এই প্রদেশের আদিম নিবাসী ভীল প্রভৃতি জাতি, যাহারা আজও দারিদ্র্য ও অজ্ঞানে নিমগ্ন।

পৃ ৮১ সবিন্দুসিন্ধু॥ নর্মদাষ্টক হইতে উদ্ধৃত পংক্তি। শংকরাচার্যের রচনা বলিয়া স্বীকৃত। ইহার আরম্ভ এই রূপ :

সবিন্দু-সিন্দুর-স্খলত্তরঙ্গভঙ্গ রঞ্জিতম্
দ্বিষৎসু পাপজাতজাতকারিবারি-সংযুতম্।
কৃতান্তদূত-কাল-ভূত-ভীতিহারি-বর্মদে
ত্বদীয় পাদপংকজং নমামি দেবি নর্মদে ॥

গতং তদৈব॥ পূরা শ্লোকটি নিম্নলিখিত রূপ :

গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদম্বু বীক্ষিতং যদা
মৃকুণ্ডসূনুশৌনকাসুরারিসেবি সর্বদা।
পুনর্ভবাব্ধি জন্মজং ভবাব্ধিদুঃখবর্মদে
ত্বদীয়পাদপংকজং নমামি দেবি নর্মদে ॥ ৪ ॥

পঞ্চগৌড়॥ সরস্বতীর তীরবর্তী প্রদেশ, কনৌজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড় অর্থাৎ বঙ্গ লইয়া ভুবনেশ্বর পর্যন্ত স্থান। বিন্ধ্যের উত্তরে স্থিত এই পাঁচটি প্রদেশে যে সকল ব্রাহ্মণেরা বাস করেন, ঐ সকল প্রদেশের অনুযায়ী তাঁহাদিগকে সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মৈথিল ও গৌড় বলা হয়।

পঞ্চদ্রাবিড়॥ বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে যে পাঁচ জাতির ব্রাহ্মণ বাস করেন—মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, কর্ণাট, গুর্জর ও দ্রাবিড়।

বিক্রম সংবত ॥ বিক্রমাদিত্যের নামে যে সংবত চলিয়া আসিতেছে; ইহা খ্রীষ্টীয় সন্ হইতে ৫৬ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে।

শালিবাহন শক ॥ শালি = সিংহ। সিংহ যাহার বাহন। জনশ্রুতি এই যে, এই নামে প্রসিদ্ধ রাজা বাল্যকালে সিংহের আকারধারী এক যক্ষকে বাহন করিয়া সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে শালিবাহন বলিত। তাঁহার নামে যে বর্ষগণনা চলিত তাহাকে 'শক' বলা হইত। ইহার অনুসারে বৎসর আরম্ভ হইত চৈত্র মাসে। বিক্রমসংবত হইতে ইহা ১৩৪-৩৫ বৎসর পরে, খ্রীষ্টীয় সন হইতে ৭৮ বৎসর পরে। এখন ভারত সরকার ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

পৃ ৮৩ কবীরবট ॥ ভরোচের পূর্বে শুক্লতীর্থের নিকটে নর্মদার স্রোতের মধ্যে এক দ্বীপ আছে, সেখানে এই প্রসিদ্ধ বট অবস্থিত। লোকে বলে যে কবীর দাঁতন করিয়া দাঁতন কাঠির যে টুক্‌রা ফেলিয়া দিয়াছিলেন তাহা হইতে এই বটবৃক্ষ জন্মিয়াছে।

১৭

সন্ধ্যারাগ

পৃ ৮৬ রসবতী পৃথিবী ও নিঃশব্দ আকাশ ॥ এখানে জানিয়া শুনিয়াই ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল ব্যাখ্যা হইল: 'গন্ধবতী পৃথ্বী' ও 'শব্দগুণমাকাশম্।'

বনচর ॥ সংস্কৃত ভাষায় 'বনচর' বলা হয় জঙ্গলে যে সব বন্যপশু ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের, আর 'বনেচর' বলা হয় জঙ্গলে যে সব মানুষ থাকে তাহাদের। এই প্রভেদ এখানে রাখা হইয়াছে।

সুরাসুরের গুরু ॥ বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য—এখানে আকাশের গুরু ও শুক্র নামে গ্রহ।

রেণুকার শাপ

পৃ ৮৮ রাণকদেবীর শাপ ॥ জনশ্রুতি এই যে গুজরাটের রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ শোরঠ আক্রমণ করিলেন এবং জুনাগড ঘিরিয়া লইলেন। সেখানকার রাণা খেঙ্গারের ভাগিনেয় বিপক্ষদলে গিয়া মিলিল। ফলে জুনাগড়ের পতন হইল, খেঙ্গার পরাস্ত হইল, মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সিদ্ধরাজ তাঁহার পত্নী রাণকদেবীকে লইয়া পাটণে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পথের মধ্যে বঢ়ওয়ানে রাণী 'সতী' হইলেন অর্থাৎ স্বামীর নাম করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, ইতিহাসে ইহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিদ্ধরাজ খাঙ্গারকে হারাইয়া বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে। সম্ভবত পরে তিনি সিদ্ধরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া থাকিবেন, তাই সিদ্ধরাজ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, আর সোরঠের দিকে আসিবার সময় বঢোয়ানের নিকটে কোন কারণে তাঁহার মৃত্যু হয় আর সেখানে তাঁহার রাণী সহমৃতা হন।

এখানে 'রাণক' কথাটির অর্থ রেণুকা নয়। 'গয়ার ফল্গু' নামক অধ্যায়ে সীতার শাপ ও সিকতার শাপের সঙ্গে ইহার তুলনা করুন।

ইয়োমা ॥ ব্রহ্ম ভাষায় পাহাড়ের নাম 'ইয়োমা'। যেমন আরাকান ইয়োমা, পেগু ইয়োমা।

অলস-মন্থর ॥ [অলস (আলস্যে ভরা)+মন্থর (ধীর), 'ললিত' পাঠান্তর গ্রহণ করিলে 'সুন্দর' অর্থে] ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর। কথাটি 'উত্তররামচরিত'-এর প্রথম অংক, ২৪শ শ্লোক হইতে লওয়া হইয়াছে ঃ

অলস-লুলিত-মুগ্ধানি অধ্ব সঞ্জাতখেদাৎ
অশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিত-মৃণালী—দুর্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা ॥

অন্ত্যজদের শাপ ॥ তাহাদের জলের সুবিধা না দেওয়ায়।

পৃ ৮৯ খণ্ডিতা ॥ কাব্যশাস্ত্রে বর্ণিত মুখ্য অষ্টনায়িকার মধ্যে একজন। 'ঈর্ষ্যাকষায়িতা'—ঈর্ষ্যাপূর্ণ নারী।

যাহার প্রবাহ বা স্রোত খণ্ডিত হইয়াছে, এখানে খণ্ডিতার সেই অর্থও ধরা হইয়াছে।

১৯

অম্বা-অম্বিকা

পৃ ৯০ অম্বা-অম্বিকা॥ মহাভারতের কথা। ভীষ্ম কোনও সময় কাশীরাজের কন্যাদের স্বয়ম্বর সভা হইতে তাঁহার তাঁহার তিন কন্যা—অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে—হরণ করিয়া লইয়া যান। এজন্য যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে তিনি শাম্বরাজকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন রাজা বিচিত্র-বীর্যের সঙ্গে কন্যাদের বিবাহ দিবার কথা উঠিল, তখন কন্যাদের একজন—জ্যেষ্ঠা অম্বা—বলিল, 'আমি তো মনে মনে শাম্বরাজকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছি।' তাঁহাকে শাম্বরাজার নিকটে পাঠানো হইল। কিন্তু শাম্বরাজা তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না; তাই তিনি ভীষ্মের গুরু পরশুরামের শরণ লইলেন। গুরু বলিলেও ভীষ্ম অম্বাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। গুরু-শিষ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল, গুরু পরাস্ত হইলেন এবং অম্বা বনে গিয়া ভীষ্মবধের সংকল্প লইয়া অগ্নিপ্রবেশ করিলেন, দেহত্যাগ করিলেন। পরে দ্রুপদরাজার গৃহে শিখণ্ডীর রূপে তাঁহার জন্ম হয়, এবং তিনি ভীষ্মবধের নিমিত্ত হন।

এখানে লেখক পৌরাণিকী কথার ইচ্ছামত পরিবর্তন করিয়াছেন।

রাজা কর্ণের দুই বিন্দু অশ্রু॥ গুজরাটের বাঘেলা বংশের শেষ রাজপুত রাজা কর্ণদেব অত্যন্ত ক্রোধী ও বিলাসী ছিলেন। তিনি নিজের মন্ত্রী মাধবের ভাই কেশবকে হত্যা করাইয়া তাঁহার পত্নীকে নিজের অন্তঃপুরে রাখিয়াছিলেন। অপমান ও অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া মাধব দিল্লী গিয়া আলাউদ্দীনকে গুজরাট আক্রমণ করিবার জন্য উত্তেজিত করেন। তিনি তাঁহার দুইজন সেনাপতিকে গুজরাট আক্রমণ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। তাহারা গুজরাট জয় করিল, রাজধানী পাটণ লুট করিল, রাজা কর্ণের রাণীদের ও পুত্রকন্যাদের ধরিয়া লইয়া দিল্লীতে আনিয়া পৌছাইয়া দিল। কর্ণ দেওগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া গেলেন। লোকে বলে যে তিনি তাঁহার

শেষ কয়টা দিন অজ্ঞাতবাসে, আবুর জঙ্গলে, এই সব নদীর পার্শ্ববর্তী প্রদেশে বিতাড়িত হইয়া শোকবিহ্বল অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন। ইহাতে সেই কথার ইঙ্গিত আছে।

গুজরাটি ভাষার প্রথম উপন্যাস সন ১৮৬৭ খ্রীঃ এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

২০

লাবণ্যফলা লূনী

লাবণ্যফলা ॥ লবণ=নুন ; লবণ-প্রধান, লবণ-সমৃদ্ধ বলিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

২১

উঁচল্লীর প্রপাত

পৃ ৯৩ 'নাগমোড়ি' ॥ ইহা মারাঠী শব্দ। ইহার অর্থ নাগের মত কুটিল। আঁকা-বেঁকা, সর্প-সদৃশ।

পৃ ৯৪ 'কোয়তা' ॥ হাঁসিয়া।

পৃ ৯৫ ঘনঘোর ॥ [ঘন=গাঢ়, ঘোর=ভীষণ] গাঢ় ও ভীষণ।

পৃ ৯৬ এতখানি শুভ্র শলীলে ॥ নদীর নাম হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

পৃ ৯৭ পদক্রম ॥ তুলনীয় : ভয়ো ত্রিবিক্রম, কিয়ো পদক্রম,
এক মহী পর, বীজেকো অম্বর, বৈজুকে প্রভু
ত্রীজেকো সির পর।

জীবনের অবতরণ ॥ জলের নিম্নাবতরণ।

কটক ॥ সংস্কৃতে কটক কথাটার অর্থ হইল কংকণ। ইহা হইতে ভূষণ। গহনার অর্থ করিয়া শ্লেষালংকার করা হইয়াছে।

সোনার আবরণে॥ তুলনীয়—হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। ঈশো ১৫

এই জগৎকে……ধরিতে হইবে॥ মূল মন্ত্র এই প্রকারের—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

পৃ ৯৮ পূর্ণ নীলিমা॥ নীলের অর্থ কাল, আসমানি, হরিৎ, চকমকি প্রভৃতি ধরা হয়। এখানকার নীলিমা ছিল হরিদ্বর্ণের। 'অজীর' বা মখমলে যেমন দুই বর্ণের ছটা দেখা যায়, সেইরূপ ছটা জলের মধ্যেও বহুবার দেখা যায়—ইহাও এখানে বোঝাইতেছে।

যুযোধি অস্মৎ॥ ঈশোপনিষদের শেষ মন্ত্রবাক্য।

২২

গোকর্ণ

পৃ ১০০ কপিলা ষষ্ঠী॥ ভাদ্র বদী ষষ্ঠী, হস্তা নক্ষত্র, ব্যতিপাত ও মঙ্গলবার—ইহাদের সংযোগের দিন। ইহা এক দুর্লভ দিন, প্রতি ৬০ বৎসর পরে আসে।

পৃ ১০২ কৃতার্থ করিল॥ স্নান করাইয়া দিল।

২৩

ভরতের দৃষ্টিতে

পৃ ১০৯ অদ্য মে সফলা॥ আজ আমাদের যাত্রা সফল হইল। আমি জলের প্রসাদে ধন্য হইলাম। মূলে 'ত্বৎপ্রসাদতঃ' ছিল, এখানে তাহা বদলানো হইয়াছে।

পৃ ১১০ শ্রীরামচন্দ্রের কর্মপ্রতিনিধি॥ রামের পরিবর্তে ভরত অযোধ্যার রাজ্য দেখাশুনা করিতেন বলিয়া। 'ভরণাৎ ভরতঃ'।

বেলগঙ্গা—সীতার স্নানভূমি

পৃ ১১১ বেরুলগ্রামের হরিৎকুণ্ড। ইংরেজীতে বেরুলকে 'ইলোরা' বলে। এইজন্য উহা সেই নামেই বেশী প্রসিদ্ধ। এই গ্রাম শিবাজীর পূর্বপুরুষদের। এখানে এক সুন্দর কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের বিষয়ে জনশ্রুতি আছে, ইলিচপুরের ইয়েলু নামক রাজার কোনও রোগে শরীরে পোকা হইয়াছিল। অনেক চেষ্টাতেও সকলই ব্যর্থ হইল। রোগ যেমনকার তেমনই রহিল। শেষে কুণ্ডের বিষয়ে রাজা আকাশবাণী শুনিতে পাইল : তুমি গিয়া ঐ তীর্থে স্নান কর, তোমার শরীর ভাল হইয়া যাইবে।

রাজা স্নান করিয়া আরোগ্য লাভ করিল।

লোকে বলে যে সেই রাজা পরে বেরুলের গুহা খোদাই আরম্ভ করিয়া দিলেন। শীতকালে হরিদ্বর্ণ মাটির জন্য কুণ্ডের জলও হরিদ্বর্ণ বলিয়া মনে হয়। কুণ্ডের চারিদিকে সুন্দর সোপানাবলী নির্মিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ। সীতাকে রাজান্তঃপুরে রাখিয়া রাম যখন বনবাসে যাইবার কথা বলিতেছিলেন, তখন সীতাও বনে যাইবার জন্য ও সেথানকার কষ্ট সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন :

ফলমূলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
ন তে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সহ॥ ১৬
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি।
ইচ্ছামি পরতঃ শৈলান্ পল্বলানি সরাংসি চ॥ ১৭
দ্রষ্টুং সর্বত্র নির্ভীতা ত্বয়া নাথেন ধীমতা।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণাঃ পদ্মিনীঃ সাধুপুষ্পিতাঃ॥ ১৮
ইচ্ছেয়ং সুখিনী দ্রষ্টুং ত্বয়া বীরেণ সংগতা।
অভিষেকং করিষ্যামি তাসু নিত্যমনুব্রতা॥ ১৯
সহ ত্বয়া বিশালাক্ষ রংস্যে পরমনন্দিনী।
এবং বর্ষসহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ॥ ২০

অযোধ্যাকাণ্ড—২৭ : ১৬-২০

[আমি সর্বদা ফলমূল খাইয়াই থাকিব। আপনার সঙ্গে থাকিয়া আমি আপনাকে কখনও কষ্ট দিব না। আপনার আগে আগে যাইব, আপনার ভোজন হইলেই ভোজন করিব। আপনার সঙ্গে নির্ভয়ে সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া পর্বত, হ্রদ ও সরোবর দেখিবার আমার বড়ই ইচ্ছা। আপনার সঙ্গে থাকিয়া হংস কারণ্ডবে পূর্ণ সুন্দর পুষ্পান্বিত সরোবর দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবার আমার ইচ্ছা আছে। সেই সকল পদ্মপূর্ণ সরোবরে আমি নিত্য স্নান করিব ও আপনার সঙ্গে নিত্য ক্রীড়ায় রত থাকিব। এইভাবে শত বর্ষ নয়, আপনার সঙ্গে থাকিলে সহস্র বর্ষও মুহূর্তের মত কাটিয়া যাইবে।]

'উত্তররামচরিতে' চিত্র দর্শনের পর সীতা তাঁহার দোহদ প্রকাশ করিতেছেন, 'মন চায় যে প্রসন্ন ও গম্ভীর বনরাজির মধ্যে বিহার করি, আর যে ভাগীরথীর জল পাবনকারী, আনন্দদায়ক ও শীতল, সেই ভাগীরথীর জলে স্নান করি।'

দ্বিতীয় অঙ্কে রাম জনস্থান আদি প্রদেশ দেখিয়া বলিতেছেন—'সত্যই বৈদেহী বন ভালবাসিতেন। এই সেই অরণ্য। ইহা হইতে অধিক ভয়ানক আর কি হইবে?'

তৃতীয় অঙ্কেও সীতার পালিত হাতী, ময়ূর, কদম্ব ও হরিণের বর্ণনা আছে। যেমন—

সীতাদেব্যাঃ স্বকরকলিতৈঃ সল্লকীপল্লবাগ্রৈর্—
অগ্রে লোলঃ করিকরভকো যঃ পুরা পোষিতোঽভূৎ।
বধ্বা সার্ধং পয়সি বিহরন্ সোঽয়মন্যেন দর্পাৎ
উদ্দামেন দ্বিরদপতিনা সন্নিপত্যাভিযুক্তঃ ॥ ৬ ॥

অনুদিবসমবর্ধয়ৎ প্রিয়া তে
যমচিরনির্গতমুগ্ধলোলবর্হম্।
মণিমুকুট ইবোচ্ছিখঃ কদম্বে
নদতি স এষ বধূসখঃ শিখণ্ডী ॥ ১৮ ॥

ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তিচক্ষুঃ
প্রচলিত-চটুল-ভ্রূ-তাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্ত্যা।
কর-কিসলয়-তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্যমানং
সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি ॥ ১৯ ॥

কতিপয়কুসুমোদ্গমঃ কদম্বঃ
প্রিয়তময়া পরিবর্ধিতো য আসীৎ।
স্মরতি গিরিময়ূর এষ দেব্যাঃ
স্বজন ইবাত্র যতঃ প্রমোদমেতি ॥ ২০ ॥
নীরন্ধ্র-বাল-কদলী-বন-মধ্যবর্তি
কান্তাসখস্য কমনীয়-শিলাতলং তে।
অত্র স্থিতা তৃণমদাদ্ বহুশো যদেভ্যঃ
সীতা ততো হরিণকৈর্ন বিমুচ্যতে স্ম ॥ ২১ ॥
করকমলবিতীর্ণৈর্ অম্বুনীবারশষ্পৈঃ
তরু-শকুনি-তুরঙ্গান্ মৈথিলী যানপুষ্যৎ।
ভবতি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেষু কোঽপি
দ্রব ইব হৃদয়স্য প্রস্তরেভেদযোগ্যঃ ॥ ২৫ ॥

পৃ ১১২ সুবর্ণময় করিয়া দেয় ॥ ফসলের প্রাচুর্য ও তাহার হরিদ্রা বর্ণ। উভয়ই এখানে সূচিত হইতেছে।

পৃ ১১৪ রামরক্ষা স্তোত্র ॥ বুধ কৌশিক ঋষি দ্বারা রচিত অতি মনোহর ও জনপ্রিয় স্তব।

শিরো মে রাঘবঃ পাতু, **ভালং** দশরথাত্মজঃ ॥ ৪ ॥
কৌশল্যেয়ো **দৃশৌ** পাতু, বিশ্বামিত্রপ্রিয়ঃ **শ্রুতী**।
ঘ্রাণং পাতু মখত্রাতা, **মুখং** সৌমিত্রিবৎসলঃ ॥ ৫ ॥
জিহ্বা বিদ্যানিধিঃ পাতু, **কণ্ঠং** ভরতবন্দিতঃ।
স্কন্ধৌ দিব্যায়ুধঃ পাতু, **ভুজৌ** ভগ্নেশকার্মুকঃ ॥ ৬ ॥
করৌ সীতাপতিঃ পাতু, **হৃদয়ং** জামদগ্ন্যজিৎ।
মধ্যং পাতু খরধ্বংসী, **নাভিং** জাম্ববদাশ্রয়ঃ ॥ ৭ ॥
সুগ্রীবেশঃ **কটিং** পাতু **সকৃথিনী** হনুমৎপ্রভুঃ।
উরূ রঘূত্তমঃ পাতু রক্ষঃকুলবিনাশকৃৎ ॥ ৮ ॥
জানুনী সেতুকৃৎ পাতু **জঙ্ঘে** দশমুখান্তকঃ।
পাদৌ বিভীষণশ্রীদঃ পাতু রামোঽখিলং বপুঃ ॥ ৯ ॥

২৫

কৃষক নদী ঘটপ্রভা

আমাদের ॥ দক্ষিণ মহারাষ্ট্রকে স্পর্শ করিয়া

সন্তানদের ॥ চাষীদের।

২৬

কাশ্মীরের দুধগঙ্গা

পৃ ১১৬ সরোবর ভাঙ্গিয়া ॥ "আজ যেখানে কাশ্মীরে রমণীয় প্রদেশ অবস্থিত, সেখানেই পৌরাণিক যুগে সতীসর নামে এক সুদীর্ঘ সরোবর অবস্থিত ছিল, ইহা হরমুখ পর্বত ও পীরপুঞ্জালের মধ্যে বিস্তীর্ণ ছিল। পার্বতী স্বয়ং এই সরোবরে বিহার করিতেন। কিন্তু পরে সেখানে অনেক রাক্ষস আসিয়া পড়িল। এ কারণে দেবতারা সতীসর নষ্ট করিয়া দিবেন ভাবিলেন। ভগবান কশ্যপ বরাহদেবের উপাসনা করিলেন। বরাহদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার দংষ্ট্রা দিয়া পাহাড়ে 'ঘাট' নির্মাণ করিয়া দিলেন এবং সতীসরের জল "বরাহমূলম্‌" 'ঘাটের' মধ্য হইতে বিতস্তা নদীর রূপ ধরিয়া বহিতে থাকিল। বিতস্তাই ঝেলম্‌ নদী, 'বরাহমূলক' আজকার বারামূল্যা।"

—লেখকের গুজরাটি পুস্তক 'জীবননো আনন্দ' হইতে।

পৃ ১১৭ সতাকন্যা। সতীর প্রদেশে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া।

২৭

সুরধুনী বিতস্তা

'সংসারে যদি·· এখানেই।' মূল ফারসি পংক্তিগুলি হইল—

অগর ফিরদৌস বর্‌রূয়ে জমীনস্ত,

হমীনস্তো, হমীনস্তো, হমীনস্ত।

পৃ ১১৮ তাহার তীরে এক বড় বৈভবশালী সংস্কৃতি…হইয়াছিল॥ অনন্তপুরের নিকটে এক পাহাড়ের নীচে এক প্রাচীন শহরের ভগ্নাবশেষ চাপা পড়িয়াছিল, তাহা সম্প্রতি খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে।

চিনার॥ এই মহাবৃক্ষ শুধু কাশ্মীরেই হয়।

পৃ ১১৯ বুৎশিকন॥ [বুৎ = মূর্তি + শিকন = ভঙ্গকারী] মূর্তিনাশক।

গাজী॥ যে মুসলমান ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে। এই শব্দ আরবি ভাষা হইতে আসিয়াছে।

সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে॥ যখন চারিদিকে বান ডাকে। গীতা ২।৪৬

পৃ ১২০ শূকরদন্তের মত॥ মনে হয় এই উপমা 'বরাহমূলম্' হইতে আসিয়াছে।

নির্মাল্য॥ দেবতাদের উদ্দেশ্যে দেওয়ার পর যাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়।

পৃ ১২১ সুরধুনী॥ [সুর = দেবতা + ধুণী = নদী।

২৮

সেবাব্রতা রাবী

পৃ ১২২ স্বামী রামতীর্থ॥ বর্তমান ভারতের গঠনে স্বামী রামতীর্থের হাত আছে। কাকাসাহেব মারাঠী ভাষায় স্বামীজীর জীবনকথা লিখিয়াছিলেন, এবং তাহার কিছু কিছু রচনা অনুবাদ করিয়া সংগ্রহ করিয়া মারাঠী ভাষায় প্রকাশ করেন। ইহা হইল তাঁহার প্রথম সাহিত্যসৃষ্টি। ইহা হইতে ত্রিশবৎসর পূর্বে কাকাসাহেবের লেখকজীবনের আরম্ভ হইয়াছিল।

অর্জুনদেব॥ শিখদের পঞ্চমগুরু (১৫৬৩-১৬০৬)। আদিগ্রন্থের রচয়িতা। এই আদিগ্রন্থে তিনি প্রথম গুরুদেব ও অন্যান্য সাধুসন্তের বাণী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। লোকে বলে তাঁহার শত্রুরা আকবর বাদশাহের নিকটে গিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে অর্জুনদেব এই গ্রন্থে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু আকবর তাঁহার গ্রন্থ দেখিয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করিলেন ও যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে তাঁহার শত্রুরা পুনরায় অভিযোগ করেন। জাহাঙ্গীরের ইচ্ছা ছিল তাঁহার পুত্র

খসরুকে বন্দী করিবেন। খসরু পলাইয়া গিয়া অর্জুনদেবের নিকটে আশ্রয় নিলেন। বাদশাহ ইহা রাজদ্রোহ মনে করিয়া তাঁহাকে দুই লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। অর্জুনদেব নিজেও জরিমানা দিলেন না, অন্য কাহাকেও জরিমানা তাঁহার হইয়া দিতে দিলেন না। এজন্য বাদশাহ জেলে তাঁহার উপর খুব অত্যাচার করাইয়া অবশেষে লোক দিয়া তাঁহাকে হত্যা করান। তরবারি বিনা নিজের পন্থ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে মনে করিয়া তিনি নিজের পুত্রকে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া গদিতে বসিতে ও পর্যাপ্ত সংখ্যায় সৈন্য রাখিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে শিখের ইতিহাস নূতন দিকে চলিতে থাকে।

রণজিৎসিংহ॥ শিখদের রাজা (১৭৮০-১৮৩৯)। আমেদ শা আবদালির পর পঞ্জাব সুবা পুনরায় শিখদের হাতে আসিল। কিন্তু তাহা ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইল। রণজিৎ সিংহ তের বৎসর বয়সে গদিতে বসেন। ১৯ বৎসর বয়সে শিখদের সকল রাজ্যের আধিপত্য তিনি নিজের হাতে গ্রহণ করেন। ইংরেজরাও তাঁহাকে ভয় করিত। ১৮২৩ খ্রীঃ তিনি পেশোয়ার প্রদেশ জয় করেন। তখন দোস্ত মহম্মদ উহা ফিরাইয়া দিবার জন্য ইংরেজকে খুব অনুরোধ করেন। কিন্তু ইংরেজরা কিছুই করে নাই। চল্লিশ বৎসর কাল নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে রণজিৎ সিংহ শিখদের মধ্যে সামরিক শক্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। লোকে বলে যে যখন তিনি অটক নদী পার হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার গুরু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হিন্দুদের অটক পার হওয়ার হুকুম নাই। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন:

> সবৈ ভূমি গোপালকী, তামেঁ অটক কহাঁ?
> জাকে মনমেঁ অটক হৈ ওহী অটক রহা।

এই বলিয়া তিনি সমস্ত আফগানিস্থান জয় করিলেন।

পৃ ১২৪ অপ্সরা: অপ্‌—জল+সৃ=আগে যাওয়া=জলে সন্তরণ কারিণী, বিহার করে যাহারা] গন্ধর্বদের স্ত্রী। জলকেলি অপ্সরাদের খুব প্রিয়, তাই উহাদের এই নাম দেওয়া হইয়াছে। রামায়ণে উহাদের উৎপত্তির বিষয়ে লেখা হইয়াছে—

অপ্‌সু নির্মথনাদেব রসাৎ তস্মাৎ বরস্ত্রিয়ঃ।
উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ। তস্মাদপ্সরসোঽভবন্‌॥

পরোপকারায়॥ এই শরীর পরোপকারের জন্য।

২৯

স্তন্যদায়িনী চিনাব

পৃ ১২৬ আমার জীবনস্মৃতি॥ ১৮৯১-৯২-এর কথা।

৩০

জম্মুর তবী বা তাবী

পৃ ১২৭ বিরোধঃ যুদ্ধ। পৃথক করা।

সন্ধিঃ পরামর্শ। একত্র হওয়া।

রাজনীতিশাস্ত্রে কার্যসিদ্ধির ছয়টি পথের কথা বলা হইয়াছে:

(১) সন্ধি, (২) বিগ্রহ, (৩) যান (আক্রমণ), (৪) স্থান অথবা আসন (গৃহনির্মাণ), (৫) সংশ্রয় (আশ্রয় গ্রহণ করা), (৬) দ্বৈধ বা দ্বৈধীভাব—সন্দেহের সৃষ্টি করা।

'আত্মরতি, আত্মক্রীড়'ঃ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞদের কথা বর্ণনা করিতে করিতে মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে ঃ

আত্মক্রীড আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥

মুণ্ডক, ৩।১।৪

আত্মায় যিনি ক্রীড়া করেন, আত্মায় যাঁহার রমণ, সেই ক্রিয়াবান্‌ পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আত্মন্যেব:

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ গীতা, ৩।১৭

যে ব্যক্তির আত্মাতেই রতি, যে তাহা লইয়াই তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাহার কার্য করিবার বাকি কিছু নাই।]

সিন্ধুর বিষাদ

পৃ ১২৮ মানদণ্ড॥ মাপিবার দণ্ড। মহাকবি কালিদাসের কৃত কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোকে হিমালয় সম্বন্ধে এই শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

[উত্তর দিকে যেখানে দেবতাদের বাস সেই হিমালয় নামক পর্বতরাজ পৃথিবী মাপিবার গজের মত পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে স্নান করিতে করিতে দাঁড়াইয়া আছে।]

পঞ্জাবের পাঁচ নদী : ঝেলম, চিনাব, রাবী, ব্যাস ও শতলজ।

সংযুক্তপ্রদেশের পাঁচ নদী : গঙ্গা, যমুনা, গোমতী, সরযূ, চম্বল।

পৃ ১২৯ অতি-ভারতীয়॥ শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতের সীমার বাহিরেও এই দুই নদী প্রবাহিত হইয়া ভারতবর্ষের বাহির হইতে ভারতে আসেন, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া বহিতে থাকেন, এইজন্য ইঁহাদিগকে অতি-ভারতীয় বলা হইয়াছে।

বৈদিক...সপ্তসিন্ধু : বেদে যাহাদের উল্লেখ আছে সেই সাত নদী : বিতস্তা (ঝেলম), অসিক্নী বা চন্দ্রভাগা (চিনাব), পরুষ্ণী বা ইরাবতী (রাবী), শতদ্রু (শতলজ), বিপাসা (বিয়াস, ব্যাস), সিন্ধু ও সরস্বতী। ক্রুমু বা কুর্‌রম ইহাদের মধ্যে ধরা হয় না।

বায়ুকোণের সম্বন্ধে...ভারতের বিরুদ্ধে যত আক্রমণ হইয়াছে প্রায় সবই এইদিক হইতে হইয়াছে।

যবন : Ioniah Greers-এর প্রথম শব্দ হইতে এই শব্দের উৎপত্তি।

বাহ্লীক : বল্‌খ, ব্যাকট্রিয়া। বাহ্লীক শব্দ বেদে আছে।

রাণী সেমিরামিস : [খ্রীঃ পূঃ ৮০০ এর কাছাকাছি] এসিরিয়ার পুরাণে প্রসিদ্ধ রাণী। লোকে বলে, ইনিই বোবিলনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একথাও লোকে স্বীকার করে যে ইনি ইঁহার স্বামী নীনসের চেয়েও— যিনি নিনেভে স্থাপনা করিয়াছিলেন—অধিক পরাক্রমশালী ছিলেন। বাল্যকালে

মা ইহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কপোতেরা ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। প্রথমে ইনি নীনসের এক সেনাপতিকে বিবাহ করেন, পরে নীনসের দৃষ্টি ইহার উপর পড়িলে স্বামী আত্মহত্যা করিলেন। ইহার পর নীনসের সহিত ইহার বিবাহ হয় এবং নীনসের পরে ইনিই সিংহাসনে উপবেশন করেন। পরবর্তী জীবনে ইনি নিজের পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া ছিলেন।

স্বর্ণ করভার : খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইরানের বাদশাহ প্রথম দরায়স সিন্ধুপ্রদেশ দখল করিয়া লন এবং তিনি ঐ প্রদেশ হইতে ১৮৫ হন্দর অর্থাৎ ৫১৫॥ মণ স্বর্ণ-করভার লইতে আরম্ভ করেন। এখানে সেই কথারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

য়ুয়েচী : খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর কাছাকাছি উত্তর ভারত হইতে শকদের দক্ষিণে বিতাড়িত করিয়া সেখানে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যাঁহারা, মধ্য এশিয়ার সেই কুশানেরা। ইহাদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ আর কেহ কেহ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ সম্রাট্ কনিষ্ক কুশান ছিলেন। কুশান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের দিনে তাহার বিস্তার এতখানি ছিল যে পশ্চিম এশিয়ার বোখারা ও আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়ার কাশগর, ইয়ারকন্দ ও খোটান, উত্তর ভারতের কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও বারাণসী এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হূণ : খ্রীঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া ইহারা অর্থাৎ শ্বেতকায় হূণেরা মালব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ইউরোপেও ইহারা এটিলার নেতৃত্বে খুবই অত্যাচার করিয়াছিল। এখানেও উহাদের অত্যাচার হইতে শেষে আর্যাবর্তের রাজগণ বালাদিত্য ও যশোধর্মার নেতৃত্বে একত্র হইয়া হূণ রাজা মিহিরকুলকে পরাস্ত করিলেন ও বন্দী করিলেন। ইহার পর আর তাহাদের আক্রমণ হয় নাই। ভারতবর্ষে হূণদের রাজ্য অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত ছিল।

পৃ ১৩০ গিলগিট : শ্রীনগরের বায়ুকোনে ১২৫ মাইল দূরে ৪৮৯০ ফুট উচ্চে এই নামের জেলার রাজধানী। ইহার চারিদিকে বৌদ্ধকীর্তির ভগ্নাবশেষ ছড়াইয়া আছে।

চিত্রল : বায়ুকোনে সীমান্ত প্রান্তের এই নামের রাজ্যের এক প্রধান শহর।

স্বাত : পঞ্জকোরার সঙ্গে মিলিয়াছে, একটি ছোট নদী।

কোহ : পাহাড়ের নাম। কোহ=পাহাড়। তুলনীয় : কোহিনূর=কোহ—ই—নূর=আলোর পাহাড়।

ব্যাকৃট্রিয়া : বল্‌খ।

কর্ণেল ইয়ংহাজব্যাণ্ড : স্তর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড ১৮৬৩ সালে পাঞ্জাবে জন্ম গ্রহণ করেন। জাতিতে এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান। ১৮৮২ সালে সৈন্ত-বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮৯০ সালে পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে বদলি হন। ১৮৮৬ সালে মাঞ্চুরিয়াতে সন্ধানী কাজ করেন। ১৮৮৭ সালে চীনী তুর্কিস্থানের রাস্তায় পিকিং হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত যাত্রা করিয়াছিলেন। ১৮৯৩-৯৪ সালে চিত্রালে পোলিটিক্যাল এজেণ্ট হিসাবে ছিলেন। ১৮৯৫ সালে চিত্রালের যুদ্ধ হয়, তখন 'টাইম্‌স'-এর সংবাদদাতা রূপে কাজ করেন। ১৯০৩-৪ সালে ব্রিটিশদলের সঙ্গে লাসায় যান। প্রাচ্য জগৎ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লেখেন। ১৯১৯ সালে রয়াল জিও-গ্র্যাফিকাল সোসাইটির সভাপতি হন। বিস্তৃত জীবনীর জন্য জর্জ সোয়ীবরের লেখা 'ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড—এক্‌স্‌প্লোরার এণ্ড মিস্টিক'—বইখানি পড়ুন।

আমীর আমানুল্লা : ভারতবর্ষে রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে যখন প্রচণ্ড আন্দোলন চলিতেছিল তখন ১৯১৯ সালের এপ্রিলে আফগানিস্থানের আমীর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। দশদিনের মধ্যেই আফগানেরা পরাস্ত হয়। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ৮ই অগস্ট তারিখে রাওলপিণ্ডিতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

গ্রীষ্মের পাগলামি : তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, তাই কাজের কোনও হিসাব ছিল না। আমীর ভাবিয়াছিলেন, গ্রীষ্মকালে আক্রমণ করিলে ইংরেজ পরাস্ত হইবে। কিন্তু ইহা ছিল ভুল ধারণা। ইংরেজরা এই সাহসের নাম দিয়াছিল 'মিড-সামার ম্যাডনেস' Mid-summer madness।

কোহাটের ক্রূরতা : ১৯২৪ সালের ৯ই ও ১০ই সেপ্টেম্বরে কোহাটে যাহা ঘটিয়াছিল এখানে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্মান্তর ও অপহরণের জন্য সেখানকার আবহাওয়া প্রথম হইতেই গরম ছিল। ইতিমধ্যে সেখানকার সনাতন ধর্মসভার সম্পাদক এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে মুসলমানদের মন উত্তেজিত হইয়া ওঠে। হিন্দুরা অবিলম্বে দুঃখ প্রকাশ করিল ও পুস্তিকার

অবশিষ্ট প্রতিটি সাধারণের সমক্ষে অগ্নিসাৎ করিল। তথাপি মুসলমানেরা সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার দাবি সরকারের সম্মুখে উপস্থিত করিল। রাত্রে মসজিদে একত্র হইয়া তাহারা প্রতিশোধ লইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। ৯ই সেপ্টেম্বর সনাতন ধর্মসভার সম্পাদক জামিন দিয়া মুক্তিলাভ করিলে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। কি করিয়া আরম্ভ হইল তাহা লইয়া মতভেদ আছে; কিন্তু আরম্ভ হইবার পরে দুই পক্ষ পরস্পরে খোলাখুলি ভাবে গুলি চালাইল। সমস্ত হিন্দু মহল্লায় আগুন লাগানো হইল। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীও গুলি চালাইল। পরিণামে প্রচুর ক্ষতি হইল। সরকারি দায়িত্বে সমস্ত হিন্দুদের ক্যাণ্টনমেণ্টে রাখা হইল। সেখান হইতে তাহাদের কথা অনুসারে রাওলপিণ্ডীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বেলগাঁও কংগ্রেসে এবিষয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে হিন্দুদের এই পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল যে কোহাটের মুসলমানেরা তাহাদের সসম্মানে ফিরাইয়া না আনিলে এবং প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার আশ্বাস না দিলে তাহারা যেন ফিরিয়া না যায়।

কুরম: এই নদী সুলেমান পর্বত হইতে বাহির হইয়া সিন্ধুতে গিয়া মিশিয়াছে। বৈদিক নাম হইল ক্রুমু।

ডেরা ইস্মাইল খাঁ: লাহোরের পশ্চিমে ১২৫ মাইল দূরে সীমান্ত প্রদেশের এক শহর। এখান হইতে গোমলঘাটের পথে আফগানিস্থানের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য চলে। সুতী কাপড় ও ভেলভেটের কাজের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

ডেরা গাজীখাঁ: ভাওয়ালপুরের বায়ুকোনে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত পাঞ্জাবের এক শহর। সিন্ধুর বন্যায় ইহার যথেষ্ট ক্ষতি করিত, তাই ১৮৯১ খ্রীঃ এখানে পাথরের এক বাঁধ দেওয়া হয়। এখানকার অনেক মসজিদ প্রসিদ্ধ।

লাহোরের ঐশ্বর্য: আকবর ও তাঁহার বংশধরদের যুগে লাহোরের ঐশ্বর্য খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উজীর খাঁর মসজিদ, জুম্মা মসজিদ, শিশমহল, রণজিৎসিংহের মহল ও শহরের বাহিরে শাহাদ্রায় অবস্থিত জাহাঙ্গীর বাদশাহের কবর ও শালিমার বাগ আজও তাহার ঐশ্বর্যের সাক্ষী।

ব্যাস: বিয়াস, বিপাশা। বশিষ্ঠ মুনির একশত পুত্রকে রাক্ষস খাইয়া

গেলে পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিবার জন্য এই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন। নদী কিন্তু তাঁহাকে বি-পাশ অর্থাৎ পাশমুক্ত করিল, এইজন্য নদীর নাম হইল 'বিপাশা।'

ত্যাগায় সংভৃতার্থানাম্ঃ রঘুবংশের আরম্ভে মহাকবি কালিদাস রঘুদের বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাদের অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন। ইহা তাহাদের অন্যতম। 'যাঁহারা ত্যাগ অর্থাৎ দানের জন্য অর্থ সংভৃত বা ধন একত্র করেন সেই রঘুদের বংশের কীর্তি আমি গান করিতে চাই।'

পৃ ১৩১ নিজের ইচ্ছামত····· চায়ঃ নালার রূপে।

উদারতাঃ চওড়া। প্রস্থ।

জয়দ্রথের সময়েঃ মহাভারতের সময়ে। জয়দ্রথ ছিলেন সিন্ধু দেশের রাজা।

দাহিরঃ সিন্ধুর এক ব্রাহ্মণ রাজা [৬৪৫-৭১২]। জচ্চের পুত্র। সিন্ধুর সংলগ্ন খলিফার অধিকারভুক্ত প্রদেশের সুবেদার হজ্জাজকে ইনি বহুবার পরাস্ত করেন। তাহার পর মোহম্মদ বিন কাসিম নামে ১৭ বৎসর বয়সের সেনাপতিকে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠানো হয়। এই যুদ্ধে দাহিরের হাতী ভড়কাইয়া যায়, এই কারণে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সৈন্যগণ পলাইয়া যায়। তখন হইতে মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিতে পারিল। মোহম্মদ তাঁহার রাণীকে বিবাহ করে এবং তাঁহার দুই কন্যাকে নজর স্বরূপ খলিফার নিকটে পাঠাইয়া দেয়।

জচ্চঃ (৪৯৭-৬৩৭) দাহিরের পিতা। ফারসি ভাষায় বিচার 'চ্চনামা' গ্রন্থে ইহার জীবনী দেওয়া হইয়াছে। ইনি খুব বীরপুরুষ ছিলেন। ইনি রাজ্যের সীমা একেবারে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন সিন্ধুর আরোর নামক গ্রামের অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ শৈলজের পুত্র। প্রথমে ইনি ছিলেন সিন্ধুরাজের মন্ত্রীর কারকুন, পরে প্রধান মন্ত্রী হন, শেষে রাজা হইয়া রাণীকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মণ অঞ্চলের বৌদ্ধদের উপর ইনি খুব অত্যাচার করিয়াছিলেন।

পৃ ১৩২ অনাচারঃ সিন্ধুর এক ব্রাহ্মণ রাজাকে এক জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন, তোমার ভাগিনেয় তোমার রাজ্য কাড়িয়া লইবে। ইহার প্রতিকারে রাজা তাঁহার নিজের ভগিনীকেই বিবাহ করেন। আর একজন রাজা এক

সতীর উপর অত্যাচার করিয়াছিল। এই সকল ব্রাহ্মণরাজার অত্যাচারে লোকে এতদূর ক্লান্ত হইয়াছিল যে মোহম্মদ বিন কাশিমকে জাট ও মেগণই সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য করিয়াছিল।

মুহম্মদ বিন কাসিম : এই কিশোর সেনাপতি সিন্ধুপ্রদেশ জয় করিয়া খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করে। দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার পর দাহিরের দুইটি মেয়েকে খলিফার নিকটে নজর স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিল। খলিফা যখন ইহাদের একটিকে বিবাহ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন মেয়ে দুইটি বলিলেন, মুহম্মদ তাহাদের ধর্মনষ্ট করিয়াছে, সেই কারণে তাহারা ঐ সম্মানের উপযুক্ত নয়। ইহাতে খলিফা ক্রুদ্ধ হইয়া হুকুম দেন যে মুহম্মদ যেন গোরুর চামড়ার মধ্যে নিজের দেহ সিলাই করিয়া খলিফার সামনে হাজির হয়। মুহম্মদ খলিফার আদেশ পালন করিল, ফলে পরের দিনই তাহার মৃত্যু হইল। মুহম্মদের মৃতদেহ যখন এই অবস্থায় হাজির করা হইল, তখন মেয়েরা সত্য কথা শোনাইল—তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণের মনসে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। খলিফা তাহাদের শিরশ্ছেদ করাইলেন।

স্যর চার্লস নেপিয়ার ॥ [১৭৮২-১৮৫৩] ১৮০৮ খ্রীঃ স্পেনে মুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, করুণার যুদ্ধে বন্দী হন। ১৮১৩ খ্রী: আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইনি কবি বাইরনের বন্ধু ছিলেন। ১৮৪১ খ্রীঃ ভারতবর্ষে আসেন। ১৮৪২ সালে সিন্ধুর সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং কয়েক বৎসরের পরে ইমামগড়ের কেল্লা দখল করেন। ১৮৫৪ সালে মিয়ানির যুদ্ধে জয়লাভ করেন। মীরপুরের শের মুহম্মদকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। ১৮৪৪-৪৫ সালে সিন্ধুর পার্বত্য জাতিদের হারাইয়া দেন। ডালহাউসির সঙ্গে মতভেদ হইলে পদত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। ১৮৫৩ সালে মৃত্যু। অন্যায়ভাবে সিন্ধু অধিকার করার পর তিনি রিপোর্ট দেন : I have sinned (sind)—আমি সিন্ধু দখল করিয়া লইয়াছি।

সুহিণী ॥ এক ধনবান কুম্ভকারের কন্যা। মেহার নামে বোখারার এক সম্ভ্রান্ত মোগল যুবক তাহার প্রেমে ফাঁসিয়া যায় এবং মিলনের যাহাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য বেশ পরিবর্তন করিয়া তাহার পিতৃগৃহে ভৃত্য হইয়া থাকিয়া যায়। উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় হইতে থাকিল। কিন্তু কন্যার পিতার ইহা

ভাল লাগিল না। এজন্য সে মেহারকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিল। সে সিন্ধুর অপর পারে গিয়া থাকিল। সুহিণী সর্বদা রাত্রিবেলা মাটির কলসির সাহায্যে সিন্ধু নদী পার হইয়া মেহারের সঙ্গে মিলিত হইত। তাহার পিতা এ সংবাদ পাইয়া পাকা কলসির স্থানে কাঁচা কলসি রাখিয়া দিল। সুহিণী তো ছিল প্রেমে পাগল। সে কাঁচা কলসি লইয়াই নদীতে লাফাইয়া পড়িল। একটু অগ্রসর হইলেই কলসি গলিয়া যাইতে লাগিল। সে মেহারের নাম ধরিয়া ডাকিল। সম্মুখের তীরে মেহার তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া আসিল, কিন্তু বাঁচাইতে পারিল না। শেষে দুজনেরই এক সঙ্গে সলিল-সমাধি হইল।

৩২

মঞ্চরের জীবনবিভূতি

পৃ ১৩৩ দিশো ন জানে॥ না আমার দিক জ্ঞান আছে, না পাইতেছি শান্তি। গীতা ১১।২৫

ইদানীম্॥ এখন আমি শান্ত হইয়াছি, সুস্থ হইয়াছি। গীতা ১১।৫১

পৃ ১৩৫ অজগরের উপাসনা করিতেছিল॥ অজগর খুব আলস্যপরায়ণ হয়। এইজন্য এখানে অর্থ হইবে আলস্যের উপাসনা করিতেছিল।

রৈহানা বহেন॥ শ্রীঅব্বাস তৈয়বজীর কন্যা। ভক্তহৃদয় ও সুগায়িকা। ইঁহার Heart of a Gopi নামক পুস্তক খুব লোকপ্রিয়। এই পুস্তকের ফরাসি ও পোলিশ ভাষায়ও অনুবাদ হইয়াছে।. হিন্দীতে গোপী-হৃদয় নামে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার কিছু কিছু মূল গ্রন্থও হিন্দীতে রচিত আছে। —'সুনিয়ে কাকাসাহেব!' 'নাস্তেসে পহলে', 'কৃপা-কিরণ' প্রভৃতি। ইঁহার হিন্দী বা হিন্দুস্থানী রচনাপদ্ধতি একেবারে নিজস্ব।

পৃ ১৩৮ মংঘ॥ বাড়িতে বাতাস চলাচলের জন্য ছাতে যে চতুর্ভুজ আকারের চিমনির মত বস্তু থাকে তাহাকে মংঘ বলে।

'ঢংঢ'॥ সিন্ধী শব্দ।

৩৩

ঢেউয়ের তাণ্ডব

পৃ ১৪০ বপ্রক্রীড়া ॥ শৃঙ্গ বা দন্তের সাহায্যে মৃত্তিকা খনন। মেঘদূতে ইহার প্রয়োগ আছে—

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥

পৃ ১৪১ শিবতাণ্ডব স্তোত্র ॥ কবি রাবণের রচিত প্রসিদ্ধ স্তোত্র। 'জোগের প্রপাতে'র টিপ্পনি দেখুন।

প্রমাণিকার পঞ্চচামর ॥ সংস্কৃত ভাষায় লোকপ্রিয় ও অত্যন্ত সরল ছন্দ। প্রমাণিকার দুই পদ মিলিয়া এক পঞ্চচামর হয়। উহাকে নারাচও বলে।

প্রমাণিকাপদদ্বয়ম্ বদেত পঞ্চচামরম্।

পুষ্পদন্ত ॥ শিবভক্ত গন্ধর্ব। শিবমহিম্নস্তোত্র রচনা করেন। বায়ুকোণে দিগ্‌গজের নামও পুষ্পদন্ত। পুষ্পদন্তের আখ্যান কথাসরিৎসাগরে আছে।

গোমূত্রিকাবন্ধ ॥ চিত্রকাব্যের এক প্রকার।

শ্রাবণ-ভাদ্রের ধারা ॥ রাজান্তঃপুরে যখন জলের প্রবাহ ছাড়িয়া দেওয়া হয় আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাথরের উপর দিয়া উহার প্রপাত করিয়া দেওয়া হয়, তখন এই প্রপাতকে 'শ্রাবণ-ভাদো'র ধারা বলা হয়।

৩৪

সিন্ধুর পরে গঙ্গা

পৃ ১৪৪ সৌবীর দেশ ॥ সিন্ধু ও মারোয়াড়ের সীমায় অবস্থিত প্রদেশ।

পৃ ১৪৫ সদাকত আশ্রম ॥ [সদাকত = সত্য + আশ্রম] বিহারের প্রসিদ্ধ দেশভক্ত মজহরুল হক ১৯২০-২১-এর মধ্যে এই আশ্রম স্থাপন করেন।

পৃ ১৪৮ রসো বৈ সঃ। নিশ্চয় তিনিই রস। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মের বর্ণনা করিতে গিয়া এই বচন বলা হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় ২।৭।

পৃ ১৫০ ওঁ পূর্ণমিদং॥ ইহা (জগৎ) পূর্ণ, উহা (ব্রহ্ম) ও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রকট হয়। পূর্ণ হইতে যদি পূর্ণকে বাহির করিয়া লই তবে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

ঈশোপনিষদের প্রথমে ও শেষে এই শান্তিমন্ত্র আছে।

৩৫

নদীর উপর খাল

পৃ ১৫১ কলৌ আদ্যন্তয়োঃ স্থিতিঃ॥ দক্ষিণে এই কথা প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল যে কলিকালে শুদ্ধ দুই বর্ণেরই অস্তিত্ব আছে—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, যেহেতু সংস্কারলোপের জন্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও এখন শূদ্রের মত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিজত্ব।। যাহারা উপবীত লইয়া এই জন্মে দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণের অধিকারী, সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজ বলে।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে।

ভগীরথ।। ভগীরথ হিমালয় হইতে গঙ্গাকে নামাইয়া বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রদেশকে উর্বর করিয়াছিলেন। তখন হইতে 'সেচবিদ্যায় কুশল' অর্থে বসে।

পৃ ১৫২ পরিবাহক।। অতিরিক্ত জল বহিয়া যাওয়ার জন্য যে পথ রাখা হইয়াছে। overflow.

৩৬

নেপালের বাঘমতী

পৃ ১৫৪ অতিমানুষী।। অলৌকিক। Superhuman.

পৃ ১৫৫ ভগিনী নিবেদিতা।। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজ শিষ্যা মিস মার্গারেট নোবল। 'নিবেদিতা' গুরুদত্ত নাম।

গোরক্ষনাথ।। অযোধ্যার নিকটে জয়শ্রী নগরীতে সদ্‌বোধ নামে জনৈক ব্রাহ্মণের এক স্ত্রী ছিল, নাম সদ্‌বৃত্তি। একবার ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে মৎস্যেন্দ্রনাথ আসিয়া সেখনে পৌছিলেন। সাধু পুরুষ জানিয়া সেই স্ত্রী

তাঁহাকে সন্তান না হওয়ার কথা জানাইল। মৎস্যেন্দ্রনাথ ভস্ম দিলেন, কিন্তু তাহা প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ না করিয়া স্ত্রীলোকটি ধূলায় ফেলিয়া দিল। ঠিক বারো বৎসর পরে মৎস্যেন্দ্রনাথ আবার আসিলেন, আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি কোথায়?" সদ্‌বৃত্তি সত্য কথা বলিয়া দিল। তখন মৎস্যেন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া ডাকিলেন 'অলখ'। অমনই সম্মুখ হইতে 'আজ্ঞা করুন' বলিয়া গোরক্ষনাথের বালমূর্তি দাঁড়াইয়া গেল। এজন্য গোরক্ষনাথকে অযোনিসম্ভব বলা হয়। গুরুর নিকটে থাকিয়া গোরক্ষনাথ সকল বিদ্যা অর্জন করিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ যোগীও ছিলেন ভোগীও ছিলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথের বৈরাগ্য ছিল অগ্নির মত প্রখর। মৎস্যেন্দ্রনাথকে সিংহল দ্বীপের প্রমীলারাণীর মোহপাশনা হইতে গোরক্ষনাথই মুক্ত করেন। তিনি যোগী, শিবোপাসক, অদ্বৈতবাদী ও যাদুকর রূপে প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, নেপাল, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র ও সিংহল দ্বীপ প্রভৃতি সকল স্থানেই তাঁহার মঠ আছে।

মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ নেপালের গুর্খাদের দেবতা। গোরক্ষনাথ হইতেই তাহাদের 'গুর্খা' নাম। নেপালে বৌদ্ধদের মহাযান পন্থ চলিত ছিল। উহাকে পরাস্ত করিয়া গোরক্ষনাথ সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শিবের উপাসনা প্রচলিত করেন। গোরক্ষনাথের সময় এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায় নাই।

৩৭

বিহারের গণ্ডকী

গণ্ডকী॥ বিহারে দুইটি নদীর নাম গণ্ডকী। লেখক মজঃফরপুরের নিকটে যে গণ্ডকী দেখিয়াছিলেন, তাহা বৃদ্ধ বা ছোট গণ্ডকী। অন্যটি বড়।

পৃ ১৫৬ বৌদ্ধ জগতের দুই স্তর॥ নর্মদা ও গণ্ডকীর মধ্যে বৌদ্ধ জগৎ আঁটিয়া গিয়াছিল।

মাণ্ডলিক নদী॥ যে সকল নদী জলরূপ কর দিতেছে; যে সকল নদী আসিয়া মিশিতেছে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ॥ ভগবান বুদ্ধের বিবৃত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের আট অঙ্গ এই প্রকার; (১) সম্যক্ দৃষ্টি; (২) সম্যক্ সংকল্প; (৩) সম্যক্ বাক্; (৪) সম্যক্ কর্মান্ত; (৫) সম্যক্ আজীব; (৬) সম্যক্ ব্যায়াম; (৭) সম্যক্ স্মৃতি; আর (৮) সম্যক্ সমাধি।

মার॥ যাহা মানুষের সদ্‌বাসনা বিনাশ করে। বৌদ্ধধর্মে আসুরী সম্পত্তির অধিষ্ঠাতা ব্যক্তির নাম 'মার'।

৩৮

গয়ার ফল্গু

পৃ ১৫৭ সীতার শাপ॥ লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে যে একসময় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ঘুরিতে ঘুরিতে ফল্গুর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়াই রামের মনে পড়িল, আজ পিতার শ্রাদ্ধের দিন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিবার জন্য তিনি লক্ষ্মণকে শহরে পাঠান। লক্ষ্মণ গেলেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বহু বিলম্ব হইল। চিন্তিত হইয়া রাম নিজেই খুঁজিবার জন্য বাহির হইয়া গেলেন। এদিকে শ্রাদ্ধের সময় পার হইয়া যায়; সীতা স্নানাদি সারিয়া হাতের কাছে যাহা কিছু ছিল তাহাই দিয়া পবিত্র হইয়া নিজে তাঁহার পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করিলেন। পিতৃগণ সন্তুষ্টচিত্তে পিণ্ড গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা পিণ্ড লইয়া যাইতেছেন। এমন সময়ে সীতা তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা নিজে আসিয়া পিণ্ড লইয়া গিয়াছেন একথা আমার স্বামী কি করিয়া বুঝিবেন?' তখন আকাশবানী হইল, 'তুমি সাক্ষী রাখিও।' সীতা ফল্গু নদী, গোরু, অগ্নি ও 'কেওড়ে'কে সাক্ষী মানিলেন।

রামলক্ষ্মণ সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া আসিলেন এবং সীতাকে চরু অর্থাৎ পিণ্ডের ভাত প্রস্তুত করিতে বলিলেন। কিন্তু সীতা কোনও উত্তরও দিলেন না, চরুও তৈয়ার করিলেন না। শেষে রাম কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সীতা সমস্ত কথা বলিয়া দিলেন। কিন্তু রামলক্ষ্মণের বিশ্বাস হইল না। তাই সীতা ফল্গু প্রভৃতি সকল সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে বলিলেন। সকলেই কিন্তু

বলিল, 'আমরা কিছুই জানি না।' তখন নিরুপায় হইয়া সীতা পুনরায় চরু প্রস্তুত করিলেন এবং রাম পিণ্ডগ্রহণের জন্য পিতৃগণকে আবাহন করিলেন। তখন আকাশবাণী হইল, জানকী আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়াছেন। তথাপি রামের বিশ্বাস হইল না। এই কারণে পুনরায় আকাশবাণী হইল। ইহাতেও রাম সন্তুষ্ট হইলেন না। ইহার পর সূর্য স্বয়ং আসিয়া সাক্ষ্য দিলেন, তখন রামের বিশ্বাস হইল।

সাক্ষী হইয়াও তাহারা বলে নাই, সেজন্য সীতা ঐ চার সাক্ষীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ফল্গুকে বলিলেন, 'তুমি পাতালে থাকিবে।' 'কেওড়ে'কে বলিলেন, 'শিব তোমাকে গ্রহণ করিবেন না।' গোরুকে বলিলেন, 'তোমার মুখ অপবিত্র ও পুচ্ছ পবিত্র বলিয়া লোকে মনে করিবে।' অগ্নিকে বলিলেন, 'তুমি সর্বভুক্ হইবে।'—শিবপুরাণ, ৩০ অধ্যায়।

৩৯

গর্জনকারী শোণভদ্র

পৃ ১৫৮ অয়ং শোণঃ…"স্বচ্ছজলশালী, অগাধ, পুলিনশোভিত, এই শোণ। ব্রহ্মন্, আমরা কোন পথে পার হইব?" রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বামিত্র জবাব দিলেন, "যে পথে মহর্ষিরা যান, আমার দ্বারা বর্ণিত এই সেই পথ।"

ক্ষত্রিয় গুরুশিষ্য ॥ ক্ষত্রিয়দের গুরু ব্রাহ্মণই সর্বদা হইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে গুরু বিশ্বামিত্রও মূলে ক্ষত্রিয় ছিলেন।

পীবরতনু ॥ পুষ্টদেহ।

গজকচ্ছপ তনু ॥ হাহা হুহু নামে দুই গন্ধর্ব ছিল। একদিন উভয়ে বিবাদ বাধিল—'সঙ্গীত বিদ্যায় আমাদের মধ্যে বড় কে?' তাহারা ইন্দ্রের নিকটে গিয়া তাঁহার সম্মুখে নিজেদের কলানৈপুণ্য দেখাইল। ইন্দ্র বলিলেন, 'তোমাদের দুইজনের মধ্যে কে বড় তাহা দেবল ঋষি ছাড়া আর কেহ বলিতে পারিবে না।' তাই তাহারা দেবলঋষির নিকটে গিয়া গান গাহিতে লাগিল। ঋষি তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন, কিছু বলিলেন না; গন্ধর্বেরা ভাবিল ইনি

জড়বুদ্ধি, কিছু বোঝেন না, তাই ভাবিয়া তাঁহার অপমান করিল। ইহাতে ঋষি তাহাদের শাপ দিলেন, 'তোমরা এখন মৃত্যুলোকে জন্মগ্রহণ করিবে।' কিন্তু পরে তাহাদের প্রার্থনায় শাপ মোচনের জন্য বলিলেন, 'হরি তোমাদের উদ্ধার করিবেন।'

এইভাবে উভয়ে মৃত্যুলোকে গজেন্দ্র ও কুম্ভীর রূপে জন্মগ্রহণ করিল। একবার গজেন্দ্র জলক্রীড়ার জন্য জলে নামিয়াছে, এমন সময় কুমীর তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া জলের মধ্যে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। গজেন্দ্র বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। গভীর জলের মধ্যে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। যখন তাহার সমস্ত দেহ জলের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে, শুধু শুঁড়ই বাকি আছে, তখন সে ঈশ্বরকে স্তব করিল। স্তব শুনিয়া ঈশ্বর আসিলেন, তাহাকে বাঁচাইলেন এবং উভয়কে উদ্ধার করিলেন।

এ কথা পঞ্চরত্নগীতার 'গজেন্দ্র-মোক্ষ'-এর মধ্যে আছে।

[বহুবৎসর পূর্বে Tug of war গজকচ্ছপ ভুল, কুমীরের সঙ্গে গজেন্দ্রের যুদ্ধ। বুঝাইবার জন্য কাকাসাহেব গুজরাটিতে 'গজগ্রাহ' শব্দ' শব্দ প্রবর্তিত করেন।]

পৃ ১৫৯ কোথা যাই ॥ মহাকবি কালিদাস শোণের এই ভাব অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরের পর নিরাশ হইয়া রাজারা যখন অজের পথ রুদ্ধ করিল, তখন অজ তাহাদের সেনাকে আক্রমণ করিলেন। কালিদাস ইহার তুলনা দিয়াছেন শোণের সহিত—শোণ যখন তাহার উত্তাল তরঙ্গ লইয়া ভাগীরথীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

তস্যাঃ স রক্ষার্থমনল্পবোধং আদিশ্য পিত্র্যং সচিবং কুমারঃ।
প্রত্যগ্রহীৎ পার্থিব বাহিনীং তাং ভাগীরথীং শোণ ইবোত্তরঙ্গঃ॥

রঘুবংশ ৭।৩৬

নাল্পে সুখমস্তি……তৎসুখম্ ॥ 'অল্পে সুখ নাই। যাহা ভূমা—সমস্ত বিশ্ব লইয়া এত বিশাল, তাহাই সুখের রূপ।'

ছান্দোগ্য ৭।২৩

৪০

তেরদালের মরীচিকা

পৃ ১৫৯ জমখণ্ডী ॥ দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের এক শহর।

৪১

চর্মণ্বতী চম্বল

পৃ ১৬২ রন্তিদেব ॥ ভরতের অধস্তন ষষ্ঠ সোপানে জাত সূর্যবংশীয় রাজা। মহাভারতে দুইবার ইহার উল্লেখ আছে। মেঘদূতেও ইহার প্রসঙ্গ আছে।

হেকাটোম ॥ [শত উক্ষ যজ্ঞ] গ্রীক-(যুনানী) দের এক যজ্ঞ, একশত বৃষ ইহাতে আহুতি দেওয়া হইত।

ভূদেব ॥ ব্রাহ্মণ। অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে দেবতাদের মুখ মনে করা হইত। তাহারা যাহা খায় তাহা সোজা দেবতারা গ্রহণ করেন।

৪২

নদীর সরোবর

পৃ ১৬৩ বেলাতাল ॥ তাল = তালাও। যেমন নৈনীতাল, ভীমতাল।

পৃ ১৬৪ হিমালয়ের নিকট হইতে মাপ চাহিয়া ॥ হিমালয়ে কেদারনাথের নিকটে মন্দাকিনী নামে এক নদী আছে বলিয়া।

মহারাজ পুলকেশী ॥ বাতাপী বংশের রাজা। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি মহারাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একত্র করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপনা করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞও করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কীর্তিবর্মা পিতার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং অঙ্গ বঙ্গ মগধও তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। ৬০৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় পুলকেশী যখন সিংহাসনে বসিলেন তখন এই চালুক্য সাম্রাজ্য

বিন্ধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে পল্লব সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি মালব, গুর্জর, কলিঙ্গও নিজের অধীন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার শক্তির সবচেয়ে বেশি পরিচয় এই যে মহারাজ হর্ষ যখন দক্ষিণ আক্রমণ করেন তখন পুলকেশী তাঁহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন (খ্রীঃ ৬৩৬)। পুলকেশী = পুলিকেশী। দক্ষিণী ভাষায় পুলি = হুলি = বাঘ। যাঁহার কেশ বাঘের মত হয়, তিনি পুলকেশী।

অনাবিল ॥ যাহাতে কোনও ময়লা নাই। স্বচ্ছ।

পৃ ১৬৬ দশার্ণ ॥ বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত প্রদেশ। দশ + ঋণ (দুর্গ) যেখানে আছে। নদীর নাম 'দশার্ণা।' মেঘদূত এই প্রকার উল্লেখ আছে—

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈর্
নীড়ারম্ভৈ র্গৃহবলিভুজাম্ আকুলগ্রামচৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যাম-জম্বূবনান্তঃ
সংপৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥২৩

বেত্রবতী ঃ মালবের এক নদী, বেতোয়া। মেঘদূতে ইহারও উল্লেখ আছে—

তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকালং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যা শ্চলোর্মি ॥২৪॥

৪৩

নিশীথযাত্রা

পৃ ১৬৭ সবিন্দু-সিন্ধু ॥ শঙ্করাচার্য বিরচিত 'নর্মদাস্তোত্র' হইতে। এই স্তবের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে, যাহাতে নর্মদাকে শর্মদা বলা হইয়াছে ঃ

ত্বদম্বুলীন দীনমীন দিব্য সম্প্রদায়কং
কলৌ মলৌঘভারহারি সর্বতীর্থনায়কং।

সুমৎস্য-কচ্ছ-নক্রচক্র-চক্রবাক-শর্মদে
ত্বদীয় পাদপংকজং নমামি দেবি নর্মদে ॥

পৃ ১৬৯ আমার জাতি হইল কাকের জাতি ॥ কাক কখনও একা খায় না। অন্য কাকদের ডাকিয়াই খায়।

লেখকের নাম হইল 'কাকা', একথা মনে রাখা চাই।

পৃ ১৭৬ নান্তঃপ্রজ্ঞং ॥ মাণ্ডুক্যোপনিষদে তুরীয় রূপের বর্ণনায় এই শব্দ পাওয়া যায়। ইহার অর্থ হইল—'তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিষ্প্রজ্ঞ নহেন। তিনি উভয়তঃপ্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞানঘন নহেন। তিনি প্রজ্ঞও নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন।"

৪৪

ধুয়াঁধার

পৃ ১৮২ পূষন্নেকর্ষে এবং **ক্রতো স্মর কৃতং স্মর** ॥ ঈশোপনিষদের শ্লোক। সম্পূর্ণ শ্লোক নিম্নলিখিত রূপ—

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ! ব্যূহ রশ্মীন্, সমূহ তেজো,
যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥
বায়ুরনিলমমৃতং অথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ; ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥

[হে জগৎপোষক সূর্য, হে একাসঞ্চরণকারিন, হে যম (সংসারকে যিনি নিয়মে রাখেন), হে সূর্য (যিনি প্রাণ ও রস শোষণ করেন), হে প্রজাপতিনন্দন, তুমি তোমার রশ্মি সংহত কর। তেজ একত্র কর। তোমার যাহা অত্যন্ত কল্যাণময় রূপ, তাহা আমি দেখিতেছি। সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত ঐ যে পরাৎপর পুরুষ, উহা তো আমিই।

এখন আমার প্রাণ সর্বাত্মক বায়ুরূপ সূত্রাত্মায় মিশিয়া যাক, এই শরীর ভস্মীভূত হউক। হে আমার সংকল্পাত্মক মন, এখন তুমি স্মরণ কর, নিজের কৃত কর্ম স্মরণ কর। এখন তুমি স্মরণ কর, নিজের কৃতকর্ম স্মরণ কর।]

পৃ ১৮৩ চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত ॥ চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ বাকাটক বংশে হইয়াছিল। তিনি বহুবৎসর ধরিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সেই সময়ে চন্দ্রগুপ্ত সেখানে অন্তরঙ্গ লোকদের পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখানে সে কথার উল্লেখ আছে। সমুদ্রেগুপ্তের বিজয়যাত্রায় এই প্রদেশও অন্তর্ভুক্ত থাকিত।

কলচুরী ॥ বাকাটক সাম্রাজ্যের পতনের পর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্যের সৃষ্টি হয়। তাহার মধ্যে উত্তর মহারাষ্ট্রের কলচুরী লোকদেরও এক রাজ্য ছিল। তাহার রাজধানী ছিল ত্রিপুরী, যেখানে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল।

বাকাটক ॥ ২২৫ হইতে ৫৪০ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে মধ্যপ্রদেশের বেরার প্রদেশে বাকাটকদের সাম্রাজ্য ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইহার উন্নতি চরমে উঠিয়াছিল। সমগ্র হায়দ্রাবাদ, বোম্বাইয়ের মহারাষ্ট্র, বেরার ও মধ্য-প্রদেশের অনেক অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়া উত্তর কোঙ্কন, গুজরাট, মালব, ছত্রিশগড় ও অন্ধ্রপ্রদেশেও ইহার প্রভুত্ব ছিল। তখনকার দিনে এতখানি বিশাল ও শক্তিসম্পন্ন সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে আর ছিল না।

৪৫

শিবনাথ ও ঈব

পৃ ১৮৪ মালিক কাফুর ॥ আলাউদ্দিন খিলিজীর প্রীতিভাজন খোজা। ইনি দক্ষিণ দেশ জয় করিয়া সেখানকার অধিবাসীদের উপর খুব অত্যাচার করিয়াছিলেন।

কালাপাহাড় ॥ বাংলার নবাব সুলেমান কররানি ও পরে তাঁহার পুত্র দায়ুদের সেনাপতি। আসাম, কাশী ও উড়িষ্যায় যত হিন্দু দেবালয় ছিল তাহার একটিও 'ইহার হাতে রক্ষা পায় নাই। কোনটা ইনি একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, কোনটা বা খণ্ডিত করিলেন, কোনটা বা ভূমিসাৎ করিলেন। জগন্নাথের মূর্তি ইনি পোড়াইয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুদের উপর ইনি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলে যে তিনি প্রথমে

ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু কোনও নবাবকন্যার প্রেমে পড়িয়া মুসলমান হন। মুসলমানদের ইতিহাসে তিনি পাঠানবংশে জাত বলিয়া উল্লেখ আছে। ১৫৬৫ খ্রীঃ তিনি উড়িষ্যা জয় করেন। ১৫৮০ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃ ১৮৬ নামরূপ ত্যাগ করিয়াই॥ মুণ্ডকোপনিষদে (৩।২।৮) নিম্নলিখিত শ্লোক আছে—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

[নিরন্তর বহমান নদী যেমন তাহার নামরূপ ছাড়িয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে, বিদ্বান্‌ও সেইরূপ নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন।]

সর্বে মহত্ত্বমিচ্ছন্তি॥ যে কুলে সকলে মহৎ হইতে চায় সেই কুলের নাশ হয়; সেইরূপ যে দেশে সকল লোকই নেতা হয়, সেই দেশেরও নাশ নিশ্চিত।

৪৬

দুর্দৈবী শিবনাথ

পৃ ১৮৮ রাক্ষসপদ্ধতির বিবাহ॥ আটপ্রকার বিবাহের কথা বলা হইয়াছেঃ (১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব (৩) আর্য, (৪) প্রাজাপত্য, (৫) গান্ধর্ব, (৬) আসুর, (৭) রাক্ষস ও (৮) পিশাচ। ইহার মধ্যে যে বিবাহে কন্যার আত্মীয়স্বজনকে মারিয়া বা হারাইয়া জবরদস্তি করিয়া কন্যাকে গ্রহণ করা হয়, তাহাকে রাক্ষস-পদ্ধতির বিবাহ বলে।

৪৭

সূর্যার স্রোত

পৃ ১৯০ কাসা॥ বোম্বাই রাজ্যের থানা জেলার এক গ্রাম। আচার্য ভিসের তত্ত্বাবধানে এখানে এক সর্বোদয় কেন্দ্র চলিতেছে, তাহার কর্মী স্থানীয় আদিবাসী 'বার্লী'দের মধ্যে খুব ভাল কাজ করিতেছে।

৪৮

অভ্রের ঈব

পৃ ১৯৩ কবিদের যতখানি……যাইতেছিল ॥ অত্যন্ত অল্প ও অস্পষ্ট।

৪৯

তেন্দুলা ও সুখা

পৃ ১৯৭ যদ্‌ভাবি ॥ যাহা হইবেই তাহা হইতে দাও।

৫০

ঋষিকুল্যার সহনশীলতা

পৃ ১৯৯ সরিৎপিতা ॥ পর্বত।

সরিৎপতি ॥ সমুদ্র।

পৃ ১৯৯ পর্বতের উদ্দেশ্যে ॥ কাকাসাহেব যে এখানে পাহাড়ের বর্ণনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এখানে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫১

সহস্রধারা

পৃ ২০১ আচার্য রামদেও ॥ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সহকর্মী। হরিদ্বার গুরুকুলের আচার্য।

৫২

গুচ্ছুপাণী

পৃ ২০৯ চন্দন ॥ কাকাসাহেবের পুত্রবধূ শ্রীমতী চন্দন কালেলকর।

৫৩

নাগিনী নদী তিস্তা

পৃ ২১৩ যন্ত্রের জীন কসিয়া ॥ পাওয়ার হাউস নির্মাণ করিয়া।

৫৪

পরশুরাম কুণ্ড

পৃ ২১৯ নহি বেরেন বেরানি······ধম্মপদের সম্পূর্ণ শ্লোকটি নিম্ন-প্রকার—

নহি বেরেন বেরানি সমম্ভীধ কুদাচনং।
অবেরেণ চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥ ৫ ॥

[বৈর দ্বারা কখনও বৈর শান্ত হয় না, অবৈরের দ্বারাই বৈরভাব শান্ত হয়—ইহা সংসারের সনাতন নিয়ম (ধর্ম)।]

৫৫

মাদ্রাজের দুই ভগ্নী

পৃ ২২২ নাগমোড়ী॥ নাগের মত যাহার বক্রতা। সর্পবৎ। এই শব্দ মারাঠী ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে।

৫৬

প্রথম সমুদ্র-দর্শন

পৃ ২২৫ মুরগাঁও॥ গোয়ার এক শহর, ইংরেজী নাম হইল 'মার্মাগোয়া'। পশ্চিম সমুদ্রতীরে এক সুন্দর বন্দর। সামরিক দৃষ্টিতে ইহার খুব মহত্ত্ব আছে।

পৃ ২২৬ দুধ-সাগর॥ জল পর্বতশৃঙ্গ হইতে নীচে এভাবে লাফাইয়া পড়ে যে তাহা হইতে দুধের মত কাব্যময় শ্বেতপ্রপাত সৃষ্টি হয়। তাই ইহার নাম 'দুধ-সাগর' হইয়াছে।

কেশু॥ কেশব, কাকাসাহেবের ভাই।

পৃ ২২৭ দত্তু॥ কাকাসাহেবের পুরা নাম হইল দত্তাত্রেয় বালকৃষ্ণ কালেলকর। দত্তাত্রেয় কথাটা সংক্ষেপ করিয়া দত্তু হইয়াছে।

গোন্দু॥ গোবিন্দ, কাকাসাহেবের অন্য এক ভাই।

৫৭

ছাপান্ন বৎসরের ক্ষুধা

পৃ ২৩৭ সরগাছ॥ কারোয়ারে সরগাছের এক সুন্দর বন আছে। কাকাসাহেবের রচিত 'স্মরণ-যাত্রা'য় 'সরোপার্ক' নামক লেখায় ২০১ পৃঃ ইহার বর্ণনা পড়ুন।

৫৮

মরুস্থল, না সরোবর ?

পৃ ২৩৯ সমুদ্রের মাসী॥ সমুদ্রের জল জোয়ারের সময় সব চেয়ে বেশি যেখানে গিয়া পৌঁছায় সেখানে এক ধরণের বেল জন্মে। সমুদ্র যতই কেন ঝড় না হউক কখনও এই সীমা উল্লংঘন করে না। এইজন্য এই বেলকে মর্যাদা বেল বলে। খালাসিদের মতে ইহা সমুদ্রের মাসী, সমুদ্র তাই ইহার ভাগিনেয়।

পৃ ২৪০ সর্বংসমাপ্নোষি॥ 'আপনি সমস্ত পৃথিবী ছড়াইয়া আছেন। সুতরাং আপনিই সর্ব।' গীতা ১১।৪০

৫৯

চাঁদিপুর

পৃ ২৪২ মহাশ্বেতা॥ বাণভট্টের বিখ্যাত কথাগ্রন্থ 'কাদম্বরী'র নায়িকা কাদম্বরীর সখী।

কাদম্বরী॥ বাণভট্টের কথা গ্রন্থের নায়িকা। কাদম্বরীর মূল অর্থ হইল সুরা, মদ্য।

পৃ ২৪৩ মদালসা॥ দেশভক্ত যমুনালাল বজাজের কন্যা।

পৃ ২৪৪ আপো নারা॥ জলের নাম 'নারা'। আর তিনি নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে জাত। এই জল প্রথমে তাঁহার (পরমাত্মার) অয়ন (নিবাসস্থান) ছিল। তাই পরমাত্মাকে নারায়ণ (জলে যাহার নিবাস স্থান) বলা হইয়াছে। মনুস্মৃতি ১।১০।

প্রথম প্রভাত॥ রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'অয়ি ভুবনমনো-মোহিনি' হইতে।

৬০

সার্বভৌম জোয়ার-ভাটা

পৃ ২৪৭ সু-গত॥ ভগবান বুদ্ধের এক নাম। এক বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া যিনি আসেন তিনি তথাগত। সকল সংকল্প ও সংস্কার নাশ করিয়া যিনি নির্বাণ পর্যন্ত পৌছান তিনি সু-গত।

৬১

অর্ণবের আমন্ত্রণ

পৃ ২৪৮ অর্ণব॥ অর্ণব শব্দের ধাতু 'ঋ'। তাহার অর্থ হইল উপচাইয়া পড়া, ফেনে ভরিয়া যাওয়া। পরে যাহাতে উথল-পুথল হয়, যাহা ফেনে ভরিয়া যায়, যাহা অশান্ত, তাহাকে অর্ণ=জল বলে। যাহাতে এই প্রকার জল আছে তাহাকে বলে অর্ণব। 'ঋণোত্যর্ণঃ। অর্ণাংসি উদকানি অত্র সন্তি ইতি অর্ণবঃ।'

অঘমর্ষণ সূক্ত॥ ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৯০ সূক্ত। ইহার ঋষির নামও অঘমর্ষণ। সন্ধ্যাবন্দনার সময় সকাল সন্ধ্যায় এই সূক্ত বলা হয়। কাকাসাহেব লিখিতেছেন: "অঘমর্ষণের অর্থ হইল পাপ ধুইয়া ফেলা। কিন্তু এই সূক্তে পাপের উল্লেখ পর্যন্ত নাই। উহাতে ঋষি বলিতেছেন: বহির্বিশ্বের বিশালতা অনুভব কর, হৃদয়ের গভীরতা পরীক্ষা কর। এই সমস্ত অন্তরের ও বাহিরের সৃষ্টি কাহার সাহায্যে টিকিয়া আছে তাহা দেখিয়া লও। কাল আর সৃষ্টি যে অনন্ত তাহা ধারণা কর। তাহা হইলে তোমার মন আপনা আপনি বড় হইয়া যাইবে। বিশাল মনে পাপের স্থান নাই।

এই অনাদি অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে 'ঋতম্' ও 'সত্যম্'-ই স্থায়ী। 'ঋতম্' কথাটির অর্থ হইল বিশ্বের সার্বভৌম নিয়ম; চরাচর সৃষ্টির সনাতন ধর্ম। ইহারই সাহায্যে অনাদি অনন্ত সৃষ্টি চলিতেছে (ঋ=চলা)। এই 'ঋতম্'-এর ভিতরে যে পরম তত্ত্ব আছে, যাহা শাশ্বত, যাহার নাশ কখনও হয় না, তাহারই

নাম সত্য। এই সত্য সর্বব্যাপী। তাই ইহাকে বিষ্ণুও (সর্বত্র যাহার প্রবেশ, ব্যাপ্তি যাহার ধর্ম) বলা হয়। 'সত্যম্' ও 'ঋতম্'-এর দ্বারাই এই সংসার উৎপন্ন হয়, বিলীন হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়। বিশ্বচক্র তপস্যায় চলে। এই বিশ্ব তো পরমাত্মার শুধু মহিমা। পরমাত্মা ইহা হইতেও বড়। তিনি সুখের ধাম, আনন্দের নিধান। তাঁহার চিন্তা হৃদয়ে যতই বাড়িতে থাকিবে, হৃদয় ততই নির্মল হইবে। তোমার হৃদয় যতই বাড়িবে, পাপে ততই তোমার ঘৃণা হইতে থাকিবে। পাপের স্থানই থাকিবে না। 'যো বৈ ভূমা তৎসুখং। নাল্পে সুখমস্তি।' এইটুকু বোঝ। ইহাই পাপনাশক মন্ত্র।"

বরুণ ॥ বেদে বরুণকে বলা হইয়াছে পশ্চিম দিকের অধিপতি ও সাগরের অধীশ্বর। বৃ (ঘিরিয়া ফেলা)+উন্ (কৃতার্থে প্রত্যয়), যাহা পৃথিবীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

ভূজ্যু ॥ ঋগ্‌বেদে ইহার কথা আছে। বলা হয়, ভূজ্যু তাঁহার পুত্র তুগ্রের উপর একবার ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তুগ্রকে তিনি অন্য দ্বীপে অবস্থিত শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দেন। পথে জাহাজে গর্ত হইয়া অতি কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন অশ্বিনীকুমারেরা একশত দাঁড়ীর নৌকায় আসিয়া উহাকে তীরে নিরাপদ স্থানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়।

পৃ ২৪৯ উদরী ॥ রোগবিশেষ, পেট জলে ভরিয়া যায়। লেখক এখানে জলরূপী উদর অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

পৃ ২৫০ সিন্ধবাদ ॥ আরব্যরজনীতে (Arabian Nights) ইহার সাতবার ভ্রমণের মনোহর কাহিনী আছে।

সিংহপুত্র বিজয় ॥ সিংহলের প্রাচীনতম পরম্পরা অনুসারে খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে সৌরাষ্ট্রের সিংহপুরের রাজকুমার বিজয় দুঃসাহসের অভিযানে যাত্রা করিয়া সিংহলে পৌঁছিয়াছিলেন। পণ্ডিতদের মতে ইনি পৌরাণিক নহেন, ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ("ভারতীয় আর্যভাষা ও হিন্দী" শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।)

ভৃগুকচ্ছ ॥ বর্তমান ভরোচ।

সোপারা ॥ প্রাচীন শূর্পারিক।

দাভোল ॥ পশ্চিমতটে অবস্থিত অতি সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।

মঙ্গলা ॥ বর্তমানে মঙ্গলুর বা মাঙ্গালোর।

তাম্রদ্বীপ ॥ সিংহল, লংকা।

পৃ ২৫১ জাভা ও বালিদ্বীপ ॥ সিঙ্গাপুরের দক্ষিণে অবস্থিত দুই দ্বীপ। সেখানকার ধর্ম ইস্‌লাম, কিন্তু হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব সেখানে আজও স্পষ্ট বলিয়া মনে হয়।

তাম্রলিপ্তি ॥ বর্তমানে তমলুক।

দশ দিকে ॥ মহাবংশে লেখা আছে, "বৌদ্ধধর্মের প্রচারক মোগ্‌গলীপুত্ত (তিস্স), স্থবির সংগঠনের কাজ শেষ করিয়া ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া আর একথা মনে রাখিয়া যে দেশের বাহিরে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা হইবে, কার্তিক মাসে কয়েকজন স্থবিরকে পৃথক পৃথক স্থানে পাঠাইয়া দেন। কাশ্মীর ও গান্ধারে মজঝন্তিককে, মহিষমণ্ডলে মহাদেব স্থবিরকে, বনবাসীতে রক্‌খিতকে, মহারাষ্ট্রে মহাধর্ম রক্‌খিতকে ও যোন (যবন) দেশে মহারক্‌খিত স্থবিরকে পাঠাইলেন।

"মজ্‌ঝিম স্থবিরকে হিমবন্ত (হিমালয়) প্রদেশে এবং সোণ ও উত্তর এই দুই স্থবিরকে সুবর্ণভূমিতে (ব্রহ্মদেশে) পাঠাইলেন। মহামহিন্দ, ইট্টিয়, উত্তিয়, সম্বল ও ভদ্দসাল এই পাঁচ জন স্থবির শিষ্যকে 'তোমরা সুন্দর লংকাদ্বীপে গিয়া মনাভিরাম বুদ্ধধর্ম স্থাপন কর' বলিয়া উক্ত দ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন।" ১-৮

ধর্মবিজয় ॥ কলিঙ্গবিজয়ের পর অশোক তাঁহার মনের অনুশোচনা বর্ণনা করিয়া যে শিলালেখ খোদিত করাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে "মহারাজের মতে ধর্মের দ্বারা যে বিজয় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিজয়।"

বন্যজাতির মত নির্ভয়ে ॥ মূল বৌদ্ধ গ্রন্থে গণ্ডারের নয়, তবে গণ্ডারের শুধু শিংয়ের উপমা আছে। সকল প্রাণীর দুইটি করিয়া শিং, কিন্তু গণ্ডারের নাকের উপর একটি শিং হয়।

ধম্মপদে এই সম্বন্ধে একক হাতীর উপমা দেওয়া হইয়াছে :

নো চ লভেথ নিপকং সহায়ং সাদ্ধংচরং সাধু বিহারিধীরং।

রাজা ব রট্‌ঠং বিজিতং পহায় একো চরে মাতংগরঞ্‌ঞেব নাগো ॥

[যদি দক্ষ, সহায়, সহচর, সদ্ভাবে বিচরণশীল ধীর ব্যক্তি মিত্রের রূপে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিজিত রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া রাজা যেমন একাকী

চলিয়া যায়, অথবা বনমধ্যে হস্তী যেমন একাকী ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ একাই ঘুরিতে হইবে।]

একস্স চরিতং সেয়্যো নত্থি বালে সহায়তা।

একো চরে ন চ পাপানি কয়িরা অপ্পোস্সুক্কো মাতংগরঞ্ঞেব নাগো॥

[একাকী চলাই শ্রেয়, বালক (অজ্ঞানী) দিয়া কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না। মাতঙ্গরাজ একাকী হাতীর মত অল্প উৎসুক হইয়া একাকী চর্যা করিতে হইবে ; পাপ করিলে চলিবে না।]

সোপারা, কান্হেরী, ধরাপুরী॥ বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী বৌদ্ধ গুহাগুলি।

খণ্ডগিরি, উদয়গিরি॥ উড়িষ্যার দুই পাহাড়। এখানে বৌদ্ধ গুহা আছে। সম্রাট্ খারবেলের বিখ্যাত শিলালেখও এখানে আছে।

পৃ ২৫২ মহিন্দ ও সংঘমিত্তা॥ অশোক নিজের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য লংকায় পাঠাইয়াছিলেন।

ভাইকিং॥ ইউরোপের উত্তর সমুদ্রে ৮ম হইতে ১০ম শতক পর্যন্ত লুণ্ঠনকারী দস্যু।

পৃ ২৫৩ লক্ষ্মীর পিতা॥ সমুদ্রে লক্ষ্মীর জন্ম, তাই পুরাণে সমুদ্রকে লক্ষ্মীর পিতা বলা হইয়াছে। এখানে লেখক উক্ত কাহিনীর সুযোগ লইয়া সমুদ্রে যাত্রার ফলে প্রাপ্তব্য লক্ষ্মী অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

জলোদর॥ উদরী।

পৃ ২৫৪ সর্বে সন্তু নিরাময়া॥ পূরা শ্লোক নিম্নপ্রকারের :

সর্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

[সকলে সুখী হউক, সকলে নিরাময় অর্থাৎ নীরোগ হউক। সকলে মঙ্গল লাভ করুক। কেহ যেন দুঃখী না হয়।]

দক্ষিণসমুদ্রতীরে

পৃ ২৫৫ ধনুষ্কোটী॥ ধনুষ্কোটীতে দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী ভূমির যে অংশ বিস্তৃত রহিয়াছে উহা ধনুকের কোটীর মত বক্র। ইহা হইতে স্থানটির নাম হইয়াছে ধনুষ্কোটী।

রত্নাকর ও মহোদধি॥ উভয়েরই অর্থ তো এক—সমুদ্র।

পৃ ২৫৬ প্রশস্ত॥ মূল অর্থ হইল কল্যাণময়, শুভ, কুশল; প্রশংসাভাজনও হইতে পারে। এখানে উভয় অর্থেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। বাংলা ও মারাঠিতে এই শব্দের অন্য অর্থও হয়—চওড়া, বিশাল। সে অর্থেও এখানে গ্রহণ করা যায়।

আত্মনি অপ্রত্যয়॥ যাহার আত্মায় অর্থাৎ নিজেতে বিশ্বাস নাই। বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ।'—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

পৃ ২৫৭ ভূমিকায় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া॥ দুই সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইবার জন্য যে ভূমি ছিল তাহার উপর দাঁড়াইয়া। অল্পার্থে 'ক' প্রত্যয় হয়, ইহার সুযোগও এখানে গ্রহণ করা হইয়াছে।

পৃ ২৫৮ রঘুবংশের লিখিত বর্ণনা॥ ত্রয়োদশ সর্গে রাবণবধের পরে সীতাকে লইয়া রাম পুষ্পক বিমানে বসিয়া অযোধ্যায় ফিরিতেছেন, লংকা হইতে বাহির হইয়া সাগর পার হইবার সময় কয়েকটি শ্লোকে সাগরের বর্ণনা করিয়াছেন:

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনৈব শরৎপ্রসন্নম্ আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥ ২ ॥
গর্ভং দধত্যর্কমরীচয়োঽস্মাৎ বিবৃদ্ধিমত্রাশ্নুবতে বসূনি।
অবিন্ধনং বহ্নিমসৌ বিভর্তি প্রহ্লাদনং জ্যোতিরজন্যনেন॥ ৪ ॥
তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয় মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা॥ ৫ ॥
সসত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ সংমীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ।
অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈরূর্দ্ধং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্॥ ১০ ॥

মাতঙ্গনক্রৈঃ সহসোৎপতদ্ভির্ভিন্নান্ দ্বিধা পশ্য সমুদ্রফেনান্।
কপোলসংসর্পিতয়া যথেষাং ব্রজন্তি কর্ণক্ষণ চামরত্বম্ ॥ ১১
বেলানিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গা মহোর্মিবিস্ফূর্জথুনির্বিশেষাঃ।
সূর্যাংশুসংপর্কসমৃদ্ধরাগৈ র্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ ॥ ১২ ॥
তবাধরস্পর্ধিষু বিদ্রুমেষু পর্যস্তমেতৎ সরসোর্মিবেগাৎ।
ঊর্ধ্বাংকুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ ক্লেশাদপক্রামতি শংখযূথম্ ॥ ১৩ ॥
প্রবৃত্তমাত্রেণ পয়াংসি পাতু মাবর্তবেগভ্রমতা ঘনেন।
আভাতি ভূয়িষ্ঠময়ং সমুদ্রঃ প্রমথ্যমানো গিরিণেব ভূয়ঃ ॥ ১৪ ॥
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥ ১৫ ॥
বেলানিলঃ কেতকরেণুভিস্তে সংভাবয়ত্যাননমায়তাক্ষি।
মামক্ষমং মণ্ডনকালহানে র্বেত্তীব বিম্বাধরবদ্ধতৃষ্ণম্ ॥ ১৬ ॥
এতে বয়ং সৈকতভিন্নভক্তি-পর্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ।
প্রাপ্তা মুহূর্তেন বিমানবেগাৎ কূলং ফলাবর্জিতপূগমালম্ ॥ ১৭ ॥

পৃ ২৫৮ পর্বতে পরমাণৌ চ ॥ পূর্বপদ এই প্রকার—'কবয়ঃ কালিদাসাদ্যাঃ কবয়ো বয়মপ্যমী।' সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ হইল। "কালিদাস প্রভৃতি কবিও কবি, আমরাও কবি ; পর্বতও পদার্থ, পরমাণুও পদার্থ—উভয়েই সমান।"

বানরযূথ-মুখ্য ঃ রামরক্ষা স্তোত্রে হনুমানের এই ভাবে স্তব করা হইতেছে—

মনোজবং মারুত-তুল্য-বেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠং।
বাতাত্মজং বানর-যূথ-মুখ্যং শ্রীরামদূতং মনসা স্মরামি ॥

সাম্পরায় ॥ মৃত্যুর পরের অবস্থা। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমরাজকে সাম্পরায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

পৃ ২৬০ উদয়ে সবিতা ॥ সূর্য উদয়ের সময়ে রক্তবর্ণ হয়, অস্তের সময়েও রক্তবর্ণ হয়। বড়লোকেরা সম্পদে ও বিপদে একরূপই হইয়া থাকেন।

পৃ ২৬২ এই ত্রিবিধ পূর্ণতার মধ্য হইতে·· স্মরণীয় ঃ

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

পৃ ২৬৩ ব্রাহ্মমুহূর্ত ॥ প্রাতঃকালে প্রায় সাড়ে তিনটার সময়। আত্মচিন্তার পক্ষে এই সময় উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। 'ব্রাহ্ম মুহূর্তে চোত্থায় চিন্তয়েৎ হিতমাত্মনঃ।'

পৃ ২৬৪ উদরপূরণ নামে যে যজ্ঞকর্ম ॥ তুলনীয়—

বদনী কবল ঘেতাঁ নাম ঘ্যা শ্রীহরিচেঁ
সহজ হবন হোতেঁ নাম ঘেতাঁ ফুকাচেঁ।
জীবন করি জিবিত্বা অন্ন হেঁ পূর্ণব্রহ্ম
উদরভরণ নোহে জাণিজে যজ্ঞকর্ম ॥

[মুখে গ্রাস লইবার সময় হরির নাম লও। সহজে নাম লইলে সহজে হবন হয়। অন্ন পূর্ণব্রহ্ম, উহা জীবন বলিয়াই আয়ুকে জীবন্ত করে; ইহা উদরভরণ নহে, ইহাকে যজ্ঞকর্ম বলিয়া জানিও।]

পৃ ২৬৫ কন্যাকুমারীর আখ্যান ॥ বণ্ডাসুর নামক এক দানব শিবের আরাধনা করিয়া হিরণ্যকশিপুর মত 'আমি ইহার হাতে মরিব না, উহার হাতে মরিব না' এরূপ বরদান চাহিয়া লইল। কিন্তু এই লম্বা-চওড়া তালিকায় কুমারী কন্যার নাম ভুক্ত করিবার কথা তাহার মনে হয় নাই। বর পাইয়া দানব নির্ভয় মনে সংসারে বড়ই দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সমস্ত সংসার ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তখন শিব পার্বতীকে কুমারী কন্যার রূপ ধরিয়া সংসারে যাইবার কথা বলিলেন। পার্বতী ললিতাদেবী হইয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং দানবকে বিনষ্ট করিলেন। তাহার পর প্রথমে যেমন স্থির করা হইয়াছিল, সেই অনুসারে হাতে 'কুঙ্কুম' ও 'অক্ষত' লইয়া বিবাহের জন্য শিবের পথ চাহিয়া রহিলেন। শিব বিবাহের জন্য যাত্রা করিলেন ঠিকই, কিন্তু পথে মূর্তিমান ক্রোধ দুর্বাসার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। অভ্যর্থনা করিতে কিছু দেরি হইয়া গেল। ততক্ষণে কলিযুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে! কলিযুগে বিবাহ হওয়া সম্ভব ছিল না।

তাই পার্বতী হাতের কুঙ্কুম-অক্ষত ফেলিয়া দিলেন এবং কলিযুগ সমাপ্তির প্রতীক্ষায় সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পার্বতীর নিক্ষিপ্ত অক্ষত এখনও সমুদ্রতটে বালুকার রূপে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধাবান লোকেরা মনে করে যে এই চাউল মুখে দিলে প্রসূতির প্রসববেদনা কম হয়। কুঙ্কুমের মত দেখিতে লাল রং-এর বালুকা তো এখানে প্রচুর।

৬৩

করাচীর পথে

পৃ ২৬৬ অনুরাধা, কৃষ্ণচন্দ্র ॥ অনুরাধা নক্ষত্র। কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। রাধা ও কৃষ্ণ, লেখক এই দুই শব্দ সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাইয়াছেন।

৬৪

সমুদ্র পিঠে

পৃ ২৬৯ গিরিধারী ॥ আচার্য কৃপালনীর ভ্রাতুষ্পুত্র। সে সময়ে লেখকের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে থাকিতেন।

'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' ॥ রবীন্দ্রনাথের রচিত সুপরিচিত সঙ্গীত।

আকাশে যেমন চাঁদ চলে ॥ রবীন্দ্রনাথের অন্য এক গানে এইরূপ চিত্র আছে :

আজি শুক্লা একাদশী, হের নিদ্রাহারা শশী,
ঐ স্বপ্ন পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।

পৃ ২৭০ জীবতরাম ॥ আচার্য কৃপালানী।

পৃ ২৭১ ধ্যেয়ঃ সদা ॥ সূর্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত, কমলাসনে বিরাজমান, কেযূর, মকরকুণ্ডল, কিরীট ও হার ধারণ করিয়া স্বর্ণময় দেহধারী, শংখ-চক্রধারী নারায়ণকে সর্বদা ধ্যান করিতে হইবে।

ভয়ংকর দিব্য ॥ দিব্য = কষ্টিপাথর, পরীক্ষা। 'ভয়ংকর দিব্য' নামে এক মারাঠী উপন্যাস সুপ্রসিদ্ধ।

পৃ ২৭৩ আত্মন্যেব সন্তুষ্টঃ ॥ আপনাতেই সন্তুষ্ট। গীতা ৩।১৭ সম্পূর্ণ শ্লোক এই :

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥

৬৫

সরোবিহার

পৃ ২৭৫ তাহার কাব্য তো দূর হইতেই খোলে॥ 'Tis distance lends enchantment to the new.

পৃ ২৭৬ শকুন্তলার মত॥ শকুন্তলার তৃতীয় অংকের শেষে শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন, তখন আর্যা গৌতমী আসিয়া সেখানে পৌঁছিলেন। তাই শকুন্তলা রাজাকে লতাগুলির পিছনে যাইতে বলিলেন, আর যাওয়ার সময় লতাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন : 'লতাবলয়, সন্তাপহারক, আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভূয়োঽপি পরিভোগায়।' আর এইভাবে লতামণ্ডপের ছলে রাজার অনুমতি লইয়া চলিয়া গেলেন।

যযাতিরও যখন জীবনের আনন্দ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল॥ রাজা যযাতি ভোগবিলাসে জড়িত হইয়া থাকিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ছেলেদের যৌবনও লইয়াছিলেন। কিন্তু পরে উহা হইতে বিরাগ জন্মিল, আর তিনি বুঝিতে পারিলেন :

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব পুনরেবাভিবর্ধতে ॥

[ভোগে কামনার শান্তি হয় না। হবি দিলে আগুনের মত আবার তাহার বৃদ্ধি হয়।]

আনারসের ফোয়ারা॥ আনারস গাছের আকারই এমন যে মনে হয় বুঝি ফোয়ারা উড়িতেছে।

৬৬

সুবর্ণদেশের মাতা ঐরাবতী

কৃষ্ণার উৎপাত॥ বন্যা। অন্য একটা অর্থও আছে। নীল নদীতে বান ডাকিলে নদী জলের সঙ্গে মাটিও ভাসাইয়া লইয়া যায়, ইহার ফলে খেতে ভাল ফসল হয়। ইজিপ্টের লোকেরা ইহাকে 'নীলের কৃপা' বলে।

পৃ ২৮০ কালিদাস দাবা খেলিতেছেন ॥ কথা আছে যে ভবভূতি 'উত্তররামচরিত' লিখিবার পর সমস্ত গ্রন্থটা কালিদাসকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। কালিদাসের শতরঞ্চ খেলার বড় শখ ছিল। তিনি দাবা খেলিতে খেলিতে গ্রন্থ শুনিতেছিলেন। কালিদাস মন দিয়া শুনিতেছেন না দেখিয়া ভবভূতির খারাপ লাগিল। কিন্তু শেষে যখন কালিদাস এক সূক্ষ্ম ও সরস সংশোধনের নির্দেশ দিলেন, তখন ভবভূতি অবাক্ হইয়া গেলেন। সমস্ত গ্রন্থ শুনিবার পর কালিদাস বলিলেন, 'নাটক তো ভাল ; তবে একটা অনুস্বার বেশি আছে।'

রামসীতার গল্পসল্পের বর্ণনা করিতে গিয়া ভবভূতি লিখিতেছেন :

অবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥

[এই ভাবে (এবং) (এদিক-ওদিকের গালগল্প করিতে করিতে) প্রহর কি করিয়া কাটিয়া গেল তাহা বোঝাই গেল না, সমস্ত রাত কাটিয়া গেল।]

কালিদাস অনুস্বার বাদ দিতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে অর্থ একেবারে বদলাইয়া গেল। চমৎকার ফল হইল :

অবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥

[(নানা বিষয়ে গালগল্প করিতে করিতে) প্রহর কেমন করিয়া চলিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারা গেল না, রাত্রি কিন্তু শেষ হইয়া গেল (আমাদের কথার শেষ হইল না)।]

ইহা শুধু জনশ্রুতি ; কালিদাস ও ভবভূতি সমসাময়িক ছিলেন না।

শানরাজ্য ॥ ব্রহ্মদেশের চীন সীমান্তের নিকট অর্ধস্বাধীন রাজ্য। শানেরা ব্রহ্মদেশ, আসাম, শ্যাম ও দক্ষিণ চীনে বাস করে। বর্ণে গৌর, ধর্মে বৌদ্ধ, অত্যন্ত পরিশ্রমী। উহাদের মধ্যে বহুপত্নী প্রথা চলিত আছে।

জাহাজের পক্ষী ॥ 'যেমন ওড়ে জাহাজের পক্ষী, আবার জাহাজে ফিরিয়া আসে।' – সুরদাস্।

পৃ ২৮১ অনিচ্চ বত ॥ 'অনিত্যা বত সংস্কারা উৎপত্তি-ব্যয়ধর্মিণঃ।'

[উৎপত্তি ও নাশ ইহাই জিনের ধর্ম, এরূপ সংস্কার (সৃষ্ট পদার্থ) অনিত্য।]

শ্রান্ত ॥ পরিশ্রান্ত লোকদের তত্ত্বজ্ঞান।

চিরন্তন ॥ চিরকাল যাহা থাকিবে। সম্পূর্ণ জ্ঞান যাহাদের আছে তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান।

সুবর্ণদেশ ॥ ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধযুগের নাম।

৬৭

সমুদ্রের সঙ্গে একত্র বাস

পৃ ২৮২ কাঁচা শিকের মত ॥ উপমার নবীনতা ও ঔচিত্য দ্রষ্টব্য।

পৃ ২৮৪ ত্রিকাণ্ড ॥ তিন কাণ্ড বা তিন ভাগ যাহার আছে। শ্রবণের তিন তারা আছে। মৃগ নক্ষত্রের পেটে তিনটি তারার ইষু ত্রিকাণ্ড নক্ষত্র হয়। শ্রবণও তাহারই মত, তাই উহাকে ত্রিকাণ্ড বলা হইয়াছে।

খস্বস্তিক ॥ আমরা যেখানেই কেন দাঁড়াই না, মাথার উপরের আকাশের ভাগ বা বিন্দু। ইংরেজিতে ইহার নাম হইল 'জেনিথ।'

পৃ ২৮৫ দীপের আলো চমকাইয়া আলোর ঝিলিক দেয় ॥ তার বিভাগে যেমন 'টরে' 'টক্কা' এই দুইটি শব্দের দ্বারা সমগ্র লিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে, রাত্রে আলোর ঝিলিক দিয়া বহুদূর পর্যন্ত সংবাদ পাঠানো হয়। দিনে সূর্যেরআলো হইতেও এইভাবে সংবাদ পাঠানো হয়, তাহার নাম 'হেলিওগ্রাফ'।

পৃ ২৮৮ ত্রিখণ্ড সহকার ॥ আফ্রিকায় কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী (যাহারা ক্রীতদাস বা মজুরের কাজ করিয়া দিন চালায়) ছাড়া গোরা ইউ-রোপীয়ানেরাও আছে, তাহারা রাজত্ব করে, আর ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য পূর্ব দেশ হইতে আগত গোধূম বর্ণ অথবা হরিদ্রা বর্ণ আরব, ভারতীয় এবং চীনেরাও আছে। তিন খণ্ডের এই সকল লোকের মধ্যে যে সহযোগিতা তাহাকে 'ত্রিখণ্ড সহকার' বলা হইয়াছে। অবশ্য, এ সহযোগ সমানে সমানে নয়।

৬৮

ভূমধ্যরেখার পারে

পৃ ২৮৯ শান্তাদুর্গা ॥ শুভংকরী শান্তা আর ভয়ংকরী দুর্গা। গোয়াতে শান্তা-দুর্গার মন্দির আছে।

নীলোত্রী

শ্রীঅপ্‌পা সাহেব ॥ ঔন্ধের শেষ রাজার দ্বিতীয় পুত্র অপ্‌পা-সাহেব পন্থ। ভারত সরকারের কমিশনর হিসাবে ইনি যখন আফ্রিকায় ছিলেন, তখন সেখানকার লোকের উপর ইঁহার খুব প্রভাব ছিল।

পৃ ২৯২ ঈশোপনিষদ্ ॥ আঠারটি মন্ত্র লইয়া এক সংক্ষিপ্ত উপনিষদ। বিনোবাজী ইহাকে বেদের সার ও গীতার বীজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গান্ধীজী বলিয়াছেন যে ইহাতে সমগ্র হিন্দুধর্মের নির্যাস আসিয়াছে। ইহার প্রথম মন্ত্র তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল, সেই মন্ত্রের সম্বন্ধে তিনি অনেকবার আলোচনা করিয়াছেন। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র হইল এই:

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনম্॥

এই উপনিষদ ঈশাবাস্যোপনিষদ নামেও পরিচিত।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ ॥ ঈশোপনিষদ হইতেও ক্ষুদ্র। ইহাতে মাত্র বারোটি মন্ত্র আছে। ইহাতে ওঙ্কারের দ্বারাই সমগ্র অদ্বৈত সিদ্ধান্ত আলোচিত হইয়াছে। ইহার উপর গৌড়পাদাচার্য যে কারিকা লিখিয়াছেন তাহাই অদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রথম নিবন্ধ বলিয়া গৃহীত হয়। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই শঙ্করাচার্য তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

আমি সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখিতে পারিলে ॥ সংস্কৃত কবি বাল্মীকি গঙ্গাষ্টকে বলিয়াছেন:

ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তর্গতো গঙ্গে! বিহঙ্গো বরং
তন্নীরে নরকান্তকারিণি! বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র-মদান্ধ-সিন্ধুর ঘটা-সংঘট্ট-ঘণ্টা রণৎ-
কার-ত্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবনিতা-লব্ধস্তুতি ভূর্পতিঃ॥

পৃ ২৯৪ মিঃ স্পীক ॥ (Speke) জন হেন্নিঙ্গ (১৮২৭-৬৪)—নীল নদীর উৎপত্তি খুঁজিয়াছিলেন। ভারতীয় সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিয়া পাঞ্জাবের যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করেন। ছুটিতে হিমালয়, তিব্বত আদি প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইবার শখ ছিল। আফ্রিকার ভূগোলে অনুরাগ জন্মিবামাত্র ১৮৫৪ সালে বার্টনের সঙ্গে আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। সোমালিল্যাণ্ডে বেড়াইলেন। তাঁহার

পুস্তকে (What led to the Discovery of the Source of the Nile) (১৮৫৪) তাহার বর্ণনা আছে। ইহার পর তিনি মধ্য আফ্রিকার হ্রদগুলি সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে ইহাদের মধ্যে উত্তরদিকের ভিক্টোরিয়া নায়াঞ্জাই নীলের উৎপত্তিস্থান। ইহার প্রমাণ তিনি তাঁহার Journal of the Discovery of the Source of the Nile পুস্তকে দিয়াছেন। বার্টন তাহার প্রতিবাদ করেন। বার্টনের মতে টাঙ্গানিকা হ্রদই নীলের উৎস। উভয়ের মধ্যে সর্বসাধারণের প্রকাশ্যে আলোচনা চলিতেছিল। আলোচনার প্রথম দিনই স্পীক শিকারে গিয়া নিজের বন্দুকের গুলিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চন্দ্রগিরি ॥ রামায়ণের মতে সিন্ধু ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থানে স্থিত শতশৃঙ্গ পর্বত। এখানে 'রুবেন জোরি' পর্বত।

মেরু পর্বত ॥ ভাগবত অনুসারে জম্বুদ্বীপে ইলাবৃত্তের মধ্যে স্থিত স্বর্ণময় পর্বত। এখানে মধ্য আফ্রিকার ঐ নামের এক পর্বত, কিলোমাঞ্জারোর প্রতিবেশী।

পৃ ২৯৫ অচ্ছোদ সরোবর ॥ বাণভট্টের কাদম্বরী হইতে এই নাম লওয়া হইয়াছে।

'শুভসংবাদ' ॥ শুভ বার্তা। ইংরেজি 'গস্‌পেল'।

স্টেনলি ॥ স্যর হেনরি মার্টিন (১৮৪০-১৯০৪): সাধারণ কৃষক-কুলে জন্ম। মূল নাম, জন রোল্যাণ্ড। বাল্যকালে নানা অসুবিধার মধ্যে কাটান। বিদ্যালয়ে শিক্ষককে প্রহার করিয়া পালাইয়া যান। ছুঁচসুতা যাহারা বিক্রয় করে তাহাদের কাছে কিছুদিন কাজ করিলেন। কষাইদের কাছেও কিছুদিন কাজ করিলেন। পরে নিউ অর্লিন্স গামী এক জাহাজে 'কেবিন বয়' রূপে কাজ করেন। সেখানে স্ট্যানলি নামে এক ব্যবসায়ী তাঁহাকে সাহায্য করেন। পরে তিনিই বালককে আশ্রয় দেন। তখন হইতে তিনি স্ট্যানলি নামই পরিচিত। পালক পিতার মৃত্যুর পরে তিনি সৈন্য বিভাগে ভর্তি হন। যুদ্ধের সময় তিনি বন্দী হন। মুক্ত হইবার পরে তিনি যখন ফিরিয়া বাড়ি গেলেন, তখন তাঁহার মা তাঁহাকে বাড়িতে স্থান দিতে চাহিলেন না। ইহাতে তাঁহার মনে বড় আঘাত লাগে। জীবিকার জন্য তিনি খালাসির জীবন গ্রহণ করিলেন। আমেরিকার নৌবিভাগে তিনি ভর্তি হইলেন। পরে সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চমৎকার বর্ণনা শক্তি ছিল। অনেক যুদ্ধে সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করিয়াছেন। ১৮৬৯-এ 'নিউইয়র্ক

হেরাল্‌ডে'র পরিচালক তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করিয়া প্যারিসে ডাকাইয়া আনেন। আর আফ্রিকার সন্ধানে প্রেরিত লিভিংস্টোনের সন্ধান করিবার ভার দেন। প্রায় এক বৎসর কাল খুব দৌড়াদৌড়ির পর তিনি ১০ নভেম্বর ১৮৭১ তারিখে উজিজিতে লিভিংস্টোনের দেখা পাইলেন। How I found Livingstone নামক পুস্তকে তিনি এবারকার প্রবাস কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমদিকে লোকে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিত না। কিন্তু তিনি লিভিংস্টোনের ডায়েরীগুলি দেখাইলেন, তখন লোকের বিশ্বাস হইল। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া তাঁহাকে রত্ন খচিত নস্যাধার উপহার দেন। কিন্তু এই ব্যাপারে লোকেরা তাঁহাকে যে ভাবে অবিশ্বাস করিত ও গালি দিত, তাহাতে তাঁহার মন চিরকালের জন্য কটু হইয়া গেল।

১৮৭৪ সালে লিভিংস্টোনের মৃত্যুর পর তাঁহার অসমাপ্ত কার্য শেষ করিবার জন্য 'ডেলি টেলিগ্রাফের' স্বত্বাধিকারী চাঁদা সংগ্রহ করিয়া স্ট্যানলিকে দিলেন এবং তাঁহার নেতৃত্বে একটি ছোট দল আফ্রিকায় পাঠাইলেন। তিন বৎসর চেষ্টার ফলে তিনি প্রমাণ করিলেন যে লিভিংস্টোন যাহা 'লুআবাবা' বলিতেন তাহা আর কংগো নদী একই। তাহার সম্পূর্ণ জলপথ তিনি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। এই কাজে তিনি যে কত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার সীমা নাই। তিনি ভিক্‌টোরিয়া নায়াঞ্জার ক্ষেত্রফল স্থির করিয়াছিলেন। টাঙ্গানিয়া হ্রদের দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল স্থির করিয়াছিলেন। ডবেরু নামে এক নূতন হ্রদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। Through the Dark Continent নামে তাঁহার এক পুস্তকে তিনি এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত দিয়াছিলেন। তাঁহার এবারকার ভ্রমণের ফলে নীল নদীর উৎসের চারিদিকের সমস্ত ভূভাগ ইংরেজের সংরক্ষণের গণ্ডীতে আসিল।

কংগো নদী আফ্রিকার মধ্যভাগ চিরিয়া জলপথ করিয়া লইয়াছে, ইহাই তাহার গুরুত্বের কারণ। বেলজিয়মের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্‌ড এই গুরুত্ব বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। আফ্রিকা হইতে স্ট্যানলি যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য লিওপোল্‌ড তাঁহার নিজের কিছু কিছু লোক মার্সেই-এ পাঠাইলেন। তাহারা রাজার পক্ষ হইয়া স্ট্যানলিকে ফিরিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু স্ট্যানলি তখন চাহিতেছিলেন বিশ্রাম করিতে, তাই তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। ১৮৭৯-এ লিওপোল্‌ড

পুনরায় তাঁহাকে ফিরিয়া যাইবার আমন্ত্রণ জানান। এতদিন স্ট্যানলি ইংরেজ বণিকদিগকে আগ্রহান্বিত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হন নাই। তাই ব্রুসেল্‌স গিয়া তিনি লিওপোল্‌ডের নিমন্ত্রণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। তিনি পুনরায় কংগো গেলেন। পাঁচ বৎসর পরিশ্রমের পর তিনি লিওপোল্‌ডের পতাকাতলে কংগোর স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। The Congo and the Founding of its Free State (১৮৮৫) নামক পুস্তকে তিনি এ বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন।

১৮৮৪ সালে তিনি পুনরায় ইউরোপে ফিরিলেন। তাঁহার বক্তৃতার ফলে জার্মানীতে আফ্রিকার ব্যাপারে উৎসাহ দেখা দিল। আফ্রিকা করতলগত করিবার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। স্ট্যানলি ইংলণ্ডে ছিলেন, কিন্তু বেলজিয়মের রাজার প্রতি তাঁহার নিষ্ঠাও তাঁহাকে টানিতে ছিল। উভয়ের হিতসাধনের জন্য তিনি আবার আফ্রিকায় গেলেন। ভূমধ্যরেখার নিকটবর্তী প্রদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার সঙ্গীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মারা গেলেন, কেহ কেহ নিহত হইলেন। কিন্তু তিনি সাহস হারাইলেন না। তিনি তাঁহার কাজ চালাইতে থাকিলেন আর ইংরেজের জন্য সেখানকার আমিনদের নিকট হইতে অনেক সুবিধা করিয়া লইলেন। এই ভীষণ যাত্রার বর্ণনা তাঁহার In Darkest Africa নামক পুস্তকে (১৮৯০) আছে।

এই ভ্রমণের পর তিনি যখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহার উপর বিবিধ সম্মান বৃষ্টি হইতে লাগিল। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারি ডিগ্রী প্রদান করিল। তিনি এক শিল্পী নারীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার আগ্রহে তিনি পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হইলেন। কিন্তু দেখা গেল, এই কাজে তাঁহার অনুরাগ ছিল না। তাঁহার যৌবনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত My Early Travels and Adventure নামক গ্রন্থে লেখা হইয়াছে। ১৮৯৭ সালে তিনি শেষবার আফ্রিকায় যান। সেবারকার বর্ণনা তিনি তাঁহার Through South Africa (১৮৯৮) নামক গ্রন্থে দিয়াছেন। ১৮৯৯ সালে ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। জীবনের শেষ দিন শান্তিতে কাটাইয়া তিনি ১৯০৪ খ্রীঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পৃ ২৯৬ মিশরের সংস্কৃতি ॥ মিশরে পুরোহিত, রাজ্যের পরিচালকবর্গ, কৃষক ও কারিকর, মজুর বা ক্রীতদাস—এই চার বর্গে বিভক্ত সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

অফলাতুনের সমাজ-ব্যবস্থা॥ 'রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে প্লেটো আদর্শ নগর রাজ্যের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে তিনি লোককে চার বর্গে ভাগ করিয়াছেন : (১) তত্ত্বজ্ঞ রাজ্য কর্তা, (২) যোদ্ধা, (৩) চাষী, কারিকর ও বণিক, (৪) ক্রীতদাস।

পৃ ২৯৭ অশ্বত্থামা॥ অশ্ব+স্থামন্। স্থামন=বল। স্থামন্-এর 'স' লোপপ াইয়াছে।

৭০

বর্ষাগান

পৃ ২৯৮ কালিদাসের শ্লোক॥ এই শ্লোকটি।

নবজলধরঃ সংনদ্ধোঽয়ং ন দৃপ্তনিশাচরঃ।
সুরধনুরিদং দূরাকৃষ্টং ন নাম শরাসনম্॥
অয়মপি পটুর্ধারাসারো ন বাণপরম্পরা।
কনকনিকষস্নিগ্ধা বিদ্যুৎ প্রিয়া ন মমোর্বশী॥—বিক্রমোর্বশীয়ম্ ৪।৭

ইহা নিশ্চয় অলংকারের উদাহরণ। শ্লোকের অর্থ মূলে দেওয়া আছে।

চিরপ্রবাসী॥ আমাদের দেশে লোকে চিরপ্রবাসকে মরণ সমান বলিয়া মনে করিত। 'রোগী চিরপ্রবাসী যজ্জীবতি তন্মরণম্।'

পৃ ২৯৯ জীবনপ্রবাহ রুদ্ধ করিবার বাঁধ॥ জীবনপ্রবাহ, অর্থাৎ জলের প্রবাহ। জলের প্রবাহ মানুষকে অগ্রসর হইয়া ওপারে যাইতে দেয় না। নদীর উপর পুল করা হইলে নদীর এই প্রতিরোধের শক্তি পরাস্ত হয়।

সেতু॥ সেতুর অর্থ 'বাঁধ'।

পৃ ৩০০ ক্ষুদ্র এক নীড়ের রূপ ধারণ॥ এই উপমা উপনিষদের একটি বচন হইতে দেখা যায়।

যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।

যেখানে সমস্ত বিশ্ব এক ছোট পাখির বাসা হইয়া যায়। এইরূপ বাসায় যে সব জীব থাকে স্বয়ং ভগবানই তাহাদের পক্ষীরূপে তা দেন।

কারোয়ার॥ বোম্বাই রাজ্যের পশ্চিম সমুদ্রতটে অতিশয় সুন্দর এক

বন্দর, লেখক সেখানে তাঁহার শৈশবের অনেক বৎসর কাটাইয়াছিলেন। লেখকের পুস্তক 'মরণযাত্রা'য় কারোয়ারের উল্লেখ বহুবার আছে।

জীবনচক্র ॥ গীতায় (৩।১৬) এই প্রবর্তিত জীবনচক্রের প্রসঙ্গ আছে। এই উপলক্ষে লেখকের 'জীবনচক্র' নামক নিবন্ধ বিশেষ করিয়া পঠনীয়।

পৃ ৩০১ যজ্ঞ-চক্র ॥ জীবনচকেই গীতাতে যজ্ঞচক্র বলা হইয়াছে। 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা'। গীতা ৩।১০-১৬

পরস্পরের সাহায্যে স্বাশ্রয় ॥ ব্যক্তিগত জীবনে স্বাশ্রয় ভাল। সামাজিক জীবনের বুনিয়াদে পরস্পরাবলম্বনই প্রধান। এইরূপ পরস্পরাবলম্বনে আদান-প্রদান যখন সমান সমান বা তুল্যমান হয়, তখন জীবনের বোঝা কাহারও উপর বেশি করিয়া চাপে না বলিয়া তাহাতে স্বাশ্রয়ের নিষ্পাপের ভাব আসে।

অবতার-কৃত্য ॥ অবতার কথাটার মানে হইল উপর হইতে নীচে নামা। বর্ষার জল উপর হইতে নীচে নামে। স্বয়ং ভগবান যখন নীচে নামিয়া মনুষ্যরূপ ধারণ করেন, তখন অবতার বলা হয়।

কুরুক্ষেত্র ॥ ভারতীয় যুদ্ধের রণক্ষেত্র।

মখমলের পোকা ॥ যাহার নাম ইন্দ্রগোপ।

দ্বিগুণ শোভা ॥ মখমলের কাপড়ে যেমন শোভা হয় তেমন শোভা। এক দিক দিয়া দেখিলে গাঢ় রং, অন্য দিক হইতে উহাই ফিকা বা অন্য কোনও রং বলিয়া মনে হয়। ইংরেজিতে 'Shot'।

পৃ ৩০২ আকাশের দেবতা ॥ তারা।

'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ॥ ভোজনের সর্বশেষ উপকরণ হইল মিষ্ট।

'ঋতুসংহার' ॥ কালিদাসের এক অতি সুন্দর কাব্য, যাহাতে ছয় ঋতুর বর্ণনা আছে।

'ঋতুভ্য' ॥ বিবাহের সময় সপ্তপদী দ্বারা গৃহস্থাশ্রমের জন্য যে জীবন-দীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহার মধ্যে ষষ্ঠ প্রতিজ্ঞা হইল 'ঋতুভ্যঃ'। 'জীবনে আমরা উভয়ে ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন পরিবর্তনও করিব'—এই হইল সেই প্রতিজ্ঞার ভাবার্থ।

সূচী

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঋ

খ

গ

ঘ

ধ

ন

ভ

শ

স

হ